প্রাক্‌কথন

নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক শ্রেণির জন্য যে পাঠক্রম প্রবর্তিত হয়েছে, তার লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হ'ল প্রতিটি শিক্ষার্থীকে তাঁর পছন্দমতো কোনও বিষয়ে সাম্মানিক (Honours) স্তরে শিক্ষাগ্রহণের সুযোগ করে দেওয়া। এক্ষেত্রে ব্যক্তিগতভাবে তাঁদের গ্রহণক্ষমতা আগে থেকেই অনুমান করে না নিয়ে নিয়ত মূল্যায়ণের মধ্য দিয়ে সেটা স্থির করাই যুক্তিযুক্ত। সেই অনুযায়ী একাধিক বিষয়ে সাম্মানিক মানের পাঠ-উপকরণ রচিত হয়েছে ও হচ্ছে — যার মূল কাঠামো স্থিরীকৃত হয়েছে একটি সুচিন্তিত পাঠক্রমের ভিত্তিতে। কেন্দ্র ও রাজ্যের অগ্রগণ্য বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের পাঠক্রম অনুসরণ করে তার আদর্শ উপকরণগুলির সমন্বয়ে রচিত হয়েছে এই পাঠক্রম। সেই সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অধ্যেতব্য বিষয়ে নতুন তথ্য, মনন ও বিশ্লেষণের সমাবেশ।

দূর-সঞ্চারী শিক্ষাদানের স্বীকৃত পদ্ধতি অনুসরণ করেই এই সব পাঠ-উপকরণ লেখার কাজ চলছে। বিভিন্ন বিষয়ের অভিজ্ঞ পণ্ডিতমণ্ডলীর সাহায্য এ কাজে অপরিহার্য এবং যাঁদের নিরলস পরিশ্রমে লেখা, সম্পাদনা তথা বিন্যাসকর্ম সুসম্পন্ন হচ্ছে তাঁরা সকলেই ধন্যবাদের পাত্র। আসলে, এঁরা সকলেই অলক্ষ্যে থেকে দূরসঞ্চারী শিক্ষাদানের কার্যক্রমে অংশ নিচ্ছেন ; যখনই কোনো শিক্ষার্থী এই পাঠ্যবস্তুনিচয়ের সাহায্য নেবেন, তখনই তিনি কার্যত একাধিক শিক্ষকমণ্ডলীর পরোক্ষ অধ্যাপনার তাবৎ সুবিধা পেয়ে যাচ্ছেন।

এইসব পাঠ-উপকরণের চর্চা ও অনুশীলনে যতটা মনোনিবেশ করবেন কোনও শিক্ষার্থী, বিষয়ের গভীরে যাওয়া তাঁর পক্ষে ততই সহজ হবে। বিষয়বস্তু যাতে নিজের চেষ্টায় অধিগত হয়, পাঠ-উপকরণের ভাষা ও উপস্থাপনা তার উপযোগী করার দিকে সর্বস্তরে নজর রাখা হয়েছে। এরপর যেখানে যতটুকু অস্পষ্টতা দেখা দেবে, বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন পাঠকেন্দ্রে নিযুক্ত শিক্ষা-সহায়কগণের পরামর্শে তার নিরসন অবশ্যই হ'তে পারবে। তার ওপর প্রতি পর্যায়ের শেষে প্রদত্ত অনুশীলনী ও অতিরিক্ত জ্ঞান অর্জনের জন্য গ্রন্থ-নির্দেশ শিক্ষার্থীর গ্রহণ-ক্ষমতা ও চিন্তাশীলতা বৃদ্ধির সহায়ক হবে।

এই অভিনব আয়োজনের বেশ কিছু প্রয়াসই এখনও পরীক্ষামূলক — অনেক ক্ষেত্রে একেবারে প্রথম পদক্ষেপ। স্বভাবতই ত্রুটি-বিচ্যুতি কিছু কিছু থাকতে পারে, যা অবশ্যই সংশোধন ও পরিমার্জনার অপেক্ষা রাখে। সাধারণভাবে আশা করা যায়, ব্যাপকতর ব্যবহারের মধ্য দিয়ে পাঠ-উপকরণগুলি সর্বত্র সমাদৃত হবে।

অধ্যাপক (ড.) শুভ শঙ্কর সরকার

উপাচার্য

~~SGR -02, UNIT-1-3~~

তৃতীয় পুনর্মুদ্রণ : ফেব্রুয়ারি, 2019

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের দূরশিক্ষা ব্যুরোর বিধি অনুযায়ী মুদ্রিত।
Printed in accordance with the regulations of the Distance Education Bureau of the University Grants Commission.

পরিচিতি

বিষয় : সহায়ক ভূগোল **স্নাতক পাঠক্রম**

পাঠক্রম ঃ পর্যায় ঃ SGR : 02

	রচনা	সম্পাদনা
একক 1 :	ড. জ্যোতির্ময় সেন	ড. কানন চ্যাটার্জী
	ড. শিবদাস ঘোষ	
	ড. কল্পনা মিত্র	
একক 2 :	ড. জ্যোতির্ময় সেন	শ্রী বিরাজ কান্তি মণ্ডল
একক 3 :	ড. জ্যোতির্ময় সেন	শ্রী বিরাজ কান্তি মণ্ডল

প্রজ্ঞাপন

এই পাঠ-সংকলনের সমুদয় স্বত্ব নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারা সংরক্ষিত। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের লিখিত অনুমতি ছাড়া এর কোনোও অংশের পুনর্মুদ্রণ বা কোনোভাবে উদ্ধৃতি সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

মোহন কুমার চট্টোপাধ্যায়
নিবন্ধক

নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

SGR - 02

(স্নাতক পাঠক্রম)

একক 1 ❑ অর্থনৈতিক ভূগোল

1.1 ❑	সম্পদের ধারণা ও শ্রেণিবিভাগ	7
1.2 ❑	সম্পদের ব্যবহার (প্রাথমিক কার্যাবলি হিসাবে)	36
1.3 ❑	সম্পদের ব্যবহার (দ্বিতীয় শ্রেণির কার্যাবলি হিসাবে)	76
1.4 ❑	প্রশ্নাবলী	76

একক 2 ❑ জনসংখ্যা ভূগোল

2.1 ❑	পৃথিবীর জনসংখ্যার বৃদ্ধি ও বণ্টন	78
2.2 ❑	পরিব্রাজন	118
2.3 ❑	জনসংখ্যা গঠন ও গ্রন্থনা ও সামাজিক বিষয়/সমস্যা	153

একক 3 ❑ ভারতের আঞ্চলিক ভূগোল

3.1 ❑	প্রাকৃতিক অবস্থা	222
3.2 ❑	অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থা	305
3.3 ❑	অঞ্চল ও তার শ্রেণিবিভাগ এবং আঞ্চলিকীকরণ	452

একক—1 ❑ অর্থনৈতিক ভূগোল

গঠন

প্রস্তাবনা

উদ্দেশ্য

1.1 সম্পদের ধারণা ও শ্রেণিবিভাগ

1.1.1 সম্পদের শ্রেণিবিভাগ

1.1.2 সম্পদ সৃষ্টির উপাদান

1.1.3 সম্পদের বৈশিষ্ট্য

1.1.4 সম্পদের কার্যকারিতা তত্ত্ব

1.1.5 সম্পদের কার্যকারিতার বিবর্তন

1.1.6 সম্পদের কার্যকারিতার নিয়ন্ত্রক

1.2 সম্পদের ব্যবহার (As Primary activity)

1.2.1 বনভূমির সংজ্ঞা, প্রকৃতি ও আয়তন

1.2.2 পশুপালনের সংজ্ঞা

1.2.3 সমুদ্রের অর্থনৈতিক গুরুত্ব

1.2.4 কৃষিকার্যের সংজ্ঞা

1.2.5 খনিজ ও শক্তি সম্পদের ভূমিকা

1.2.6 খনিজ ও অন্যান্য সম্পদ

1.2.7 খনিজ সম্পদের শ্রেণিবিভাগ

1.2.8 প্রাকৃতিক জ্বালানি—খনিজ তেল ও কয়লা

1.3 সম্পদের ব্যবহার (As Secondary activity)

1.3.1 কার্পাস বয়ন শিল্প

1.3.2 লৌহ ও ইস্পাত শিল্প

1.3.3 পেট্রোকেমিক্যাল শিল্প

1.4 প্রশ্নাবলী

প্রস্তাবনা

আফগানিস্তান পৃথিবীর দরিদ্রতম দেশের মধ্যে অন্যতম, আর যুক্তরাষ্ট্র (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বা, U.S.A) পৃথিবীর ধনী দেশগুলোর মধ্যে একটি। প্রথমটি অনুন্নত, দ্বিতীয়টি উন্নত দেশ। এখন প্রশ্ন জাগা খুব স্বাভাবিক, কেন এমনটি হল? আফগানবাসীরা কি মার্কিনীদের চেয়ে শ্রমবিমুখ না কম পরিশ্রমী? উত্তর হল এর কোনটাই তো নয়, বরং আফগানবাসীরা মার্কিনীদের তুলনায় অনেক বেশি কষ্টসহিষ্ণু ও পরিশ্রমী। এবার তবে প্রশ্ন করতে হয় উভয় দেশের মধ্যে উন্নয়নের এত ফারাক কেন? উত্তর হল আফগানিস্তানে মানব উদ্যোগের (Human Enterprise) সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও সম্পদের (বিশেষ করে খনিজ সম্পদের) একান্ত অভাব। প্রকৃতি তার দরাজ হাতে যুক্তরাষ্ট্রকে সাজিয়ে দিয়েছে অতুল বৈভবে, আর বঞ্চিত করেছে আফগানিস্তানকে। ফলে যুক্তরাষ্ট্র খনিজ সম্পদ, উর্বর মাটি আর মানব উদ্যোগে ভরপুর, আফগানিস্তানে মানব উদ্যোগের সম্ভাবনা কিছু মাত্রায় থাকলেও খনিজ সম্পদ ও উর্বর মাটির অভাবে দেশটি বিত্তহীন হয়েছে। এই প্রসঙ্গে বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ জিমারম্যান-র একটি উক্তি মনে আসে, "Resources are the base of both security and opulence; they are the foundation of power and wealth. They affect man's destiny in war and peace" (World Resources and Industries) অর্থাৎ সম্পদ নিরাপত্তা ও সমৃদ্ধির ভিত্তি তথা শক্তি ও ঐশ্বর্যের উৎস। সম্পদ যুদ্ধ ও শান্তি উভয় সময়েই মানুষের ভাগ্যকে নিয়ন্ত্রণ করে।

উদ্দেশ্য ঃ

এই এককটি পাঠ করে আপনি—

- সম্পদের সংজ্ঞা নির্দেশ করতে পারবেন।
- সম্পদের প্রকৃতি, বৈশিষ্ট্য ও বণ্টন সম্বন্ধে ধারণা করতে পারবেন।
- অতীতে সম্পদ সম্বন্ধে মানুষ কী ধারণা পোষণ করত তা বুঝিয়ে দিতে পারবেন।
- কী কী বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে সম্পদকে ভাগ করা যায় বা সম্পদের শ্রেণিবিভাগ কিসের ভিত্তিতে করা যায় তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

1.1 সম্পদের ধারণা ও শ্রেণিবিভাগ (Concept and Classifcation of Resources)

সম্পদ চেতনা (Resource and Consciousness)

সম্পদ সম্পর্কে মানুষের এই আগ্রহ নতুন কিছু নয়, বহু যুগ ধরেই মানুষ ভেবে আসছে যে আগামীদিনের

খাবার কোথা থেকে আসবে? সম্পদ বা জমির দখল নিয়ে বিবাদ নতুন কিছু নয়। ইতিহাসের পাতা ওল্টালে দেখা যায় যে কোন খনিজ সম্পদের অধিকার নিয়ে বা জলসীমা নিয়ে দ্বন্দ্ব নতুন কোন ঘটনা নয়।

যদিও সম্পদ সম্পর্কে আগ্রহ পুরনো, তবুও সাম্প্রতিককালে পাশ্চাত্য দেশগুলোতে সম্পদ চেতনার নতুন ধারা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। আজকের মানুষের অভাববোধ ও ভোগ প্রাচীনকালের চেয়ে অনেক গুণ বেড়ে গেছে। আধুনিক যুগের মানুষের সমৃদ্ধি ও নিরাপত্তার ভিত্তি হল সম্পদ। এই নতুন সম্পদ চেতনা মানুষের অর্থনৈতিক চিন্তাধারার ক্রমবিবর্তনের ধারাবাহিক ফসল। আদিমকালে মানুষের সম্পদ সম্পর্কিত চেতনা ছিল খুব স্থূল। মানুষ যুগ যুগ ধরে নানাবিধ বাধা-নিষেধের মধ্যে শৃঙ্খলিত জীবনযাপন করত, কারণ ঐ সময় একদিকে যেমন ছিল কঠোর সামাজিক অনুশাসন, অন্যদিকে ছিল সামন্তরাজা ও ধর্মযাজক ও পুরোহিতের অত্যাচার। সে যুগে বেশির ভাগ মানুষ, দাস ও ভূমিদাস (serf) হিসেবে অভিজাত সম্প্রদায়, রাজন্যবর্গ, শক্তিমান একনায়ক, পুরোহিত বা যাজকদের ভোগবিলাসের পণ্যসামগ্রী উৎপাদন করত। প্রাচীন রোম সাম্রাজ্যে ব্যক্তি-স্বাধীনতার কথা শোনা গেলেও তা ছিল কিছু সংখ্যক সুযোগ সন্ধানীর জন্য। ষোড়শ শতাব্দী থেকে শুরু হল বিভিন্ন প্রকার আবিষ্কার যার জোয়ারে ভেসে গিয়েছিল পশ্চিমী দেশগুলো। কলকারখানার সংখ্যা বাড়তে থাকে, বাড়তি পণ্য বিক্রয়ের জন্য বাজারের খোঁজ চলতে থাকে। শুরু হয় উপনিবেশ স্থাপনের চক্রান্ত। উপনিবেশ থেকে প্রাকৃতিক সম্পদ আহরণ করে কিভাবে নিজের দেশে ঐ সম্পদের গুণগত ও প্রকৃতিগত পরিবর্তন এনে তাকে আবার উপনিবেশে পাঠিয়ে কি করে আরও ধনী হওয়া যায় তার প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে যায়। একদিকে যেমন প্রাকৃতিক সম্পদের নতুন আবিষ্কার ও ব্যবহারের সাথে সাথে মানুষ তার অধিকার ও ব্যক্তি স্বাধীনতার বিষয়ে সচেতন হয়ে ওঠে ও ব্যক্তি স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করতে থাকে, অন্যদিকে তেমনি ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে সরকারি হস্তক্ষেপ ক্রমশঃ দূরীভূত হতে থাকে। বাণিজ্যক্ষেত্রে এই শৃঙ্খল মুক্তি অবশ্য অবাধ বাণিজ্যের মধ্যে দিয়ে এসেছিল, শিল্প ক্ষেত্রে দেখা যায় স্বাধীন শিল্পোদ্যোগ (free enterprise system)। অনেকে মনে করেন অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতাব্দীর ব্যাপক অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি সামাজিক ও সরকারি বাধা-নিষেধের জাল অপসারণের ফলে সম্ভব হয়েছে। তাঁরা আরও মনে করেন যে ব্যক্তিগত উদ্যোগ এবং বাণিজ্য ও মুনাফা অর্জনের অবাধ অধিকার থাকলেই সবচেয়ে বেশি জনকল্যাণ হবে। প্রকারান্তরে বলতে হয় অবাধ প্রতিযোগিতার মধ্যে দিয়ে ব্যক্তি ও সমষ্টির স্বার্থের মধ্যে সমন্বয় (Coordination) ঘটবে।

বলতে গেলে গোটা ঊনবিংশ শতাব্দী জুড়ে এই মতবাদ সত্য ও অভ্রান্ত বলে ধরে নেওয়া হত। 1890 সালে প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ Alfred Marshall (আলফ্রেড মার্শাল) এই অবাধ বাণিজ্যনীতি মতবাদের বিরোধীতা করেন। তার মতে নিজ নিজ উন্নতি করলেই দেশের সার্বিক কল্যাণ সাধিত হবে এমন মনে করা ঠিক নয়। কখনও কখনও ব্যক্তিগত স্বার্থ ও সামাজিক স্বার্থ বিপরীতমুখী হয়ে থাকে। মাটি, অরণ্য, খনিজ ও শক্তিসম্পদ, জলপ্রবাহ প্রভৃতি মৌলিক সম্পদের ক্ষেত্রে জনস্বার্থ রক্ষার জন্য দরকার সঠিক সরকারি নীতি। এজন্য দেশের সার্বজনীন কল্যাণের জন্য সরকারেরও কিছু করার আছে। পরবর্তীকালে পিগু (Pigou), কেইনস্ ও (John Meynand Keynes) এই মত সমর্থন করেন।

ব্যক্তিগত ব্যবসায়িক স্বার্থের সাথে সরকারের যে সমস্ত বিষয়ে তফাৎ রয়েছে, দেশের সম্পদ বিশেষ করে মাটি, জল, বনভূমি প্রভৃতি মৌলিক সম্পদের সংরক্ষণ তাদের অন্যতম। ব্যবসায়ীর প্রধান লক্ষ্য হল অল্প সময়ে

বেশি লাভ করা। তার দৃষ্টিভঙ্গী বর্তমান বা নিকট ভবিষ্যতের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। আগামী একশ বা দুশো বছরে সম্পদ নিঃশেষিত হলে দেশের সামগ্রিক চেহারায় কি পরিবর্তন আসবে সেটা তার লক্ষ্য থাকে না। যেমন একজন কাঠ বিক্রেতার লক্ষ্য হল বন থেকে কিভাবে সবচেয়ে বেশি সংখ্যায় কাঠ কেটে তা থেকে বেশি লাভ করা যায়। কিন্তু বনভূমি তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে গেলে তার প্রভাব যে মাটি কিংবা জলবায়ুর ওপর পড়বে সেদিকে তার দৃষ্টি থাকে না। তেমনিভাবে একজন কয়লা ব্যবসায়ী কয়লা সম্পদ ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য সংরক্ষণের জন্য কী কী ব্যবস্থা নেওয়া দরকার তা নিয়ে মাথা ঘামায় না। কারণ তারও লক্ষ্য হল কিভাবে কয়লা খনি থেকে সর্বাধিক কয়লা তোলা যায়। উভয়বিধ ক্ষেত্রেই সামাজিক স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হবার সম্ভাবনা থেকে যায়। তাই বনভূমি, মাটি, খনিজদ্রব্য ইত্যাদি মৌলিক সম্পদ সংরক্ষণের জন্য সরকারি হস্তক্ষেপ একান্ত প্রয়োজনীয়। এজন্য দীর্ঘমেয়াদী কার্যসূচী গ্রহণ করতে হয়, যদিও এতে আশু ফলাফলের সম্ভাবনা থাকে না। জনগণের স্বার্থের দিকে লক্ষ্য রেখে এরকম দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহণ করা শুধুমাত্র সরকারের পক্ষেই সম্ভব।

তাই সামাজিক স্বার্থরক্ষা ও সংরক্ষণের জন্য মার্শাল সরকারি নীতি ও হস্তক্ষেপকে সমর্থন করেছেন।

অর্থনীতির ক্ষেত্রে মার্শালের এই মতবাদ বর্তমানে প্রত্যেক জাতি ও সরকারকে সম্পদ সম্বন্ধে সচেতন করে তুলেছে।

সম্পদ উন্নয়নের ঐতিহাসিক পটভূমিকা (Historical background of resource development)

গোটা পৃথিবীতে সম্পদ চেতনার যে বিবর্তন লক্ষ্য করা যায় তার পেছনে রয়েছে নিম্নলিখিত কিছু ঐতিহাসিক ঘটনাবলী—

(i) এদের মধ্যে প্রধান হল যুক্তরাষ্ট্রে বসতি বিস্তারের ঘটনা। যখন থেকে যুক্তরাষ্ট্রে আর বিনামূল্যে জমি সংগ্রহ করা সম্ভব হল না, তখন থেকে এই নবচেতনার উন্মেষ হয়।

(ii) দুটি বিশ্বযুদ্ধ শক্তির ভারসাম্য রক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে সব রাষ্ট্রকে সচেতন করে তুলেছে। আধুনিক যুদ্ধ সম্পদের অধিকারকে কেন্দ্র করেই ঘটে থাকে। এই যুদ্ধ সফলতার সাথে পরিচালনা করতে হলে দেশের সম্পদ সংরক্ষণ করা প্রয়োজন, কারণ এর ওপরেই নির্ভর করে সামরিক শক্তি। বিভিন্ন দেশে সম্পদের পূর্ণ ব্যবহার করে দেশের শক্তি বৃদ্ধি করতে সব রাষ্ট্রনায়ক চিন্তাভাবনা শুরু করেছেন।

(iii) ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার অবিসম্বাদী ফল হিসেবে দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তীকালে গোটা পৃথিবী জুড়ে অর্থনৈতিক মন্দা দেখা দেয়। তা প্রতিরোধ করার জন্য মার্কিন প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট (Franklin Delano Roosvelt) নিউ ডিল (New Deal) নামে যে অর্থনৈতিক সংস্কার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন তা ধনতান্ত্রিক দেশগুলোতে বিশেষ জনপ্রিয় হয়। কেবলমাত্র ব্যক্তিগত বণিক স্বার্থে মৌলিক উপাদানসমূহ যাতে বরাবরের জন্য ব্যবহার না হয় তার ব্যবস্থা করাই সরকারি হস্তক্ষেপের মূল উদ্দেশ্য। পরবর্তীকালে অন্যান্য দেশেও রুজভেল্ট মডেল-এর পরিকল্পনা নেওয়া হয়।

(iv) দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ফলে দুই বড় শক্তি-শিবিরের (যুক্তরাষ্ট্র ও পূর্বতন প্রাক্তন সোভিয়েত ও রাশিয়া) মধ্যে ঠাণ্ডা লড়াইও (cold war) এই সম্পদ-চেতনার একটি বর্হিপ্রকাশ। উভয় দেশই অর্থনৈতিক উন্নয়নে

সচেষ্ট হয়। এজন্য তারা বিভিন্ন দেশের ওপর অর্থনৈতিক প্রভুত্ব কায়েম করতে চায়। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মধ্যে যুদ্ধ বিগ্রহের পেছনে এদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ মদত থাকত।

(v) প্রাক্তন সোভিয়েত রাশিয়া ও পূর্ব ইউরোপীয় দেশগুলোতে সমাজতন্ত্রের পতনের পর মুক্ত অর্থনীতির জন্য নতুন করে সওয়াল শুরু হয়েছে।

(vi) ইদানীং "বিশ্বায়নের" (globalisation) যুগে যুক্তরাষ্ট্রের "দাদাগিরি" চোখে পড়ার মতন আমাদের দেশ ভারতবর্ষের দিকে তাকালে এই সত্যটি ধরা পড়ে অবাধ বাণিজ্য (free trade) রীতি গ্রহণের ফলে প্রাথমিক অবস্থায় প্রতিযোগিতা বর্তমান থাকলেও পরে বণিকগোষ্ঠী আরও বেশি মুনাফা অর্জনে এবং ক্ষমতা কেন্দ্রীকরণের জন্য একচেটিয়া বাজার প্রতিষ্ঠায় প্রয়াসী হয়েছে। এজন্য বহুজাতিক কর্পোরেশন (multinational corporation) গঠিত হয়েছে। অবাধ বাণিজ্য মুখোশের আড়ালে অবাধ লুণ্ঠনের চেহারা নিয়েছে এবং নিচ্ছে। অবাধ বাণিজ্য নীতির ভিত্তি ছিল যে অবাধ প্রতিযোগিতা, তা নষ্ট হয়ে যাওয়ায় অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সরকারি হস্তক্ষেপের দাবি প্রবল হয়ে উঠেছে। সামগ্রিক কল্যাণের খাতিরে দেশের সম্পদ সরকার কর্তৃক পরিকল্পিত ও নিয়ন্ত্রিত হবার পক্ষে জনমত ঝুঁকছে। ভারতে অবাধ বাণিজ্যনীতি সর্বক্ষেত্রে শুরু হয়েছে। তাই এর ফলাফলের জন্য আমাদের অপেক্ষা করতে হবে।

(vii) আধুনিক রাষ্ট্রের আয়তন বড় ও গঠন খুব জটিল। নাগরিক জীবন (civil life) সুশৃঙ্খলভাবে নিয়ন্ত্রণের জন্য জীবনের প্রায় সবক্ষেত্রেই সরকারি হস্তক্ষেপের প্রয়োজন। সামগ্রিক কল্যাণের স্বার্থে অনেক দেশেই প্রাকৃতিক উপকরণের ওপর সরকারি মালিকানা স্থাপিত হয়েছে। এমন কি ধনতান্ত্রিক দেশগুলোতে ও মৌলিক সম্পদ সংরক্ষণের ব্যাপারে সেই সেই দেশের সরকার সজাগ হয়ে উঠেছে।

(viii) সম্পদের সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে চেতনা বাড়ার ফলে ব্যবসায়ী শিল্পপতিরা তাদের সামাজিক দায়িত্ব সম্পর্কে ধীরে ধীরে সজাগ হয়ে উঠেছে। সম্পদ সংরক্ষণ ও পরিবেশ দূষণ ইত্যাদি বিষয়ে তারা নজর দিতে শুরু করেছে।

(ix) 1991 সালে উপসাগরীয় যুদ্ধের পর থেকে পরিবেশ দূষণ ও প্রাকৃতিক ভারসাম্যতা বজায় রাখার জন্য আন্তর্জাতিক স্তরে আলাপ আলোচনা শুরু হয়েছে। কৃষিতে কৃত্রিম সার ব্যবহারের বিপজ্জনক দিক নিয়ে চিন্তাভাবনা শুরু হয়েছে। শিল্পদূষণ নিয়ে পরিবেশবিদ্‌রা গবেষণা চালাচ্ছেন। আর্সেনিক যুক্ত জল নিয়েও সরকার যথেষ্ট উদ্বিগ্ন।

(x) জীবাশ্ম জ্বালানিতে (fossil fuel) যে পরিমাণ কার্বন-ডাই-অক্‌সাইড (CO_2) বের হয়, তাতে এর প্রতিরোধ ব্যবস্থা না নিলে পৃথিবীর আবহাওয়া দূষিত হবার সম্ভাবনা রয়েছে। বনভূমি ধ্বংস ও জলাভূমি কমে যাওয়ার ফলে মানব প্রজাতির জৈব বৈচিত্র্যের ক্ষেত্রে আশঙ্কাজনক অবস্থা তৈরি হয়েছে।

(xi) সমীক্ষায় দেখা যায় বিগত বছরে অন্তত 1.2 বিলিয়ান হেক্টর জমির উৎপাদিকা শক্তি কমে গেছে। অথচ আগামী শতাব্দীর মাঝামাঝি লোকসংখ্যা প্রায় দু'গুণ হয়ে যাবে।

সংজ্ঞা (Definition)

পেটারসনের (J. H. Paterson)-এর মতে ভূগোলে প্রাকৃতিক ও মানুষের তৈরি বিষয়গুলোকে সমীক্ষা

করা হয় শুধুমাত্র বস্তু হিসেবে নয়, সম্পদ হিসেবেও। 'সম্পদ' কথার অভিধানগত অর্থ হল প্রাণীকূল ও মানুষের জীবনকে টিকিয়ে রাখার সহায়কবস্তু—'means of support—support for the animal life and for man' কথাটিকে একটু ঘুরিয়ে বললে দাঁড়ায় মানুষ ও জীবজন্তুদের বেঁচে থাকবার জন্য যা কিছু দরকার সে সব কিছুই হল সম্পদ বা Resource।

ইংরেজী রিসোর্স (Resource) কথাটি বিশ্লেষণ করলে আমরা পাই Re (রি) এবং source (সোর্স); রি বলতে বুঝি আবার বা পুনরায় (again) আর সোর্স হল উৎস। 'রিসোর্স' কথাটির সাথে সময়ের যোগসূত্র বিদ্যমান। কোন জিনিস প্রকৃতিতে থাকলেই হবে না, প্রকৃতিপ্রদত্ত বস্তুকে মানুষের প্রয়োজনের উপযোগী করে নিতে হবে। বলা যেতে পারে উৎস বা পদার্থের কার্যকারিতা সৃষ্টি করতে হবে এবং এই কার্যকারিতাই হল সম্পদ।

রিসোর্সের অভিধানগত অর্থ থেকে আমরা পেলাম—

(i) যার ওপর কেউ সাহায্য, সহযোগিতা এবং যোগদানের জন্য নির্ভর করতে পারে (that upon which one relies for aid, support or supply)

(ii) কোন নির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জনের হাতিয়ার (Means to attain given ends)।

(iii) সুযোগ থেকে সুবিধে গ্রহণের ক্ষমতা ও অসুবিধে ঠেকানো (the capacity to take advantage of opportunities or to extricate oneself from difficulties)।

অর্থবিদ্যায় 'wealth'-কে সম্পদ বলে। অর্থবিদ্যায় সম্পদ বলতে বোঝায় এমন কোন বস্তু (i) যার উপভোগ বা অভাবমোচনের ক্ষমতা আছে, (ii) যার যোগান চাহিদার তুলনায় অপ্রচুর ও (iii) যা বিক্রয় যোগ্য। কিন্তু অর্থনৈতিক ভূগোলে সম্পদ বলতে কোন পদার্থ বা বস্তুকে বোঝায় না। একে (সম্পদ) মানুষের চাহিদা মেটাবার উপায় হিসাবে দেখা যায়।

Dictionary of Social Sciences-এর মতে সম্পদ হল মানব পরিবেশের সেই সব দিক যা দিয়ে মানুষের অভাব মেটানোর কাজে সুবিধে হয়, বা অভাব পূরণ করে এবং সামাজিক লক্ষ্য মেটায় বা মেটাতে সাহায্য করে "Resources are those aspects of man's environment which render possible or facilitate the satisfaction of human wants and the attainment of social objectives..." সোজা কথায় বলা যায় সেই সব উপাদান যা মানুষের কাছে প্রয়োজনীয় বা আবশ্যক সেগুলোকে সম্পদরূপে গণ্য করা যায়।" "All those elements of the earth which are useful or necessary to man can be considered as resources"—বিখ্যাত সম্পদ বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক E. W. Zimmermann সম্পদের এক সুন্দর সংজ্ঞা দিয়েছেন।

তাঁর মতে সম্পদ বলতে কোন বস্তু বা পদার্থকে বোঝায় না; কোন বস্তু বা পদার্থ কাজ করে নির্দিষ্ট লক্ষ্য বা অভাবপূরণ করতে যে ভূমিকায় অবতীর্ণ হয় সেই কর্মক্ষমতাকে সম্পদ বলে। "The word 'resource' does not refer to a function which a thing or substance may perform or to an operation in which it may take part namely the functions or operation of attaining a given

end, such as, satisfying a want।" তাঁর মতে পরিবেশের যে বৈশিষ্ট্য ও বিষয়সমূহ মানুষের প্রয়োজনে সাহায্য করে এবং মানুষের অভাব ও চাহিদাগুলো পূরণ করার কাজে উপযোগী হয় সেগুলোই সম্পদ। "Features of environment which are considered to be capable of serving man's needs; they are given utility by the capabilities and wants of man"। তাই বলা যায় সম্পদ বস্তু নয়—বস্তুর কার্যকারিতাই সম্পদ। কার্যকারিতা বলতে বোঝায় অভাবমোচনের ক্ষমতা। কার্যকারিতা ব্যক্তিগত তথা জাতীয় অভাবও পূরণ করে। তাই যে ক্ষমতা দিয়ে বস্তু (দৃশ্য ও অদৃশ্য উভয়বিধ) ব্যক্তিবিশেষের এবং সমাজ তথা জাতির বা দেশের অভাবকে পূরণ করে তাকেই সম্পদ আখ্যা দেওয়া হয়। সম্পদ হল অভাবমোচনের উপায়। প্রকৃতির বাধা এবং প্রতিরোধ দূর করে ও প্রাপ্ত অভ্যন্তরীণ সুযোগের যথোপযুক্ত ব্যবহার করে বস্তুর যে কার্যকারিতা মানব সমাজের একক ও সামগ্রিক অভাবমোচন করে তাই সম্পদ। উদাহরণ হিসেবে খনিজ তেলের কথা ধরা যেতে পারে। বোম্বে হাই-এ (Bombay High) উত্তোলিত খনিজ তেল বর্তমানে সম্পদ। কিন্তু 1974-র আগে যখন ঐ খনিজ তেল সমুদ্রগর্ভের শিলাস্তরে ছিল তখন তাকে সম্পদ বলা হত না। অনুরূপভাবে, কেরালার উপকূলের বালিতে প্রচুর মোনাজাইট ও ইলমোনাইট পাওয়া যায়। এই মোনাজাইট থেকে থোরিয়াম ও ইউরেনিয়াম এবং ইলমেনাইট থেকে টাইটেনিয়াম পারমাণবিক ও তেজস্ক্রিয় খনিজ সংগ্রহ করা হয়। কিন্তু কেরালা উপকূলের বালি থেকে যতদিন পর্যন্ত এই পারমাণবিক ও তেজস্ক্রিয় খনিজ পদার্থ সংগ্রহ করা হয় নি ততদিন এই বালি সম্পদ হিসেবে গণ্য হয় নি। তামিলনাড়ুর নেভেলীর লিগনাইট প্রকল্প চালু হবার আগে তার (লিগনাইট) ব্যবহার ছিল না বলে তখন তাকে সম্পদ বলা হত না। বর্তমানে লিগনাইট থেকে তাপবিদ্যুৎ, সার ইত্যাদি পাওয়া যায় বলে তাকে সম্পদ বলে ধরা হয়। তাই সূক্ষ্মভাবে দেখতে গেলে বোম্বে হাই-এর খনিজ তেল, কেরালা উপকূলের বালি কিংবা তামিলনাড়ুর লিগনাইট সম্পদ নয়—এদের কার্যকরী ক্ষমতাই সম্পদ।

মানুষের চাহিদা পূরণে বা কল্যাণে জল, বাতাস, সূর্যালোক প্রভৃতির উপযোগিতা বা প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। তাই এরা সম্পদের পর্যাযভুক্ত।

সম্পদের পরিধি শুধুমাত্র বস্তুগত পদার্থের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। অরণ্য চাযের জমি, খনিজ সম্পদ, যন্ত্রপাতি ইত্যাদি বস্তুগত পদার্থ ছাড়া ও জ্ঞান ও বুদ্ধি, স্বাস্থ্য, সামাজিক বন্ধন, স্বাধীনতা প্রভৃতি অবস্তুগত পদার্থ সম্পদের পর্যায়ভুক্ত। কারণ মানুষের ইচ্ছাশক্তি তার জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নতি, নতুন নতুন কলাকৌশল ইত্যাদির ওপর নির্ভর করছে সম্পদের সৃষ্টি, প্রসার ও বিকাশ। এজন্য বলা হয়ে থাকে সম্পদ শক্তিশীল। আর সম্পদের গতিশীলতাই দেশের অর্থনীতির অগ্রগতির চাকাকে সামনে চালিত করে। পরাধীন ভারতের সম্পদ ছিল সীমিত। ভারত তখন ছিল একটি অনগ্রসর দেশ। স্বাধীনতা লাভের পর পণ্ডিত নেহেরুর নেতৃত্বে ভারতের জাতীয় সরকার একাধিক পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা রূপায়ণের মাধ্যমে নতুন নতুন সম্পদ সৃষ্টি করতে সমর্থ হয়েছে বলে ভারত আজ পৃথিবীর অন্যতম উন্নয়নশীল দেশে পরিণত হয়েছে। বলা যেতে পারে সময়ের সাথে সাথে সম্পদের প্রসার ও সংকোচন হতে পারে।

আবার এও বলা হয়ে থাকে বস্তুর কার্যকারিতা প্রকৃত বা সম্ভাব্য হতে পারে।

সুতরাং উপরের আলোচনা থেকে বোঝা যায় যে—

1. সম্পদ প্রাকৃতিক পরিবেশ থেকে আহৃত বা মানুষের দ্বারা সৃষ্ট উপযোগী সামগ্রী।
2. সম্পদ মানুষের পরিবেশের অংশ।
3. বস্তু বা পদার্থের কার্যকারিতা ও কর্মসম্পাদনের ক্ষমতাই সম্পদ।
4. সম্পদ মানুষের চাহিদা মেটায়, অভাবমোচন করে।
5. সম্পদ মানুষের আকাঙ্ক্ষা ও সামাজিক লক্ষ্যপূরণ করে।
6. সম্পদ সামাজিক লক্ষ্য মেটায় বা মেটাতে সাহায্য করে।
7. সম্পদ হল অর্থনৈতিক উন্নয়নের ভিত্তি।
8. কোন বস্তুর বাস্তব কার্যকারিতাই সম্পদ।
9. সম্পদ কোন জড়পদার্থ বা বস্তু নয়।
10. সম্পদ হল প্রকৃতি, মানুষ ও তার সংস্কৃতির মিলিত প্রচেষ্টার ফল।
11. মানুষের ব্যক্তিগত ও সামাজিক অর্থাৎ সামগ্রিক কল্যাণসাধনই সম্পদের একমাত্র লক্ষ্য।
12. মানুষের চাহিদা, সামর্থ্য ও জ্ঞানের নিরিখে সম্পদ চিহ্নিত হয় অর্থাৎ সম্পদ গতিশীল।
13. সম্পদের পরিধি কেবলমাত্র বস্তুগত পদার্থের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, অবস্তুগত পদার্থ যথা জ্ঞান ও বুদ্ধি, সামাজিক বন্ধন ইত্যাদি সম্পদের পর্যায়ভুক্ত।
14. সম্পদের প্রয়োগবিধি সম্পদের বৈশিষ্ট্যের ওপর নির্ভরশীল (কয়লা, খনিজ তেল প্রভৃতি প্রাকৃতিক সম্পদ প্রয়োজনমত ব্যবহার করা যায়, কিন্তু সূর্যকিরণ, বাতাস ইত্যাদি উপাদানগুলোকে সঞ্চিত রেখে চাহিদামত ব্যবহার করার পদ্ধতি এখনও করায়ত্ত নয়)।
15. কোন সম্পদই সীমাহীন নয়। আপাতদৃষ্টিতে কোন কোন সম্পদ অফুরন্ত বলে মনে হলেও পৃথিবীর অধিকাংশ সম্পদই সীমাবদ্ধ।

সম্পদের প্রকৃতি (Nature of Resources) :

সম্পদের ধারণা স্থান-কাল (spatiotemporal) নির্ভর। সম্পদ নির্দিষ্ট ও স্থানু নয় এটি বস্তুগত (tangible) ও অবস্তুগত (intangible)ও হতে পারে। এটি সীমিত বা অসীম উভয় প্রকারই হতে পারে। এটি মানুষের চেতনা ও উপলব্ধি নির্ভর। সম্পদের উন্নতি প্রযুক্তি নির্ভর। উদাহরণের সাহায্যে উপরোক্ত বিষয়সমূহ আলোচনা করা হল।

(i) সম্পদের ধারণা স্থান-কাল নির্ভর—F.A.O.-র তথ্য অনুসারে 1985 সালে হেক্টর প্রতি গম উৎপাদনে যুক্তরাষ্ট্র (6,842 কেজি), ফ্রান্স (5,597 কেজি) এবং চীন যথাক্রমে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান দখল করেছিল, এটি স্থান নির্ভর ধারণা। কিন্তু ঐ একই সংস্থার 1996 সালের তথ্য অনুযায়ী দেখা যাচ্ছে আয়ারল্যান্ড (8,997 কেজি) নেদারল্যান্ডস (8,961 কেজি) এবং বেলজিয়াম-লুক্সেমবার্গ (8,884 কেজি) যথাক্রমে প্রথম,

দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অধিকার করেছিল। উল্লেখ্য, গম উৎপাদনে 1996 সালে যুক্তরাজ্য (8,113) চতুর্থ স্থান অধিকার করে, যদিও গত 12 বছরে ঐ দেশের গম উৎপাদন অনেক বেড়েছে। তাই বলা যেতে পারে স্থান ও কালের তফাতে সম পরিমাণ জমির কার্যকারিতা পাল্টিয়ে যায়।

(ii) সম্পদ নির্দিষ্ট ও স্থানু (static) নয়—বস্তুর কার্যকারিতা নির্দিষ্ট নয়। জমির উৎপাদিকা শক্তিরও পরিবর্তন হতে পারে। একই জমি হতে বর্তমানের তুলনায় ভবিষ্যতে বেশি ফলন পাওয়া যেতে পারে বা এর বিপরীতও ঘটতে পারে। একই পরিমাণ জমি থেকে একই সময়ে বিভিন্ন দেশে প্রাপ্ত ফলনের পরিমাণ বিভিন্ন হতে পারে। অনুরূপভাবে, কাঁচামাল থেকে মানুষের কর্মপ্রচেষ্টা ও প্রযুক্তিতে পার্থক্যের দরুণ বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন সময়ে শিল্পদ্রব্য উৎপাদনের পরিমাণে তফাৎ ঘটতে পারে।

(iii) সম্পদ বস্তুগত ও অবস্তুগত হতে পারে—কয়লা, লোহা, খনিজ তেল ইত্যাদি বস্তুগত উপকরণ থেকে সম্পদ সৃষ্টি হতে পারে, আবার মানুষের শ্রম, কর্মকুশলতা, উদ্ভাবনী শক্তি ইত্যাদি অবস্তুগত উপকরণ মানুষের চাহিদা পূরণ করে সম্পদ সৃষ্টি করে।

(iv) সম্পদ সীমিত বা অসীম হতে পারে—সূর্যালোক, বায়ুপ্রবাহ, বৃষ্টিপাত ইত্যাদি উপকরণগুলো অসীম। এরা অনন্তকাল ধরে চলে আসছে এবং চলবে। আবার কয়লা, পেট্রোলিয়াম ইত্যাদি খনিজ সম্পদ ব্যবহারের ফলে একদিন না একদিন শেষ হয়ে যাবে যদিও সাময়িকভাবে এদের কার্যকারিতা বাড়ানো যায়, তবুও এর একটি সীমা আছে। তাই পৃথিবীতে খনিজ সম্পদের সঞ্চয় ক্রমশ কমে আসছে। এখানে মেডোস এবং মেডোস (1979) এর Limits to growth থেকে কিছু সম্পদের স্থায়িত্ব তুলে ধরার লোভ সামলাতে পারছি না। মেডোস এবং মেডোস-এর মতে বিভিন্ন সম্পদের স্থায়িত্ব কাল হল নিম্নরূপ—

সম্পদ	আনুমানিক আরও যত বছর চলার সম্ভাবনা রয়েছে
কয়লা	150
খনিজ তেল	50
প্রাকৃতিক গ্যাস	119
লোহা	173
তামা	48
অ্যালুমিনিয়াম	55

উপরোক্ত সারণি আমাদের মনে শঙ্কা জাগায়। বাসযোগ্য ও চাষযোগ্য জমির পরিমাণ কমে আসার দরুণ উলম্বভাবে সম্প্রসারণের (vertical expansion) প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। শুধু বড় বড় শহরেই নয়, শহরতলিগুলোতেও (suburban) বহুতল ফ্ল্যাট তৈরি হচ্ছে।

(v) সম্পদ মানুষের চেতনার বহিঃপ্রকাশ—মানুষ তার চেতনা ও উপলব্ধি দিয়ে বিশ্লেষণ করে কোনটিকে সম্পদ বলা হবে, আর কোনটিকে সম্পদ বলা হবে না, বা মানুষ বাস্তববুদ্ধি দিয়ে বিবেচনা করে সম্পদকে কেন সংরক্ষণ করতে হবে। নিরক্ষীয় অঞ্চলে বা ক্রান্তীয় মৌসুমী অঞ্চলে জলের অপচয় হতে দেখেও মানুষ

তা রোধে এগিয়ে আসে না। কিন্তু শুষ্ক অঞ্চলে অল্প বৃষ্টি বা শিশিরের জলকে মানুষ জমিতে কাজে লাগাবার জন্য কি প্রাণপাত করে। গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গে নির্বিচারে গাছ কাটা হচ্ছে, কিন্তু দেরীতে হলেও পশ্চিমবঙ্গের মালভূমি এলাকায় অরণ্য ধ্বংসের বিরুদ্ধে মানুষ ধীরে ধীরে সোচ্চার হচ্ছে। বনভূমি ধ্বংসের ফলে কোথাও উর্বর জমি পতিত (follow) জমিতে পরিণত হচ্ছে। আবার কোথাও চেষ্টা চলছে কৃত্রিম অরণ্য সৃষ্টি করে ভূমিক্ষয় রোধ করার ও তাকে সুষ্ঠুভাবে কাজে লাগাবার।

(vi) সম্পদ উন্নত প্রযুক্তির ফসল—বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সফল প্রয়োগের দরুণ উন্নততর দেশগুলো শিল্প, কৃষি, খনিজ প্রভৃতি ক্ষেত্রে চরম উন্নতি করেছে এবং সম্পদ সংগ্রহের ক্ষেত্রে উন্নতির শীর্ষে পৌঁছেছে।

সম্পদ সম্পর্কে কয়েকটি প্রচলিত ভ্রান্তধারণা (Some popular misconceptions about resources) :

শত শত বছর ধরে অর্থনৈতিক চিন্তাধারায় সম্পদের স্থান ছিল নগণ্য। সংগঠনের বিষয় হিসেবে শুধুমাত্র জমি, শ্রম ও পুঁজিকে গুরুত্ব দেওয়া হত কিংবা ব্যয় ও দাম, চাহিদা ও যোগান নির্ধারণের অভাব স্বীকার করতে হত। ধনবিজ্ঞানীদের দ্বারা একরকম উপেক্ষিত হয়ে সম্পদ সম্বন্ধে ধারণা কেবলমাত্র প্রকৃতিবিজ্ঞানী (Physical scientist) ও প্রাকৃতিক ভৌগোলিকদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। বর্তমানযুগে মানুষ সম্পদ সম্পর্কে সচেতন হয়েছে। আস্তে আস্তে সম্পদ সম্পর্কে মানুষের ধারণা সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর হয়েছে। সম্পদের সংজ্ঞা বর্তমানে বহুবিস্তৃত। সম্পদ সম্বন্ধে ভুল ধারণাগুলো দূর করা দরকার, কারণ এখনও অনেকে সম্পদ সম্পর্কে ভুল ধারণা পোষণ করেন।

সম্পদ সম্পর্কে ভুল ধারণাগুলো হল—

(a) যে সব জিনিসের বস্তুগত অস্তিত্ব রয়েছে, মানুষ সেগুলোকেই শুধুমাত্র সম্পদ বলে মনে করে, অবস্তুগত পদার্থগুলোকে সম্পদ বলে গণ্য করে না। এটি কিন্তু একটি খুব ভুল ধারণা। এটা ঠিক যে কয়লা, লোহা আকরিক, খনিজ তেল, বনভূমি ইত্যাদি বস্তুসম্পদ হিসেবে কাজ করে থাকে।

কিন্তু সাথে সাথে এও মনে রাখা দরকার যে, অবস্তুগত জিনিসও (যেমন শিক্ষা, স্বাধীনতা, সামাজিক নিরাপত্তা, গণস্বাস্থ্য) সম্পদ হিসেবে কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। বলা যেতে পারে যে বস্তুগত ও অবস্তুগত উপাদানগুলোর পারস্পরিক ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে দিয়ে সম্পদ সৃষ্টি হয়।

(b) সম্পদ বলতে এতকাল শুধুমাত্র প্রাকৃতিক সম্পদকেই বোঝানো হত। কিন্তু প্রাকৃতিক সম্পদ ছাড়াও মানবিক ও সাংস্কৃতিক সম্পদকে বর্তমানে সম্পদের অঙ্গীভূত বলে মনে করা হয়। কিন্তু এও ভুল ধারণা। বস্তুতপক্ষে মানুষের জ্ঞানবুদ্ধিই তার শ্রেষ্ঠ সম্পদ, কারণ এই সম্পদই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সব সম্পদের দরজা খুলে দিয়েছে।

(c) সম্পদ সম্পর্কে সঠিক কোন ধারণা না থাকার দরুণ আগে সম্পদকে সীমাহীন উপাদান হিসেবে ভাবা হত, যথেচ্ছভাবে খনিজ সম্পদ সংগ্রহ করা হত। কিন্তু আমরা জানি সম্পদের ভাণ্ডার সীমাবদ্ধ। এমন কি এর দরুণ প্রবহমান সম্পদ (flow resource)-এর কার্যকারিতা নষ্ট হয়ে যেতে পারে।

(d) সম্পদ সম্পর্কে আর একটি ভুল ধারণা হল কোন জিনিসকে বিচ্ছিন্নভাবে সম্পদ হিসেবে গণ্য করা। কিন্তু এককভাবে কোন বস্তুই সম্পদ বলে বিবেচিত হয় না। কয়লা বা খনিজ তেল সম্পদ নয়, তাদের কার্যকারিতাই সম্পদ। আবার এই কার্যকারিতা নির্ভর করে বৈজ্ঞানিক জ্ঞান, কারিগরি দক্ষতা, সরকারি দক্ষতা ইত্যাদির ওপর। স্থান-কাল ভেদে এইসব বিষয় আবার পাল্টায়। তাই সম্পদ হিসেবে বিবেচনা করার সময় কয়লা বা খনিজ তেলকে এককভাবে না বিচার করে একটি বিশেষ স্থান ও কালে জ্ঞানবিজ্ঞানের উন্নতি, শাসনব্যবস্থা ও সরকারি নীতি, অর্থনৈতিক উন্নতি ইত্যাদি বিষয়ের সামগ্রিক প্রেক্ষাপটে তা বিচার বিবেচনা করা দরকার।

(e) শুধুমাত্র বিচ্ছিন্ন বস্তুসম্পদকে সম্পদ বলে বিবেচনা করার দরুণ অনেকে সম্পদকে নির্দিষ্ট (fixed) ও স্থানু (Static) বলে ভেবে থাকেন, কিন্তু আমরা জানি সম্পদ স্থানু নয়। এটি অনির্দিষ্ট ও গতিশীল "Those who still insist that the natural environment is constant and that the supply of 'land' is fixed, face powerful array of opposing authorities" মানুষের প্রয়োজন ও প্রচেষ্টা অনুস্যারে সম্পদ বাড়ে ও কমে। সম্পদ বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই মানুষের সৃষ্টি। মানুষের জ্ঞানবুদ্ধিই তার শ্রেষ্ঠ সম্পদ। মিচেলের (Welsey. c. Mitchell) ভাষায় "In comparably greatest among human resources is knowledge. It is greatest because it is the mother of other resources"। এর সৃষ্টির ক্ষমতা অনেকক্ষেত্রেই মানুষের ওপরেই নির্ভর করে।

(f) অনেকে প্রাকৃতিক বাধা ও প্রতিরোধকে সম্পদ থেকে আলাদা করে দেখেন। কিন্তু দিনের পর যেমন রাত-আলোর পাশে অন্ধকার তেমনি সম্পদ ও বাধা-প্রতিরোধ এক অবিচ্ছেদ্য বন্ধনে বাঁধা। একটি ছাড়া অপরটি ভাবা যায় না। অবস্থাভেদে বাধা ও প্রতিরোধও সম্পদ বলে গণ্য হয়ে উঠতে পারে। সত্যি বলতে কি, আধুনিক বিজ্ঞানের লক্ষ্য হল প্রাকৃতিক বাধা ও প্রতিরোধকে উন্নত সাংস্কৃতিক সম্পদের সহায়তায় সম্পদ হিসেবে তৈরি করে নেওয়া। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে জিমারম্যান সম্পদ ও প্রতিরোধকে শ্যাম দেশীয় যমজ বলে উল্লেখ করেছেন, "The two worlds should be as inseparable as siamese twins in resource thinking."

সম্পদ, প্রাকৃতিক বাধা ও নিরপেক্ষ সামগ্রী (Resource, Resistance and Neutral staff) ঃ

পৃথিবীতে যে সব বস্তু আছে তাদের মূলত দু'ভাগে ভাগ করা যায়—(এক) মুক্ত বস্তু, (দুই) অর্থনৈতিক বস্তু। প্রথমটি হল এমনসব বস্তু যাদের যথেষ্ট উপযোগিতা ও কার্যকারিতা থাকলেও যোগান অফুরন্ত বলে এসব বস্তুর প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে তেমন গুরুত্ব দেওয়া হয় না। যেমন, জল, অক্‌সিজেন ইত্যাদি। যোগান অসীম বলে এদের গুরুত্ব তেমনভাবে অনুভব করা যায় না। কিন্তু এমন কিছু বস্তু আছে যাদের যোগান সীমাবদ্ধ। এজন্য ঐসব বস্তু সংগ্রহ ও উৎপাদন করতে আমাদের যথেষ্ট পরিশ্রম করতে হয়। এদের অর্থনৈতিক বস্তু বলে। মুক্ত বস্তুরও উপযোগিতা আছে। এগুলোর সরবরাহ অসীম। পক্ষান্তরে, অর্থনৈতিক বস্তুরও উপযোগিতা আছে। আবার এগুলো দুষ্প্রাপ্য। তাই সম্পদের ক্ষেত্রে মুক্ত বস্তুর চেয়ে অর্থনৈতিক বস্তুকেই বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়। কার্যকরী বস্তুগুলোকেই আমরা সচরাচর সম্পদ বলে চিহ্নিত করে থাকি।

পৃথিবীতে এমন কিছু বস্তু আছে যারা মানুষের অভাবমোচন তো করেই না, উল্টে মানুষের ক্ষতি করে বা কার্যকলাপে বাধা দান করে। অশিক্ষা, কুসংস্কার, অনুর্বর মাটি, দুর্ঘটনা, দূষণ, ঝড়, অতিবৃষ্টি বা প্লাবন ইত্যাদি।

এ ধরনের বস্তুকে বাধা বা প্রতিরোধ (resistance) বলে। এরা মানুষের উদ্যমে বা উদ্যোগে বাধা সৃষ্টি করে থাকে।

অর্থাৎ

(i) সম্পদ = মানুষের সামগ্রিক উন্নতির অনুকূল উপাদানের ক্ষমতা বা (x)

(ii) প্রতিরোধ বা বাধা = মানুষের সামগ্রিক উন্নতির প্রতিকূল উপাদানের শক্তি বা (y)

সুতরাং, সম্পদের কার্যকারিতা = x-y।

যদি x-এর ক্ষমতা y-এর বেশি হয়, সে ক্ষেত্রে সম্পদ সংগ্রহ বা সম্পদ সৃষ্টি চলবে। কিন্তু যদি দ্বিতীয়টির (y) ক্ষমতা প্রথমটির (x) চেয়ে বেশি হয়, তবে সম্পদ সংগ্রহ বা সম্পদ সৃষ্টির প্রকল্প বাধাপ্রাপ্ত হবে।

প্রতিরোধকে চার ভাগে ভাগ করা যায়, যথা—(i) প্রাকৃতিক, (ii) মানবিক, (iii) সামাজিক এবং (iv) অর্থনৈতিক প্রতিরোধ।

পৃথিবীতে এমন কিছু বস্তু আছে যারা মানুষের ক্ষতি করে না বা মানব উদ্যোগে বাধা সৃষ্টি করে না বা মানব উদ্যোগে বাধা সৃষ্টি না করে আবার মানুষের কোন কাজে লাগে না: অর্থাৎ এই জাতীয় উপকরণের মানুষের ওপর কোন অনুকূল বা প্রতিকূল প্রভাব নেই। এদের নিরপেক্ষ সামগ্রী (neutral stuff) বলে।

মানুষের কাজ হচ্ছে উন্নত সাংস্কৃতিক সম্পদের সাহায্যে নিরপেক্ষ সামগ্রীকে সম্পদ হিসেবে ব্যবহার করার ব্যবস্থা করা এবং বাধা বা প্রতিরোধকে সম্পদে পরিণত করা। মানুষ যত নতুন নতুন সম্পদ আবিষ্কার করছে নিরপেক্ষ উপাদানের সংখ্যা তত কমছে। বলা চলে সম্পদ ও নিরপেক্ষ উপাদানের সম্পর্ক ব্যস্তানুপাতিক। আজকের নিরপেক্ষ উপাদান আগামীতে তাই সম্পদে পরিণত হতে পারে। তাই নিরপেক্ষ উপাদানের ধারণা আপেক্ষিক ও গতিশীল। নিরপেক্ষ সামগ্রীকে সম্পদ এবং বাধাকে সম্পদ বা নিরপেক্ষ সামগ্রীতে পরিণত করার প্রক্রিয়াকে কার্যকারিতা তত্ত্ব (Functional theory) দিয়ে বিশ্লেষণ করা যায়। এই নিয়ে আমরা পরে আলোচনা করব।

সম্পদ = + উপযোগিতা

নিরপেক্ষ সামগ্রী = ± উপযোগিতা

প্রতিরোধ বা বাধা = – উপযোগিতা

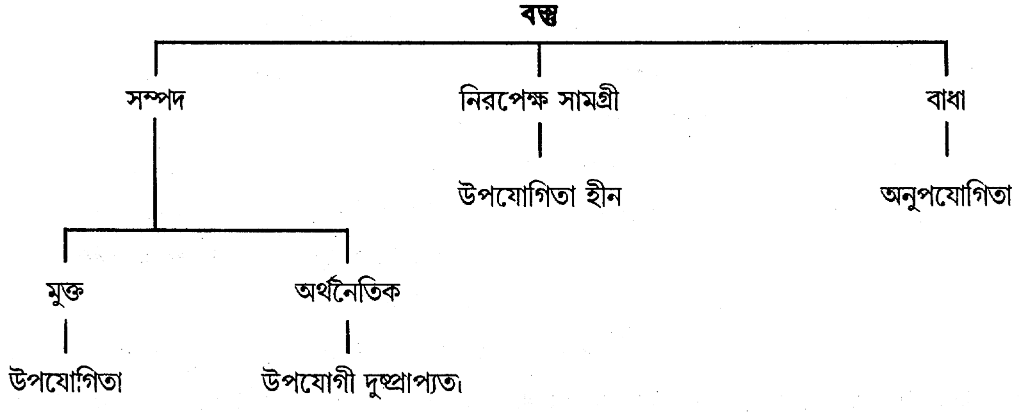

উপরের আলোচনা থেকে স্পষ্ট হয় যে বিভিন্ন বস্তুর পরিপ্রেক্ষিতে উপযোগিতা বিশ্লেষণ করা হয়।

1.1.1 সম্পদের শ্রেণিবিভাগ (Classification of resources) :

প্রাচীনকাল থেকে আজ পর্যন্ত বিভিন্নভাবে সম্পদকে শ্রেণিবিভাগ করা হয়েছে। একটি অতি প্রচলিত শ্রেণিবিভাগ হল—

(a) **জমি (Land)**—স্থান (space) ও প্রাকৃতিক (physical) সম্পদ উভয় অর্থে

(b) **পুঁজি বা মূলধন (Capital)**—এটি আবার তিনপ্রকার—স্থির পুঁজি, উৎপাদনের কাজে ব্যবহৃত যন্ত্রাদি ও বিনিময়যোগ্য পুঁজি

(c) **শ্রম (Labour)**—অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের সাথে যুক্ত মানুষের মানসিক ও কায়িক ক্ষমতা।

সম্পদকে আবার প্রকৃত, সম্ভাব্য ও লীন এই তিন ভাগে ভাগ করা হয়।

জিমারম্যানের মতে বস্তুর (১) সজীবতা এবং (২) স্থায়িত্ব এবং ব্যবহার অনুযায়ী সম্পদকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়—জৈব ও অজৈব সম্পদ।

বিশদভাবে আলোচনা করলে সম্পদকে নিম্নলিখিত নয় ভাগে ভাগ করা যায়, যথা—

(i) সম্পদের প্রকৃতি অনুসারে

(ii) সম্পদের স্থায়িত্ব অনুসারে

(iii) সম্পদের অবস্থান অনুসারে

(iv) সম্পদের অধিকার অনুসারে

(v) সম্পদের বণ্টন অসাম্য অনুযায়ী

(vi) সম্পদের প্রাপ্তি অনুসারে

(vii) সম্পদের জৈবিক বৈশিষ্ট্য অনুসারে

(viii) সম্পদের উদ্ভব অনুসারে

(ix) সম্পদের উপলব্ধি অনুসারে

(i) প্রকৃতি অনুযায়ী সম্পদ তিন প্রকার—

(a) প্রাকৃতিক সম্পদ—প্রাকৃতিক পরিবেশ থেকে পাওয়া সম্পদ যেমন জল, বায়ু, খনিজ পদার্থ, মাটি ইত্যাদি।

(b) মানবিক সম্পদ—ব্যক্তি বা গোষ্ঠীবদ্ধ মানুষ যেখানে সম্পদ, যেমন—জনসংখ্যা, কর্মদক্ষতা, কৃষি শ্রমিক ও খনিশ্রমিক ইত্যাদি।

(c) সাংস্কৃতিক সম্পদ—মানুষের সংস্কৃতি থেকে পাওয়া সম্পদ যেমন জ্ঞান, বুদ্ধি, প্রযুক্তি, সংগঠন, কারিগরি দক্ষতা ইত্যাদি।

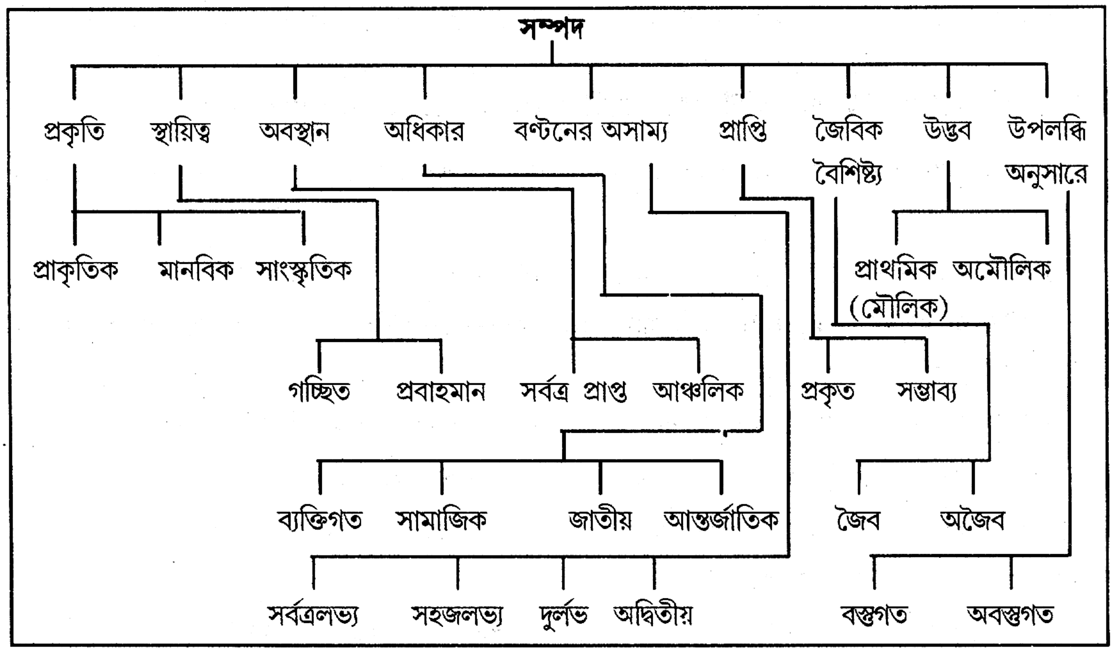

(ii) **স্থায়িত্ব অনুসারে** প্রাকৃতিক সম্পদকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়—

(a) গচ্ছিত (fund) সম্পদ ও (b) প্রবহমান (flow) সম্পদ।

বিশদ আলোচনা

প্রবহমান ও গচ্ছিত সম্পদের তুলনা

(a) **গচ্ছিত/ক্ষয়িযুও/অপুনর্ভব সম্পদ**—যে সব সম্পদ সীমিত বা বহুদিন ধরে ব্যবহারের ফলে শেষ হয়ে যায় কিংবা যে সম্পদকে আবার একই পরিমাণে সৃষ্টি করে পৃথিবীতে ফিরিয়ে দেওয়া যায় না, তাকে

প্রবহমান সম্পদ	**গচ্ছিত সম্পদ**
(1) যোগান অফুরন্ত, তাই নিঃশেষিত হবার প্রশ্ন ওঠে না।	(1) যোগান সীমিত, ক্রমাগত ব্যবহারের ফলে তা নিঃশেষিত হয়ে যাবে।
(2) ব্যবহারের যোগান কমলেও বৃদ্ধি সম্ভব।	(2) ব্যবহারের যোগান কমলেও বৃদ্ধি সম্ভব নয়।
(3) জৈব সম্পদ সাধারণভাবে প্রবহমান সম্পদ।	(3) অজৈব সম্পদ সাধারণভাবে গচ্ছিত সম্পদ।
(4) অবাধ সম্পদ বহুপ্রকার; খনিজ পদার্থ ছাড়া আর সব প্রাকৃতিক উপাদানই পূরণশীল, যেমন জলবিদ্যুৎ, সৌরশক্তি, বাতাস ইত্যাদি।	(4) প্রাকৃতিক উপাদান হিসেবে শুধুমাত্র খনিজ পদার্থ গচ্ছিত সম্পদ।

প্রবহমান সম্পদ	গচ্ছিত সম্পদ
(5) সংরক্ষণের প্রয়োজন নেই।	(5) সংরক্ষণের প্রয়োজন আছে।
(6) বেশির ভাগ অবাধ সম্পদ স্থানান্তরযোগ্য নয়, তবে অনেক পূরণশীল সম্পদ স্থানান্তরযোগ্য।	(6) অধিকাংশ গচ্ছিত সম্পদ স্থানান্তরযোগ্য।
(7) ব্যবহার সমস্যা সৃষ্টি করে না, তবে অতি ব্যবহার সাময়িক সমস্যা সৃষ্টি করে।	(7) ব্যবহার সমস্যা সৃষ্টি করে।
(8) বিকল্পের প্রয়োজন নেই।	(8) বিকল্পের সন্ধান প্রয়োজন।
(9) অবাধ ও পূরণশীল সম্পদ কয়েকটি ক্ষেত্রে ব্যয়বহুল।	(9) গচ্ছিত সম্পদ সবক্ষেত্রেই ব্যয়বহুল।
(10) পৃথিবীর মোট তাপ ও শক্তিসম্পদের মাত্র 20 শতাংশ এই সম্পদ থেকে আসে।	(10) গচ্ছিত সম্পদ পৃথিবীর তাপ ও শক্তিসম্পদের প্রায় 40 শতাংশ যোগান দেয়।
(11) এই সম্পদ ব্যবহারে পরিবেশ দূষিত হবার সম্ভাবনা থাকে না।	(11) গচ্ছিত সম্পদ ব্যবহারে পরিবেশ দূষিত হবার সম্ভাবনা থাকে।
(12) এই সম্পদ শিল্পোৎপাদনে পরোক্ষ ভূমিকা গ্রহণ করে।	(12) এই সম্পদ শিল্পে কাঁচামাল হিসেবে প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করে।
(13) নিরপেক্ষ উপাদানের প্রাপ্তিযোগ্যতা ও সম্পদ সৃষ্টির মধ্যে ভৌগোলিক দূরত্ব থাকে না বললেই চলে।	(13) ভৌগোলিক দূরত্ব থাকে। জাপান ভারত থেকে আকরিক লোহা (নিরপেক্ষ উপাদান) দেশে নিয়ে গিয়ে লোহা ও ইস্পাত (সম্পদ) উৎপাদন করে।

গচ্ছিত/ক্ষয়িষ্ণু/অপুনর্ভব সম্পদ বলে।

অর্থাৎ গচ্ছিত সম্পদের পরিমাণ নির্দিষ্ট ও সীমাবদ্ধ, এর বৃদ্ধি বা সম্প্রসারণ নেই, যেমন খনিজ পদার্থ মাটির নীচে নির্দিষ্ট পরিমাণে সঞ্চিত থাকে, ঠিক কলসীর জলের মতন। ব্যবহারের ফলে একদিন না একদিন তা শেষ হয়ে যাবে।

নির্দিষ্ট স্থানের সঞ্চয় ফুরিয়ে গেলে আবার কোন এক নতুন স্থানে সব বস্তুর পরিমাণ নির্দিষ্ট, তাদের ব্যবহার কমিয়ে ফেলে বিকল্প (alternate) বস্তু ব্যবহার করতে হয়। যেমন কয়লা, বহুদিন ধরে ব্যবহারের ফলে কয়লা শেষ হয়ে আসছে বলে আমাদের দেশে কয়লার ইঞ্জিনের পরিবর্তে ডিজেল এবং বৈদ্যুতিক ইঞ্জিনের ব্যবহার বেড়েছে। কয়লাকে তাপবিদ্যুৎ শক্তিতে (thermal power) রূপান্তরিত করেও ব্যবহার করা হচ্ছে। এছাড়া

ধৌত প্রক্রিয়ার (Coal washery) মাধ্যমে (কয়লার) জ্বালানী শক্তি বাড়ানো হচ্ছে। কিছু কিছু গচ্ছিত সম্পদ ব্যবহারের ফলে একেবারে শেষ হয়ে যায়। যেমন খনিজ তেল বা কয়লা। আবার কিছু কিছু খনিজ পদার্থ আকার পাল্টিয়ে টিকে থাকে, যেমন আকরিক লোহা। ইস্পাত বা কোন যন্ত্রপাতি হিসেবে এটি অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখে। অজৈব সম্পদ গচ্ছিত সম্পদ।

(b) **প্রবহমান/অফুরন্ত/পুনর্ভব সম্পদ**—যে সব সম্পদ বারংবার ব্যবহার করলেও শেষ হবার বা ক্ষয় হবার সম্ভাবনা থাকে না, তাদের অফুরন্ত সম্পদ বলে। যেমন সূর্যকিরণ, বাতাস, আলো ইত্যাদি। কিছু কিছু সম্পদ ব্যবহারের ফলে কমে যায় কিন্তু আবার বেড়ে গিয়ে ব্যবহারের যোগ্য হয়ে যায়—যেমন গরমকালে পুকুরের জল বা নদীর জল শুকিয়ে গেলেও বর্ষায় তা আবার বেড়ে যায়। এই ধরনের সম্পদকে পুনর্ভব (renewable) সম্পদ বলে। যেমন অরণ্য বা মৎস্য সম্পদ। এই সম্পদ ব্যবহারের পর আবার নতুন সম্পদ তৈরি হয়। কোন বিশেষ সময়ে সম্পদ ফুরিয়ে গেল্গেও প্রকৃতির নিয়মে নতুন করে সম্পদ সৃষ্টি হয়। যেমন মানব সম্পদ। প্রাণশক্তির প্রাচুর্যে ভরা মানুষ নিত্য নতুন সম্পদ আবিষ্কারে নিয়োজিত রয়েছে। জৈব সম্পদ প্রবহমান সম্পদ।

প্রবহমান গচ্ছিত সম্পদ ব্যবহারের সময়ে দ্বিতীয়টির ব্যবহার যতদূর সম্ভব কমিয়ে প্রথমটির (প্রবহমান) ব্যবহারে বেশি যত্নবান হওয়া উচিত। প্রবহমান সম্পদের যোগান অফুরন্ত হওয়ায় তা সমস্যার সৃষ্টি করে না। আধুনিক পরিবেশে বিজ্ঞানীরা প্রবহমান সম্পদের (flow/resources) অপব্যবহার (misuse) রোধ করার পরামর্শ দেন। তাঁদের মতে এর ফলে সম্পদের স্রোত একদিন শেষ হতে পারে। এছাড়া অপব্যবহারের ফলে প্রবহমান সম্পদের গুণগত মানও (Quality) নষ্ট হয়ে যেতে পারে। বৃষ্টির জলে অম্লের প্রাচুর্য, বাতাসে ধূলো বা ধোঁয়া ইত্যাদি নানা সমস্যা দেখা দেয়। ফলতঃ সম্পদের কার্যকারিতা কমে যায়। তাই বলা যায় প্রবাহমান সম্পদ দুই প্রকার—

(i) মানুষের হস্তক্ষেপের ফলে পরিবর্তনযোগ্য

(ii) অপরিবর্তনীয়।

কিন্তু গচ্ছিত সম্পদের যোগান নির্দিষ্ট হওয়ায় তার সংরক্ষণে বিশেষ গুরুত্ব দিতে হয়।

(iii) **অবস্থান অনুযায়ী** সম্পদকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়—যেমন **(a) সর্বত্রপ্রাপ্ত, (b) আঞ্চলিক সম্পদ**।

(a) **সর্বত্রপ্রাপ্ত সম্পদ**—যে সব সম্পদ পৃথিবীর সর্বত্র পাওয়া যায়, কোন অঞ্চলের সীমার মধ্যে আবদ্ধ থাকে না, তাদেরকে সর্বত্রপ্রাপ্ত সম্পদ বলে, যেমন জল, বাতাস, সূর্যকিরণ, মাটি ইত্যাদি।

(b) **আঞ্চলিক সম্পদ**—যে সব সম্পদ পৃথিবীর সবখানে খুঁজে পাওয়া যায় না, কিছু নির্দিষ্ট অঞ্চলেই পাওয়া যায়, তাঁদেরকে আঞ্চলিক সম্পদ বলে। লোহা, তামা, কয়লা, সোনা এই জাতীয় সম্পদের উদাহরণ—

(iv) **মালিকানা বা অধিকারের ভিত্তিতে** সম্পদকে চারভাগে ভাগ করা যায়। যথা—**(a) ব্যক্তিগত, (b) সামাজিক, (c) জাতীয় এবং (d) আন্তর্জাতিক সম্পদ**।

(a) **ব্যক্তিগত সম্পদ**—মানুষের কিছু ব্যক্তিগত পার্থিব বস্তু যেমন ঘরবাড়ি, টাকা-পয়সা, জমি, চারিত্রিক গুণ, বিদ্যাবুদ্ধি ও স্বাস্থ্য ইত্যাদি।

(b) **সামাজিক সম্পদ**—সমাজের মঙ্গলের জন্য, সমাজের অধীন যে সম্পদ তাকে সামাজিক সম্পদ বলে।

যথা, হাসপাতাল, বিদ্যালয়, পাঠাগার ইত্যাদি।

(c) **জাতীয় সম্পদ**—জাতীয় সম্পদ হল যে কোন দেশের প্রতিটি নাগরিকের সম্পদের সমষ্টি। দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ, যথা—কৃষিজমি, বনভূমি, জলবায়ু, তথা রেলপথ, পোতাশ্রয়, সোনারখনি, তেলখনি ইত্যাদি জাতীয় সম্পদ।

(d) **আন্তর্জাতিক সম্পদ**—এটি হল পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সম্পদের সমষ্টি অর্থাৎ যে সব পার্থিব ও অপার্থিব বস্তু মানুষের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে লাগে, যেমন বায়ুমণ্ডলের মহাদেশীয় অঞ্চল।

(v) **বন্টনের অসাম্য অনুযায়ী** সম্পদকে চার ভাগে ভাগ করা যায়, যথা—(a) সর্বত্রলভ্য সম্পদ, (b) সহজলভ্য সম্পদ, (c) দুর্লভ সম্পদ, (d) অদ্বিতীয় সম্পদ।

(a) **সর্বত্রলভ্য সম্পদ**—মানুষের জীবনধারণের প্রয়োজনীয় বস্তু যা পৃথিবীর প্রায় সবখানে পাওয়া যায়। যেমন—বালি, জল, বাতাস, সূর্যালোক ইত্যাদি।

(b) **সহজলভ্য সম্পদ**—কিছু কিছু বস্তু সবখানে পাওয়া না গেলেও বেশির ভাগ স্থানে পাওয়া যায়, যেমন স্বাভাবিক উদ্ভিজ, বৃষ্টির জল, চাষোপযোগী জমি।

(c) **দুর্লভ সম্পদ**—কিছু কিছু বস্তু আছে যেগুলো কয়েকটা মাত্র স্থানে পাওয়া যায়। যেমন মালয়ের রবার বা ইন্দোনেশিয়ার কাছাকাছি সমুদ্রতলদেশ থেকে প্রাপ্ত টিন।

(d) **অদ্বিতীয় সম্পদ**—কিছু কিছু সম্পদ আছে যা পৃথিবীতে কেবলমাত্র একটি স্থানে পাওয়া যায়, যেমন অ্যালুমিনিয়াম তৈরির উপাদান পৃথিবীতে কেবলমাত্র কানাডাতেই পাওয়া যায়।

(vi) **সম্পদের প্রাপ্তি অনুযায়ী** সম্পদ হল দু'প্রকার যথা, (1) প্রকৃত, (2) সম্ভাব্য সম্পদ।

(a) **প্রকৃত বা সমৃদ্ধ সম্পদ**—যে সব বস্তু ক্রমাগত ব্যবহার হয়ে চলেছে, কেবলমাত্র সঞ্চিত অবস্থায় সীমাবদ্ধ নেই, তাদেরকে প্রকৃত বা সমৃদ্ধ সম্পদ বলে। যেমন যুক্তরাষ্ট্রের জলবিদ্যুৎ সম্পদ।

(b) **সম্ভাব্য সম্পদ**—যে সব সম্পদের ভৌগোলিক অস্তিত্ব আছে, অথচ ব্যবহারযোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও কোন আর্থসামাজিক বা প্রাকৃতিক কারণে ঐ সম্পদের পুরোপুরি ব্যবহার সম্ভব হয় না। এদের সম্ভাব্য সম্পদ বলে। যেমন আফ্রিকা মহাদেশে জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও তার উৎপাদন অতি সীমিত।

(vii) **জৈবিক বৈশিষ্ট্য অনুসারে সম্পদকে** দু'ভাগে ভাগ করা যায়—যথা, (a) **জৈবিক সম্পদ ও** (b) **অজৈবিক সম্পদ**।

(a) **জৈবিক সম্পদ**—যে সম্পদের জীবন আছে যেমন মানুষ, জীবজন্তু, গাছপালা, তাদের জৈবিক সম্পদ বলে। জৈব সম্পদের শ্রেষ্ঠতম সম্পদ হল মানব সম্পদ। এর কারণ এই সম্পদের যেমন দৈহিক শক্তি আছে, তেমনি মননশক্তি আছে যা তাকে পুরো সম্পদের পরিচালনায় সাহায্য করে।

(b) **অজৈবিক সম্পদ**—অনুভূতিহীন জড় পদার্থ সমূহ হল অজৈবিক সম্পদ। এরা কঠিন, তরল ও গ্যাসীয় হিসেবে অবস্থান করে। মানুষ তার প্রয়োজনে সেগুলো প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কাজে লাগিয়ে থাকে। জল, বাতাস, খনিজ পদার্থ এগুলো অজৈব সম্পদের অন্তর্গত। এগুলো থেকে বিভিন্ন শক্তি পাওয়া যায়, যা অজৈব শক্তি নামে পরিচিত।

জৈব বা অজৈব শক্তির তুলনা

(viii) **উদ্ভব বা উৎপত্তিগত দিক দিয়ে সম্পদকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়—**

(a) প্রাথমিক বা মৌলিক সম্পদ এবং **(b) অমৌলিক সম্পদ**।

জৈব শক্তি		অজৈব শক্তি	
(1)	প্রবহমান সৌরশক্তি। মুক্তশক্তি নয়।	(1)	এটা মুক্তশক্তি, অতীতের সঞ্চিত সৌরশক্তি থেকেই এর সৃষ্টি।
(2)	এই শক্তির পৌনঃপুনিক ব্যয় (recurring cost) অনেক।	(2)	পৌনঃপুনিক ব্যয় কম।
(3)	ব্যবহারের জন্য জড়শক্তির ওপর নির্ভরশীল নয়।	(3)	ব্যবহারের জন্য জৈবশক্তির ওপর নির্ভর করতে হয়।
(4)	কম শক্তিশালী।	(4)	বেশ শক্তিশালী। বলদে টানা লাঙল ও ডিজেল ইঞ্জিনের মধ্যে তুলনা করলে এটা পরিষ্কার হবে।
(5)	ক্রমবর্ধমান সম্পদ।	(5)	ক্ষয়সহিষ্ণু সম্পদ।
(6)	কৃষিনির্ভর অর্থনীতিতে এই শক্তির ব্যবহার বেশি লক্ষ্য করা যায়।	(6)	শিল্পনির্ভর অর্থনীতিতে ব্যবহার বেশি দেখা যায়। যেমন কয়লা বা ডিজেলের সাহায্যে কলকারখানা বা ইঞ্জিন চলে না।
(7)	জৈবশক্তি নিজেই কাজ করতে পারে, যন্ত্রের ব্যবহারের দরকার নেই।	(7)	যেহেতু স্বয়ংচালিত নয়, তাই এই শক্তি ব্যবহারের জন্য যন্ত্রের প্রয়োজন হয়।

(a) **প্রাথমিক বা মৌলিক সম্পদ**—জল, বাতাস, সূর্যালোক ইত্যাদি প্রকৃতির বস্তু সমূহকে বা মৌলিক সম্পদ বলে।

(b) **অমৌলিক সম্পদ**—মানুষ যখন প্রকৃতিদত্ত বস্তুকে শ্রমের দ্বারা আরও উন্নততর সামগ্রীতে পরিণত করে, তখন তাকে অমৌলিক সম্পদ বলে। একটু উদাহরণ দিলে ব্যাপারটা পরিষ্কার হবে। মানুষ মাটিতে গম, আখ, চা-পাতা ইত্যাদি ফলায়, পুনরায় যন্ত্রের সাহায্যে সেগুলোকে ব্যবহারের উপযোগী করে তোলে।

(ix) **উপলব্ধি বা অনুভব অনুসারে** সম্পদকে দু'ভাগে ভাগ করা হয় যেমন **(a) বস্তুগত সম্পদ** ও **(b) অবস্তুগত সম্পদ**।

(a) **বস্তুগত সম্পদ**—জল হল তরল পদার্থ, কিন্তু লোহা আকরিক হল কঠিন পদার্থ, আবার বাতাস গ্যাসীয় পদার্থ, স্পর্শগত অস্তিত্বকে বস্তুগত সম্পদ বলে।

(b) **অবস্তুগত সম্পদ**—স্বাস্থ্য, শিক্ষা, পরিকল্পনা, স্বাধীনতা এগুলোর কোনটার স্পর্শগত অস্তিত্ব নেই, অর্থাৎ স্পর্শহীন এবং প্রধানত মানুষের সাংস্কৃতিক পরিবেশ থেকে সৃষ্ট উপাদানই হল অবস্তুগত সম্পদ।

সম্পদের বিস্তৃত আলোচনা থেকে এটা স্পষ্ট হল যে কয়েকটি সম্পদ একই প্রকার, শুধুমাত্র শ্রেণিবিভাগের সুবিধার্থে আমরা তাদের ভিন্ন ভিন্ন ভাগে বিভক্ত করেছি। যেমন প্রাকৃতিক সম্পদের মধ্যে রয়েছে প্রকৃতিদত্ত বিভিন্ন বস্তু, অর্থাৎ জল, মাটি, খনিজ পদার্থ ইত্যাদি। আবার অজৈব সম্পদের মধ্যেও উপরোক্ত বস্তু রয়েছে। অন্যত্র জল, বাতাস, সূর্যালোক হল প্রাথমিক (মৌলিক)। প্রবাহমান সম্পদ আর খনিজ পদার্থ গচ্ছিত সম্পদের উদাহরণ। এজন্য মনে হয় সম্পদের কার্যকারিতার উপাদান হিসেবে সম্পদের শ্রেণিবিভাগ করা অনেকটা কষ্টসাধ্য। আমরা জানি মানুষ স্বীয় অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক উন্নতিবিধানে সম্পদকে কাজে লাগাচ্ছে। প্রকৃতিদত্ত বস্তুকে স্বীয় বিচারবুদ্ধিতে ও কলাকৌশলের মাধ্যমে সম্পদে পরিণত করেছে। এই বিচারে সম্পদকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়।

1.1.2 সম্পদ সৃষ্টির উপাদান (Factors of Resource Creation) ঃ

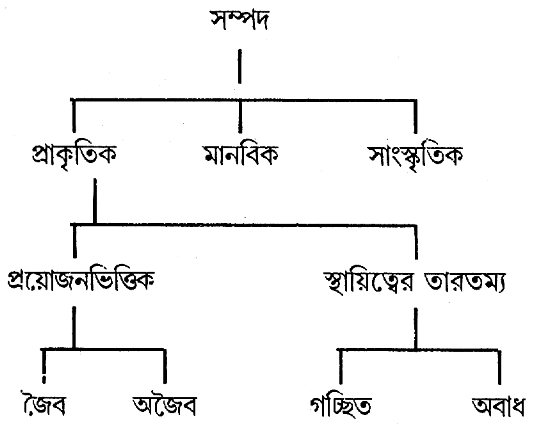

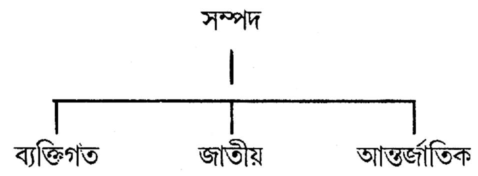

কোন কিছু উৎপাদন করতে গেলে প্রয়োজন ভূমি, শ্রম, মূলধন এবং ব্যবস্থাপনা। এই চারটিকে উৎপাদনের উপাদান হিসাবে গণ্য করা হয়। যেকোন ধরনের উৎপাদনের জন্য এই চারটি উপাদান লাগে। সম্পদ সৃষ্টির ক্ষেত্রেও তেমনি প্রয়োজন প্রকৃতি, মানব এবং সংস্কৃতির। প্রকৃতিকে বলা যেতে পারে ভূমি (প্রকৃতির দান)। মানব শক্তি হল শ্রম এবং সংস্কৃতির মধ্যে মূলধন ও ব্যবস্থাপনাকে অন্তর্ভুক্ত করা যায়। প্রকৃতি, মানব এবং সংস্কৃতি—এই তিন উপাদানের

ঘাত-প্রতিঘাতে সৃষ্টি হয় সম্পদের। নিম্নে তিনটি উপাদান নিয়ে আলোচনা করা হল—

(a) **প্রকৃতি** (Nature) ঃ জল, বায়ু, খনিজ পদার্থ, মৃত্তিকা ইত্যাদি প্রকৃতির দান। এই বস্তুগুলি নিরপেক্ষ সামগ্রীরূপে অথবা প্রকৃতির বাধা হিসাবে সঞ্চিত রয়েছে। মাটির নীচে আছে খনিজ পদার্থ, উপরে ও ভূগর্ভে রয়েছে জলাধার ও জলপ্রবাহ। জলপ্রবাহ (যেমন জলপ্রপাত বা খরস্রোতা নদী) বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদনে সহায়ক। আবার এই জলপ্রবাহ যেখানে মৃদুস্রোতা ও স্বচ্ছসলিলা সেখানে সেচের কাজে এই জলপ্রবাহকে ব্যবহার করা যায়। এই সব প্রকৃতির দানগুলিকে মানুষকেই তার প্রয়োজন সিদ্ধির উপযোগী করে নিতে হয়। আর যতক্ষণপর্যন্ত না ঐ কাজটি সম্পন্ন হচ্ছে ততক্ষণ ঐ বস্তু সম্পদ হিসাবে পরিগণিত হচ্ছে না।

(b) **মানুষ** (Man) ঃ মানুষ সম্পদের সৃষ্টিকারী তথা ভোগকারী। সম্পদ অর্থে যে কার্যকারিতা বোঝায় সে কার্যকারিতা মানুষের সহযোগে কেবল সৃষ্টি করা সম্ভব। মানুষ নিরপেক্ষ সামগ্রীকে সম্পদে পরিণত করে। প্রকৃতির বাধাকে নিরপেক্ষ সামগ্রীতে কিংবা ক্ষেত্র বিশেষে সম্পদে রূপান্তরিত করে। মানুষের সহযোগিতা না থাকলে প্রকৃতির দান নিরপেক্ষ সামগ্রী হিসাবেই পড়ে থাকত। সম্পদ হিসাবে তার উত্তরণ ঘটত না। পৃথিবীর অনেক অঞ্চল আছে যেখানে মনুষ্যবসতি না থাকায় প্রকৃতির দানের যথোপযুক্ত ব্যবহার সম্ভব হয়নি। আফ্রিকার প্রত্যন্ত প্রদেশে যেদিন মানুষের গর্বিত পদসঞ্চার ঘটল তখনই বিচিত্ররূপী আফ্রিকার অফুরন্ত সম্পদ ভাণ্ডারের দুয়ার মানবজাতির সামনে উন্মুক্ত হয়ে গেল। তাই মানুষ একটি উপাদান এবং অতি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান।

(c) **সংস্কৃতি** (Culture) ঃ সম্পদ সৃষ্টির কাজে মানুষ তার দৈহিক শক্তি দিয়ে যেমন সহযোগিতা করছে তেমনি মানবশক্তি দিয়ে সহায়তা করছে। কাজ করতে গিয়ে দেখা গেছে নিজ হাতে করার থেকে কোন যন্ত্র নিয়ে কাজ করলে বেশি কাজ করা যায়। উন্নত পদ্ধতিতে চাষ করলে উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। পরস্পর হানাহানি না করে সংঘবদ্ধ হয়ে বাস করলে কিছু অধিকার ত্যাগ করে কতকগুলি নিয়মনীতি তৈরি করে নিলে, অভাব মেটানো অনেক সহজ হয়ে আসে। এই চিন্তা থেকেই গড়ে উঠল নিত্য নতুন সমাজব্যবস্থা। এই সব বুদ্ধিবৃত্তি, যন্ত্র, কর্মপদ্ধতি, নিয়মনীতি সমাজ ব্যবস্থাই সংস্কৃতি নামে পরিচিত। শিক্ষা-দীক্ষা, বুদ্ধি, স্বাস্থ্য, সভ্য ভদ্র আচরণ, সুশৃঙ্খল জীবনযাত্রা সম্পদের অবস্তুগত (non-material) উপাদান।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, সম্পদ, প্রকৃতি, মানুষ এবং সংস্কৃতির যৌথ প্রক্রিয়ার স্বর্ণ ফসল। এককভাবে কোন উপাদান দ্বারা সম্পদ সৃষ্টি সম্ভব নয়। সম্পদ পরিণতিলাভ (Resourceship) প্রকৃতি, মানুষ এবং সংস্কৃতির যৌথ প্রক্রিয়ার অবদান। সম্পদের কার্যকারিতাতত্ত্ব আলোচনাকালে এই তথ্য প্রমাণিত হবে। তবে প্রকৃতি ও মানুষ হল মৌলিক উপাদান। সংস্কৃতি সহায়ক উপাদান।

সম্পদের উপাদান

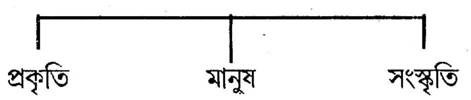

1.1.3 সম্পদের বৈশিষ্ট্য ঃ

আমরা প্রস্তাবনাতেই বলেছি যে বস্তুমাত্রই সম্পদ নয়। কোন বস্তুকে সম্পদ বলে পরিগণিত হতে হলে নিচের বৈশিষ্ট্যগুলি থাকতে হবে।

1. উপযোগিতা বা অভাবমোচনের ক্ষমতা ঃ অর্থশাস্ত্রে (Economics) উপযোগিতা বলতে অভাবমোচনের ক্ষমতাকে বোঝায়। যে বস্তু বা পদার্থের অভাবমোচনের ক্ষমতা আছে, তাকে সম্পদ বলে। আর যে সব বস্তুর এই ক্ষমতা নেই অর্থাৎ উপযোগিতা নেই, তাদের সম্পদ হিসেবে গণ্য করা চলে না। জেমস্ ওয়াট কর্তৃক বাষ্পীয় ইঞ্জিন আবিষ্কারের আগে পর্যন্ত কয়লা মাটিতে লুক্কায়িত অবস্থায় ছিল। কিন্তু বাষ্পীয় ইঞ্জিন আবিষ্কারের পর থেকে কয়লার ব্যবহার শুরু হল। আধুনিক যুগে কয়লা ছাড়া মানুষের চলে না। কেবলমাত্র বস্তুগত পদার্থই নয়, মানুষের কায়িক শ্রম, চিন্তাশক্তি, বুদ্ধিমত্তা, শিল্প প্রভৃতি ব্যক্তি ও সমষ্টির অভাব মেটায় বলে সেগুলোও সম্পদ।

2. কার্যকারিতা ঃ সম্পদের দ্বিতীয় প্রধান বৈশিষ্ট্য হল কার্যকারিতা, অর্থাৎ কার্য সম্পাদনের ক্ষমতা, যেমন জল যা তৃষ্ণা নিবারণ করা ছাড়াও পরিবহন এবং শিল্পে কাজে লাগে, জলের এই প্রকার কার্যকরী ভূমিকার দরুণ আমরা তাকে সম্পদ বলি।

3. ক্ষয়শীলতা ঃ সম্পদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল ক্ষয়শীলতা। নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ্ স্যামুয়েলসন-এর মতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির নতুন নতুন আবিষ্কার আফ্রিকা ও এশিয়া মহাদেশের অনেক বস্তুকেই অপ্রয়োজনীয় করে তুলেছে। যেমন চটের বস্তা ও থলির স্থান নিয়েছে কাগজ, প্লাস্টিক ও নাইলনের ব্যাগ, প্রাকৃতিক রবারের বদলে ব্যবহার করা হচ্ছে কৃত্রিম রবার, সূতীর কাপড়ের স্থান নিয়েছে টেরিলিন, টেরিকট ও সিন্থেটিক শাড়ি।

4. সুগম্যতা বা আহরণ যোগ্যতা ঃ আমরা জানি ব্যবহারের উপযোগী অবস্থায় কোন বস্তুকে পেলে তবেই তা দামী হয়ে ওঠে। হিমালয় অঞ্চলে জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের যথেষ্ট সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও তাকে ব্যবহার করা যায় নি, কারণ হল দুর্গমতা। অনুরূপভাবে হিমালয় পার্বত্য এলাকার কাঠ ও খনিজ সম্পদকে পরিবহণের অসুবিধের দরুণ ঐ সব বস্তুকে ঠিকমত ব্যবহার করা যায় না। দুর্গম অঞ্চল থেকে খনিজ সম্পদ আহরণও বেশ ব্যয়বহুল। পক্ষান্তরে, উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থার দৌলতে দামোদর উপত্যকার কয়লা ও ছোটনাগপুরের বিভিন্ন খনিজ সম্পদের সমাবেশে পশ্চিমবঙ্গ-বিহার সীমান্তে শিল্পাঞ্চল গড়ে উঠেছে। কিন্তু এখানেই কিছু গ্রাম আছে যেগুলো তিনদিক দিয়েই নদী দিয়ে ঘেরা। সেখানকার নদীর চরে প্রচুর তরমুজ জন্মায়, আবার দুগ্ধজাত দ্রব্যও সুলভে মেলে অথচ যোগাযোগের অসুবিধের দরুণ ওই সব সামগ্রী সেখানকার অর্থনীতিতে প্রভাব ফেলে না বললেই চলে।

5. সার্বজনীন চাহিদা ঃ তাকেই সম্পদ বলা হবে যার সার্বজনীন চাহিদা আছে। কথাটিকে একটু ঘুরিয়ে বললে বলতে হয় যে সব বস্তুর ব্যাপক চাহিদা আছে, তাকে সম্পদ বলে। প্রসঙ্গত উল্লেখ করতে হয় কোন ব্যক্তিগত চাহিদা বস্তুকে সম্পদে পরিবর্তিত করতে পারে না, যেমন চা, কফি মানুষের ব্যক্তিকেন্দ্রিক চাহিদা, কিন্তু সূর্যালোক, বাতাস, জল ইত্যাদি সার্বজনীন চাহিদা।

6. প্রয়োগযোগ্যতা ঃ যে বস্তু যত বেশি পরিমাণে ব্যবহার হবে অর্থাৎ যে দ্রব্য যত বেশি পরিমাণে মানুষের অভাবমোচন করতে পারবে সেই দ্রব্যের উৎপাদনও তত বেড়ে যাবে ও গুরুত্বপূর্ণ সম্পদে পরিণত হবে। যেমন খনিজ তেল, লোহা, কয়লা ইত্যাদি। তাই বলা চলে উৎপাদনমুখীতা হল সম্পদের একটি বিশেষ গুণ।

7. গ্রহণযোগ্যতা ঃ সম্পদ সকলেরই দরকার। যেমন চিরাচরিত শক্তির উৎস হিসেবে কয়লা অচিরাচরিত শক্তির জন্য সৌরশক্তি একটি গ্রহণীয় সম্পদ।

8. পরিবেশমিত্রতা ঃ সম্পদ শুধুমাত্র ব্যবহার করলেই চলবে না। লক্ষ্য করতে হবে তার কাজ যেন পরিবেশকে বিষাক্ত না করতে পারে যেমন সৌরশক্তি পরিবেশমিত্র সম্পদ, কারণ পরিবেশের ওপর তার কোন প্রতিক্রিয়া পড়ে না। জলবিদ্যুৎ শক্তি উৎপাদন পরিবেশের ওপর বিরূপ প্রতিক্রিয়া ফেলে না, কিন্তু তাপবিদ্যুৎ উৎপাদনকালে যে ছাই বেরিয়ে আসে, তা আশেপাশে এলাকার ওপর এসে জমে ও সবশেষে জমিকে বন্ধ্যা করে তোলে। তাই পরিবেশ মিত্রতার স্বার্থ ও সম্পদ সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে যুক্তিযুক্ত ব্যবহার করে সম্পদের স্থায়িত্ব বাড়ানো উচিত।

9. সীমাবদ্ধতা ঃ সম্পদের যোগান সীমাহীন, বলতে গেলে প্রকৃতির দান হিসেবে তা একরকম নির্দিষ্ট। চাইলেই এদের যোগান বাড়ানো যায় না বলে **সম্পদ অস্থিতিস্থাপক**। মালথাস, অ্যাডাম স্মিথ, আলফ্রেড মার্শাল মেডোস, অসবোর্ন ইত্যাদি অর্থনীতিবিদ্‌রা সম্পদ সীমাবদ্ধ মনে করেন। মেডোস তো "Limits to growth"—তে কয়েকটি সম্পদের আয়ুষ্কাল নিয়ে এক বিস্তৃত বিশ্লেষণ করেছেন। অধ্যাপক অসবোর্ন-এর মতে সম্পদের ক্রমবর্ধমান দুষ্প্রাপ্যতা উন্নয়নের পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

1.1.4 সম্পদের কার্যকারিতা তত্ত্ব (Functional theory of Resources) ঃ

প্রকৃতিদত্ত সামগ্রীকে নিজের প্রয়োজন-উপযোগী করে নেবার মানবিক প্রয়াস সম্পদের কার্যকারিতা তত্ত্বের মূল প্রতিপাদ্য। যে বস্তুর কোন কার্যকরী গুণ নেই, যাকে ব্যবহার করলেও কাজ পাওয়া যায় না, যার চাহিদা মেটানোর ক্ষমতা নেই, তা সম্পদ নয়। Zimmerman (জিম্যারম্যান) (1933)-র আগে Mitchell (মিচেল), Marshall (মার্শাল), Bowman (বাওম্যান) প্রমুখ অর্থনীতিবিদগণ সম্পদের কার্যকারিতার বিষয়টি উল্লেখ করেন। তবে জিমারম্যানই সর্বপ্রথম সম্পদের কার্যকারিতাকে তত্ত্বের আকারে প্রকাশ করেন (1933)। তাঁর এই তত্ত্বে কোন বস্তুকে শুধুমাত্র কিছু ভৌত (Physical) ও রাসায়নিক গুণাবলীর সমষ্টি হিসেবে দেখানো হয় না। সম্পদ হতে গেলে ঐ বস্তুর উপযোগিতা থাকা দরকার। পৃথিবীব্যাপী অর্থনৈতিক মন্দা (economic depression) মানুষকে শুধুমাত্র সম্পদ সম্বন্ধে সচেতন করে তুলেছে তাই নয়, এই মন্দা কাটিয়ে ওঠার জন্য মানুষ বিজ্ঞান, প্রযুক্তির সাহায্যে সম্পদকে কীভাবে আরও বেশি করে কাজে লাগানো যায় তা খুঁজতে উৎসাহী হয়েছে। আর এই আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে জিমারম্যান কোন বস্তুর কাজ করার ক্ষমতাকে সম্পদের কার্যকারিতা তত্ত্বে বিশ্লেষণ করেছেন।

কার্যকারিতা তত্ত্বের মূল কথা হল ঃ

1. পদার্থের কার্যকরী শক্তিই সম্পদ।
2. সংস্কৃতির কার্যকরী ক্ষমতাও সম্পদ।

3. সংস্কৃতির কার্যকারিতা সম্পদের উপযোগিতা বাড়ায়।

4. কার্যকারিতা আছে বলে সম্পদের পরিধি ব্যাপক।

5. চাহিদা সম্পদের কার্যকারিতা বাড়ায়।

6. প্রশাসনিক দক্ষতা সম্পদের কার্যকারিতা বাড়ায়।

7. কার্যকারিতার সাপেক্ষে গতিশীল প্রকৃতির।

8. আর্থ-সামাজিক আদর্শ ও লক্ষ্য সম্পদের কার্যকারিতার অনুঘটক।

1. **পদার্থের কার্যকরী শক্তিই সম্পদ ঃ** সম্পদের কার্যকারিতা বস্তু, অবস্তু এবং তাদের কর্ম সম্পাদনের পারস্পরিক সম্পর্কের ওপর নির্ভরশীল। নিম্নলিখিত সূত্রের সাহায্যে এই সম্পর্ক দেখানো হল—

বস্তু + কার্যকারিতা = সম্পদ (কয়লা)

অবস্তু + কার্যকারিতা = সম্পদ সমাজব্যবস্থা

কার্যকারিতাহীন বস্তু = সম্পদ নয় (মরুভূমি)

কার্যকারিতাহীন অবস্তু = সম্পদ নয় (কুসংস্কার)

সম্পদ – কার্যকারিতা = সম্পদ নয় (অনুর্বর জমি)

2. **সংস্কৃতির কার্যকরী ক্ষমতা ও সম্পদ ঃ** প্রকৃতিদত্ত বস্তুকে মানুষ তার উন্নত জ্ঞানভাণ্ডার তথা উদ্ভাবিত সাংস্কৃতিক সম্পদের সহায়তায় কার্যকরী করে সম্পদ তৈরি করছে বা কোন পদার্থকে তার দরকার মেটাবার মত তৈরি করে নিচ্ছে। It is technology which gives value to the stuff which it processes; and as the useful arts advance the gifts of nature are remade (Hamilton, W. H. Control of strategic materials (an article), অর্থাৎ হ্যামিলটনের মতে প্রযুক্তি বস্তুকে মূল্যদান করে ও পরিবর্তন প্রক্রিয়া চালু রাখে। এভাবে কলাকুশলতার যত উন্নতি হয়, প্রকৃতির দান তত পুণর্নির্মিত (remade) হয়। Zimmerman-র মতে "Resources are dynamic not only in response to increased knowledge, improved arts, expanding science, but also in response to changing individual wants and objectives" অর্থাৎ সম্পদ গতিশীল। এই গতিশীলতা সৃষ্টি হয় মানুষের পরিবর্তিত অভাব ও সামাজিক উদ্দেশ্যের পরিপ্রেক্ষিতে, শুধুমাত্র জ্ঞান, উন্নত কলাকৌশল ও সম্প্রসারণশীল বিজ্ঞানের জন্য নয়, এই বিচারে সংস্কৃতির কার্যকরী ক্ষমতাও সম্পদ।

3. **সংস্কৃতির কার্যকারিতা সম্পদের উপযোগিতা বাড়ায় ঃ** মানুষের অভাব মেটানো কার্যকলাপের সীমানা নির্ধারণ করে দিয়েছে প্রকৃতি। প্রকৃতির দানের মধ্যেই তাকে কাজ করতে হয়। নতুন করে কোন পদার্থ সৃষ্টি করার সাধ্য তার নেই। প্রকৃতি যে সব জিনিস মানুষকে দিয়েছে, সেগুলোকেই ঘষে মেজে নিত্য নতুন প্রয়োজনের উপযোগী করে তৈরি করে নিয়ে ক্রমবর্ধমান অভাব মেটানোর ব্যবস্থা করতে হয়। আর এই অভাব মেটাতে গিয়েই বস্তুর কার্যকারিতা সৃষ্টি ও সম্প্রসারণ ঘটে। নীচের চিত্রের সাহায্যে জিমারম্যান উন্নত সমাজব্যবস্থায় সম্পদ সৃষ্টির প্রয়োজনে মানুষ, সংস্কৃতি ও প্রকৃতির সম্পর্ককে তুলে ধরেছেন।

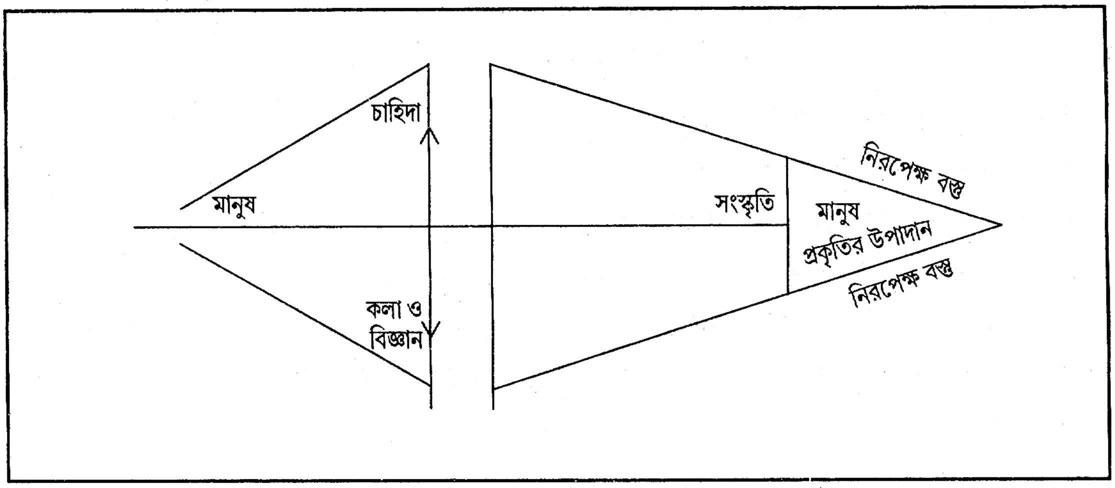

জিমারম্যান এর মতানুসারে নিরপেক্ষ বস্তু থেকে সম্পদ সৃষ্টির প্রক্রিয়া

4. **কার্যকারিতা আছে বলে সম্পদের পরিধি ব্যাপক ঃ** সম্পদের কোনও নির্দিষ্ট পরিধি নেই। ব্যবহারযোগ্যতা অনুযায়ী সম্পদের পরিধি বাড়ে, আবার কমেও। একটি উদাহরণ দিলে ব্যাপারটা পরিষ্কার হবে। আজ থেকে একশ বছর আগেও খনিজ তৈলকে কেবলমাত্র জ্বালানী শক্তিরূপে ব্যবহার করা হত। বর্তমানে ঐ তেলকে নানাবিধ কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে। বর্তমান যুগ পেট্রো-রাসায়নিক শিল্পের যুগ। পেট্রোলিয়াম থেকে নানাবিধ সামগ্রী তৈরি হচ্ছে। কৃত্রিম তন্তু, রান্নার গ্যাস, প্লাস্টিক, কীটনাশক, প্রসাধন ইত্যাদি কত কী বলা যেতে পারে পেট্রোলিয়ামের কার্যকারিতা বেড়েছে। আমাদের দেশে এখনও পলিথিন, প্লাস্টিকের ঠোঙা, প্যাকেট ব্যাপকভাবে ব্যবহার হচ্ছে। কিন্তু মাটিতে মিশে যায় না বা সহজে পচে না বলে বিদেশে বহুদিন এগুলোর ব্যবহার নিষিদ্ধ হয়েছে। পরিবর্তে চটের ব্যাগ, থলে, কাগজের ঠোঙার ব্যবহার বেড়েছে। অর্থাৎ পলিথিন, প্লাস্টিকের ব্যবহার কমেছে। পরিবর্তে পুরনো সামগ্রী অর্থাৎ কাগজ, চটের ব্যবহার পুনরায় বেড়েছে।

5. **চাহিদা সম্পদের কার্যকারিতা বাড়ায় ঃ** মানুষের তিনটি মৌলিক চাহিদা হল খাদ্য, বস্ত্র, আশ্রয়। মানুষের প্রাথমিক অবস্থায় এগুলোর চাহিদা ছিল সামান্যই। কিন্তু সভ্যতা বিকাশের সাথে সাথে এগুলোর চাহিদাও বাড়ল। শুধু তাই নয়, এগুলো ব্যবহারেও বৈচিত্র্য এসেছে। নীচের চিত্রের সাহায্যে মানুষের চাহিদার বিবর্তন দেখানো হল।

১। সাংস্কৃতিক উন্মেষের আগে চাহিদা ঃ

- ক. খাদ্য
  - গাছের ফলমূল
  - পশুপাখির মাংস, মাছ
- খ. বস্ত্র
  - প্রায় নিরাবরণ
  - গাছের বাকল লতা, পাতা
- গ. বাসস্থান
  - গাছের কোটর
  - শিলাগুহা

২। সাংস্কৃতিক উন্মেষের পরে চাহিদা ঃ

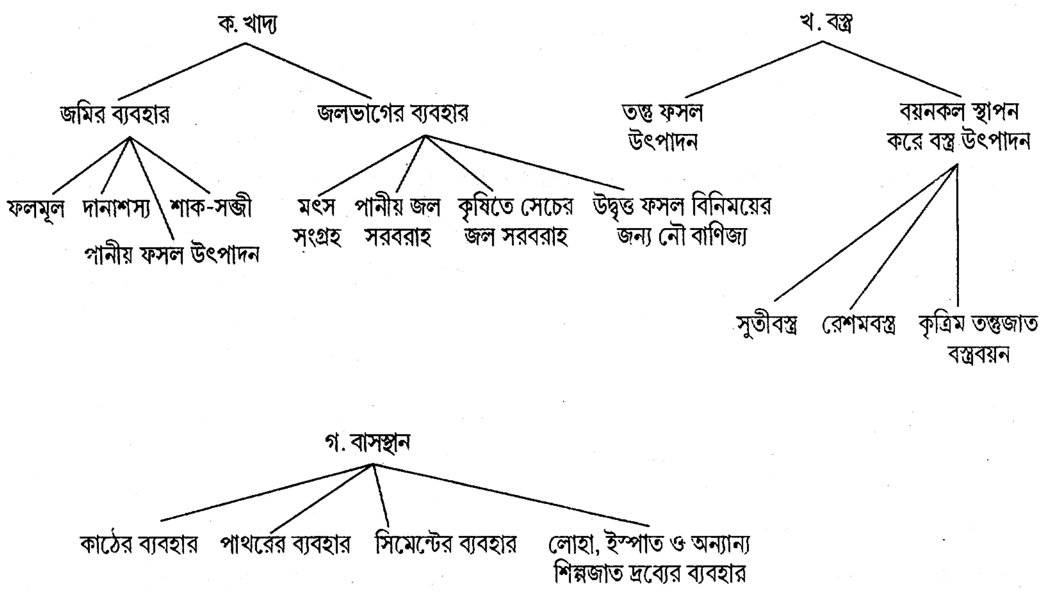

6. **প্রশাসনিক দক্ষতা সম্পদের কার্যকারিতা বাড়ায় ঃ** প্রশাসনিক কর্মদক্ষতা ও সদিচ্ছা সম্পদের কার্যকারিতা বাড়ায়। ইংরেজ আমলে ভারতে বার্ষিক মাথা পিছু জাতীয় আয় ছিল মাত্র 20 (বিশ) টাকা। 1997-98 সালে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে 237 (দুশো সাঁইত্রিশ) টাকা। এই বৃদ্ধি সম্ভবপর হয়েছে স্বাধীন ভারতের জনকল্যাণমুখী সরকারি নীতি ও প্রশাসনিক সদিচ্ছার দরুণ। ইংরেজরা এদেশকে শোষণের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করেছিল। এদেশে শিল্প স্থাপন ও কৃষির উন্নতি কোনটিতেই তাদের উৎসাহ ছিল না। বর্তমানে ভারত কৃষিক্ষেত্রে স্বনির্ভর, শিল্পক্ষেত্রেও প্রায় 5 শতাংশ উন্নতির হার বজায় রেখেছে।

7. **কার্যকারিতার সাপেক্ষে সম্পদ গতিশীল প্রকৃতির ঃ** অরণ্য দূষিত কার্বন-ডাই-অক্সাইড শোষণ করে ও বিশুদ্ধ অক্সিজেন বাতাসে ছেড়ে বায়ুমণ্ডলের ভারসাম্য রক্ষা করে। গাছের পাতা থেকে বাষ্পীভবনের ফলে বনভূমির বাতাস আর্দ্র হয়। বনভূমি বৃষ্টিপাতের পরিমাণ বাড়ায়। বনভূমির আবরণ থাকলে মাটির উপরিভাগ সহজে জলে ধুয়ে যায় না। কিন্তু এই বনভূমিকেই নির্বিচারে কাটার ফলে আমরা উপরোক্ত সুযোগসুবিধা থেকে বঞ্চিত তো হই, উপরন্তু নিজেদের বিপদ নিজেরা ডেকে আনি। আজ মানুষের অদূরদর্শিতা ও তাৎক্ষণিক লোভ বনভূমিকে বিধ্বস্ত করে চলেছে। ফলে বাতাসে কার্বন-ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ বেড়েছে। U.N.O-র প্রকাশিত World Resources (1998-99)-র বিভিন্ন ছত্রে এই ভয়ঙ্কর সমস্যার কথা উল্লেখিত হয়েছে। বাতাসে কার্বন-ডাই-অক্সাইড-এর পরিমাণ বাড়লে শুধুমাত্র যে তাপ বেড়ে চলে, তাই নয়, মেরু অঞ্চলে জমে থাকা হিমবাহও বেশি করে গলতে শুরু করবে, উপকূলবর্তী নীচু জায়গাও ডুবে যাবে অন্যদিকে বনভূমি ধ্বংস হবার ফলে বৃষ্টির পরিমাণ কমে যাবে, আবহাওয়ার পরিবর্তন ঘটবে। আজ থেকে 40 বছর আগেও শিলিগুড়িতে

দুটো ঋতু ছিল—বর্ষা ও শীত। ইদানীং নির্দিষ্ট সময় ছাড়া বর্ষার দেখা মেলে না। এর কারণই হল বনভূমির ব্যাপক ধ্বংস। অপরপক্ষে, দার্জিলিং হিমালয় অঞ্চলে ধ্বংসের প্রবণতাও বেড়েছে।

আবার আমরা দেখি যে আণবিক শক্তি থেকে যেমন কল্যাণমূলক কাজ পাওয়া যায়, তেমনি এই শক্তি ব্যবহার করে একটা গোটা দেশকেই ধ্বংস করে দেওয়া যায়। তাই সম্পদ হিসেবে বনভূমি বা আণবিক শক্তির প্রকৃতি পরিবর্তনশীল।

৪. **আর্থ-সামাজিক আদর্শ, লক্ষ্য সম্পদের কার্যকারিতার অনুঘটক ঃ** 1955 সালে আমাদের দেশে বিদ্যুৎ শক্তির উৎপাদন ছিল মাত্র 230 মিলিয়ন কিলোওয়াট, আর 1995-96 সালে তা বেড়ে দাঁড়াল 448 বিলিয়ান কিলোওয়াট। আবার অন্যত্র আমরা লক্ষ্য করেছি যে 1950-51 সালে ভারতে হেক্টর প্রতি চাল উৎপাদন ছিল 668 কেজি। 1990-91 সালে তা বেড়ে গিয়ে দাঁড়াল 1751 কেজি। একই পরিমাণ জমি থেকে আগে যে ফসল উৎপন্ন হত, বিভিন্ন পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় কৃষি উন্নয়নের প্রচেষ্টা নেওয়ায় বর্তমানে তার অপেক্ষা অনেক বেশি ফসল উৎপন্ন হচ্ছে। মানুষের আর্থ-সামাজিক আদর্শ ও লক্ষ্য যে সম্পদের কার্যকারিতা বৃদ্ধিতে সাহায্য করে, ভারতের অর্থনৈতিক পরিকল্পনা ও সংশ্লিষ্ট কর্মোদ্যোগ জাতীয় কার্যকারিতা বৃদ্ধির জ্বলন্ত নিদর্শন।

সম্পদ কার্যকারিতা তত্ত্বের মূল বৈশিষ্ট্য হল—

A. **আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য** (Regional specialisation) ঃ অঞ্চলভেদে সম্পদ সৃষ্টির প্রক্রিয়া ভিন্ন ভিন্ন। পৃথিবীর সবখানে প্রাকৃতিক ভিত্তিভূমি এক নয়, সংস্কৃতি ও একই প্রকার নয়। এজন্য এক একটি অঞ্চলে সম্পদ সৃষ্টির প্রক্রিয়ায় একটা নিজস্ব আঞ্চলিকতার ছোঁয়া পাওয়া যায়।

B. **নিত্য বহমানতা** (Free-flowness) ঃ সম্পদ সৃষ্টির ধারা নিত্য প্রবহমান। এর কোনও শেষ নেই। মানুষের চাহিদার (wants) যেমন সীমা-পরিসীমা নেই, তেমনি তা বেড়েই চলে। এজন্য মানুষ তার জ্ঞান, কার্যকরী দক্ষতা প্রয়োগ করে সম্পদের ভাণ্ডার ভরে তুলছে। সংস্কৃতির উচ্চস্তরে একটির পর একটি সম্পদ সৃষ্টি হয়েই চলেছে। অভাব মোচনের সাথে সাথে নিত্য নতুন অভাব সৃষ্টি হচ্ছে। একটি সম্পদ তৈরির পরে আবার নতুন সম্পদ সৃষ্টির পালা শুর হচ্ছে। মানুষের অভাব ও জ্ঞানই তার এই চিরন্তন সম্পদ সৃষ্টির পেছনে কাজ করছে।

C. **নিরপেক্ষ বস্তুকে সম্পদে রূপান্তর ও সম্পদের বিনাশ ঃ** মানুষ চিরন্তন প্রকৃতির নিরপেক্ষ সামগ্রীকে সম্পদে রূপান্তরিত করে চলেছে। আবার কখনও কখনও সম্পদের ব্যবহারযোগ্যতা ও উপযোগিতা কমে গিয়ে সেগুলো নিরপেক্ষ দ্রব্যে পরিণত হচ্ছে। প্রাকৃতিক প্রতিরোধ ভেঙে যেমন সম্পদ সৃষ্টি হয়ে চলেছে তেমনি এর জন্য বহু বাধানিষেধও লঙ্ঘন করতে হচ্ছে। সম্পদ হিসেবে উপযোগিতা নষ্ট হয়ে গেলে সেগুলো আর অভাবমোচনের উপযোগী থাকে না। অকেজো, নিরপেক্ষ বস্তুতে পরিণত হয়। রাসায়নিক নীল (dye) তৈরি হওয়ার পর থেকে নীলের (indigo) চাষ উঠে গেছে। পাটের বিভিন্ন পরিবর্ত দ্রব্য (substitute) চালু হবার পর থেকে পাট চাষে মন্দা দেখা দিয়েছে।

আবার মানুষের অদূরদর্শিতা, অপব্যবহার, যুদ্ধবিগ্রহ সম্পদের বিনাশ ঘটায়। আমাদের দৈনিক জীবনে সবচেয়ে প্রয়োজনীয় বস্তু জল দিয়েই শুরু করা যাক। আধুনিক পৃথিবীতে মানুষের সবচেয়ে বড় সমস্যা হল জলের অভাব। বিভিন্ন উৎস থেকে প্রচুর পরিমাণে জল নিয়ে ব্যবহার করার ফলে বিভিন্ন সমস্যা ক্রমশঃ তীব্র

হয়ে উঠেছে। এতদিন প্রকৃতির মুক্ত দান মুক্ত সম্পদরূপে গণ্য করে মানুষ অবাধে জলের ব্যবহার করে এসেছে। ফলে গত দুই দশকে জলের পরিমাণ ও গুণাগুণ দুইই ক্রমশঃ ক্ষয় হয়েছে।

অরণ্যের ক্ষেত্রেও দেখি গোড়ায় সম্ভবতঃ স্থলভাগের 1/4 ভাগ বনভূমি ছিল, কিন্তু নির্বিচারে বনভূমি কাটার ফলে বর্তমানে তা 15%-এ দাঁড়িয়েছে। F.A.O.-র পরিসংখ্যান অনুযায়ী 1976 সালে পৃথিবীতে মোট বনভূমির আয়তন ছিল 423 কোটি হেক্টর, বর্তমানে (1992)-এ তা দাঁড়িয়েছে 386 কোটি হেক্টরে। এসবই ঘটছে মানুষের সম্পদের অপব্যবহারের ফলে। যুদ্ধও সম্পদের বিনাশ ঘটায় এ প্রসঙ্গে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে প্রচুর মানব সম্পদ ধ্বংসের কথা স্বভাবতই এসে পড়ে।

D. **প্রাকৃতিক দ্রব্যের কার্যকারিতা বৃদ্ধি ঃ** সম্পদ হিসাবে একটি বিশেষ দ্রব্যের ব্যবহারিক মূল্য সবসময় বদলাচ্ছে। আগে হয়ত কোন বস্তু একরকমভাবে ব্যবহৃত হত, আজ বিজ্ঞানের ক্রমোন্নতির সাথে সাথে তা থেকে বিবিধ দ্রব্য উৎপাদিত হচ্ছে। যেমন একসময় খনিজ তেল শুধুমাত্র জ্বালানী হিসেবেই ব্যবহৃত হত, বর্তমানে পেট্রো-রাসায়নিক শিল্পের দৌলতে বিভিন্ন প্রকার সামগ্রী প্রস্তুত হচ্ছে, যেমন পলিমার, ন্যাপথা, ভেজলিন ইত্যাদি। অনুরূপভাবে কয়লারও কার্যকারিতা বেড়েছে। আজ থেকে 50 বছর আগেও 7 টন কয়লার যে কার্যক্ষমতা ছিল, এখন মাত্র 1 টন কয়লাতেই সেই পরিমাণ কাজ হচ্ছে।

E. **বর্তমানে দ্রুত ও ব্যাপকভাবে সম্পদ সৃষ্টি ঃ** সংস্কৃতির ক্রমাগত উন্নতির ফলে এখন অপ্রাণীজ শক্তি ও যন্ত্রের ব্যবহার বহুলাংশে বেড়েছে। তাই সম্পদ সৃষ্টির হার বর্তমান যুগে দ্রুততালে ঘটছে। কেবলমাত্র তাই নয়, জলে-স্থলে-আকাশে মানুষ সম্পদের খোঁজ চালাচ্ছে। তাই সম্পদ সৃষ্টির হার কেবল দ্রুত হয় নি, তা ব্যাপকভাবে বেড়েওছে।

1.1.5 সম্পদের কার্যকারিতার বিবর্তন ঃ

সম্পদের কার্যকারিতাকে চারটি পর্যায়ে ভাগ করা যায়—

1. মানুষের হস্তক্ষেপ ব্যতিরেকে সম্পদ অর্জন
2. মানুষের কায়িক প্রচেষ্টায় সম্পদ সৃষ্টি
3. মানুষের কায়িক ও সাংস্কৃতিক চেষ্টায় সম্পদ সৃষ্টি
4. এছাড়া রয়েছে শোষণ পর্যায়।

প্রথম পর্যায়ে মানুষ প্রকৃতির মুক্তদানে জল, বায়ু, সূর্যালোক গ্রহণ করে জীবনধারণ করে। এই পর্যায় বা পর্বে যখন সম্পদ মুক্ত অবস্থায় রয়েছে তখন সম্পদের কার্যকারিতা সব মানুষের কাছে সমান অর্থাৎ বড়লোক, গরীবলোক—সবার কাছে সূর্যকিরণ, বায়ু, বেঁচে থাকার পক্ষে অত্যাবশ্যক বস্তু। সর্বত্রপ্রাপ্ত এই সব বস্তুগুলো পেতে মানুষকে আলাদাভাবে কোন পরিশ্রম করতে হয় না। যেমন নিরক্ষীয় অঞ্চলে সারা বছর ধরেই তাপমাত্রা 26° সেন্টিগ্রেডের কাছাকাছি থাকে। সারা বছর সেখানে বৃষ্টি হয়। কিন্তু মাটি ভিজে, স্যাঁতসেঁতে থাকায় ফসল ভালো হয় না, যদিও সেখানকার জলবায়ু উদ্ভিদ বিকাশের পক্ষে উপযোগী। কিন্তু মেরু অঞ্চলে একটানা ছমাস

দিনের পর টানা ছমাস রাত্রি চলে। তাপমাত্রা উদ্ভিদ বিকাশের পক্ষে অনুকূল নয়। তাছাড়া মাটি বরফে ঢাকা থাকায় সেখানে কৃষিকাজ করা সম্ভবপর নয়। এক্ষেত্রে মানুষ ইচ্ছে করলেই প্রকৃতিকে পাল্টাতে পারে না।

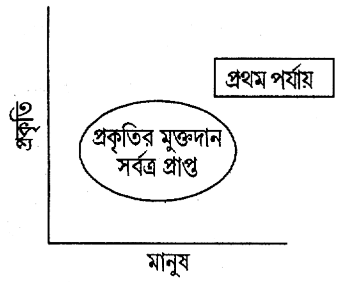

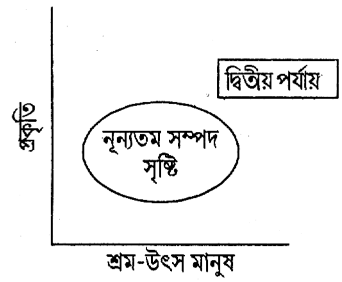

দ্বিতীয় পর্যায়ে মানুষ কেবল কায়িক পরিশ্রমে সম্পদ সংগ্রহ করে। যে মানুষ যত বেশি পরিশ্রম করতে পারে, সে তত বেশি সম্পদ সংগ্রহ করতে পারে। তার আয়ও তত বেশি হয়। পক্ষান্তরে কর্মবিমুখ অলস প্রকৃতির মানুষের আর্থিক উন্নতি হয় না। এই পর্বে ন্যূনতম সম্পদ সংগ্রহের মাধ্যমে প্রকৃতির উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল মানুষ জীবন নির্বাহ করে। কারণ খনি থেকে অনেক শ্রম করে কয়লা সংগ্রহ করা যেতে পারে। কিন্তু কয়লা থেকে গ্যাস, পিচ, আলকাতরা পেতে গেলে মানুষকে কারিগরিজ্ঞানসম্পন্ন হতে হবে। নয়তো কায়িক পরিশ্রমের সাহায্যে পাওয়া ন্যূনতম সম্পদ নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হবে।

উপরোক্ত দুই পর্বের মধ্যে তফাৎ এইটুকুই যে প্রথমটিতে মানুষের কোন ভূমিকাই নেই, প্রকৃতিই সব। কিন্তু দ্বিতীয় পর্যায়ে মানুষ তার কায়িক পরিশ্রমের ফল ভোগ করে। প্রকৃতি থেকে পাওয়া বস্তুকে সে পরিশ্রমের মাধ্যমে কাজে লাগাচ্ছে।

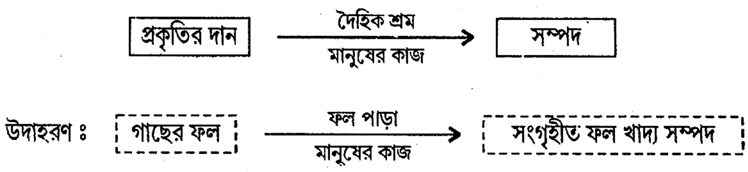

তৃতীয় পর্যায়ে কারিগরি দক্ষতা তথা প্রযুক্তিগত উৎকর্ষতা অর্জন করে মানুষ প্রকৃতি থেকে উপকরণ আহরণের দিকে অনেকটাই এগিয়ে যায়। প্রয়োজনমত ঐ উপকরণকে পরিবর্তন করে নতুন নতুন সম্পদ সৃষ্টি করে। একসময়

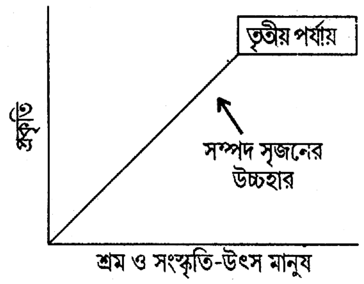

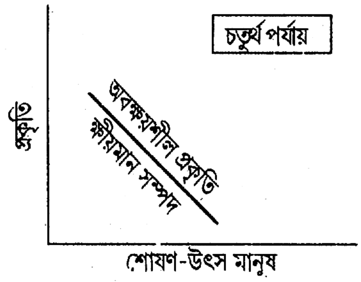

সম্পদ উৎপাদন হয় সর্বাধিক। সম্পদের কার্যকারিতা এই পর্বে সবচেয়ে বেশি হয়। মানব-সংস্কৃতি এই পর্বে সবচেয়ে বেশি উন্নতি লাভ করে বলে মানুষ তার আর্থ-সামাজিক উন্নতির শীর্ষে পৌঁছায়।

চতুর্থ পর্বে লোকসংখ্যা যত বাড়বে, প্রকৃতি ততই সম্পদ সংগ্রহের ক্ষেত্র হয়ে ওঠে। এতে কেবলমাত্র সম্পদের হ্রাস ঘটে না। সম্পদকে শোষণ করার ফলে বিভিন্ন সমস্যা দেখা যায়। বায়ুমণ্ডলে দূষণের মাত্রা বাড়ে, জল দূষিত হয়। এমন কি, ওজন স্তর ozone layer ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

ফলে সূর্যরশ্মির ক্ষতিকর প্রভাব মানুষের ওপরে পড়ে। সামগ্রিকভাবে পরিবেশের অবনমন (environmental degradation) ঘটে। এমনকি, মানুষের আর্থ-সামাজিক উন্নতি ব্যাহত হওয়ার আশঙ্কা থাকে।

1.1.6 সম্পদের কার্যকারিতার নিয়ন্ত্রক ঃ

সম্পদের কার্যকারিতা চারটি বিষয়ের দ্বারা প্রভাবিত হয়, যেমন চাহিদা, প্রযুক্তি, সময় ও স্থান। নীচে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হল—

চাহিদা ঃ মানুষের অভাব বা চাহিদা দু'ধরনের—1. ন্যূনতম চাহিদা যথা, খাবার, পোষাক, মাথা গোঁজার ঠাঁই, 2. সাংস্কৃতিক চাহিদা, যেমন, শিক্ষা, দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় পরিষেবা যেমন বিদ্যুৎ, ডাক ব্যবস্থা, টেলিফোন ব্যবস্থা ইত্যাদি।

মানুষ প্রথমাবস্থায় ছিল গুহাচারী। তার প্রয়োজন ছিল অতি সীমিত। বনের পশুপাখী মেরে সে পুড়িয়ে খেত, বনের ফলমূল আর ঝরনার জল তার ক্ষুধা মেটাবার পক্ষে যথেষ্ট ছিল। তারপর পাথরে পাথর ঘসে আগুন জ্বালাতে শিখল। একদিন সে লক্ষ্য করল খাবার পর তার আশ্রয়স্থলের বাইরে যে সব অবশিষ্টাংশ ফেলেছিল, তা থেকে ছোট চারা গাছ বেরিয়েছে ও পরে তাতে ফল ধরেছে। এইভাবেই সে একদিন চাষবাস শিখল। ক্রমশঃ তার ভোগের চাহিদা বেড়ে চলল। কৃষি ও প্রযুক্তির ক্রমাগত উন্নতির ফলে তার জীবনযাত্রার পরিবর্তন এল। ভোগ্যপণ্যের চাহিদা বাড়ার সাথে সাথে নিত্য নতুন সম্পদ উৎপাদন করার তাগিদ বাড়ল। তাই বলা চলে **চাহিদা সম্পদের কার্যকারিতা বৃদ্ধি করার ক্ষেত্রে অন্যতম নিয়ন্ত্রক।**

প্রযুক্তি ঃ এটি সম্পদের কার্যকারিতা বৃদ্ধির অন্যতম হাতিয়ার। উদাহরণ হিসেবে বলা চলে ভারতে 1950-51 সালে প্রতি হেক্টরে চালের উৎপাদন ছিল 668 কেজি, 1970-71 তা বেড়ে দাঁড়াল 1123 কেজিতে আর 1990-91 সালে তা হল 1751 কেজি। কৃষিতে এই ক্রমবর্ধমান বৃদ্ধি ঘটেছে উচ্চফলনশীল বীজ, সার, জলসেচ, ট্রাক্টর, হারভেস্টার প্রভৃতি ব্যবহারের ফলে। অনুরূপভাবে শিল্পক্ষেত্রেও যন্ত্রপাতির ব্যবহার উৎপাদন বাড়িয়েছে। যেমন বিদ্যুতের ক্ষেত্রে স্বাধীনতা উত্তর যুগে যথেষ্ট অগ্রগতি লক্ষিত হয়। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় (1959-65) এদেশে বিদ্যুতের উৎপাদন ছিল 34.2 লক্ষ কিলোওয়াট, 1969-74 সালে চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় তা বেড়ে দাঁড়াল 70 লক্ষ কিলোওয়াট, আর 1997 সালে এই পরিমাণ বেড়ে দাঁড়াল 13952 মেগাওয়াটে। ভারতে লোহা ও ইস্পাতের ক্ষেত্রেও অগ্রগতি লক্ষণীয়। এদেশে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় (1991-96) ইস্পাতের উৎপাদন লক্ষ্য ধার্য করা হয়েছিল 70 লক্ষ টন, চতুর্থ পরিকল্পনায় 94.4 লক্ষ টন।

1997-98 সালে এদেশে 141.4 লক্ষ টন ইস্পাত উৎপাদিত হয়েছিল। ভারতের বিভিন্ন ক্ষেত্রে অগ্রগতির মূলে রয়েছে প্রযুক্তির উৎকর্ষতা। এজন্য বলা হয় প্রযুক্তি সম্পদের কার্যকারিতা বৃদ্ধির একটা অঙ্গ।

সময় ঃ সময়ের সাথে সাথে কোন বস্তুর কার্যকারিতা বদলায়। অনেক সময় নিরপেক্ষ বস্তুও সম্পদে পরিণত হয়। এ প্রসঙ্গে কয়লা, খনিজ তেলের কথা স্বাভাবিকভাবেই এসে পড়ে। আমরা আগেই উল্লেখ করেছি যে জেমস ওয়াট (James Watt) কর্তৃক বাষ্পীয় ইঞ্জিন আবিষ্কারের আগে পর্যন্ত কয়লার ব্যবহার এত ব্যাপক ছিল না। অনুরূপভাবে খনিজ তেলকে শুধুমাত্র জ্বালানির কাজে লাগানো হত। পেট্রো-রাসায়নিক শিল্পের অভূতপূর্ব উন্নতির সাথে সাথে এর বহুমুখী ব্যবহার সম্ভব হয়েছে। বলা যেতে পারে সময়ের সাথে সাথে মানুষের আর্থ-সামাজিক জগৎ-এ পরিবর্তন এসেছে।

স্থান ঃ সম্পদের ব্যবহার বহুক্ষেত্রে ভৌগোলিক অবস্থান দ্বারা প্রভাবিত হয়। একে কার্যকারিতার স্থানিক বৈশিষ্ট্য বলে। ভারতে হেক্টর প্রতি ধান উৎপাদন হল 2,600 কেজি। পক্ষান্তরে চীনে এই পরিমাণ হল 5,780 কেজি। উভয় দেশের মাটি উর্বর হলেও ভারত ও চীনের ধান উৎপাদনের মধ্যে হেরফেরের কারণ হল এই দুই দেশে কৃষিক্ষেত্রে প্রযুক্তির ব্যবহারে তফাৎ। তাই একই সম্পদের (মাটি) উৎপাদন আলাদা। আবার, দ্বীপময় দেশ জাপান ও ইংল্যান্ড শিল্পক্ষেত্রে উন্নত। অথচ, এই দুই দেশের লোহা-ইস্পাত উৎপাদন এক নয়। ইস্পাত উৎপাদনে জাপান পৃথিবীতে দ্বিতীয় স্থানের (1998 সন) (10.45 কোটি মেট্রিক টন) আর ইংল্যান্ড দ্বাদশ স্থানের (1.72 কোটি মেট্রিক টন) অধিকারী। তাই ভূমিভাগ একই হওয়া সত্ত্বেও উৎপাদন সমান নয়। আরও বলতে হয় যে ইংল্যান্ড শিল্প বিপ্লবের পীঠস্থান হলেও ইস্পাত উৎপাদনের ক্ষেত্রে জাপান ইংল্যান্ডকে ছাপিয়ে গেছে।

1.2 (Resource utilization as primary activity—forest, domesticated animal, fish, minerals, power generation, agriculture.)

1.2.1 বনভূমির সংজ্ঞা, প্রকৃতি ও আয়তন ঃ

যে সমস্ত গাছ বা উদ্ভিদ প্রকৃতিগতভাবে নিজে থেকেই জন্ম লাভ করে, স্বাভাবিক প্রাকৃতিক পরিবেশে বেড়ে ওঠে তাকেই স্বাভাবিক বনভূমি বলে। কোন অঞ্চলের ভূপ্রকৃতি, মৃত্তিকার গঠন, উষ্ণতা, বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ইত্যাদির উপর নির্ভর করেই সৃষ্টি হয় সেই সকল স্থানের উদ্ভিদের প্রকৃতি। তাই বনভূমির প্রকৃতি জানতে হলে জানতে হবে যে বনভূমি কেন এবং কোন পরিবেশের উপর নির্ভর করে জন্মায়।

বনভূমির প্রকৃতি প্রধানত নির্ভর করে তার প্রাকৃতিক পরিবেশের উপর এবং যে সব প্রাকৃতিক পরিবেশের উপর নির্ভর করে বনভূমি গড়ে ওঠে তাকে মোটামুটিভাবে পাঁচটি ভাগে ভাগ করা যায়।

(ক) তাপমাত্রা ঃ উদ্ভিদ জন্মাবার জন্য কমপক্ষে গড়ে 6 সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রার প্রয়োজন। এই তাপমাত্রার নিচে কোন উদ্ভিদ জন্মাতে পারে না বলে তাপমাত্রাকে বলে বিশেষ শূন্যতা বা Specific Zero। আবার তাপমাত্রার তারতম্যের ফলে উদ্ভিদ প্রকৃতির মধ্যেও পার্থক্য দেখা যায়, যেমন—শীতল অঞ্চলে জলপাই গাছ এবং অতি উষ্ণ অঞ্চলে তাল গাছ ইত্যাদি জন্মায়।

(খ) বৃষ্টিপাত ঃ বৃষ্টিপাতের তারতম্য বনভূমি সৃষ্টিতে বিভিন্নতা নিয়ে আসে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় অত্যধিক বৃষ্টিপাত যুক্ত অঞ্চলে চিরহরিৎ বনভূমি, মধ্যম বৃষ্টিপাত যুক্ত অঞ্চলে পর্ণমোচী বনভূমি এবং অল্পবৃষ্টিপাত যুক্ত অঞ্চলে কাঁটা জাতীয় গুল্ম জন্মায়।

(গ) সূর্যালোক ঃ সূর্যালোক ব্যতীত গাছের খাদ্য তৈরি সম্ভব হয় না। সূর্যালোকের সাহায্যে গাছ তাদের সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে।

(ঘ) বায়ুপ্রবাহ ঃ বায়ুপ্রবাহ গাছের প্রস্বেদন প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করে। আবার বিভিন্ন গাছের পরাগ সংযোগ ঘটে বাতাসের সহায়তায়।

(ঙ) মৃত্তিকা ঃ মৃত্তিকার প্রকাবভেদ গাছেরও প্রকারভেদ ঘটায়। রুক্ষ মরু মৃত্তিকায় কাঁটা গুল্ম ব্যতীত কোন গাছ জন্মাতে পারে না। আবার জৈব মৃত্তিকা যুক্ত অঞ্চলে যেমন ক্রান্তীয় বনভূমিতে শাল, সেগুন ইত্যাদি বৃক্ষ সহজে জন্মায়।

ভূমিভাগের গঠন ঃ ভূমি ভাগের গঠন পার্বত্য হলে পর্বতের উচ্চতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে উদ্ভিদেরও গঠনের পরিবর্তন দেখা যায়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে হিমালয়ের পাদদেশে চিরহরিৎ উদ্ভিদ জন্মায় এবং উচ্চতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গো বনভূমিরও পরিবর্তন সংগঠিত হয় সরল বর্গীয় গাছ, আল্পীয় বনভূমি এবং তার চেয়ে উঁচুতে শৈবাল জাতীয় বনানী জন্মায়।

এইভাবে প্রকৃতি অনুসারে যে বনভূমির সৃষ্টি হয় পৃথিবীতে এর পরিমাণ বর্তমানে 419.71 কোটি হেঃ। (World Resource–1998-99) অর্থাৎ ভূভাগের উপর তার পরিমাণ শতাংশের হিসাবে 30। এই পরিমাণ আবার সর্বত্র সমান হয় না। পৃথিবীর উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলিতে এই বনভূমির পরিমাণের মধ্যে পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। উন্নয়নশীল দেশগুলি অপেক্ষা উন্নত দেশগুলিতে বনভূমির পরিমাণ অনেক বেশি হয়ে থাকে।

বনভূমির অর্থনৈতিক গুরুত্ব (Economic Significance of Forest) ঃ

অর্থনৈতিক গুরুত্ব বিচারে এর দুটি দিক রয়েছে—একটি এর প্রত্যক্ষ উপযোগিতা এবং অন্যটি পরোক্ষ উপযোগিতা। অধ্যাপক জিমারম্যানের ভাষায় বনভূমিকে সম্পদ আখ্যা দেওয়া খুবই যুক্তিযুক্ত কারণ তাঁর মতে "সম্পদ কোন বস্তুকে নির্দেশ করে না। কোন বস্তু বা পদার্থ যে কার্য সম্পাদন করে তাকেই নির্দেশ করে।" সেই অর্থে বলা যায় যে বনভূমি মানুষের নিকটে একটি অতি প্রয়োজনীয় সম্পদ। অর্থনৈতিক গুরুত্ব বিচারে এর প্রত্যক্ষ উপযোগিতা এবং পরোক্ষ উপযোগিতা নিয়ে পরের পৃষ্ঠায় আলোচনা করা হল—

বনভূমির প্রত্যক্ষ উপযোগিতা—

(ক) কাঠ শিল্প (Lumbering Industries) : বনভূমির প্রধান সম্পদ হল কাঠ। বনভূমি হতে বিভিন্ন প্রকারের কাঠ সংগ্রহ করে ঐ সকল কাঠের সাহায্যে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে কাষ্ঠ শিল্প গড়ে উঠেছে। এই সকল কাঠ দিয়ে গৃহে ব্যবহৃত নানা আসবাব পত্র, জাহাজ ও জাহাজের মাস্তুল ও পাটাতন, রেলের কামরা, স্লিপার, নৌকা, মোটর লঞ্চ, ট্রাকের কাঠামো ও নানা প্রকার প্যাকিং বাক্স ইত্যাদি তৈরি করতে ব্যবহৃত হয়।

(খ) শিল্পের কাঁচামাল (Raw Meterials for Industries) : কোন কোন ক্ষেত্রে কাঠ শিল্পের কাঁচামাল হিসাবে ব্যবহৃত হয়। যেমন কাগজ শিল্পের জন্য কাষ্ঠ মণ্ড, দেশলাই-এর বাক্স, ফাইবার বেড যা কৃত্রিম রেশম শিল্পের জন্য (গাছের আঁশ) এক অতি প্রয়োজনীয় কাঁচামাল। এর সঙ্গে সঙ্গে বনের গাছ, লতাপাতা, বহু মূল্যবান ঔষধ তৈরি করতেও ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। আবার বনের নিকৃষ্ট জাতীয় কাঠ জ্বালানি হিসাবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। বনের ফলমূল খাদ্য হিসেবে ব্যবহার করে পৃথিবীর অনেক মানুষ এখনও নিজেদের ক্ষুধার নিবৃত্তি করে থাকে।

(গ) উপজাত দ্রব্য (Different By Products) : বনভূমি বহু প্রকারের উপজাত দ্রব্যাদিও সরবরাহ করে থাকে। যেমন জীব জন্তুর মাংস ও চামড়া, মধু, মোম, লাক্ষা, রবার, তার্পিন তেল, রেশমের গুটি, কর্পূর প্রভৃতি। এছাড়া বনের ফল ও পশু শিকার করেও বহু মানুষ জীবনধারণ করে থাকে।

(ঘ) পশুপালন (Animal Husbandry) : বিভিন্ন বনভূমির প্রান্তদেশে যে বিস্তীর্ণ তৃণভূমি দেখা যায় সে সব অঞ্চল পশুপালন শিল্পের জন্য প্রসিদ্ধ। উদাহরণস্বরূপ অস্ট্রেলিয়ার ডাউন্স, আফ্রিকার সাভানা বা উত্তর আমেরিকার প্রেইরি অঞ্চলের নাম করা যায়।

বনভূমির পরোক্ষ উপযোগিতা (Indirect Utilities of Forest) :

বনভূমির পরোক্ষ প্রভাবগুলি নিচে আলোচনা করা হল—

(ক) জলবায়ুর উপর প্রভাব (Effect on Climate)

কোন দেশের জলবায়ুর উপর বনভূমি যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে থাকে, বনভূমি বৃষ্টিপাতকে নিয়ন্ত্রণ করে, প্রচণ্ড ঝড়ের গতিবেগ বৃক্ষাদির উপর প্রতিহত হয়ে তা মন্দীভূত হয়।

(খ) জমির উর্বরতা বৃদ্ধি (Growth of Soil Fertilities) : বৃষ্টির জল ভূমির উপরিভাগের উর্বর মৃত্তিকাকে ধুইয়ে বনভূমির বাইরে নিয়ে যেতে পারেনা। কারণ মাটি ধুয়ে গাছের শিকড় ইত্যাদিতে আটকে যায় ও গাছের পাতা ইত্যাদি মাটিতে পড়ে পচে মাটির উর্বরতা শক্তিকে বৃদ্ধি করতে সাহায্য করে।

(গ) মৃত্তিকা ক্ষয় রোধ (Protect Soil Erosion) : বনভূমির বিভিন্ন বৃক্ষের শিকড়ের সহায়তায় মাটি দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ থাকে বলে বৃষ্টিপাত বা অন্যান্য কারণে মাটি সহজে ধুয়ে যেতে পারে না ফলে ভূমি ক্ষয় রোধ হয়ে থাকে।

(ঘ) বন্যা নিয়ন্ত্রণ (Flood Control) : বনভূমির বৃক্ষের শিকড়ে বৃষ্টির জল প্রতিহত হয় বলে সহসা নিকটস্থ নদীর জল বৃদ্ধি পেতে পারে না এবং বন্যার গতিবেগ মন্দীভূত হয়।

(ঙ) তাপমাত্রার উপর প্রভাব (Effect on Temparature) : বনভূমি অঞ্চলে বৃষ্টিপাতের আধিক্য থাকে বলে মাটি জলসিক্ত থাকে এবং এর সঙ্গে সঙ্গে বাষ্পীভবনের ফলে তাপমাত্রা সর্বদাই মাঝামাঝি হয়।

(চ) বনভূমির অন্যান্য গুরুত্ব (Other Significance of the Forest) : বনভূমি বিভিন্ন পশু ও পাখির আশ্রয়স্থল। বনভূমি বেষ্টিত পার্বত্য ভূমি অঞ্চলের জলবায়ু স্বাস্থ্যের পক্ষে উপযোগী বলে ঐ সব অঞ্চলে ভালো স্বাস্থ্যকেন্দ্র ও ভ্রমণ কেন্দ্রগুলি গড়ে উঠেছে। যেমন ভারতের দার্জিলিং, নৈনিতাল ইত্যাদি। এই বনভূমিকে প্রবহমান সম্পদ বলে। এই সম্পদ একেবারে বিনষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা কম এবং মানুষের সচেতনতা বৃদ্ধি পেলে এই সম্পদকে বাঁচিয়ে রাখা সম্ভব।

উপরের এই আলোচনা হতে এটা পরিষ্কার যে কোন দেশের অর্থনৈতিক উন্নতির ক্ষেত্রে বনভূমি কতটা গুরুত্বপূর্ণ তা আপনারা বুঝতে পেরেছেন।

বনভূমির শ্রেণিবিভাগ (Classification of Forest) :

বায়ুপ্রবাহ, বৃষ্টিপাত, উত্তাপ, সূর্যালোক, মৃত্তিকা ইত্যাদির প্রকারভেদে বনভূমির পরিবর্তন ঘটে। কোন বনভূমির গাছগুলি আকারে বড়, আবার কোন বনভূমির গাছগুলি আকারে ছোট। কোন অঞ্চলের গাছের কাঠ শক্ত, আবার কোথাও নরম। কোথাও গাছের পাতাগুলি বড় বড়, কোথাও বা আকারে ছোট। আবার কোথাও কাঁটা গাছের ঝোপ দেখতে পাওয়া যায়। ঋতু ভেদে কোথাও গাছের পাতা ঝরে যায় আবার কোথাও ঝরে যায় না। অতএব দেখা যাচ্ছে যে উদ্ভিদের প্রকৃতির তারতম্য প্রধানত নির্ভর করে জলবায়ুর উপর। তাই পৃথিবীর সমগ্র বনভূমিকে তার জলবায়ুর উপর নির্ভর করে প্রধান দুটিভাগে ও তাদের আরো কতকগুলি উপ বিভাগে বিভক্ত করা যায়।

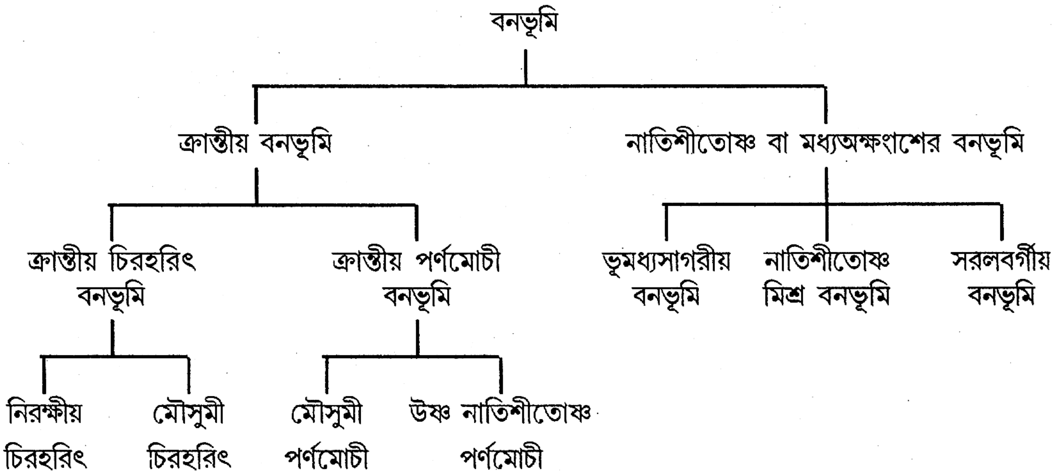

ক্রান্তীয় বনভূমি (Equatorial Forest) ঃ

ক্রান্তীয় বনভূমি উত্তরে কর্কটক্রান্তি রেখার উত্তর সীমানা হতে দক্ষিণে মকরক্রান্তি রেখার দক্ষিণ সীমানা পর্যন্ত এক বিরাট অঞ্চলে জুড়ে অবস্থান করেছে। পৃথিবীর প্রায় অর্ধেকের বেশি বনভূমি এই অঞ্চলের অন্তর্গত। এই বনভূমিকে তার গঠন ও প্রকৃতি অনুসারে আবার দুটি ভাগে ভাগ করা যায়। (১) ক্রান্তীয় চিরহরিৎ বনভূমি (২) ক্রান্তীয় পর্ণমোচী বৃক্ষের বনভূমি।

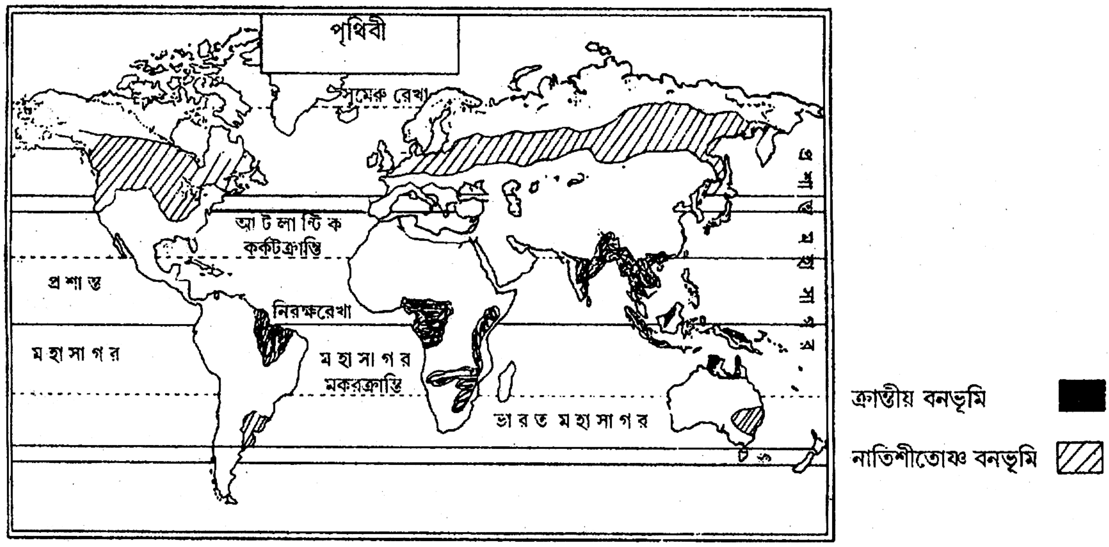

চিত্র 1.2.1 পৃথিবীর ক্রান্তীয় এবং নাতিশীতোষ্ণ বনভূমির অবস্থান

ক্রান্তীয় চিরহরিৎ বনভূমি (Equatorial Evergreen Forest) ঃ

নিরক্ষরেখার উত্তর ও দক্ষিণে সারা বছর সূর্য লম্বভাবে কিরণ দেওয়ার ফলে যেমন প্রচুর উত্তাপ পাওয়া যায় তেমনি প্রচুর বৃষ্টিপাত ঘটে। এই অঞ্চলের বৃষ্টিপাত, স্থলভাগ ও জলভাগের অবস্থান ও অক্ষাংশের উপর নির্ভর করে কোথাও দেখা যায় চিরহরিৎ বনভূমি আবার কোথাও দেখা যায় মৌসুমী চিরহরিৎ বনভূমি তাই অঞ্চলের বনভূমিকে আবার দুটি উপবিভাগে বিভক্ত করা যায়—(ক) নিরক্ষীয় চিরহরিৎ ও (২) মৌসুমী চিরহরিৎ বনভূমি।

১. নিরক্ষীয় চিরহরিৎ বনভূমি ঃ

নিরক্ষরেখার ৫°-১০° উত্তর ও দক্ষিণ অক্ষাংশের মধ্যে যে সব অঞ্চলের বৃষ্টিপাত ৪০০-৫০০ সেঃ মিঃ এবং এই বৃষ্টিপাত সারা বছর ধরে সমানভাবেই হয়ে চলে ও সারা বছর ধরে উত্তাপ ২৭°-৩২° সেঃ। দিনরাত্রির মধ্যে উত্তাপের প্রসারও খুব কম থাকে (৫° সেঃ) সে সব অঞ্চলে এরূপ বনভূমি দেখা যায়। সারা বছর এরূপ প্রচুর বৃষ্টিপাত ঘটে বলে গাছগুলির সব পাতা একসঙ্গে ঝরে যায় না বলেই এই বনভূমিকে নিরক্ষীয় চিরহরিৎ বনভূমি বলে।

অবস্থান ঃ এই বনভূমির অবস্থান প্রধানত নিম্নরূপ ঃ

(ক) দক্ষিণ আমেরিকার আমাজন নদীর পূর্ব পশ্চিমে ঐ নদীর মোহনা হতে আন্দিজ পর্বতমালা পর্যন্ত বিস্তৃত এই বনভূমি সেলভা নামে পরিচিত।

(খ) উত্তর আমেরিকার দক্ষিণে পানামা, নিকারাগুয়া, মেক্সিকো, প্রভৃতি অঞ্চলে এই বনভূমি দেখা যায়।

(গ) আফ্রিকার কঙ্গো নদীর অববাহিকার জাইরে, ক্যামেরুন, উগাণ্ডা, বুরন্ডি প্রভৃতি অঞ্চলে এই বনভূমির বিস্তার দেখা যায়।

(ঘ) দঃ পূঃ এশিয়ার থাইলান্ড, কম্বোডিয়া, মালয়েশিয়া, ভিয়েতনাম, মায়ানমার, ভারত, শ্রীলঙ্কা প্রভৃতি অঞ্চলে এই বনভূমির প্রাচুর্য দেখা যায়।

(ঙ) অস্ট্রেলিয়ার উত্তরাঞ্চল কুইন্সল্যান্ড ও নর্দান টেরিটরির উত্তরে এই বনভূমির বিস্তার দেখা যায়।

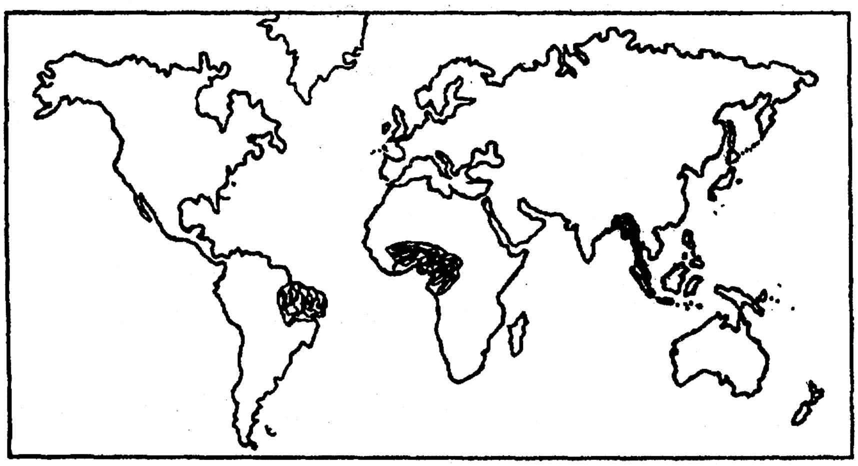

চিত্র 1.2.2 নিরক্ষীয় চিরহরিৎ বনভূমি ও মৌসুমী চিরহরিৎ বনভূমির অবস্থান।

এই অঞ্চলের বৃক্ষাদি ও তার বৈশিষ্ট্য (Principal plant group and their nature)

● সারা বছর ধরে প্রচণ্ড উত্তাপ ও বৃষ্টিপাতের ফলে এই অঞ্চলে কঠিন কাঠযুক্ত দীর্ঘ চিরহরিৎ গাছের নিবিড় বনভূমির সৃষ্টি হয়েছে। এই সকল দীর্ঘ বৃক্ষগুলি এতই ঘন সন্নিবিষ্ট হয় যে ঐ সকল বৃক্ষের ঘনপাতা ভেদ করে বনভূমির নিম্নাঞ্চলে সূর্যালোক প্রবেশ করতে পারে না। তাই এই সকল বনভূমির নিম্নে গুল্ম, দড়ির মত লতা, পরগাছা ইত্যাদি প্রচুর পরিমাণে জন্মায়।

● এই অঞ্চলের বৃক্ষগুলির আরও একটি বৈশিষ্ট্য হল এক জায়গায় নানা জাতীয় গাছের একত্র সমাবেশ।

● এই অঞ্চলে প্রচুর মূল্যবান বৃক্ষ জন্মায় এবং সেগুলির মধ্যে প্রধান হল মেহগনি (Mehogny), আবলুস (Ebony), সেগুন (Teak), দেবদারু (Cedar), গোলাপ কাঠ (Rose Wood), আয়রন কাঠ (Iron Wood) ইত্যাদি প্রধান।

২. মৌসুমী চিরহরিৎ বনভূমি (Monsoon Evergreen Forest)

ক্রান্তীয় বনভূমির যে সব অঞ্চলে বিভিন্ন ঋতুতে বায়ুর দিক পরিবর্তন হয় তাই মৌসুমী জলবায়ু অঞ্চলে বলে পরিচিত এবং এই মৌসুমী অঞ্চলে যে বৃক্ষ জন্মায় তাই মৌসুমী চিরহরিৎ বনভূমি নামে পরিচিত।

এই অঞ্চলের বার্ষিক গড় উত্তাপ প্রায় ২৭° সেঃ এবং বৃষ্টিপাত গড়ে প্রায় ২০০ সেঃ মিঃ। ভারতবর্ষ ও বাংলাদেশের বৃষ্টিবহুল অঞ্চল সমূহ ব্যতীত শ্রীলঙ্কা, মায়ানমার, ভিয়েতনাম, আফ্রিকার পূর্ব উপকূলের কিছু অংশ ব্রাজিলের উপকূলবর্তী কিছু অঞ্চলে এই জাতীয় বনভূমি দেখতে পাওয়া যায়।

এই বনভূমির প্রধান বৃক্ষগুলি হল শাল, সেগুন, তাল, বাঁশ ইত্যাদি এবং এর সঙ্গে সঙ্গে মৌসুমী অঞ্চলে প্রচুর মিষ্টি ফলের বনভূমি খুব গভীর বা ঘন হয় না।

ক্রান্তীয় বনভূমির বাণিজ্যিক উপযোগিতা (Commercial Utility of Equatorial Forest)

(ক) নিরক্ষীয় চিরহরিৎ বনভূমির মূল্যবান বৃক্ষগুলি হতে প্রাপ্ত কাঠ মূল্যবান আসবাবপত্র ও জাহাজ নির্মাণ কল্পে ব্যবহৃত হয়। এই কাঠের চাহিদা প্রচুর ও বহুদেশে রপ্তানি হয়। এছাড়া খেলার সরঞ্জাম, নৌকা, রেলগাড়ির কামরা ও স্লিপার ইত্যাদি কাজে ব্যবহৃত হয়।

(খ) এই বনভূমির কিছু কাঠ জ্বালানি হিসাবেও ব্যবহৃত হয়।

(গ) এ ছাড়া এই বনভূমিতে কিছু উপজাত দ্রব্যাদিও উৎপাদিত হয়। এদের মধ্যে জাপোট গাছের রস হতে চিকল উৎপন্ন হয়। চিকল হতে চিউইংগাম প্রস্তুত হয়। এ ছাড়া রবার, আঠা, লাক্ষা, মোম ইত্যাদি নানা সামগ্রী এই বনভূমি হতে সংগ্রহ করা হয়।

(ঘ) এই অঞ্চলে নানা প্রকার মিষ্ট ফল যথা কলা, আনারস, আম, জাম, পেয়ারা, বাদাম ইত্যাদি সংগ্রহ করেও বহু লোক জীবিকা অর্জন করে থাকে।

(ঙ) এই অঞ্চলের কাঠ খুব ভারী হলেও আসবাবপত্র প্রস্তুত করার জন্য এই কাঠের তুলনা হয় না।

ক্রান্তীয় বনভূমির অসুবিধা (Problems of Equatorial Forest)

(ক) এই অঞ্চলে বনভূমি হতে কাঠ সংগ্রহ কষ্টকর বলে এখানে কাঠ শিল্প তেমনভাবে গড়ে উঠেনি।

(খ) এই বনভূমির কাঠগুলি খুব ভারী বলে বনভূমি হতে কাঠ বহন করে আনা ব্যয়বহুল ও শ্রমসাধ্য।

(গ) এই বনভূমির নিম্নাংশ লতাপাতা ও গুল্মে আবৃত এবং গাছগুলি অত্যন্ত ঘন সন্নিবিষ্ট বলে বনভূমির অভ্যন্তরে প্রবেশ ও কাঠ আহরণ অনেক ক্ষেত্রেই দুঃসাধ্য।

(ঘ) এই অঞ্চলের জলবায়ু উষ্ণ, আর্দ্র ও স্যাঁতস্যাঁতে এবং এরূপ জলবায়ুতে বিষাক্ত কীট পতঙ্গের আক্রমণে দক্ষ ও অভিজ্ঞ মানুষেরা এই অঞ্চলে কাজ করতে অনীহা প্রকাশ করে।

(ঙ) এই সকল কারণের সঙ্গে সঙ্গে বাজারের অভাব, শক্ত কাঠের সীমাবদ্ধতা ও আন্তর্জাতিক চাহিদার অভাব এখানে কাঠ শিল্পের গড়ে ওঠার পক্ষে বাধাস্বরূপ।

ক্রান্তীয় পর্ণমোচী বনভূমি (Tropical Deciduous Forest) ঃ

ক্রান্তীয় অঞ্চলের যে স্থানে বার্ষিক বৃষ্টিপাত গড়ে ১০০-২০০ সেঃ মিঃ এবং উত্তাপ ২৭°-৩২° সেঃ ও বৃষ্টিপাত ঋতু নির্ভর সে সব অঞ্চলে পর্ণমোচী বৃক্ষের বনভূমি দেখতে পাওয়া যায়। সাধারণত নিরক্ষীয় মৌসুমী

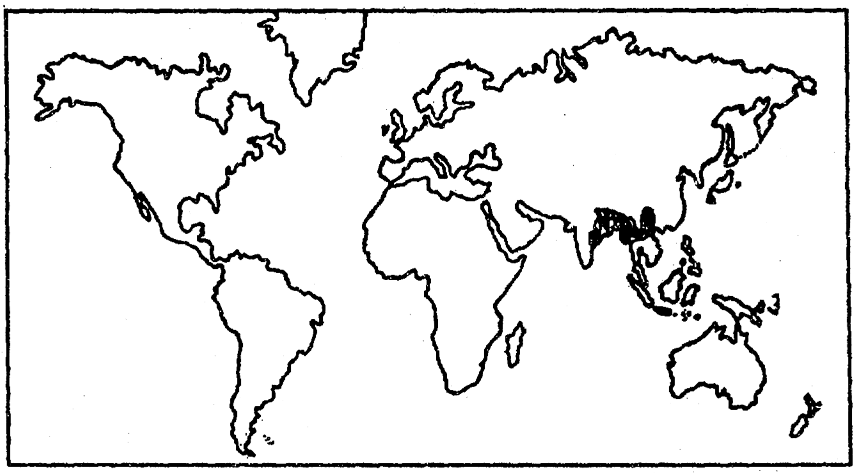

চিত্র 1.2.3 ক্রান্তীয় পর্ণমোচী বনভূমির অবস্থান

বনভূমি অঞ্চলে এ জাতীয় বৃক্ষ জন্মায়। বছরের এক বিশেষ ঋতুতে প্রধানত শীত ঋতুতে বৃষ্টির অভাবে গাছের পাতা ঝরে যায় আর সেই কারণে এই বনভূমি পর্ণমোচী বনভূমি নামে পরিচিত। গ্রীষ্মকালে বৃষ্টিপাতের সঙ্গে সঙ্গে বৃক্ষগুলিতে আবার নূতন পাতা জন্মায়। পর্ণমোচী বৃক্ষের বনভূমিকে আবার এদের গঠন অনুসারে দুভাগে বিভক্ত করা যায় (ক) মৌসুমী পর্ণমোচী ও (খ) উষ্ণ নাতিশীতোষ্ণ পর্ণমোচী।

(ক) মৌসুমী পর্ণমোচী ঃ এরূপ বনভূমির প্রধান বৈশিষ্ট্য হল সারা বছর তাপমাত্রার আধিক্য। গ্রীষ্মকালে ব্যাপক বৃষ্টিপাত এবং শীতকালে প্রায় বৃষ্টিহীন হয়ে থাকে।এরূপ উত্তাপ ওবৃষ্টিপাত উদ্ভিদ জন্মাবার ও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হওয়ার এক বিশেষ অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করে।

শীতকাল বৃষ্টিহীন বলে এই সময় গাছগুলি জলের অভাব পূরণ করার জন্য পত্রমোচন করে। এই কারণে এই অঞ্চলের পর্ণমোচী বনভূমি মৌসুমী পর্ণমোচী নামে পরিচিত।

দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার ভারত, বাংলাদেশ, মায়ানমার, থাইল্যান্ড, ভিয়েতনাম, পশ্চিম ভারতের দ্বীপপুঞ্জের কোন কোন অংশে দক্ষিণ আমেরিকার ব্রাজিল, সুদানের দক্ষিণাংশে, উত্তর অস্ট্রেলিয়ার কুইন্সল্যান্ড উপকূল অঞ্চলে মৌসুমী পর্ণমোচী বৃক্ষের বনভূমি দেখতে পাওয়া যায়।

(খ) উষ্ণ নাতিশীতোষ্ণ পর্ণমোচী বৃক্ষের বনভূমি ঃ প্রধানত গ্রীষ্ম প্রধান অঞ্চলগুলিতে এধরনের বৃক্ষাদি জন্মাতে দেখা যায়। এই সব অঞ্চলে প্রধানত বসন্ত ঋতুতে বৃক্ষগুলি পত্র মোচন করে। তবে উষ্ণতা, বৃষ্টিপাত ও ভূমির উচ্চতার দরুণ এই অঞ্চলে কোথাও চিরহরিৎ আবার কোথাও সরলবর্গীয় বৃক্ষের বনভূমি জন্মাতে দেখা যায়।

জাপান, চীন, উত্তর পশ্চিম ও পূর্ব ইউরোপের কিছু অংশ, কানাডার দঃ পশ্চিমাংশ, যুক্তরাষ্ট্রের উত্তর পশ্চিমাংশ, দক্ষিণ পূর্ব অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড, দক্ষিণ চিলি প্রভৃতি স্থানে এ জাতীয় বনভূমি দেখা যায়।

ক্রান্তীয় পর্ণমোচী বনভূমির ব্যবহার (Uses of Tropical Deciduous Forest)

(ক) এই বনভূমি নিরক্ষীয় বনভূমির মত নিবিড় নয়। ফলে এখানে কাঠ আহরণ অনেকটা সহজ।

(খ) এই অঞ্চলের শক্ত কাঠ হতে নানা প্রকার আসবাব পত্র, রেলের কামরা ও স্লিপার, জাহাজ, নৌকা, গাড়ির চাকা, ইত্যাদি তৈরি করতে ব্যবহৃত হয়।

(গ) এই অঞ্চলের বৃক্ষগুলির মধ্যে শাল, সেগুন, শিশু, পলাশ, মহুয়া, অশ্বত্থ, বট ইত্যাদি প্রধান।

(ঘ) ক্রান্তীয় মৌসুমী অঞ্চলে খাদ্যগুণ সম্পন্ন নানা ফল যথা আম, জাম, কাঁঠাল, লিচু, কলা, আনারস ইত্যাদি ফল প্রচুর পরিমাণে জন্মায়।

(ঙ) এছাড়া এই অঞ্চলের গৌণ উৎপাদনগুলির মধ্যে প্রধান হল বাঁশ যা কাগজ উৎপাদনের জন্য ব্যবহৃত হয়। পলাশ গাছে লাক্ষা কীট প্রতিপালন করা হয়। মহুয়া গাছের ফুল হতে মদ প্রস্তুত করা হয়। তুঁত গাছে রেশমের চাষ হয়। এটা ব্যতীত বাঁশ বেত প্রভৃতি দিয়ে নানা নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র তৈরি হয়ে থাকে। তাছাড়া জ্বালানি হিসাবে এই বনভূমির কাঠের প্রচুর ব্যবহার দেখা যায়।

(চ) পৃথিবীর মোট কাঠের প্রায় ২০% এই বনভূমি থেকে পাওয়া যায়।

অতএব দেখা যাচ্ছে পর্ণমোচী বনভূমির গুরুত্ব ও ব্যবহার প্রচুর পরিমাণে রয়েছে। তবে এই বনভূমির প্রধান সমস্যা হল জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এই বনভূমির এক বিশাল অংশ কৃষিকাজ ও বসবাসের জন্য ব্যবহৃত হচ্ছে। এছাড়াও প্রাকৃতিক ও অপ্রাকৃতিক নানা কারণে এই বনভূমির পরিসর ক্রমান্বয়ে সীমিত হয়ে চলেছে।

নাতিশীতোষ্ণ বা মধ্য অঞ্চলের বনভূমি (Temparate Forest) :

নিরক্ষরেখার উভয়দিকে ৩০°-৬৬$\frac{১}{২}$° উত্তর ও দক্ষিণ অক্ষরেখার মধ্যবর্তী অঞ্চল সমূহে সূর্যকিরণ তির্যক ভাবে পড়ার দরুণ তাপমাত্রা ১৫°-২৫° সেন্টিগ্রেডের মধ্যে থাকে এবং বৃষ্টিপাত ৩০-১০০ সেঃ মিঃ এর

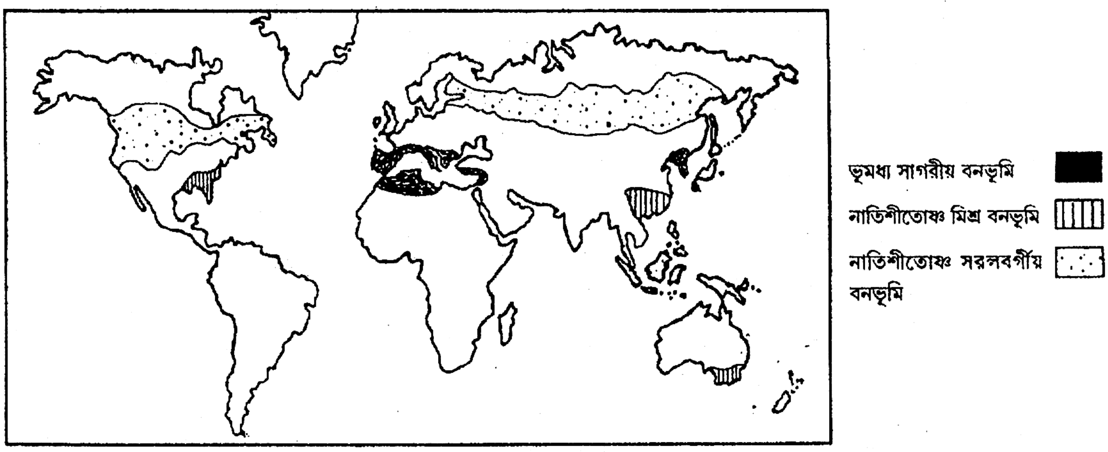

চিত্র 1.2.4 নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলের বনভূমি।

মধ্যে থাকে। এরূপ নাতিশীতোষ্ণ জলবায়ু অঞ্চলে যে সকল বৃক্ষ জন্মায় তা নাতিশীতোষ্ণ বনভূমি বলে পরিচিত। এই বনভূমিকে তার বৃষ্টিপাত ও তাপমাত্রার উপর নির্ভর করে তিনটি ভাগে ভাগ করা হয়। সেগুলি যথাক্রমে (ক) ভূমধ্যসাগরীয় বনভূমি অঞ্চল (খ) নাতিশীতোষ্ণ মিশ্র বনভূমি এবং(গ) নাতিশীতোষ্ণ সরলবর্গীয় বনভূমি।

ভূমধ্যসাগরীয় বনভূমি (Mediterranean Forest) ঃ

ভূমধ্যসাগরের তীরবর্তী অঞ্চলগুলিতে এক বিশেষ ধরনের জলবায়ু দেখতে পাওয়া যায়। সাধারণত নিরক্ষরেখার ৩০-৪৫ উত্তর ও দক্ষিণ অক্ষাংশের মধ্যে অবস্থিত দেশগুলি যথা—ইউরোপের পর্তুগাল, স্পেন, দক্ষিণ ফ্রান্স, ইতালি, যুগোস্লাভিয়া, আফ্রিকার আলজিরিয়া, টিউনিসিয়া, মরক্কো প্রভৃতি অঞ্চল। এছাড়াও ভূমধ্য সাগরের তীরবর্তী কিছু অঞ্চলেও এই জলবায়ু দেখা যায়। এই অঞ্চলগুলি হল আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়া, মধ্যচিলি, দক্ষিণ আফ্রিকার কেপটাউন ও অস্ট্রেলিয়ার দক্ষিণ পূর্ব ও দক্ষিণ পশ্চিমের কিছু অংশ।

এই সকল অঞ্চলের গড় উত্তাপ ১৮°-২৫° সেঃ এর মধ্যে থাকে এবং বৃষ্টিপাত ৫০-১০০ সেঃ মিঃ। তবে এখানকার জলবায়ুর প্রধান বৈশিষ্ট্য হল শীতকালীন বৃষ্টিপাত ও শুষ্ক গ্রীষ্মকাল।

ভূমধ্যসাগরীয় অরণ্যের বৈশিষ্ট্য ঃ

● গাছগুলি খর্বাকৃতি ও বৃহৎ পত্রযুক্ত।

● শুষ্ক গ্রীষ্মকালের হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য পত্রমোচন না করে প্রকৃতি বিশেষ পন্থা গ্রহণ করে থাকে। যেমন কোন কোন পাতায় রেশমী রোঁয়ার আবরণ থাকে, আবার কোন কোন গাছের পাতা চামড়ার মত। কোন গাছের ছাল পুরু আবার কোন গাছ দীর্ঘ শিকড় মৃত্তিকার অভ্যন্তরে বহু দূর প্রসারিত করে জলের খোঁজে। ভূমধ্যসাগরীয় চিরহরিৎ অরণ্যে বৃক্ষসমূহের এই ধরনের বৈশিষ্ট্যের জন্য এদের স্কেলরোফিল (Sclerophil) বলে।

● এখানকার বৃক্ষগুলির মধ্যে অলিভ, ওক, পাইন, ফার, জুনিপার, সাইপ্রেস, সিডার ইত্যাদি প্রধান।

বনভূমির ব্যবহার ঃ

● এই বনভূমির গাছগুলি কাঠ শিল্পের উন্নতিকল্পে বিশেষ সহায়তা না করলেও স্থানীয় প্রয়োজনে বেশ কিছু কাঠ ব্যবহৃত হয়।

● এই অঞ্চলের কর্ক, ওক গাছের ছাল হতে বাণিজ্যিক ভাবে কর্ক প্রস্তুত করা হয়। বোতলের ছিপি হিসাবে কর্কের ব্যবহার ব্যাপক। এছাড়া কর্ক থেকে জুতো ও টুপির লাইনিং, গদি, রেফ্রিজারেটরে অপরিবাহী আস্তরণ ইত্যাদি তৈরি হয়।

● জলপাই গাছ থেকে জলপাই তেল তৈরি হয়।

এই সকল দ্রব্যের সঙ্গে সঙ্গে রেশম, ধুনা, রজন, তার্পিন তেল, আঠা ইত্যাদি নানা উপজাত দ্রব্যও পাওয়া যায়।

সমস্যা ঃ

কৃষি ও জনবসতির প্রসারে এই অঞ্চলের বনভূমি ক্রমশ সঙ্কুচিত হয়ে পড়েছে।

নাতিশীতোষ্ণ মিশ্র বনভূমি (Tropical Mixed Forest) ঃ

নাতিশীতোষ্ণ জলবায়ু অঞ্চলে বৃহৎ পত্রযুক্ত চিরহরিৎ ও পর্ণমোচী বৃক্ষের মিশ্রণে যে বনভূমি দেখা যায় তা নাতিশীতোষ্ণ মিশ্র বনভূমি নামে পরিচিত। এই মিশ্র বনভূমি ৩০°-৫০° উত্তর ও দক্ষিণ অক্ষাংশের মধ্যে যেখানে গড় উষ্ণতা ১৫°-১৭° সেঃ এবং বৃষ্টিপাত ৫০-৬০ সেঃ মিঃ অর্থাৎ মৃদু শীতল আবহাওয়ায় মধ্যম বৃষ্টিপাতযুক্ত অঞ্চলে এরূপ বনভূমি ভাল জন্মায়। বেশি বৃষ্টিপাত, যুক্ত অঞ্চলে চিরহরিৎ বৃক্ষ দেখা যায় এবং যে সব অঞ্চলের বৃষ্টিপাত তুলনামূলক ভাবে কম সেখানে পর্ণমোচী শ্রেণির বৃক্ষ দেখা যায় এবং শীতকালে এরা পত্রমোচন করে। এই বনভূমির প্রধান সুবিধা হল যে এখানে একই প্রকার প্রজাতির বৃক্ষের পাশাপাশি অবস্থান দেখা যায়।

সাধারণত উত্তর পশ্চিম ও মধ্য চীন, জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া, দক্ষিণ কানাডা, মেক্সিকো, দক্ষিণ অষ্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড প্রভৃতি রাজ্যে মিশ্র নাতিশীতোষ্ণ বনভূমি দেখা যায়। তবে বৃহৎ পত্রযুক্ত চিরহরিৎ বনভূমি প্রধানত দেখা যায় দক্ষিণ পূর্ব চীন, দক্ষিণ জাপান, দঃ পূঃ অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ডে।

মিশ্র তৃণভূমি অঞ্চলে পপলার, ওক, বার্চ, চেস্টনাট, ম্যাপল, উইলো, বীচ, পাইন, ফার, ওয়ালনাট, অ্যাশ ইত্যাদি নরম ও মধ্য উভয় প্রকার বৃক্ষ প্রচুর পরিমাণে জন্মায়।

অর্থনৈতিক গুরুত্ব ঃ

১. এই অঞ্চলের কাঠ থেকে নানা প্রকার আসবাব পত্র, রেলগাড়ির কামরা, জাহাজ, বাড়িঘর প্রভৃতি নির্মাণে ব্যবহৃত হয়।

২. এই অঞ্চলের ম্যাপল গাছের রস থেকে সিরাক, চেস্টনাট, ওয়ালনাট গাছের ছাল থেকে ট্যানিন, ওক গাছ থেকে কর্ক, পাইন, ফার, পপলার গাছের রস থেকে আঠা, তার্পিন, রজন, ধুনা প্রভৃতি নানা উপজাত দ্রব্য পাওয়া যায়।

৩. পৃথিবীর মোট চেরাই কাঠের ২৫% এই বনভূমি থেকে পাওয়া যায়।

সমস্যা ঃ

জনবসতির বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কৃষিকার্য, পরিবহন ব্যবস্থা, নগরায়ন, শিল্পায়নের প্রয়োজনে এই বনভূমির আয়তন ক্রমশ হ্রাস পাচ্ছে।

নাতিশীতোষ্ণ সরলবর্গীয় বৃক্ষের বনভূমি (Temperate Coniferous Forest) ঃ

সরলবর্গীয় বনভূমি প্রধানত উত্তর গোলার্ধের শীতল নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলের ৫০°-৭০° উত্তর অক্ষাংশের মধ্যবর্তী অঞ্চলে দেখা যায়। এই বনভূমির গাছগুলি খুবই লম্বা এবং সোজা হয় আর এর পাতাগুলি খুবই

সরু তাই এদের সরলবর্গীয় বনভূমি বলে। এই বনভূমির জলবায়ু অত্যন্ত শীতল এবং শীতকাল দীর্ঘস্থায়ী হয়। এখানকার গড় উষ্ণতা ১০° সেঃ। এই বনভূমির উত্তর সীমানাকে গ্রীষ্মকালীন ৫০° সেঃ সমোষ্ণরেখা সীমাবদ্ধ করে রাখে এবং ১০° সেঃ সমোষ্ণরেখা দক্ষিণ সীমাকে নির্ধারণ করে থাকে। এখানে শীতকালে প্রচুর তুষারপাত হয় এবং এরূপ শীতল পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে নিতে এখানকার গাছগুলির আকৃতি শঙ্কুর মত, গাছের পাতাগুলি খুবই সরু ও সূঁচালো হয়।

এই বনভূমি প্রধানত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা ও ইউরোপের দেশসমূহ ও রাশিয়াতে দেখা যায়।

ক. আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র ঃ আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের উত্তর পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরীয় উপকূলে এই বনভূমি যথেষ্ট সমৃদ্ধি লাভ করেছে। এছাড়া পশ্চিমের কাসকেড রেঞ্জ, সিয়েরা নেভেদা, আলাস্কার বিস্তীর্ণ অঞ্চল ও দেশের উত্তরপূর্ব বনভূমিতেও বিক্ষিপ্তভাবে এই সরলবর্গীয় বনভূমি দেখা যায়।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে মোট কাঠ উৎপাদনের শতকরা ৪০ ভাগ আসে এই মার্কিন বনাঞ্চল থেকে।

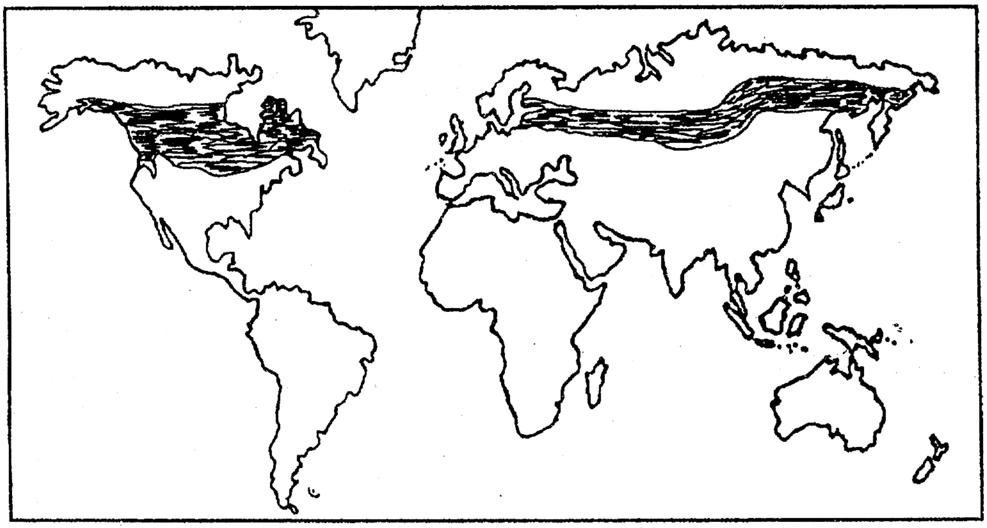

চিত্র 1.2.5 সরলবর্গীয় বৃক্ষের বনভূমি।

খ. কানাডা ও রকি পার্বত্য অঞ্চল ঃ কানাডা ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রকি পার্বত্য অঞ্চলে প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টিপাত হয় বলে এই অঞ্চলের কুইবেক, অন্টারিয়ো, ম্যানিটোবা এবং বৃটিশ কলম্বিয়া প্রদেশে এই বনভূমি প্রসার লাভ করেছে। কানাডার প্রায় ৪০ শতাংশ অঞ্চল এই বনভূমির অন্তর্গত। এই বনভূমি প্রচুর নরম কাঠ সরবরাহ করে বলে এই দেশকে নরম কাঠের গুদাম বলে।

গ. ইউরোপের দেশ সমূহ ঃ এই মহাদেশের সুইডেন, ফিনল্যান্ড, সুইজারল্যান্ড, ফ্রান্স, জার্মানী ও ইতালিতে সরলবর্গীয় বৃক্ষের বনভূমি বিস্তৃত। তবে বর্তমানে চাষ আবাদ ও বসবাসের প্রয়োজনে জমির বৃক্ষচ্ছেদন করা হয়েছে।

ঘ. রাশিয়া ঃ পৃথিবীর মোট বনভূমির প্রায় তিন ভাগের এক ভাগ এরূপ বনভূমি রাশিয়াতেই অবস্থিত। এই বনভূমি ইউরোপের পূর্বাংশে প্রশান্ত মহাসাগর হতে পশ্চিমে নরওয়ে সুইডেন পর্যন্ত বিস্তৃত। এখানকার বনভূমিকে রাশিয়ান ভাষায় বলে তৈগা। তৈগা কথার অর্থ পাইন। এই বনভূমিতে প্রচুরপরিমাণে পাইন জাতীয় উদ্ভিদ জন্মায় বলেই এই বনভূমিকে তৈগা বলা হয়। এই বনভূমির আয়তন প্রায় ৫০ কোটি হেক্টর। আরকানজেল, ওনেগা, পার্ম, চেলিয়াবিনক্স, পূর্ব ও পশ্চিম সাইবেরিয়ার ইর্খটুস্ক, ইগার্কা প্রভৃতি অঞ্চল কাঠ শিল্পের জন্য প্রসিদ্ধ।

ঙ. উপরে বর্ণিত প্রধান উৎপাদক দেশ ব্যতীত দক্ষিণ গোলার্ধে দক্ষিণ আমেরিকার ব্রাজিলের দক্ষিণাংশ, আর্জেন্টিনা ও চিলির দক্ষিণে আন্দিজ পর্বতমালা পর্যন্ত এই বনভূমির বিস্তার দেখা যায়। এ ছাড়া নিউজিল্যান্ডের দক্ষিণেও এইরূপ বৃক্ষ জন্মাতে দেখা যায়।

চ. এখানকার বৃক্ষগুলির মধ্যে পাইন, স্প্রুস, ফার্ন, বার্চ, সাইপ্রেস, হেমলক, ডগলাস, জুনিপার প্রভৃতি প্রধান। এই বৃক্ষগুলির কাঠ নরম ও হালকা বলে সহজেই ছেদন ও বহন করা সম্ভব।

অর্থনৈতিক গুরুত্ব ঃ

১. এই বনভূমি শিল্প ও জ্বালানির জন্য প্রচুর কাঠ সরবরাহ করে থাকে।

২. আসবাব পত্র, জাহাজের মাস্তুল ও পাটাতন, রেলগাড়ির কামরা, দিয়াশলাইয়ের কাঠি ও বাক্স, কাগজের মণ্ড, কৃত্রিম রেশম, প্লাইউড, নিউজ প্রিন্ট প্রভৃতি নির্মাণে এই অঞ্চলের বিভিন্ন নরম কাঠের বহুল ব্যবহার প্রচলিত।

৩. এই বনভূমি থেকে বিভিন্ন উপজাত দ্রব্য—যথা, মধু, মোম, লাক্ষা ইত্যাদিও প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়।

৪. এই বনভূমির পরিমাণ পৃথিবীর মোট বনভূমির প্রায় ৩০% হলেও মোট ব্যবহৃত কাঠের পরিমাণ শতকরা ৭৫ ভাগ।

সমস্যা ঃ

সরলবর্গীয় বনভূমির পরিমাণও বর্তমান জনসংখ্যার চাপে নগরায়নের ফলে ধীরে ধীরে সংকুচিত হয়ে চলেছে।

1.2.2 পশুপালনের সংজ্ঞা (Definition of Animal Husbandry) ঃ

অধ্যাপক জিমারম্যানের মতে (১৯৫১) পশুপালন কৃষিকার্যের অন্তর্গত। সেইদিক থেকে বিচার করলে পশুপালনকে অর্থনৈতিক কার্যের প্রাথমিক কার্যাবলীর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা যায়।

প্রাথমিক অর্থনৈতিক কার্যাবলী বলতে বোঝায় সেইসব কার্যাবলী যার সহায়তায় মানুষ ক্ষুধা নিবারণের জন্য সম্পদ আহরণ করে অর্থাৎ খাদ্য উৎপাদনের জন্য যে সকল পন্থা অবলম্বন করা যায়, তাই হল প্রাথমিক অর্থনৈতিক কার্যাবলী। কৃষির সঙ্গে সঙ্গে মৎস্য সংগ্রহ, বনজ সম্পদ সংগ্রহ এবং পশুশিকার ও পশুপালনও এই পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত।

পশুপালনের অর্থনৈতিক গুরুত্ব (Economic Importance of Animal Husbandry) ঃ

পৃথিবীর বহু দেশে পশুপালন একটি উল্লেখযোগ্য শিল্প হিসাবে গড়ে উঠেছে। পশুপালন ও পশুজাত সম্পদের উপর নির্ভর করে বহু মানুষ তাদের জীবিকা নির্বাহ করে চলেছে। পৃথিবীর বিভিন্ন অংশের প্রাকৃতিক পরিবেশে বিভিন্ন ধরনের পশু প্রতিপালিত হলেও ঐ সকল পশুজাত দ্রব্যাদি পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক বাণিজ্যে এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে রয়েছে। তাই পশুপালনের অর্থনৈতিক গুরুত্ব সম্বন্ধে অবহিত হওয়া একান্ত প্রয়োজন। নিম্নে পশুপালনের অর্থনৈতিক গুরুত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করা হল—

১। খাদ্যের যোগান ঃ গৃহপালিত পশু হিসাবে গরু, ছাগল, মেষ, শুকরের মাংস এবং গবাদি পশুর দুগ্ধ উপযুক্ত প্রোটিন খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করা হয়। দুগ্ধ হতে উৎপন্ন মাখন, ঘি, পনির, গুঁড়ো দুধ ইত্যাদির বাণিজ্যিক উৎপাদন ও ব্যবহার একদিকে খাদ্যের পুষ্টি যোগান দেয়, অন্যদিকে অর্থনৈতিক উন্নতি সাধনে সহায়তা করে। আবার হাঁস, মুরগীর মাংস ও ডিম খাদ্য হিসেবে বহুল প্রচলিত।

২। পরিবহনের ক্ষেত্রে ঃ প্রাচীন যুগ হতে পশু পরিবহনের অঙ্গ রূপে ব্যবহৃত হচ্ছে। বর্তমানে বিজ্ঞানের উন্নতিতে পশু পরিবহন অনেকাংশে প্রায় বন্ধ হয়ে গেলেও দুর্গম অঞ্চলে যোগাযোগের ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের জ্ঞান পৌঁছাতে প্রাকৃতিক গঠন বা পরিবেশ কোন ভাবেই তাকে সহায়তা করে না। সেখানে এখনও পশু যথা ঘোড়া, উট, হাতি ইত্যাদি পরিবহনের প্রধান সহায় স্বরূপ বিবেচিত হয়। তুন্দ্রা অঞ্চলে বল্গা হরিণ ও কুকুরের শ্লেজ গাড়ি টানা পরিবহনের এক সুন্দর উদাহরণ।

৩। কৃষিকার্য ঃ পশুপালন কৃষিকার্যের এক গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। নিবিড় জীবিকা ভিত্তিক কৃষি অঞ্চলগুলি যথা দক্ষিণ ও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া, আফ্রিকা, ল্যাটিন আমেরিকার বিভিন্ন দেশে জমি চাষ করা, ধান মাড়াই করা, মাটি হতে ফসল তোলা প্রভৃতি নানা কাজে গরু, ঘোড়া, মহিষ প্রভৃতি জীবজন্তু ব্যবহৃত হয়ে থাকে। পৃথিবীর প্রায় অর্ধেকের বেশি অংশে এখনও কৃষি পশুশক্তির উপর নির্ভরশীল।

৪। বিভিন্ন শিল্পের কাজে ঃ ভারত, বাংলাদেশের বিভিন্ন গ্রাম অঞ্চলে তেলের ঘানিতে বা আখের রস বার করতে বা বন হতে কাঠের গুঁড়ি বহন করে আনতে প্রচুর পরিমাণে পশু শক্তির ব্যবহার দেখা যায়। আবার এর সঙ্গে সঙ্গে পশম শিল্প, চর্ম শিল্প ইত্যাদি নানা শিল্পগুলি প্রধানত পশু নির্ভর।

৫। বিভিন্ন গবেষণার কাজ ঃ বিভিন্ন ঔষধের কার্যকারিতা পরীক্ষা করার জন্য ব্যবহার করা হয় গিনিপিগ, বানর, মেষ ইত্যাদি প্রাণীদের।

এইভাবে দেখা যাচ্ছে মানুষের জীবনের একটি অন্যতম প্রধান সম্পদ হল এই পশু সম্পদ। বন সম্পদের মত পশু সম্পদও প্রকৃতির ভারসাম্য রক্ষা করতে সহায়তা করে থাকে।

পশুপালনের শ্রেণিবিভাগ (Classification of Animal Husbandry) ঃ

প্রাকৃতিক পরিবেশের বিভিন্নতা পশুপালনের মধ্যেও বিভিন্নতা নিয়ে আসে। এই বিভিন্নতার উপর নির্ভর করে পশুপালন ব্যবস্থাকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়। (১) যাযাবরী পশুপালন (২) মিশ্র পশুপালন ও (৩) বাণিজ্যিক পশুপালন।

১। যাযাবরী পশুপালন ঃ অতি প্রাচীন কাল থেকে যে সব অঞ্চলের জলবায়ু চরমভাবাপন্ন এবং খাদ্য ও জলের অভাব প্রকট সে সব অঞ্চলে যাযাবরী পশুপালন ব্যবস্থা দেখতে পাওয়া যায়। এই পশুপালন মুখ্যত জীবিকা ভিত্তিক। ইউরেশিয়া অঞ্চলের কিরঘিস, কাজাক বা তুন্দ্রা অঞ্চলের ল্যাপ, সামোয়েদ ইত্যাদি উপজাতিরা এখনও পশুপালন করে জীবিকা নির্বাহ করে থাকে। এদের পশুপালনের জন্য কোন নির্দিষ্ট জমি থাকে না। এরা পশুদের খাদ্যের সন্ধানে স্থান হতে স্থানান্তরে ঘুরে বেড়ায়।

২। মিশ্র পশুপালন ঃ এরূপ ক্ষেত্রে শস্য উৎপাদন ও পশুপালন একত্রে চলে। এই মিশ্র পশুপালনের ক্ষেত্রে বেশি মূলধন, দক্ষ শ্রমিকের প্রয়োজন হয়। এরূপ পশুপালন যুক্তরাষ্ট্রের ভুট্টা বলয়ে, আর্জেন্টিনার প্যাম্পাস তৃণভূমিতে, ইউরোপের- মধ্য ও পূর্বাংশের তৃণভূমি অঞ্চলে প্রধানত হয়ে থাকে। এই সকল মিশ্র পশুপালন ব্যবস্থার প্রধান বৈশিষ্ট্য হল যে এখানে জীবিকা ভিত্তিক ও বাণিজ্যিক উভয় প্রকার কৃষির মিশ্রণ এবং এইরূপ কৃষি প্রগাঢ় চাষের অন্তর্গত। এছাড়া এরূপ ক্ষেত্রে শস্যাবর্তন ব্যবস্থা এক বিশেষ স্থান অধিকার করে থাকে। কৃষকেরও সারাবছর কাজের কোন অভাব ঘটেনা।

৩। বাণিজ্যিক পশুপালন ঃ এরূপ পশুপালনের ক্ষেত্রে মানুষ নিজের জন্য পশুপালন করে না, খামারের বাইরের বৃহত্তর অঞ্চলে পশুপালন করা হয় এবং উৎপাদিত দ্রব্যাদি যথা দুধ, পনির, মাংস, পশম, চর্ম ইত্যাদি বিক্রি করে অর্থ উপার্জনের উদ্দেশ্যে। সাধারণত নাতিশীতোষ্ণ ক্রান্তীয় তৃণভূমিতে এরূপ পশুচারণ দেখা যায়। এই ধরনের কৃষির প্রধান বৈশিষ্ট্য হল, এগুলি বৃহদায়তন এবং সুসংহত হয়। পশুপালনই এই অঞ্চলের প্রধান উপজীবিকা ও কৃষি দ্বিতীয় উপজীবিকা। এখানে বিজ্ঞানসম্মত ভাবে পশুপালন করা হয়। এই কাজে প্রচুর পুঁজি ও দক্ষ শ্রমিকের প্রয়োজন হয়। এই অঞ্চলের আর একটি বৈশিষ্ট্য হল এখানে একটি অঞ্চলে এক ধরনের পশুই পালিত হয়। যেমন দোহ শিল্পের জন্য গবাদি পশু ও পশমের জন্য মেষ ইত্যাদি।

পশু ও পশুজাত দ্রব্য (Animal and Animal Products) ঃ

পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে যে সকল পশুপালন করা হয় সেগুলির মধ্যে গবাদি পশু, মেষ ও শুকর প্রধান। এই পশুগুলি যে সব দ্রব্য উৎপাদনের জন্য প্রতিপালিত হয় তা নিম্নে দেওয়া হল।

গবাদি পশু পালন করা হয়—(১) দুগ্ধ, (২) মাংস, (৩) ভারবহন, (৪) চামড়া ইত্যাদি উৎপাদনের জন্য।

মেষ প্রধানত পালন করা হয়—(১) পশম ও (২) মাংসের জন্য

শুকর পালন করা হয়—(১) মাংস ও (২) চর্বির জন্য।

1.2.3 সমুদ্রের অর্থনৈতিক গুরুত্ব (Economic Significance of Sea) ঃ

সমুদ্র নানা প্রকার গচ্ছিত ও প্রবহমান সম্পদের ভান্ডার। এই ভান্ডার মানুষের অর্থনৈতিক জীবনধারার মানকে উন্নত করতে নানাভাবে সহায়তা করে। মানব জীবনে সমুদ্র সম্পদের গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনা করলে এ বিষয়ে জানা সহজ হবে।

১. সমুদ্র মানুষের খাদ্যের এক অফুরন্ত ভাণ্ডার। আবার এই খাদ্যগুলি যেমন মানুষকে প্রোটিন সরবরাহ করে তেমনি ভিটামিনও সরবরাহ করে থাকে। এছাড়া খনিজ লবণ ও আয়োডিনও সরবরাহ করে থাকে।

অতি আদি যুগে মানুষ যখন চাষবাস করতে জানত না, তখন বন হতে যেমন পশু শিকার করত তেমনি সমুদ্র বা জলাশয় থেকে মৎস্য শিকার করে খাদ্যের চাহিদা পূরণ করত। বর্তমানকালেও যেসব অঞ্চলে কৃষিকার্য করা সম্ভব হয় না সেসব অঞ্চলের মানুষেরা প্রধানত খাদ্য ও জীবিকা হিসাবে মৎস্য শিকারকেই বেছে নিয়েছে। পৃথিবীর সাগর, মহাসাগর হতে বর্তমানে বছরে প্রায় ১০ কোটি মেট্রিক টন মৎস্য শিকার করা হয়—বিভিন্ন সংস্থার রিপোর্টে এই তথ্য পাওয়া গেছে। প্রোটিন খাদ্যের সঙ্গে সঙ্গে সমুদ্র থেকে প্রচুর পরিমাণে খাদ্যোপযোগী সামুদ্রিক উদ্ভিদ সংগ্রহ করে সেগুলির সহায়তায় ভিটামিন সমৃদ্ধ নানা পুষ্টিকর খাদ্যের উৎপাদন করা সম্ভব হয়েছে। মালয়েশিয়া, চীন, জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া প্রভৃতি দেশ প্রচুর পরিমাণে সি-উইড-উৎপাদন করে মানুষের ও পশু-পাখির ভিটামিন যুক্ত খাদ্য প্রস্তুত করতে সক্ষম হয়েছে। এই খাদ্য বহুল পরিমাণে ব্যবহার সম্ভব হলে পৃথিবীর খাদ্য সমস্যার বহুলাংশে সমাধান করা সম্ভব হবে বলে বিভিন্ন বিশেষজ্ঞরা অভিমত পোষণ করেন।

২. সমুদ্র বিভিন্ন প্রবহমান সম্পদের উৎস। সমুদ্রের জোয়ার ভাঁটা শক্তিকে কাজে লাগিয়ে বিদ্যুৎ শক্তি উৎপাদন করা সম্ভব হয়েছে। এরূপ একটি বিদ্যুৎ কেন্দ্র গড়ে উঠেছে ফ্রান্সের লা রাঞ্চ নদীর খাড়িতে (১৯৬৬ সালে)। বর্তমানে ভারতসহ বিভিন্ন দেশে জোয়ার ভাঁটার শক্তিকে কাজে লাগিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হচ্ছে।

জোয়ার ভাঁটার সঙ্গে সঙ্গে সমুদ্রের তরঙ্গের শক্তি হতেও বিদ্যুৎ উৎপাদন সম্ভব হয়েছে। জাপানের কাইমি শক্তি উৎপাদন কেন্দ্রে ১৯৭৮ সালে এই ধরনের বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন করে বিদ্যুৎ উৎপাদিত হচ্ছে। সমুদ্র জলের উষ্ণতার পার্থক্যকে কাজে লাগিয়ে ফ্রান্স ও আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের সমুদ্র উপকূলে পরীক্ষামূলকভাবে বিদ্যুৎ কেন্দ্র গড়ে উঠেছে ও বিদ্যুৎ উৎপাদিত হচ্ছে। ভারতের তামিলনাড়ু উপকূলেও এরূপ একটি কেন্দ্র গড়ে তোলা হয়েছে।

বর্তমানে পৃথিবীতে ব্যবহৃত শক্তির উৎস যথা কয়লা বা খনিজ তেল উভয়ই ক্ষয়িষ্ণু এবং পরিবেশ দূষণের ক্ষেত্রেও এরা একটি বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে। তাই সমুদ্রের এই সকল শক্তিকে যদি বাণিজ্যিকভাবে ব্যবহার করা সম্ভব হয় তবে ভবিষ্যতে শক্তি সম্পদের সমস্যা অনেকাংশেই সমাধান করা সম্ভব হবে এবং সঙ্গে সঙ্গে পরিবেশ দূষণের মাত্রাও অনেক কমে যাবে।

৩. সমুদ্র বিভিন্ন খনিজ সম্পদের ভাণ্ডার। এই সমস্ত খনিজের মধ্যে সমুদ্রের মহীসোপান অঞ্চল হতে খনিজ তেল বা Hydro Carbon এবং প্রাকৃতিক গ্যাস সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। ভারতের মুম্বাই দরিয়া, বৃটিশ যুক্তরাজ্যের রক, সৌদি আরবের সাকানিয়া ইত্যাদি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

বর্তমানে পৃথিবীতে যে খনিজ তেল আহরণ করা হয় তার ২০-৩০ শতাংশ উৎপাদিত হয় এইসব দরিয়া অঞ্চলগুলি হতে।

বিভিন্ন বিজ্ঞানীরা পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণ করেছেন যে সমুদ্র বক্ষে ইউরেনিয়াম সহ অন্যান্য তেজস্ক্রিয় খনিজ সম্পদের যে সঞ্চয় রয়েছে তার ব্যবহার সম্ভব হলে তা থেকে যে পরিমাণ আণবিক শক্তি উৎপাদিত হবে, তা দ্বারা পৃথিবীর শক্তি সম্পদের চাহিদা মেটান সম্ভব হবে।

সমুদ্রের গভীরতম অংশে প্রচুর পরিমাণে খনিজ সম্পদ যথা ম্যাঙ্গানিজ, নিকেল, কোবাল্ট, তামা, মলিবডেনাম, লোহা, অ্যালুমিনিয়াম ইত্যাদির ভাণ্ডার রয়েছে। ঐ সকল খনিজ সম্পদ আহরণ করা সম্ভব হলে পৃথিবীর খনিজ সম্পদের চাহিদা সহজেই পূরিত হয়।

এছাড়া সমুদ্রের অন্যান্য আহরণযোগ্য সম্পদগুলির মধ্যে হীরে, প্লাটিনাম, সোনা, লোহা ইত্যাদি মূল্যবান খনিজ সম্পদগুলি বিভিন্ন সমুদ্রের উপকূল অঞ্চলে পাওয়া যায়। আবার সমুদ্রের মহীসোপান অঞ্চলে ফসফেটিক নোডিউলস ও ইভাপোরাইট জাতীয় লবণের স্তর দেখতে পাওয়া যায়। আরও গভীর সমুদ্রের তলদেশে ফেরো ম্যাঙ্গানীজ নোডিউলস্ যা থেকে প্রচুর পরিমাণে লোহা, ম্যাঙ্গানিজ, তামা নিকেল, কোবাল্ট ইত্যাদি খনিজ আহরণ করা সম্ভব।

সমুদ্রের জল দ্রবীভূত লবণের আকর। প্রতি ১০০০ গ্রাম জল হতে প্রায় ৩৪.৪৫ গ্রাম লবণ পাওয়া যায়।

৪. সমুদ্র জল পরিবহন দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক পরিবহনের সর্বাপেক্ষা সহজ ও সস্তা উপায়। অল্প খরচের এতবেশি পণ্যবহন, অন্য কোন পরিবহন ব্যবস্থা দ্বারা হওয়া সম্ভব নয়।

৫. সমুদ্রের নিকটস্থ স্থলভাগের জলবায়ু সম্পূর্ণরূপে সমুদ্রের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। বাতাসে জলীয় বাষ্পের যোগান দেয় সমুদ্র এবং পরোক্ষভাবে বৃষ্টিপাতে সহায়তা করে থাকে। সমুদ্রের উষ্ণ বা শীতলস্রোত প্রবাহ, সংলগ্ন স্থলভাগের আবহাওয়াকেও নিয়ন্ত্রণ করে থাকে।

৬. সমুদ্র জীবিকার এক বিশেষ উৎস। সমুদ্র হতে বিভিন্ন প্রকার মৎস্য সংগ্রহ করা, সংরক্ষণ করা, মৎস্য সংগ্রহের জন্য বিভিন্ন জলযান তৈরি করা, মৎস্য শিকারের সরঞ্জাম তৈরি করা, মুক্তা চাষ করা ইত্যাদি নানা ব্যবসা ও তার আনুষঙ্গিক নানা কাজে প্রচুর শ্রমিকের প্রয়োজন হয়।

চিত্র 1.2.6 পৃথিবীর বিভিন্ন সমুদ্রের অবস্থান

৭. সমুদ্র তীরবর্তী অঞ্চলগুলিতে সমুদ্র ও স্থলভাগের মিলনের ফলে যে সৌন্দর্যের সৃষ্টি হয়, তা উপভোগ করতে মানুষ বারবার ছুটে যায় সমুদ্রের বেলাভূমিতে। এর ফলে গড়ে উঠেছে নানা আকর্ষণীয় পর্যটন।

সমুদ্রের বিভিন্ন উদ্ভিদ সংগ্রাহক দেশ সমূহ (Different Sea-weed Harvesting Countries)

পৃথিবীর স্থলভাগের মত জলভাগেও নানাপ্রকার উদ্ভিদ জন্মায়। এই সকল উদ্ভিদ হতে বর্তমান যুগে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সহায়তায় নানাপ্রকার পশুখাদ্য, আয়োডিন, ভিটামিন (AD ও B) মানুষের খাদ্য, নানাপ্রকার সার, রং তৈরির উপকরণ ইত্যাদি নানা-প্রকার সামগ্রী উৎপাদন করা হচ্ছে। এই সব সামুদ্রিক উদ্ভিদ বা সি-উইড (Sea-weed) কে তাদের গঠন অনুসারে যে ভাবে ভাগ করা হয় তা সারণিতে দেখান হল।

সামুদ্রিক উদ্ভিদ

↓ বিভিন্ন প্রকার শৈবাল ছত্রাক ইত্যাদি
- ↓ এককোষী অ্যালগি (Algae)
- ↓ বহুকোষী ব্যাকটেরিয়া (Bacteria)

↓ নানা-ধরনের গাছপালা (বাণিজ্যিকভাবে আহরণ করা হয়)

- সমগ্র পৃথিবীর মধ্যে সামুদ্রিক উদ্ভিদ উৎপাদনে চীন প্রথম স্থান অধিকার করে রয়েছে। সমগ্র উৎপাদনের প্রায় ৪০ শতাংশ একা চীন উৎপাদন করে।
- চীনের পর সামুদ্রিক উৎপাদনে জাপানের স্থান দ্বিতীয়। জাপান প্রায় ১৯.১১ শতাংশ উৎপাদন করে।
- চীন ও জাপানের পর দক্ষিণ কোরিয়া ও ফিলিপাইন যথাক্রমে তৃতীয় ও চতুর্থ স্থান অধিকার করে রয়েছে। এছাড়া অন্যান্য সি-উইড উৎপাদনকারী দেশগুলির মধ্যে সি. আই. এস, নরওয়ে, চিলি, ফ্রান্স, কানাডা, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি প্রধান।

সমুদ্র হতে প্রাপ্ত বিভিন্ন রাসায়নিক ও খনিজ সম্পদ (Different chemical and mineral resource of the sea)

সমুদ্র নানাবিধ খনিজের আকর। তাই সমুদ্রের আর এক নাম রত্নাকর। এই সকল খনিজ পদার্থগুলি সমুদ্রের বিভিন্ন স্থান হতে আহরণ করা সম্ভব। প্রাপ্তিস্থান অনুসারে এর বিভাগগুলি নীচের সারণিতে দেওয়া হল।

সামুদ্রিক খনিজ দ্রব্য

- ↓ দ্রাব্য অবস্থায় সমুদ্র জল হতে লবণ, ম্যাগনেশিয়াম ইত্যাদি
- ↓ তটভূমি ও মহীসোপান অঞ্চল হতে হীরে, লোহা, প্লাটিনাম ইত্যাদি
- ↓ গভীর সমুদ্রের তলদেশে ম্যাঙ্গানিজ নুড়ি

সমুদ্রজলে দ্রাব্য অবস্থায় প্রাপ্ত খনিজ (Minerals Dissolved in Sea Water)

সমুদ্রজলে দ্রাব্য অবস্থায় বাণিজ্যিকভাবে যেসব খনিজ আহরণ করা হয় সেগুলির মধ্যে লবণ, ব্রোমিন ও ম্যাগনেসিয়াম প্রধান। এগুলি ব্যতীত কিছু ক্যালসিয়াম ও পটাসিয়ামও সংগ্রহ করা হয়। অতি প্রাচীনকাল হতে মানুষ সমুদ্রের জল থেকে লবণ সংগ্রহ করত। গড়ে প্রতি ১০০০ গ্রাম সমুদ্র জল হতে ৩৪.৪৫ গ্রাম লবণ পাওয়া যায় তবে সমুদ্র জলে বিভিন্ন প্রকার লবণ দ্রাব্য অবস্থায় থাকে এবং এই সব দ্রাব্য লবণের পরিমাণ সর্বত্র সমান হয় না। নিচের সারণিতে বিভিন্ন লবণের পরিমাণের পরিমাপ হতে ধারণা আরও পরিষ্কার হবে।

সমুদ্রতলে বিভিন্ন লবণের পরিমাণ

লবণের নাম	প্রতি ১০০০ গ্রাম জলে লবণের গড় পরিমাণ (গ্রামের হিসাবে)
1. সোডিয়াম ক্লোরাইড (NaCl)	23.48
2. ম্যাগনেশিয়াম ক্লোরাইড ($MgCl_2$)	4.98
3. সোডিয়াম সালফেট (Na_2SO_4)	3.92
4. ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড ($CaCl_2$)	1.10
5. পটাসিয়াম ক্লোরাইড (KCl)	0.66
6. সোডিয়াম বাই কার্বনেট ($NaHCO_3$)	0.19
7. পটাসিয়াম ব্রোমাইট (KBr)	0.10
8. অন্যান্য	0.02

সমুদ্রজল হতে যে সমস্ত লবণ পাওয়া যায় তাদের মধ্যে সোডিয়াম ক্লোরাইড সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয়। ডেডসিতে পাওয়া যায় পটাসিয়াম ব্রোমাইড। এই লবণ ফিল্ম ডেভলপিং-এর জন্য প্রয়োজন হয়।

হিসেব করে দেখা গেছে যে প্রতি বছর বিশ্বের সমুদ্র জল হতে প্রায় ৪ কোটি মেট্রিক টন লবণ আহরণ করা হয়।

সমুদ্রের গভীর অঞ্চল হতে সংগৃহীত বিভিন্ন সম্পদ সমূহ (Resource Available from Deep Sea)

গভীর সমুদ্রের সঞ্চয় সম্পর্কে এখনও বৈজ্ঞানিকদের সম্পূর্ণ ধারণা করা সম্ভব হয়নি তবে যে সম্পদের সন্ধান তারা দিয়েছেন তার মধ্যে প্রধান হল ফেরো ম্যাঙ্গানিজ নোডিউলস্ (Ferro-Manganese Nodules)।

- এই সম্পদটি আসলে সমুদ্রের গভীর তলদেশে লোহা, ম্যাঙ্গানিজ, তামা, নিকেল, কোবাল্ট ইত্যাদি খনিজে সমৃদ্ধ। বিভিন্ন খনিজের মধ্যে এসকল নুড়িগুলিতে ম্যাঙ্গানিজের পরিমাণ বেশি থাকে বলে একে অনেকে ম্যাঙ্গানিজ নুড়ি বলেও অভিহিত করেন।

● পৃথিবীর বিভিন্ন সমুদ্রের মধ্যে প্রশান্ত মহাসাগরে সঞ্চিত ম্যাঙ্গানিজ নুড়ির পরিমাণ সবচেয়ে বেশি বলে বিজ্ঞানীরা বিভিন্ন সমীক্ষা দ্বারা প্রমাণ করেছেন এবং আটলান্টিক ও ভারত মহাসাগরে এর অস্তিত্ব নির্ধারণ করতে সমর্থ হয়েছেন।

● পৃথিবীর বিভিন্ন উন্নত দেশগুলি যথা আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান, ব্রিটিশ যুক্তরাজ্য ও জাপান গভীর সমুদ্রের তলদেশ হতে এই সম্পদ আহরণ করে ম্যাঙ্গানিজ সহ বিভিন্ন ধাতুর নিষ্কাশন আরম্ভ করেছে। ভারতেও এই কাজ বর্তমানে শুরু হয়েছে। এরূপ উত্তোলন ও নিষ্কাশন বাণিজ্যিকভাবে করা সম্ভব হলে ভূ-পৃষ্ঠে অপূরণশীল খনিজের সংরক্ষণ করা সম্ভব হবে। কারণ সমুদ্রের তলদেশের ঐ সব সম্পদগুলি ক্ষয়িষ্ণু নয় বলেই বিজ্ঞানী J. L. Mero তাঁর গ্রন্থ The Mineral Resource of the Sea (1965)-তে ব্যাখ্যা করে বলেন সমুদ্রের তলদেশের এই নুড়ির পরিমাণ ক্রমশ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়ে চলেছে।

মৎস্য সম্পদ ও তার প্রকারভেদ (Fish Resource—Different Types)

মৎস্য সমুদ্রের আর একটি অন্যতম সম্পদ। মৎস্য মানুষের একটি প্রোটিনযুক্ত সুষম খাদ্য। তবে খাদ্য ব্যতীত অন্যান্য বিভিন্ন কার্যেও এর ব্যবহার দেখা যায়। যেমন তেল চামড়া ও সার ইত্যাদি প্রধান উপজাত দ্রব্যগুলি মৎস্য হতে পাওয়া যায়। পৃথিবীর অধিকাংশ উপকূলবর্তী দেশগুলি সমুদ্র থেকে মৎস্য আহরণ করে জীবিকা অর্জন করে থাকে। বিশেষত যে সকল অঞ্চলে চাষবাসের জমির অভাব সে সব অঞ্চলের লোকেরা সমুদ্র হতে মৎস্য সংগ্রহ করে জীবনধারণ করে থাকে। জাপান, ইংল্যান্ড, কানাডার নিউ ফাউন্ডল্যান্ড প্রভৃতি অঞ্চল মৎস্য শিকারে পৃথিবীতে এক বিশেষ স্থান অধিকার করেছে। পরের পাতায় সারণিতে মৎস্য চাষের প্রকারভেদ দেওয়া হল।

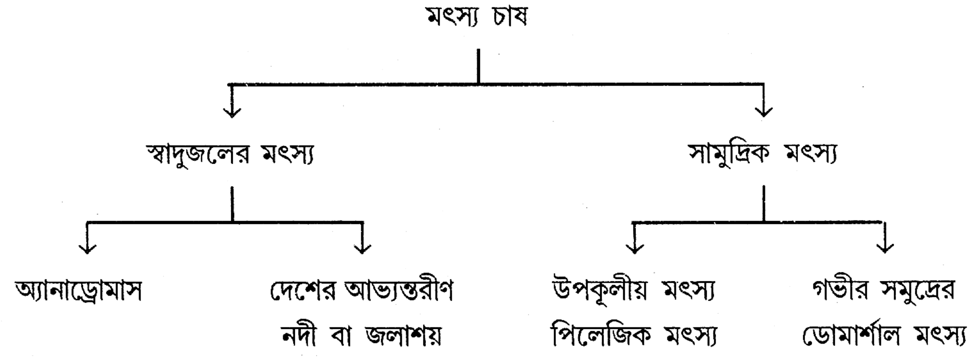

১. স্বাদুজলের মৎস্য সংগ্রহ করা হয় দেশের অভ্যন্তরস্থ নদী, নালা, খাল-বিল, জলাশয় প্রভৃতি হতে। এই স্বাদুজলের মৎস্যগুলিকে তাদের প্রাপ্তিস্থান অনুসারে দুভাগে ভাগ করা হয়।

(ক) অ্যানাড্রোমাস মৎস্য (Anadromus fish) ঃ যে সকল মৎস্য অধিকাংশ সময় সমুদ্র উপকূলের লবণাক্ত জলে বসবাস করলেও বছরের এক বিশেষ ঋতুতে সমুদ্রের খাড়ি অঞ্চলের মাধ্যমে দেশের অভ্যন্তরে চলে আসে তাকে অ্যানাড্রোমাস মৎস্য বলে। যেমন—ইলিশ, স্যামন ইত্যাদি।

(খ) দেশের অভ্যন্তরস্থ নদী বা জলাশয়ের মৎস্য ঃ যে সকল মৎস্য দেশের অভ্যন্তরস্থ নদী বা হ্রদ ইত্যাদি স্বাদু জলে জন্মায় এবং বংশ বিস্তার করে সেই সব মৎস্যকে স্বাদুজলের মৎস্য বলে-যেমন রুই, কাতলা, শিঙি, মাগুর ইত্যাদি। ভারত, বাংলাদেশ, চিন, মালয় প্রভৃতি অঞ্চলে এই স্বাদুজলের মাছের চাষ প্রচুর পরিমাণে হয়ে থাকে।

স্বাদুজলের মৎস্য চাষের সুবিধা হল যে এই চাষে চাহিদা অনুসারে উৎপাদন বা সংগ্রহ সম্ভব হয় এবং এই চাষে উৎপাদন খরচও সামুদ্রিক মৎস্য সংগ্রহ হতে অনেক কম হয়। তবে এই চাষ খুব কমই বাণিজ্যভিত্তিক করা সম্ভব হয় কিন্তু এটা স্থানীয় চাহিদা পূরণে সহায়তা করে বলে এরূপ মৎস্য চাষকে জীবিকা সত্তাভিত্তিক চাষ বললে কিছু ভুল বলা হয় না। এরূপ মৎস্য চাষ দক্ষিণ পূর্ব-এশিয়ার দেশগুলি, পূর্বতন সোভিয়েত দেশ, আফ্রিকার বিভিন্ন নদী ও হ্রদ বিশেষত নীল নদ এবং আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন নদনদী ও হ্রদ সমূহ হতে প্রচুর পরিমাণে সংগ্রহ করা হয়ে থাকে।

সামুদ্রিক মৎস্য চাষ (Sea water fishing) ও পৃথিবীর প্রধান মৎস্য ক্ষেত্রগুলি (Major fishing grounds of the world) ঃ

সাগর বা মহাসাগর হতে প্রাপ্ত বিভিন্ন মৎস্য প্রাপ্তি ক্ষেত্রকে ভিত্তি করে বাণিজ্যভিত্তিক যে মৎস্য সংগ্রহ করা হয় তাকে সামুদ্রিক মৎস্য চাষ বলা হয়। সামুদ্রিক এই মৎস্যকে তার প্রাপ্তিস্থান অনুসারে দুটি ভাগে ভাগ করা হয়।

- উপকূল অঞ্চলের মৎস্য ঃ উপকূলের অগভীর অঞ্চলে যে সকল মৎস্য বাস করে তাদের বলে পিলেজিক মৎস্য (Pelagic)। এই মৎস্য সাধারণত নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলের বিভিন্ন স্থানে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। হেরিং, সার্ডিন, পিলচার্ড, ব্রিসলিং প্রভৃতি এরূপ মৎস্যের অন্তর্গত। এরূপ মৎস্য বাণিজ্যিক ও জীবিকা সত্তাভিত্তিক এই উভয় ধরনের হয়ে থাকে।
- গভীর সমুদ্র অঞ্চলে যে ধরনের মাছ পাওয়া যায় তাদের বলে ডেমার্শাল মৎস্য। এই মৎস্য প্রধানত বাণিজ্যভিত্তিক। কড, হ্যালিবাট, টুনা প্রভৃতি এই জাতীয় মৎস্য।

এই সকল সামুদ্রিক মৎস্যগুলির প্রাপ্তিস্থান বিচার করলে দেখা যায় যে পৃথিবীর বিভিন্ন নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলগুলিতে বিশেষত উচ্চ অক্ষাংশে এর অবস্থান। নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে প্রাকৃতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থাগুলি এখানে মৎস্য চাষ গড়ে তুলতে সাহায্য করে বলেই নিম্নোক্ত অঞ্চলগুলিতে মৎস্য কেন্দ্র গড়ে উঠেছে।

নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে মৎসক্ষেত্র গড়ে ওঠার কারণগুলিকে প্রধানত দুটি ভাগে ভাগ করা হয়। (১) প্রাকৃতিক কারণ ও (২) আর্থ সামাজিক কারণ। প্রাকৃতিক অনুকূল কারণগুলি নিম্নরূপ—

(১) অগভীর সমুদ্র এবং প্লাঙ্কটনের প্রাচুর্য—সমুদ্রের অগভীর অংশে যেখানে সমুদ্র জলের গভীরতা ২০০ মিটারের মধ্যে অর্থাৎ মহীসোপান অঞ্চলগুলি মৎস্য শিকারের প্রধান ক্ষেত্রের কারণ—(ক) সমুদ্রের এই

অগভীর অংশে নদীবাহিত আবর্জনা, জীবজন্তুর মৃতদেহ ইত্যাদি সঞ্চিত হয় এবং এইসব আবর্জনা হতে মৎস্য তাদের খাদ্য সংগ্রহ করে। (খ) সমুদ্রের অগভীর অংশ মাছের ডিম পাড়ার জন্য প্রশস্ত ক্ষেত্র কারণ এইসব অঞ্চলে জলের উপর ঢেউয়ের যে চাপ পড়ে তা মাছের ডিম হতে পোনা সৃষ্টিতে সহায়তা করে। (গ) সূর্যালোক ব্যতীত মাছের খাদ্য প্লাঙ্কটনের জন্ম বা বৃদ্ধি ঘটায় এবং সূর্যালোক সমুদ্রের তলদেশে ২০০ মিটারের অধিক গভীরে পৌঁছাতে পারে না তাই অগভীর সমুদ্রে যেখানে সূর্যালোক পৌঁছাতে পারে, যেসব অঞ্চলে প্লাঙ্কটন এবং বিভিন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উদ্ভিদ ও প্রাণী জন্মাতে পারে সেসব অঞ্চল মৎস্য চাষের পক্ষে প্রকৃষ্ট। এইসব কারণে অগভীর মহীসোপান অঞ্চলে পিলেজিক জাতীয় মৎস্য প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়।

(২) উষ্ণ ও শীতল স্রোতের মিলন—উষ্ণ ও শীতল স্রোতের মিলন স্থানগুলি মৎস্য সংগ্রহের আদর্শ কেন্দ্র। উষ্ণ স্রোত প্রধানত শীতল স্রোতের উপর দিয়ে প্রবাহিত হয় এবং শীতল স্রোতের নিম্নাভিমুখী চলনের ফলে সমুদ্রের নিম্নস্থ খনিজ এবং খাদ্য সমূহ দুই জলরাশির চলনের ফলে ঊর্ধ্বদিকে উৎক্ষিপ্ত হয়, এর ফলে সমুদ্রস্থিত মৎস্যের খাদ্যের প্রাচুর্য ঘটে। আবার শীতল স্রোতের সঙ্গে হিমশৈল ইত্যাদি বাহিত হয়ে আসে এবং উষ্ণ স্রোতের প্রভাবে ঐগুলি গলে গেলে ঐ সকল হিমশৈলে সঞ্চিত বালি মাটি, নুড়ি ইত্যাদি অগভীর সমুদ্রে অধক্ষেপের ফলে বিভিন্ন মগ্ন চড়ার সৃষ্টি হয় বলে ঐ সকল অঞ্চলে প্রচুর মৎস্য সংগ্রহ করা সম্ভব হয়। গ্রান্ডব্যাঙ্ক, জর্জেস ব্যাঙ্ক প্রভৃতি মগ্ন চড়াগুলি তাই মৎস্য ক্ষেত্ররূপে পৃথিবী বিখ্যাত।

(৩) সমুদ্রের ঊর্ধ্বমুখী আবর্ত—সমুদ্রের বিভিন্ন অংশে উষ্ণতা, লবণতা ও ঘনত্ব ইত্যাদির পার্থক্যের ফলে সমুদ্রজলে এক ঊর্ধ্বমুখী আবর্ত দেখা যায়। এই আবর্তের ফলে সমুদ্রের গভীরে যে সকল বিভিন্ন সমুদ্রজ প্রাণীর মৃতা দেহাবশেষের অবশিষ্টাংশ বিভিন্ন খনিজ ইত্যাদি থাকে তা উপরে ভেসে ওঠে এবং ঐ সকল অঞ্চলের মৎস্যের খাদ্যপুষ্টি যোগাতে সহায়তা করে। যে সকল অঞ্চলের জলে এরূপ আবর্ত দেখা যায় সে সকল অঞ্চলে খাদ্যের খোঁজে মৎস্য সকল ঝাঁক বেঁধে আসে বলে মৎস্য সংগ্রহ সহজ হয়।

(৪) মৃদু শীতল জলবায়ু—মৃদু শীতল জলবায়ু এই অঞ্চলের সমুদ্রে অংশগ্রহণকারী শিকারীদের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি করে এবং স্বাভাবিক বরফপ্রাপ্তির সুযোগ হেতু এই অঞ্চলের মৃত মৎস্য সংরক্ষণ করা সম্ভব হয়।

(৫) ভগ্ন উপকূল—ভগ্ন উপকূলভাগ বন্দর গড়ে ওঠার পক্ষে উপযুক্ত। উত্তর গোলার্ধে ভগ্ন উপকূল যথেষ্ট পরিমাণে থাকার ফলে অতি সহজেই মৎস্য বন্দরগুলি গড়ে উঠতে সহায়তা করেছে এবং তা মৎস্য বাণিজ্যের কেন্দ্র হয়ে উঠেছে।

(৬) অরণ্যের উপস্থিতি—উপকূল অঞ্চলে অরণ্যের উপস্থিতি মৎস্য সংগ্রহের জন্য জাহাজ, নৌকা, ট্রলার প্রভৃতি নির্মাণের জন্য সুলভ। নরম উপযুক্ত কাঠের সরবরাহ করে থাকে। এর সঙ্গে সঙ্গে বৃষ্টির জলে বনভূমি হতে নদী প্রবাহে প্রচুর পরিমাণে মৎস্য খাদ্য মহীসোপান অঞ্চলে জমা হয় এর ফলে ঐ সকল অঞ্চলে প্রচুর পরিমাণে মৎস্য সমাগম ঘটে থাকে।

(৭) খাদ্যাভ্যাস ও চাহিদা—সাধারণ সমুদ্র উপকূলের মৎস্য শিকারের অঞ্চলগুলির অবস্থান ও বন্ধুর ভূপ্রকৃতি ঐ সকল অঞ্চলগুলিকে কৃষির অনুপযোগী করে তোলে, ফলে বিকল্প খাদ্য ও জীবিকা হিসেবে ঐ সকল দেশ যথা নিউ ফাউন্ডল্যান্ড, নরওয়ে, সুইডেন, ডেনমার্ক, জাপান ইত্যাদি অঞ্চলগুলি প্রসিদ্ধ মৎস্য শিকার কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে। এর সঙ্গে দ্রুত পচনশীল দ্রব্য মৎস্যের জন্য, বাজারের নৈকট্য একান্ত প্রয়োজন। এই কারণে

মৎস্য শিকার কেন্দ্রের নিকটস্থ বিপুল জনতার চাহিদা স্থানীয় মৎস্য বাজারের সৃষ্টি করেছে এবং তা মৎস্য সংগ্রহকে আরও বেশি উন্নত করে তুলতে সহায়তা করছে।

(৮) শ্রমিকের সরবরাহ—সমুদ্র উপকূলবর্তী অঞ্চলের অধিবাসীরা তুলনামূলকভাবে সমুদ্রে ভেসে চলার ব্যাপারে অনেক সাহসী ও সাঁতারে পটু হয় এবং ঐ সকল অঞ্চল কৃষিকার্যে অনুপযুক্ত বলে মৎস্য শিকার কেন্দ্রগুলিতে প্রচুর সুলভ দক্ষ শ্রমিক পাওয়া যায়। এরা সারা বছর ধরেই এই সব কাজে ব্যাপৃত থাকে। মৎস্য শিল্পে মৎস্য সংগ্রহের সঙ্গে সঙ্গে মাছ পরিষ্কার করা, প্যাকিং করা বা শুকনো করা, তাকে বাজার জাত করা ইত্যাদি কাজে প্রচুর দক্ষ শ্রমিকের সরবরাহ এসব অঞ্চল থেকে পাওয়া যায়।

(৯) দ্রুত পরিবহন ব্যবস্থা—মৎস্য সংগ্রহ করার পর তাকে দ্রুত বাজারজাত বা বন্দরজাত করার জন্য উন্নত সড়ক ও রেল পরিবহন ব্যবস্থার প্রয়োজন কারণ অধিক বিলম্বে মৎস্য নষ্ট হয়ে যাবার সম্ভাবনা থাকে। এই সকল অঞ্চলের পরিবহন ব্যবস্থা অতি আধুনিক ও বিজ্ঞানসম্মত হওয়ার ফলে মৎস্য পরিবহনের বিশেষ সুবিধা হয়েছে।

(১০) হিমায়নের সুবিধা—সংগৃহীত মৎস্য যেহেতু একসঙ্গে বিক্রয় করা সব সময় সম্ভব হয় না তাই মৎস্য বন্দর অঞ্চলে মৎস্যকে শীঘ্র হিমায়িত করার সুবন্দোবস্ত থাকা প্রয়োজন। নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে প্রাকৃতিক বরফ প্রাপ্তির সুবিধার জন্য হিমায়ন সুবিধাজনক।

(১১) আর্থিক সুবন্দোবস্ত ও কারিগরী সুবিধা—মৎস্য সংগ্রহের জন্য যে সব আধুনিক নৌকা, জাহাজ বা ট্রলার, নেট ইত্যাদির প্রয়োজন হয় এবং মৎস্য হিমায়িত করার জন্য যে বরফের প্রয়োজন হয় তার জন্য উপযুক্ত আর্থিক স্বচ্ছলতা প্রয়োজন। ফলে এই সকল অঞ্চল কারিগরী ও প্রযুক্তিগতভাবে উন্নত। তাই এই সব অঞ্চলের মৎস্য শিকার বা সংরক্ষণ করা অতি সহজ হয়।

পৃথিবীর বিভিন্ন মৎস্যক্ষেত্র সমূহ (World's Fishing Grounds) ঃ

উত্তর গোলার্ধের নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলগুলির ভৌগোলিক এবং আর্থ-সামাজিক পরিবেশ এখানে মৎস্য ক্ষেত্রগুলিকে গড়ে তুলতে সর্বতোভাবে সহায়তা করছে এবং এর ফলে এই অঞ্চলে পাঁচটি প্রধান বাণিজ্যভিত্তিক মৎস্য ক্ষেত্র গড়ে উঠছে। নিম্ন সারণিতে ক্ষেত্রসমূহ দেওয়া হল।

সারণি

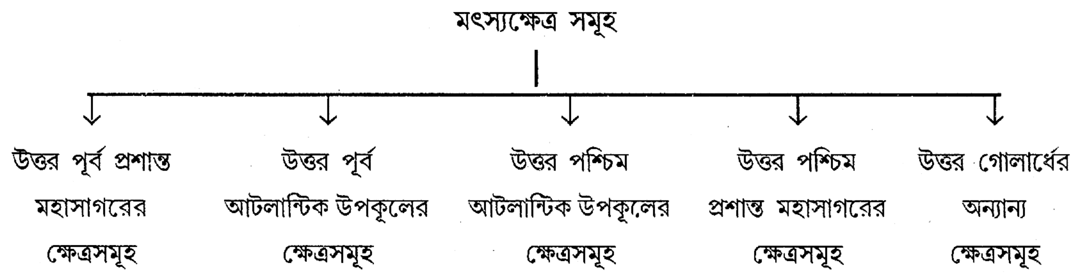

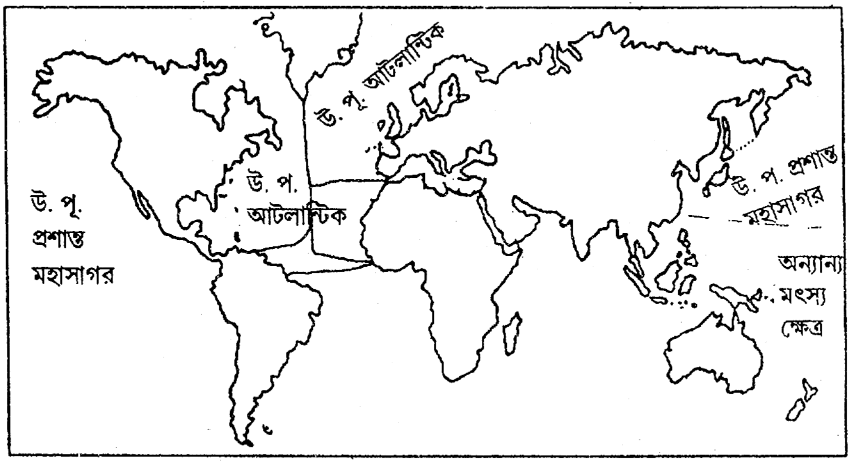

চিত্র 1.2.7 পৃথিবীর বিভিন্ন মৎস্যক্ষেত্র সমূহ

মৎস্য হ্রাস (Depletion of Fish)

মৎস্য একটি প্রবহমান সম্পদ, স্বাভাবিক নিয়মেই এদের জন্ম ও বৃদ্ধি ঘটে। কিন্তু এই প্রবহমান সম্পদটিও মনুষ্য হস্তক্ষেপের ফলে ধীরে ধীরে নতুনভাবে সৃষ্টি হয়ে স্থান পূরণ করে নিতে অসমর্থ হয়ে পড়েছে। এর প্রধান কারণ মানুষের নির্বিচারে মৎস্য সংগ্রহ। এর ফলে পৃথিবীর বিভিন্ন মৎস্য ক্ষেত্রগুলিতে অনেক মৎস্য অবলুপ্ত হয়ে চলেছে।

- মৎস্য হ্রাসের অন্যান্য কারণগুলির মধ্যে জলদূষণ একটি অন্যতম প্রধান কারণ। সমুদ্র উপকূলবর্তী দেশগুলি হতে বিভিন্ন কলকারখানার বিভিন্ন আবর্জনা ও রাসায়নিক পদার্থ প্রতিনিয়ত প্রবাহিত হয়ে সমুদ্রের জলে মিশে জলকে দূষিত করছে ফলে প্লাঙ্কটন ইত্যাদি মৎস্য খাদ্যের ক্ষতিসাধন করে চলেছে।
- সমুদ্রে বিভিন্ন জাহাজ চলাচলে ও সমুদ্র তটবর্তী অঞ্চল হতে তেল উত্তোলনের ফলে সমুদ্রের জলে ক্রমাগত তেল মিশে যাচ্ছে যা সামুদ্রিক প্রাণীর জীবনহানি ঘটিয়ে চলেছে।
- এছাড়াও বিভিন্ন যুদ্ধের সময় শত্রুপক্ষের তৈলবাহী জাহাজ ধ্বংস করার ফলে প্রচুর পরিমানে তেল সমুদ্রজলে মিশে বহু সংখ্যক সামুদ্রিক প্রাণীর জীবননাশ করে। উপসাগরীয় যুদ্ধে (১৯৯০) প্রায় ২০ লক্ষ সামুদ্রিক পাখি, অসংখ্য লেদার ব্যাক, কচ্ছপ ও সামুদ্রিক প্রাণী নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে বলে বিশেষজ্ঞ মহল অভিমত পোষণ করেন।

মৎস্য হ্রাসের কারণগুলি নিয়ে বর্তমানে বিভিন্ন ভাবনা চিন্তা চলেছে। ভবিষ্যতে কিভাবে এই অবস্থার প্রতিকার করা সম্ভব এসম্বন্ধে বৈজ্ঞানিকেরা সচেতন হচ্ছেন এবং নানা গবেষণা করছেন।

মৎস্য সংরক্ষণ

মৎস্য সংরক্ষণ বলতে সমুদ্রের মৎস্যক্ষেত্রগুলির উৎপাদন 'স্থিতিশীল রাখা এবং সমুদ্রের প্রাকৃতিক ভারসাম্য বজায় রাখাকে বোঝায়'। এ সম্বন্ধে যে সব ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে সেগুলি নিচে আলোচনা করা হল।

- যথেচ্ছ মৎস্য শিকার ও অপরিণত মৎস্য আহরণ বন্ধ করা।
- বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক উপায়ে মৎস্য প্রজননের ব্যবস্থা করা।
- বিভিন্ন শিল্পকারখানার বর্জ্য দূষিত পদার্থ সমুদ্রে নিক্ষেপের উপর বাধা নিষেধ আরোপ।
- চাহিদা অনুসারে মৎস্য শিকার করা।
- সমুদ্রের তৈলবাহী জাহাজ হতে তেল ছড়িয়ে পড়ার দিকে নজর রাখা এবং তেল ছড়িয়ে পড়লে বৈজ্ঞানিক উপায়ে তেলের প্রভাব নষ্ট করা।
- সমুদ্রের জল দুষণের মাত্রা রোধ করা।
- সর্বোপরি ক্রমহ্রাসমান মৎস্য প্রজাতির আহরণ নিষিদ্ধ করা। এছাড়া অতি মূল্যবান সিল, তিমি ইত্যাদি শিকার বন্ধ করা এবং এ সম্বন্ধে জনসচেতনতা বৃদ্ধির দিকে আরও জোর দেওয়া।

1.2.4 কৃষিকার্যের সংজ্ঞা (Definition of Agriculture) ঃ

কৃষিকার্যকে ইংরাজীতে বলে Agriculture. Latin শব্দ Ager-এর অর্থ ভূমি বা মৃত্তিকা ও Culture এর অর্থ কর্ষণ বা মৃত্তিকা কর্ষণ। অর্থাৎ মৃত্তিকা বা ভূমিকর্ষণের ফলে যে ফসল উৎপাদন করা হয় তাই কৃষিকার্য। তবে মৃত্তিকা কেবলমাত্র উদ্ভিদ এবং ফসলই উৎপাদন করে না এর সঙ্গে সঙ্গে প্রাণীজগতের জন্ম ও বৃদ্ধিকে সুনিশ্চিত করে। তাই প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ জিমারম্যান (Zimmermann) এর মতে "কৃষি হল একটি উৎপাদনশীল প্রয়াস যার মাধ্যমে ভূ-পৃষ্ঠে বসবাসকারী মানুষ স্বকীয় চাহিদা পূরণের জন্য উদ্ভিদ ও প্রাণীজগতের স্বাভাবিক বৃদ্ধি অব্যাহত রাখে এবং সম্ভব হলে তাকে ত্বরান্বিত ও উন্নত করে।"

সংজ্ঞা অনুসারে বর্তমানে ভূমি-কর্ষণের সঙ্গে সঙ্গে স্বাভাবিক উদ্ভিদের জন্ম, বৃদ্ধি ও রক্ষণাবেক্ষণ, মৎস্য চাষ, পশুপালন ও পশুজাত দ্রব্যাদি আহরণ ইত্যাদিও কৃষিকার্যের অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

পৃথিবীর প্রাপ্ত সর্বপ্রকার সম্পদ হতে কৃষি উৎপাদনকে পৃথিবীর সম্পদের প্রাথমিক ভিত্তি বলা চলে। কারণ কৃষি মানুষকে কেবলমাত্র খাদ্যের যোগানই দেয় না, সঙ্গে সঙ্গে মানুষ তার বস্ত্র ও নানা শিল্পের কাঁচামালও সংগ্রহ করে এই কৃষিকার্য হতে। কৃষি মানুষকে প্রত্যক্ষ না হলেও পরোক্ষ শিল্পকর্মে নিয়োজিত হতে সহায়তা করে। কৃষি দেয় কর্মসংস্থান, কোন কোন কৃষিসম্পদ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনেও সহায়তা করে থাকে। কৃষি সরকারি রাজস্বের মূল উৎস। কৃষির প্রয়োজনেই গড়ে উঠেছে নানা শিল্প। তাই প্রাথমিক শিল্প হিসেবে কৃষির গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম।

কৃষিকার্যের উপর ভৌগোলিক পরিবেশের প্রভাব (Influence of Geographical Conditions on Agriculture) ঃ

বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃতির স্বাভাবিক কার্যকরী শক্তিকে অনেকাংশে প্রতিহত করতে পারলেও কৃষির ক্ষেত্রে দেখা যায় যে পৃথিবীর যে কোন অংশের কৃষিজ ফলন বা জমির বণ্টন যোগ্যতা নির্ভর করে

তার ভৌগোলিক পরিবেশের উপর। ভৌগোলিক পরিবেশকে তার কার্যকারিতার উপর নির্ভর করে প্রধানত দুটি ভাগে ও আরও উপবিভাগে বিভক্ত করা হয়।

কৃষিকার্যের পরিপ্রেক্ষিতে ভৌগোলিক পরিবেশ সমূহ

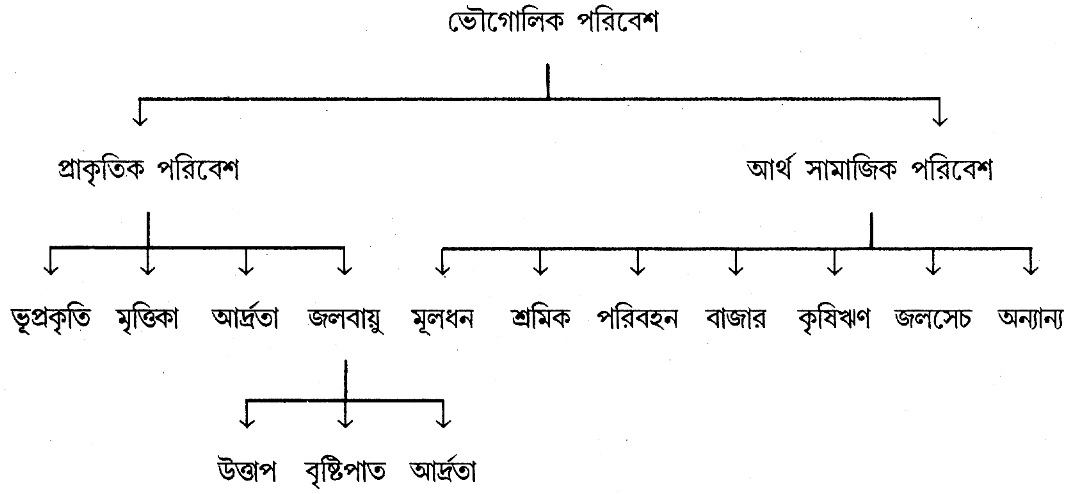

কৃষিকার্যের উপর প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রভাব (Influence of Physical Environment on Agriculture) ঃ

প্রাকৃতিক উপাদান বলতে প্রকৃতি হতে প্রাপ্ত উপাদান সমূহ যথা জলবায়ু, মৃত্তিকা ও ভূপ্রকৃতি প্রধান।

❑ **জলবায়ু (Climate) ঃ** কোন অঞ্চলের কৃষিকার্য সম্পূর্ণরূপে জলবায়ুর উপর নির্ভরশীল। পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে কৃষির পার্থক্যের অন্যতম প্রধান কারণ জলবায়ু। পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন প্রকার ফসল উৎপাদন, বিস্তার বা কৃষি পদ্ধতি সবই জলবায়ু দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। জলবায়ুর বিভিন্ন উপাদানের মধ্যে তাপমাত্রা ও বৃষ্টিপাতের প্রভাব কৃষির উপর সর্বাধিক।

❑ **উত্তাপ (Temperature) ঃ** যে কোন প্রকার উদ্ভিদের জন্ম ও বৃদ্ধির জন্য উত্তাপের প্রয়োজন হয়। উত্তাপ অর্থাৎ সূর্যকিরণ উদ্ভিদের সালোকসংশ্লেষ, বাষ্পমোচন এবং শ্বাসকার্যকে নিয়ন্ত্রিত করে। উত্তাপ ভিন্ন ফসল উৎপাদিত হতে পারে না। তবে সর্বপ্রকার ফসল একই উত্তাপে জন্মাতে পারে না। এক এক প্রকার ফসলের জন্য এক এক প্রকার উত্তাপের প্রয়োজন হয়। উষ্ণতা এবং অক্ষরেখা অনুসারে তাপের পরিবর্তনের ফলে পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন প্রকার ফসল জন্মায়। উত্তর গোলার্ধে ৬০° উত্তর অক্ষাংশের উর্ধ্বে অত্যধিক শৈত্যের জন্য কোন কৃষিকাজ করা সম্ভব হয় না। পৃথিবীর যে সকল অঞ্চলের তাপমাত্রা অধিক সে সব অঞ্চলে ধান, পাট, চা, ইক্ষু, রবার ইত্যাদি ফসল জন্মায় আবার যেখানে তাপ মধ্যম রকমের সেখানে গম, যব, ভুট্টা, রাই, বীট, জোয়ার ইত্যাদি জন্মায়।

❑ **বৃষ্টিপাত (Rainfall) ঃ** কৃষিকার্যের জন্য জলসরবরাহের প্রধান উৎস হল বৃষ্টিপাত, কারণ যে কোন উদ্ভিদের জন্ম ও বৃদ্ধির জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণে বৃষ্টিপাতের একান্ত প্রয়োজন। এই বৃষ্টিপাতের পরিমাণ আবার ফসলের প্রকৃতি অনুসারে পরিবর্তিত হয়ে থাকে। কেন কোন ফসল অধিক বৃষ্টিপাতে ভাল জন্মায় যেমন ধান, পাট, রবার, চা ইত্যাদি আবার গম, যব, জোয়ার, ভুট্টা ইত্যাদি কম বৃষ্টিপাত যুক্ত অঞ্চলে ভাল জন্মায়।

❑ **আর্দ্রতা (Humidity) ঃ** আর্দ্রতা ফসলের পুষ্টি ও বৃদ্ধিকে নিয়ন্ত্রিত করে। এই আর্দ্রতা নির্ভর করে বৃষ্টিপাত, তুষারপাত, বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ যা বাষ্পীভবনের হারের প্রকৃতির উপর। উদ্ভিদের প্রস্বেদন প্রক্রিয়া আর্দ্রতার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে থাকে। বিভিন্ন ফসলের উৎপাদনও আর্দ্রতার প্রকৃতির উপর নির্ভরশীল- যেমন চা ও কফি উৎপাদনে আর্দ্রতার একান্ত প্রয়োজন হয়। আর্দ্র জলবায়ুতে কৃষির যেমন উন্নতি ঘটে শুষ্ক জলবায়ুতে আবার জলসেচ ব্যতীত কোন ফসল ফলান সম্ভব হয় না।

❑ **মৃত্তিকা (Soil) ঃ** মৃত্তিকার উর্বরতা কৃষি উৎপাদনের একটি বিশেষ উপাদান। মৃত্তিকার প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য ও রাসায়নিক গুণাবলি ফসলের অঙ্কুরোদগম প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করে। মৃত্তিকার গ্রথন, গঠন, প্রবেশ্যতা ইত্যাদি গুণাবলির উপর মৃত্তিকার উর্বরতা শক্তি অনেকাংশে নির্ভরশীল। তাই একথা সত্য যে উর্বর মৃত্তিকা কৃষিকার্যের জন্য একান্ত প্রয়োজন। তবে এর সঙ্গে সঙ্গে এটাও মনে রাখতে হবে যে সকল প্রকার মৃত্তিকায় সব রকমের ফসল জন্মায় না। মৃত্তিকা ভেদে কৃষি উৎপাদনের পরিবর্তন ঘটায়। যেমন উর্বর পলি মৃত্তিকায় ধান, কৃষ্ণ মৃত্তিকায় তুলা, নাইট্রোজেন মিশ্রিত এঁটেল ও বেলে মাটিতে ভুট্টা ইত্যাদির চাষ সুবিধা ও লাভজনক।

❑ **ভূপ্রকৃতি (Topography) ঃ** কৃষির আর একটি অন্যতম প্রধান উপাদান হল ভূপ্রকৃতি। ভূমির অবস্থান, ঢাল, সমুদ্রপৃষ্ঠ হতে উচ্চতার তারতম্য ইত্যাদির কারণে বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন প্রকার ফসল জন্মায়। তবে সাধারণভাবে প্রায় সমতল বা সমভূমি অঞ্চলগুলি কৃষিকার্যের জন্য বিশেষ উপযুক্ত তবে চা, কফি, রবার এগুলি উঁচু ও ঢালু পার্বত্য অঞ্চলে ভাল জন্মায়।

উপরে আলোচিত উপাদানগুলিকে একত্রে Physical frontiers of agriculture বলে। কারণ এই চারটি উপাদানের উপরই কৃষির প্রাকৃতিক পরিবেশ বহুলাংশে নির্ভরশীল।

কৃষির আর্থসামাজিক পরিবেশ (Culture and Economic Conditions for the Growth of Agriculture) ঃ

প্রাকৃতিক পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গে কতগুলি অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক উপাদানের উপরও কৃষির সাফল্য বহুলাংশে নির্ভরশীল। এসব উপাদানগুলি যথাক্রমে—

❑ **মূলধন (Capital) ঃ** কোন কিছু উৎপাদনের জন্য মূলধনের প্রয়োজন। উন্নত ও লাভজনক কৃষি, মূলধন ব্যতীত সম্ভব হয় না। কৃষির বিভিন্ন যন্ত্রপাতি, উন্নত মানের বীজ, সার, কীটনাশক, শ্রমিকের মজুরি ইত্যাদি সরবরাহ বজায় রাখতে প্রচুর অর্থের প্রয়োজন। তাই মূলধনের অভাব হলে কৃষির উন্নতি ব্যাহত হয়।

❑ **শ্রমিক (Labour) ঃ** কৃষিকার্য একটি শ্রমনিবিড় অর্থনৈতিক কাজ। এই কাজে জমি চাষ হতে আরম্ভ করে বীজ বপন, রোয়া, কীটনাশক ব্যবহার হতে ফসল কাটাই, বাছাই, তোলা সর্বপ্রকার কাজে শ্রমিকের প্রয়োজন

হয়। তবে এই শ্রমের ব্যবহার কৃষির পদ্ধতির উপর নির্ভর করে। যেমন শ্রম নিবিড় প্রগাঢ় কৃষির ক্ষেত্রে যেমন অধিক শ্রমিকের প্রয়োজন হয় আবার তেমনি বাণিজ্য ভিত্তিক কৃষিতে শ্রমিক অপেক্ষা যন্ত্র এবং শিক্ষিত দক্ষ শ্রমিকের অধিক প্রয়োজন।

❑ **পরিবহন ও যোগাযোগ (Transport and Communication) ঃ** কৃষিজাত পণ্যাদি কৃষি খামার হতে গোলাজাত করা বা উৎপাদন ক্ষেত্র থেকে বাজারজাত করার জন্য উপযুক্ত পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থার একান্ত প্রয়োজন।

❑ **বাজার (Market) ঃ** কৃষিজ ফসলের চাহিদা নির্ভর করে বাজারের উপর। কোন ফসলের ব্যাপক চাহিদা না থাকলে উৎপাদন ব্যাহত হয়। চাহিদার উপর নির্ভর করেই বিভিন্ন কৃষিজ ফসলের উৎপাদন করা হয়। বাজার কৃষি পণ্যের উৎপাদনকে নিয়ন্ত্রণ করে।

❑ **কৃষিঋণ (Agriculture Loan) ঃ** কৃষিকার্যের উন্নতির জন্য বিভিন্নভাবে কৃষিকার্যে সহায়তা করার জন্য এই ঋণের প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। তবে এই সব প্রকল্প প্রধানত সরকারি ও কিছু বেসরকারি ভাবেই করা হয়ে থাকে। কৃষকের ফসল উৎপাদন ক্ষেত্রে যাতে কোন অভাব না থাকে সেদিকে লক্ষ্য রাখার জন্য বিভিন্ন পরিষেবার ব্যবস্থা করা হয় এবং এর সঙ্গে সঙ্গে কৃষিজাত পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধির দিকে নজর দিতে এই কৃষি ঋণের ব্যবস্থা করা হয়।

❑ **জলসেচ (Irrigation) ঃ** কৃষির জন্য জলের প্রয়োজন। বৃষ্টি প্রকৃতি নির্ভর। তাই কৃষিতে জলের সরবরাহকে সতত বজায় রাখার জন্য প্রয়োজন জলসেচের। যে সব অঞ্চলে বৃষ্টিপাত কম সেসব অঞ্চলেও জলসেচের সহায়তায় কৃষি উৎপাদন সম্ভব হচ্ছে। বর্তমানে বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক প্রথায় বাঁধ দিয়ে, সেচখাল তৈরি করে কৃষি জমিতে জলসেচের দ্বারা বিভিন্ন ফসল ফলানো সম্ভব হচ্ছে।

❑ **অন্যান্য উপাদান (Other factors for the Agricultural Growth) ঃ** উপরে আলোচিত উপাদান ব্যতীত উন্নত মানের বীজ, সার, কীটনাশক, কৃষি যন্ত্রপাতি ইত্যাদির যেমন প্রয়োজন হয় তেমনি প্রয়োজন সরকারি সহায়তা, কৃষি শিক্ষার ব্যবস্থা এবং সমগ্র শিক্ষা পরিকাঠামোর সৃষ্টি করা একান্ত প্রয়োজন।

কৃষির শ্রেণি বিভাগ (Classification of Agriculture) ঃ

কৃষিকাজ পৃথিবীর অর্থনৈতিক কার্যকলাপের একটি অন্যতম অঙ্গ হলেও কৃষিজ দ্রব্যের উৎপাদন, কৃষি পদ্ধতি বা কৃষি সংগঠন পৃথিবীর সর্বত্র একই প্রকার হয় না। জলবায়ু, মৃত্তিকা, ইত্যাদি প্রাকৃতিক উপাদানগুলির তারতম্য অনুসারে বা আঞ্চলিক ও সামাজিক পরিবেশের ভিত্তিকে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে কৃষি পদ্ধতির মধ্যে পার্থক্য দেখা যায়। তাই কৃষি পদ্ধতির বিভিন্নতা অনুসারে পৃথিবীর কৃষি ব্যবস্থাগুলিকে কতগুলি ভাগে ও উপবিভাগে বিভক্ত করা হয়। সারণিতে এই বিভাগগুলি দেখান হল।

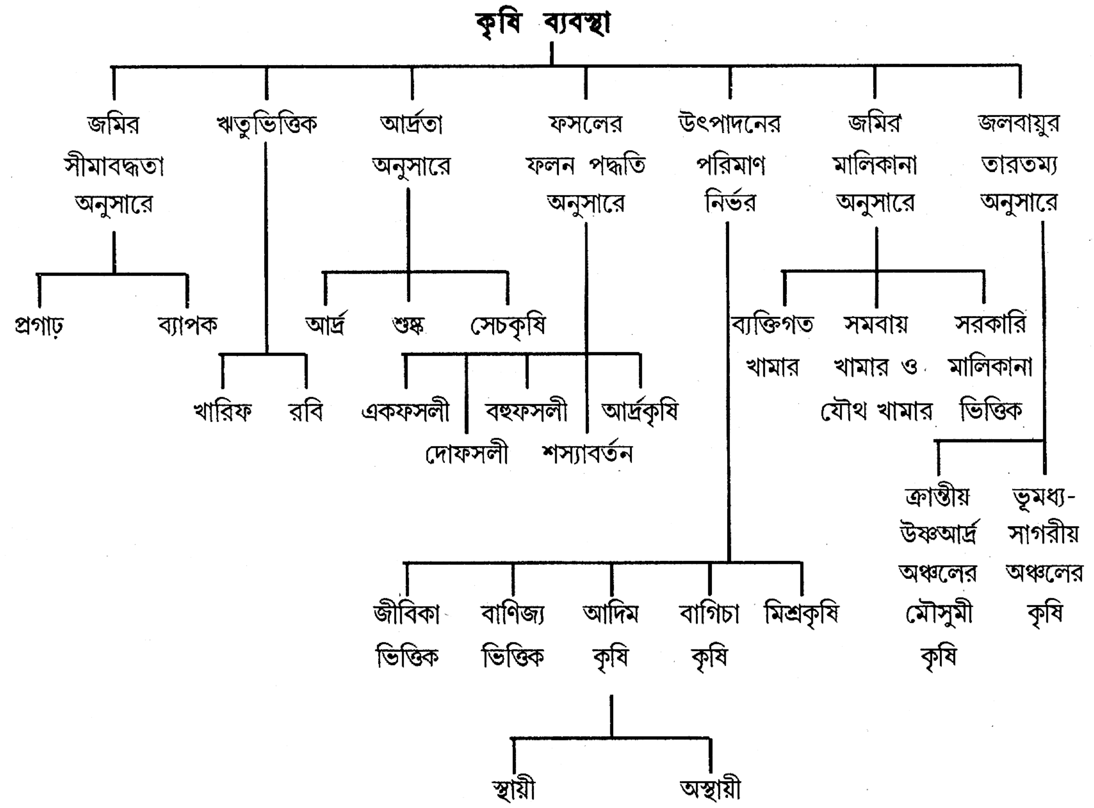

আধুনিক সমাজে অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপ হিসাবে কৃষির ভূমিকা (Importance of Agriculture as an Economic Activity in Modern Society)

মানব সমাজে সভ্যতার সৃষ্টির প্রথম পদক্ষেপ ছিল কৃষির আবিষ্কার ও প্রচলন। মানুষের জীবনধারণের প্রধান প্রয়োজনীয় বস্তু হল খাদ্য এবং খাদ্যের যোগান দেয় এই কৃষি। খাদ্যের পরই মানুষের প্রয়োজনীয় বস্তু হল বস্ত্র। কৃষি মানুষকে খাদ্য ও বস্ত্র উভয়ই যোগান দিয়ে থাকে। এ ছাড়া বর্তমান শিল্পভিত্তিক জীবনধারার শিল্পের কাঁচা মালও সরবরাহ করে এই কৃষি। এই আলোচনা হতে এটা পরিষ্কার যে কৃষি কাজ এবং অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপ একে অপরের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। কৃষির উন্নতি জীবনযাত্রার মানকে উন্নত করতে সহায়তা করে। কিভাবে কৃষি অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপে সহায়তা করে থাকে তা নীচে আলোচনা করা হল।

● **কৃষিকার্য কর্ম সংস্থানের মাধ্যম (Agriculture is the Medium of Employment)**—পৃথিবীর বিভিন্ন উন্নত বা অনুন্নত সকল প্রকার অঞ্চলেই কৃষিকার্যের মাধ্যমে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে বহুমানুষ জীবিকা নির্বাহ করে থাকে। অনুন্নত বা উন্নয়নশীল দেশগুলির প্রায় ৮০%—৯০% ভাগ মানুষই কৃষির সঙ্গে যুক্ত। বর্তমানে ধীরে ধীরে শিল্পের উন্নতির ফলে কৃষিজীবী মানুষের ও কৃষিজমি উভয়েরই হ্রাস ঘটেছে তবে পরোক্ষভাবে বিভিন্ন শিল্পে কাঁচামাল যোগানের ক্ষেত্রে কৃষির ভূমিকাকে বাদ দেওয়া সম্ভব নয়।

● **শিল্পের কাঁচামালের উৎস (Source of Raw Materials for Agro-based Industry)**—বিভিন্ন শিল্পের কাঁচামাল সরবরাহ করে এই কৃষি। তাই প্রাথমিক শিল্প হিসাবে কৃষির ভূমিকা অতি গুরুত্বপূর্ণ। দেশের বিভিন্ন স্থানে উৎপাদিত কৃষিজ দ্রব্যগুলির উপর নির্ভর করে ঐ সকল স্থানে বিভিন্ন শিল্প-কারখানা গড়ে ওঠার দরুণ শিল্পায়ন সম্ভব হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় পাট উৎপাদিত অঞ্চলে পাট শিল্প, তুলা উৎপাদনকারী অঞ্চলে বস্ত্র শিল্প এবং এই ভাবে চিনি, রেশম, পশম, চামড়া, দুগ্ধ, মৎস্য ইত্যাদি নানা শিল্পের সমাবেশ ঘটেছে এবং দেশের সামগ্রিক শিল্পায়ন সম্ভব হয়েছে।

● **বৈদেশিক মুদ্রা উপার্জন (Foreign Exchange Earnings)**—বৈদেশিক মুদ্রা উপার্জনের ক্ষেত্রে কৃষির ভূমিকা সর্বাধিক। বিভিন্ন প্রকার কৃষিজাত ফসল যথা পাট, তুলা, চা, গম, মাছ প্রভৃতি রপ্তানি করে পৃথিবীর বহু দেশ প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা উপার্জন করে থাকে। আবার অন্যদিকে কৃষিজাত দ্রব্যের শিল্পসামগ্রী বিশ্বের বাজারে রপ্তানির মাধ্যমেও প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা সম্ভব। এরূপে অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রার সহায়তায় বিদেশ থেকে বিভিন্ন শিল্পের প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি আমদানি করে দেশের শিল্প কারখানার প্রসার ঘটানো সম্ভব হয়েছে।

● **কৃষির প্রয়োজনে শিল্প (Industry for Agriculture)**—কৃষির উন্নতি ও সম্প্রসারণের জন্য কিছু সহায়ক শিল্পেরও প্রসার ঘটেছে যেমন সার, কীটনাশক বা কৃষি যন্ত্রপাতি। এই সব শিল্পগুলি সম্পূর্ণরূপে কৃষি নির্ভর।

● **জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন (Status of Human Development)**—কৃষিকার্যের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে মানুষের জীবনযাত্রার মানও উন্নত হয়। কারণ কৃষি প্রয়োজনীয় খাদ্য, শিল্পের কাঁচামাল এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ করে জীবনযাত্রার মানকে উন্নত করতে সহায়তা করে।

● **কৃষি বনাম শিল্পোন্নতি (Agriculture Versus Industrial Development)**—কৃষি বনাম শিল্পোন্নতি হলো একটি পুরনো বিতর্কিত বিষয়। প্রথমদিকে পৃথিবীর মানুষ শুধুমাত্র কৃষিকাজে আত্মনিয়োগ করাতে এই বিতর্ক ওঠে নি। কিন্তু যখন থেকে শিল্পোন্নয়ন শুরু হয়, তখন পৃথিবীর নানা দেশে কৃষি বনাম শিল্প কোন্ উন্নয়নে অধিকতর মনোনিবেশ করা হবে এই বিতর্কটি দেখা দেয়। মূলত বলা যেতে পারে যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর উন্নতিশীল দেশগুলিতে প্রচণ্ড খাদ্য সংকট দেখা দেয় এবং ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার বৃদ্ধির হার চোখে পড়ে। সেই কারণে উন্নয়নশীল দেশসমূহ কৃষির উন্নয়নের মাধ্যমে শিল্পের বিকাশের ওপর গুরুত্ব দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করতে পারে। বর্তমানে পৃথিবীর অধিকাংশ দেশে কৃষি এবং শিল্প উন্নয়নের মধ্যে একটি সাযুজ্য আনার চেষ্টা চলছে, যাতে একটি উন্নয়নের জন্যে অপর উন্নয়নটি কোন মতেই পশ্চাদমুখী হয়ে না পড়ে। কেননা আমরা অতীত অভিজ্ঞতা থেকে দেখতে পেয়েছি যে যদি কোন রাষ্ট্রে কৃষি এবং শিল্পের উন্নয়ন ধারাবাহিক এবং সর্বতোমুখী না হয় তাহলে ঐ রাষ্ট্রটির সার্বিক উন্নতি হয় না[২]।

উপরোক্ত আলোচনা হতে এটা পরিষ্কার যে অর্থনৈতিক উন্নয়নে কৃষি এক অনন্য ভূমিকা পালন করে। তবে বর্তমানে উন্নত দেশগুলি প্রধানত শিল্প-নির্ভর। যেমন-বৃটিশ যুক্তরাজ্য, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, নেদারল্যান্ড

২। মিত্র-সেন—"ফলিত ভূবিদ্যা" পৃঃ ৬৪।

প্রভৃতি দেশগুলি প্রচুর পরিমাণে কৃষি-উৎপাদন করলেও তা বাণিজ্যভিত্তিক কারণ দেশের চাহিদা কম। অন্যদিকে এই সব দেশে নগরায়নের পরিমাণ বৃদ্ধি বা বনসৃজন ইত্যাদি কারণের জন্য কৃষি জমির পরিমাণ কমের দিকে তবে বিভিন্ন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সহায়তায় উৎপাদনের বৃদ্ধি ঘটেছে। শিল্পনির্ভর দেশগুলিও কিন্তু বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে কৃষির উৎপাদনকে খর্ব করতে পারে নি।

তাই আধুনিক সমাজ ব্যবস্থায় কৃষিকার্যের পদ্ধতির পরিবর্তন ঘটিয়ে চাষ আবাদ করা হয়। খাদ্য শস্যের সঙ্গে সঙ্গে কৃষি নির্ভর শিল্পের কাঁচামাল যা অন্যান্য বাজারের চাহিদা অনুসারে ফসল উৎপাদনের দিকে গুরুত্ব আরোপ করা হচ্ছে।

আধুনিক কৃষি ব্যবস্থার আর একটি চাহিদা নির্ভর ফসল হল বাগিচা ফসলের (Horti-culture) উৎপাদন। বছরের বিভিন্ন সময়ে চাহিদার উপর নির্ভর করে বিভিন্ন সজ্জি, ফল ইত্যাদি উৎপাদন করে নিয়মিত বাজারে প্রেরণ করা এই প্রকার কৃষির অন্তর্গত। এই প্রকার কৃষিতে কৃষিজাত দ্রব্যাদি নিয়মিত ট্রাকের সাহায্যে যাতায়াত করা হয় বলে এরূপ কৃষি ব্যবস্থাকে 'ট্রাক ফার্মিং' (Truck farmings) ও বলা হয়ে থাকে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে যথা জাপান, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র এবং ইউরোপের বিভিন্ন শহরে এরূপ ফার্মিং প্রচুর পরিমাণে দেখা যায়।

আধুনিক কৃষির আর একটি প্রধান উপাদান হল ডেয়ারি ফার্মিং (Dairy farming)। খাদ্য ফসলের পাশাপাশি দুগ্ধ ও মাংস উৎপাদন করা হয়।

এই ভাবে আধুনিক সমাজে কৃষির ক্ষেত্রে নতুন নতুন উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। যেমন কৃষি ফসলের উৎকর্ষতা বৃদ্ধিকরণ, সার ও নানা প্রকার কীটনাশকের ব্যবহার, কৃষি যন্ত্রপাতির ক্ষেত্রে নানা প্রকার বৈজ্ঞানিক উৎকর্ষতা সাধন এবং সঙ্গে সঙ্গে পরিবেশের দূষণের দিকে দৃষ্টি রেখে কৃষির ক্ষেত্রে এক নয়া যুগান্তর সৃষ্টি করেছে।

1.2.5 খনিজ ও শক্তি সম্পদের ভূমিকা

খনিজ ও শক্তি সম্পদের সম্বন্ধে আলোচনা করা হবে। অন্যান্য সম্পদ যথা, অরণ্য, কৃষিজ, পশুপালন প্রভৃতি সম্পদের চেয়ে খনিজ সম্পদের কিছু তফাৎ এবং বৈশিষ্ট্য আছে। এগুলো এখানে সংক্ষিপ্তভাবে আলোচনা করা হবে।

❑ গোটা পৃথিবীতে প্রচুর খনিজ সম্পদ আছে কিন্তু দেশ হিসাবে বিভিন্ন দেশে এর পরিমাণে প্রচুর পার্থক্য দেখা যায়। এর ভূবৈজ্ঞানিক কারণগুলির মধ্যে প্রধান হচ্ছে—বিভিন্ন প্রকারের খনিজ সম্পদ—বিশেষ বিশেষ শিলাস্তরের মধ্যে প্রকৃতিতে থাকে। প্লাটিনাম, নিকেল, কোবাল্ট প্রভৃতিকে ম্যাগমাজাত অবক্ষেপ (magmatic deposit) হিসাবে দেখা যায়। এরা সাধারণত ভূত্বকের গভীরে উৎপন্ন হয় এবং সৃজনকারী আগ্নেয়শিলার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। এই সব শিলার খনিজ গোষ্ঠী প্রবল তাপে (900° থেকে 1500°K) এবং কঠোর চাপে ভূগর্ভের গভীর অঞ্চলে উৎপন্ন হয়।

অন্যদিকে বহু কোটি বছর পূর্বের বনাঞ্চলের উদ্ভিদ থেকেই কয়লার সৃষ্টি। ভেষজ বস্তুর প্রথম পরিবর্তন হয় রাসায়নিক—যাতে অক্সিজেন ও হাইড্রোজেনের পরিমাণ হ্রাস পায় এবং অঙ্গারের পরিমাণ ক্রমশ বৃদ্ধি পায়।

প্রথম অঙ্গারময় পদার্থের নাম পিট (Peat)-এর পরিবর্তনের জন্য 35° থেকে 40°K তাপমাত্রার প্রয়োজন। সবচেয়ে উন্নতমানের কয়লার জন্য 160° থেকে 200°K তাপমাত্রার প্রয়োজন। কয়লার রূপান্তরে চাপেরও প্রভাব সক্রিয় থাকে।

খনিজ সম্পদ বিভিন্ন প্রাচীনতার বিভিন্ন প্রকৃতির শিলার (পাললিক, আগ্নেয় শিলা প্রভৃতি) মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। এইজন্য ভূবৈজ্ঞানিক সমীক্ষার বিশেষ প্রয়োজন হয় যে কোনও খনিজ সম্পদ সম্পর্কে জানতে।

পৃথিবীতে প্রচুর খনিজ থাকা সত্ত্বেও—সর্বত্র তা বাণিজ্যিক ভিত্তিতে ব্যবহার করা যায় না। এর নানা কারণ থাকতে পারে। প্রথম খনিজ পদার্থের অবস্থান খুব গুরুত্বপূর্ণ। যে সকল খনিজ পর্যাপ্ত পরিমাণে প্রয়োজন হয়, বিশেষ শিল্পে যেমন সিমেন্ট শিল্পের জন্য চুনাপাথর কিংবা লৌহশিল্পের জন্য লৌহ আকর। এগুলি যদি খুব দুর্গম জায়গায় পাওয়া যায় তাহলে আপাতত কাজে লাগানো শক্ত। এদের খননে অনেক মূলধন এবং আধুনিক প্রযুক্তিবিদ্যার প্রয়োজন হতে পারে। সম্প্রতি তিব্বতের মালভূমি অঞ্চলে যেখানকার উচ্চতা 15000 ফুটেরও বেশি তামার খনিতে উৎপাদনের ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। পাপুয়া-নিউগিনিতে বোগেনডিল্ তামার খনিও বিখ্যাত। যদিও এখানকার আকরে তামার পরিমাণ কম।

দ্বিতীয়তঃ খনিজ পদার্থ বিশেষ পরিমাণে না থাকলে তাকে মাটির তলা থেকে উঠিয়ে শিল্পে ব্যবহারের উপযোগী করে তোলাতে প্রচুর মূলধন ও আধুনিক প্রযুক্তির প্রয়োজন হয়। তবে কিছু ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রম হয়। যেমন সোনার খনি—সোনা যেহেতু মহার্ঘ্য ধাতু, এবং অর্থনীতিতে এর প্রভাব আছে—সেইজন্য যত বেশি অসুবিধাই হোক না কেন বা যত খরচই হোক না কেন কোলারের সোনার খনি এখনও উৎপাদন করে চলেছে। এই অঞ্চলে আধুনিক প্রক্রিয়ায় খনন কার্য শুরু হয়েছে প্রায় 100 বছর আগে এবং বর্তমানে খনিগহ্বর প্রসারিত হয়েছে 3000 মিটারের চেয়েও অনেক বেশি। স্বর্ণভাণ্ডারও প্রায় নিঃশেষিত। আজ পর্যন্ত আনুমানিক 850 টন সোনা কোলার খনি থেকে আহরণ করা হয়েছে।

❑ কিছু কিছু খনিজ দ্রব্য অন্যান্য খনিজের সঙ্গে মিশ্রিত অবস্থায় প্রকৃতিতে থাকে। এই মিশ্রণের পরিমাণের উপর ঐ খনিজের শিল্পে উপযোগিতা নির্ভর করে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, লৌহ আকরিকের মধ্যে যদি শতকরা 30 ভাগের কম লৌহ থাকে অথবা যদি 50 ভাগ লৌহ এবং তার সঙ্গে বেশ কিছু পরিমাণ ফস্‌ফরাস ও গন্ধক থাকে তবে তা আর বাণিজ্যিক ভিত্তিতে সাধারণত ব্যবহার করা চলে না। অনুরূপভাবে কিছু কয়লা আছে যেগুলোকেই কেবল সরাসরি ইস্পাত কারখানায় ব্যবহার করা যায়—অন্য কয়লা যাতে ছাই এবং জলের পরিমাণ বেশি সেগুলোকে করা যায় না।

❑ পৃথিবীতে বহুপ্রকার খনিজ পদার্থ আছে। সুপ্রাচীনকাল থেকে মানুষ কিছু কিছু খনিজদ্রব্য ব্যবহার করে আসছে। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল, লোহা, তামা এবং সোনা। প্রত্নতত্ত্ববিদ এবং ঐতিহাসিকেরা সভ্যতার ইতিহাসের বিবর্তন বোঝাতে লৌহযুগ (Iron Age), তাম্রযুগ (Copper Age), ব্রোঞ্জযুগ (Bronze Age) প্রভৃতি ব্যবহার করে থাকেন। এর দ্বারা বোঝানো হয় আনুমানিক কতবছর আগে আমাদের পূর্বপুরুষেরা ঐ সব ধাতু বা মিশ্রণের ব্যবহার শুরু করেছিলেন। উল্লেখ করা যেতে পারে যে প্রত্নতত্ত্ববিদদের অনুমান অনুসারে তুরস্কে তামা-সীসা-দস্তা খনিজ পদার্থ ব্যবহার করা হত আনুমানিক খৃষ্টজন্মের 5000 বছর আগে; ভারতবর্ষের

হীরকের ভাণ্ডার সম্বন্ধে প্রাচীন পর্যটকদের লেখা থেকে জানা যায় যে খৃষ্টজন্মের 200-300 বছর আগে আমাদের দেশই সারা পৃথিবীর হীরকের চাহিদা মেটাত। ফরাসী পর্যটক ট্যাভার্নিয়ে সপ্তদশ শতাব্দীতে লিখেছিলেন যে আনুমানিক 60000 লোক কৃষ্ণা নদীর তীরের হীরক ভাণ্ডারে কাজ করত।

1.2.6 খনিজ ও অন্যান্য সম্পদ ঃ

খনিজ এবং শক্তি সম্পদের সঙ্গে অন্যান্য সম্পদের বেশ কিছু পার্থক্য আছে সেগুলো নিয়ে সংক্ষিপ্তভাবে আলোচনা করব।

খনিজ ও শক্তি সম্পদ এমন ধরনের যার প্রয়োগ এবং ব্যবহার সর্বস্তরের দেশ এবং সর্বধরনের সমাজ ব্যবস্থায় সব লোকেরই কিছু না কিছু প্রয়োজন। যেমন সার (fertilizer) প্রায় সবদেশের কৃষকেরই অল্পবিস্তর প্রয়োজন। লোহা, সিমেন্ট, উন্নত ধনীদেশেরও যেমন প্রয়োজন—অনুন্নত দেশেও প্রয়োজন। জ্বালানি তেল কিংবা কয়লা সম্বন্ধেও একই কথা প্রযোজ্য। মহাকাশযান থেকে শুরু করে ভূমিহীন কৃষকের লাঙ্গল—সব ক্ষেত্রেই কিছু না কিছু খনিজ পদার্থের প্রয়োজন। খনিজ তেল পরিশোধন করার সময় যে সব উপজাত দ্রব্য পাওয়া যায়—যথা ন্যাপথা, পীচ, কৃত্রিম বস্ত্র প্রভৃতি—সেগুলোও আমাদের প্রতিদিনের প্রয়োজনে লাগে। এগুলি থেকে নানারকম ঔষধও তৈরি হয় বা কীটনাশক বিষ হয়—যা কৃষিকার্যেও লাগে।

❑ খনিজ পদার্থের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল যে ক্রমাগত ব্যবহারে তা ফুরিয়ে যায়। এইখানেই অন্যান্য সম্পদ থেকে মূল পার্থক্য। একই জমিতে বার বার চাষ করা যায়; নদী কিংবা সমুদ্রে মাছ ধরা যায় এবং জঙ্গল কমে গেলে বনসৃজন করা যায়। কিন্তু একটা কয়লা খনিতে—একটা সময় আসে যখন আর কয়লা পাওয়া যায় না এবং সেটা পরিত্যক্ত খনি হিসাবে গণ্য হয়।

❑ প্রকৃতিতে খনিজ সম্পদের অবস্থান এবং প্রাচুর্য সেই জায়গার ভূবৈজ্ঞানিক বৈশিষ্ট্যের উপর নির্ভরশীল। প্রাচীন পাথর যেখানে আছে সেখানে ধাতব খনিজ থাকার সম্ভাবনা; অনুরূপভাবে নতুনযুগের শিলাস্তর থাকলে খনিজ তেল ও গ্যাস থাকবার সম্ভাবনা। আবার শুধু 'প্রাচীনত্বর' ওপর খনিজ সম্পদ থাকা নির্ভর করে না—উদাহরণস্বরূপ আমাদের দেশে আসামের তেল সম্পদ যে শিলাস্তরে পাওয়া যায়—অন্য জায়গায় সেই শিলাস্তরে তেলসম্পদ নেই।

এই প্রসঙ্গে একটা বিষয়ের উল্লেখ করা যেতে পারে। খনিজ সম্পদের অবস্থান এবং প্রাচুর্যের ওপর মানুষের কোনও কর্তৃত্ব নেই—কিন্তু এই সকল খনিজসম্পদকে ব্যবহার উপযোগী করার দায়িত্ব মানুষের। মানুষের জ্ঞানবুদ্ধির দৌলতেই উপকূলের কাছে তেল থাকবার সম্ভাবনার কথা ভাবা হয়েছিল এবং আধুনিক প্রযুক্তি বিদ্যার জন্য মুম্বাই উপকূলে সমুদ্রের জলের তলা থেকে পেট্রোলিয়াম উত্তোলন করা সম্ভব হচ্ছে—এবং আমাদের দেশে সেটাই এখন তৈলসম্পদের প্রধান উৎস। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ পর্যন্ত আরবদেশ ছিল কেবলমাত্র মরুভূমি—কিন্তু পরবর্তীকালে মরুভূমির তলায় যে বিপুল তৈলভাণ্ডার ছিল তার সন্ধান পাওয়ায়—আরব দেশগুলো এখন ধনী দেশ।

❑ অনেকের মতে খনিজ সম্পদ ব্যবহার করতে গেলে যেসব খনি তৈরি হয়—সেটা প্রচুর জমি ব্যবহার করে যাতে কৃষি বা অন্য কাজ ব্যাহত হয়। খনি অঞ্চলে জনপদ গড়ে ওঠে—এবং আশেপাশের গ্রাম থেকে

লোকজন সব চলে আসে কাজকর্মের জন্য। খনি শহরের লোকজনকে কিন্তু—খাদ্যের জন্য কৃষি এলাকার ওপর নির্ভর করতে হয়। খনির ভাণ্ডার ফুরিয়ে গেলে—সেই শহরের অবস্থা খারাপ হয়। অপরদিকে কৃষি এলাকায় কখনই এরকম হওয়ার সম্ভাবনা নেই। সুতরাং কৃষিকার্য স্থায়ী এবং গঠনমূলক—অন্যদিকে খনিজ শিল্প প্রাকৃতিক সম্পদ ধ্বংসকারী।

সাম্প্রতিক এক হিসাবে দেখা যাচ্ছে যে সারাদেশে আনুমানিক 10000 খনি সম্পর্কে Lease আছে, যার মোট পরিমাণ 1100 হেক্টর। সারাদেশের আয়তনের অনুপাতে এটা মাত্র 0.35 শতাংশ। খনিবিজ্ঞানীদের মতে এই lease জায়গার মাত্র 30-35 শতাংশ ব্যবহার হবে। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে mining lease-এর পরিমাণ 5 হেক্টর—শুধুমাত্র কয়লা, লোহা এবং কিছু অন্য খনিজের বেলায়—জায়গার পরিমাণ বেশি লাগে। বেশির ভাগ কয়লা খনির 'লিজ' 500 হেক্টরের মতো—কেবলমাত্র কিছু বড়মাপের কয়লা খনির 'লিজ' 1000 হেক্টরের মতো। কিছু লোহার খনির 'লিজ' 2000 থেকে 5000 হেক্টরের মতো—অর্থাৎ 20 থেকে 50 বর্গ কিলোমিটার।

উপরের আলোচনার উদ্দেশ্য যে 'খনিজ সম্পদ' যেখানে থাকে—সেখানেই খনি করা সম্ভব, অন্যত্র নয়। অন্য শিল্পের বেলায় কাঁচামালের থেকে দূরত্ব বেশি হলেও অসুবিধে নেই। জাপানে আকরিক লোহা নেই—অথচ বড় জাহাজ তৈরির শিল্প গড়ে উঠেছে। সভ্যতা, অর্থনীতিতে খনিজ সম্পদ যে পরিমাণ গুরুত্বপূর্ণ সেই তুলনায় জায়গা নষ্ট অনেক কম। এছাড়াও আজকাল পরিবেশ চেতনার জন্য নানারকম সরকারি নীতি অনুসৃত হচ্ছে যাতে করে খনির আশেপাশের জায়গা কম নষ্ট হচ্ছে।

1.2.7 খনিজ সম্পদের শ্রেণিবিন্যাস ঃ

খনিজ সম্পদকে সাধারণত তিন ভাগে ভাগ করা হয়।

- ধাতব খনিজ
- অধাতব খনিজ
- ইন্ধন ও শক্তি উৎপাদক খনিজ

ধাতব খনিজ বলতে সেইসকল খনিজকে বোঝায় যেগুলি হতে ধাতু নিষ্কাশন করা যায় যথা—লৌহ, তাম্র, স্বর্ণ প্রভৃতি। এগুলিকে আবার তিন ভাগে ভাগ করা যায়—যেমন

- লৌহ ও লৌহ খাদ ধাতব ঃ লৌহ, ম্যাঙ্গানিজ, ক্রোমিয়াম, নিকেল
- অলৌহ ধাতব ঃ তাম্র, অ্যালুমিনিয়াম, সীসা, দস্তা, টিন প্রভৃতি
- মহার্ঘ ধাতব ঃ স্বর্ণ, রৌপ্য, প্লাটিনাম।

অধাতব খনিজ বহু প্রকার হয়—যেমন, চুনা পাথর (Limestone), অভ্র (Mica), গন্ধক (Sulphur), লবণ (Salt), মার্বেল (Marble), ফসফেট (Phosphate), গ্রাফাইট (Graphite) প্রভৃতি। এগুলি নানাবিধ শিল্পে প্রয়োজন হয়—যেটা নিম্নলিখিত তালিকা থেকে কিছুটা অনুমান করা যাবে।

ইন্ধন শক্তির প্রধান উৎসগুলি হল—কয়লা ও লিগনাইট; খনিজ তেল ও গ্যাস; চলমান জল; ইউরেনিয়াম। অপ্রচলিত শক্তি—যেটা প্রবহমান—nonconventional energy—অর্থাৎ সৌরশক্তি, বায়ুশক্তি প্রভৃতির ব্যবহারও আরম্ভ হয়েছে।

খনিজ পদার্থগুলিকে নিম্নলিখিত তালিকায় দেখান হল ঃ

খনিজ (Minerals)

- ধাতব (Metals)
- অধাতব (Non-metals)

লৌহ ও খাদ (Ferrous Metal and alloys)	অলৌহ (Non-ferrours metals)	মহার্ঘ (Precious metals)	নির্মাণ দ্রব্য	রাসায়নিক	অন্যান্য	ইন্ধন দ্রব্য
লৌহ	তামা	স্বর্ণ	মার্বেল	গন্ধক	গ্রাফাইট	কয়লা
ম্যাঙ্গানিজ	অ্যালুমিনিয়াম	রৌপ্য	চুনাপাথর	নাইট্রেট	অভ্র	খনিজ তেল
নিকেল	দস্তা	প্লাটিনাম	বেলেপাথর	ফসফরাস	চীনামাটি	গ্যাস
ক্রোমিয়াম	সীসা		স্লেট	পটাস	সিলিকা	ইউরেনিয়াম
ভ্যানাডিয়াম	টিন		গ্রানাইট	বোরাক্স		
টিটানিয়াম	অ্যান্টিমনি		বালি	লবণ		
মলিবডেনাম	পারদ (তরল)					
	ম্যাগনেশিয়াম					

❑ অন্যান্য সম্পদের বেলায় যেমন কৃষিজ, অরণ্য প্রভৃতি সম্পদের ব্যবহার সরাসরি প্রযুক্তিবিদ্যার সঙ্গে জড়িত—খনিজ সম্পদের বেলায়ও অনেকটাই তাই। তবে অনেক জায়গায় ভূবৈজ্ঞানিক সমীক্ষাতে আকরের উপস্থিতি—কোনও বিশেষ শিলাস্তরে পাওয়া গেলেও—পরবর্তী সমীক্ষাতে সেগুলোকে বর্তমান বাজারে উত্তোলনের উপযুক্ত বলে মনে করা হয় না। সেইজন্য মানচিত্রে—যেসব জায়গায় বিভিন্ন আকরের অবস্থান দেখান হল—সেগুলোর সব জায়গায় খনি নেই কিংবা আপাতত খনি করার পরিকল্পনা নেই।

❑ খনিজ সম্পদ—মাটির নীচে থাকে—এবং সমীক্ষাতে কেবল অনুমান করা যায় সম্পদের পরিমাণ কত। কেবলমাত্র খনির কাজ শুরু হলেই জানা যায়—যে সম্পদের প্রকৃত পরিমাণ কত। অথচ মূলধন বিনিয়োগের জন্য জানা প্রয়োজন কতটা সম্পদ আছে। খনিজ সম্পদের পরিমাণের শ্রেণিবিন্যাস হল ঃ

(১) **প্রমাণিত** (Proved বা Measured)—যেখানে প্রচুর পরিমাণে সমীক্ষা করে মাটির নিচের সম্পদ সম্বন্ধে নির্দিষ্টভাবে বলা সম্ভব।

(২) **সম্ভাব্য** (Possible বা Indicated)—যেখানে মাটির নিচের সম্পদ সম্বন্ধে প্রচুর তথ্য আছে এবং সম্পদ সম্বন্ধে অনুমান করা সম্ভব।

(৩) **অনুমিত** (Probable বা Inferred)—যেখানে মাটির নিচের সম্পদ সম্বন্ধে অল্প তথ্য আছে এবং ভূবৈজ্ঞানিক সমীক্ষাতে ঐ জায়গায় সম্পদ থাকার সম্ভাবনা আছে।

1.2.8 প্রাকৃতিক জ্বালানি (Natural Fuel) ঃ

জ্বালানি ও শক্তির উৎস প্রকৃতিতে সাধারণত তিন প্রকার যথা খনিজ তেল ও গ্যাস; কয়লা এবং আণবিক খনিজ। আণবিক খনিজ থেকে শক্তি উৎপাদন প্রযুক্তিবিদ্যার উপর নির্ভরশীল এবং খুব অল্পপরিমাণ থেকে বহুগুণ শক্তির উৎপাদন সম্ভব। কয়লা এবং পেট্রোলিয়াম খুব কম দেশেই পাওয়া যায়—তাছাড়া এগুলো বিশেষ সময়ের বা প্রাচীনত্বের পাললিক শিলাতে থাকে। আমাদের দেশের ভাণ্ডারগুলির সংক্ষিপ্ত আলোচনা নিচে দেওয়া হল।

খনিজ তেল ঃ

খনিজ তেলকে সাধারণভাবে পেট্রোলিয়াম বলা হয়—এই শব্দটি ল্যাটিন। ল্যাটিন ভাষায় "পেট্রা"র অর্থ প্রস্তর এবং "অলিয়ম" অর্থে তেল বোঝায়। কথাটির অর্থ প্রস্তরে সঞ্চিত তেল। প্রকৃতিতে পেট্রোলিয়াম যে ভাবে থাকে তাকে পরিস্রুত করে তবেই ব্যবহার করা যায়। অপরিশ্রুত তেলের রাসায়নিক সংযুতি হল প্রধানত হাইড্রোকার্বনের জটিল মিশ্রণ ও সেই সঙ্গে অল্প পরিমাণ অক্সিজেন, নাইট্রোজেন, গন্ধক ও ভ্যানাডিয়াম।

প্রকৃতিতে অপরিস্রুত তেল গ্যাস অথবা বিটুমেন/টার অ্যাসফালট রূপে দেখা যায়। প্রাচীনকালেই মানুষ পেট্রোলিয়ামের ব্যবহার জানত তবে শক্তির উৎস হিসাবে এর ব্যবহার মোটামুটি আধুনিক যুকে ইঞ্জিন আবিষ্কারের পরই বেড়ে গেছে।

- পরিস্রুত খনিজ তেল থেকে পেট্রোল, কেরোসিন, মোম ইত্যাদি উৎপন্ন হয়।
- পেট্রোলিয়ামজাত উপাদান থেকে নানারকম জিনিস তৈরি করা হয় যেগুলো নিত্যপ্রয়োজনে লাগে যেমন নাইলন বস্ত্র, গৃহসজ্জার ফরমাইকা, ডেকোলাস প্রভৃতি।

ভারতবর্ষে সর্বপ্রথম 1825 খৃষ্টাব্দে আসাম রাজ্যে তেলের অবস্থিতির সম্বন্ধে জানা যায়। 1865 খৃষ্টাব্দে মাকুম অঞ্চলে তেলকূপ খনন করা হয় এবং 1867 খৃষ্টাব্দে ডিগবয়ের তেলক্ষেত্রের আবিষ্কার হয়। দেশ স্বাধীন হওয়ার আগে প্রধানত আসামে এবং বর্তমানে পাকিস্থানের অন্তর্ভূক্ত পাঞ্জাবের কিছু অংশে খনিজ তেলের অনুসন্ধান এবং আহরণ করা হত। স্বাধীনতা লাভের পর 'তেল ও গ্যাস কমিশন' (Oil and Natural Gas Commission) ও 'অয়েল ইন্ডিয়া লিমিটেড' দেশের বিভিন্ন অংশে বৈজ্ঞানিক সমীক্ষা চালিয়ে কয়েকটি তেলভাণ্ডারের সন্ধান পেয়েছে—এদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নীচে দেওয়া হল।

- আসামের তেলক্ষেত্রের আয়তন প্রায় 40,000 বর্গকিলোমিটার। এই বলয় আসামের উত্তর-পূর্বাঞ্চল, গারো-খাসি-মিকির পার্বত্য অঞ্চল ও নাগাল্যান্ড পর্যন্ত বিস্তৃত। এখানকার গুরুত্বপূর্ণ তেলক্ষেত্রগুলি হল ঃ নাহারকাটিয়া, মোরান, রুদ্রসাগর, ডিগবয়, লাকোয়া ও গেলেকি।
- গুজরাটের কাম্বে অঞ্চলে বিচ্ছিন্নভাবে তৈলাধারের সন্ধান পাওয়া গেছে যেমন মেহেসোনা, আমেদাবাদ, তারাপুর, ব্রোচ ইত্যাদি। এই অঞ্চলে তৈল ভাণ্ডারের পরিমাণ আনুমানিক 40 কোটি টন।

- বোম্বাই (মুম্বাই)-এর মহীসোপান অঞ্চলের ব্যাপ্তি প্রায় 300 কিলোমিটার যদিও রত্নগিরির দিকে এর বিস্তার আনুমানিক 60 কিলোমিটার। এই মহীসোপান (Shelf area) অঞ্চলেই ভবিষ্যতের তৈলক্ষেত্র আবিষ্কারের সম্ভাবনা আছে। বর্তমানে 'বোম্বে হাই' (Bombay High) কাম্বের সামুদ্রিক অঞ্চলের তথা ভারতবর্ষের খনিজ তেলের প্রধান ভাণ্ডার। এখানে আনুমানিক 250 কোটি টন তেলের ভাণ্ডার আছে।
- পশ্চিমবঙ্গের গাঙ্গেয় অববাহিকায় উল্লেখযোগ্য তৈল ভাণ্ডারের সন্ধান পাওয়া যায় নি। কিছু বৈজ্ঞানিকের মতে এখানে হাইড্রোকার্বনের সৃষ্টি হয়েছিল কিন্তু উপযুক্ত আধারের অভাবে কোন ভাণ্ডারের সৃষ্টি সম্ভব হয়নি।
- ওপরের তথ্য থেকে আমরা জানলাম যে ভারতবর্ষের স্থলাঞ্চলে মাত্র দু জায়গায় পশ্চিমে গুজরাটে ও উত্তর পূর্বে আসাম অঞ্চলেই একমাত্র তেলের ভাণ্ডার আছে। সমুদ্রতীর থেকে দূর মহীসোপান অঞ্চলে "বোম্বে হাই" একমাত্র জানা তৈল ভাণ্ডার—যদিও কৃষ্ণা-কাবেরী অঞ্চলেও সম্ভাবনা রয়েছে।

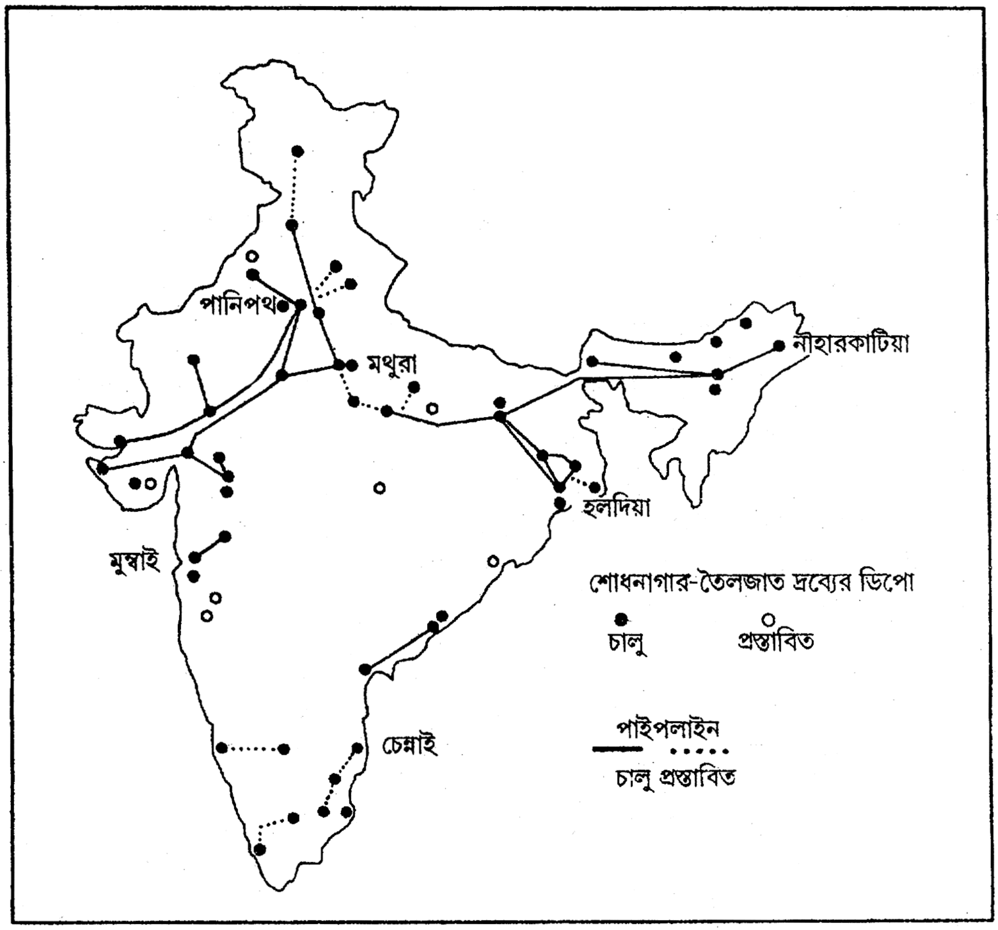

চিত্র 1.2.8 ভারতে তৈল শোধনাগারগুলির অবস্থান

- আমাদের দেশের চাহিদার তুলনায়—উৎপাদনের পরিমাণ অনেক কম হওয়ায়—প্রচুর অপরিস্রুত তেল আমাদের আমদানি করতে হয় বৈদেশিক মুদ্রা খরচ করে। ক্রমবর্ধমান চাহিদার আনুমানিক 40 শতাংশের কিছু বেশি আমাদের দেশে উৎপন্ন হয়।
- মানচিত্রে তেল শোধনাগার এবং পাইপ লাইনের অবস্থান দেখান হল।
- রাজস্থানের জয়সলমীর, বিকানীর-নাগৌর এবং বিকানীর অঞ্চলে সমীক্ষা চালিয়ে কিছু তেল ও প্রাকৃতিক গ্যাসের ভাণ্ডারের সন্ধান পাওয়া গেছে। এখান থেকে প্রাকৃতিক গ্যাস আহরণ করা হচ্ছে। তেলের ভাণ্ডারের সন্ধান চলছে।

গত পাঁচ বছরে আমাদের দেশে পেট্রোলিয়ামের চাহিদা বেড়ে যাওয়ায় এবং আন্তর্জাতিক বাজারে-এর মূল্য বেড়ে যাওয়ায় আমদানি খাতে ব্যয়ের পরিমাণ কয়েক হাজার কোটি টাকা বেড়ে গিয়েছে।

এই সঙ্গে শহর ও গ্রামাঞ্চলে গাড়ির ব্যবহার ও গ্রামাঞ্চলের কেরোসিনের ব্যবহার বেড়ে যাওয়ায় চাহিদার উর্ধ্বগতি অব্যাহত রয়েছে। গ্রামে জঙ্গলের আয়তন কমে যাচ্ছে—লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে কাজেই কেরোসিন ব্যবহার বাড়ছে। এছাড়া 'শ্যালো' ইত্যাদির জন্য ডিজেলের চাহিদাও বাড়ছে। তেলের বদলে কয়লা ব্যবহারের দিকে বিশেষ অগ্রগতি হয়নি। এইসব 'কয়লা'র ওপর আমাদের নির্ভরশীলতা বাড়ছে।

কয়লা ও লিগনাইট ঃ

কয়লার প্রয়োজনীয়তা এবং এর গুরুত্বের জন্য একে কালো হীরে (Black Diamond) বলা হয়ে থাকে। আনুমানিক নবম শতাব্দীতে ইংল্যান্ডে জ্বালানি হিসাবে কয়লার প্রচলন হয়েছিল এবং বাষ্পচালিত ইঞ্জিনের আবিষ্কারের সাথে সাথে কয়লার ব্যবহার এবং গুরুত্ব অনেকগুণ বেড়ে যায়। কয়েকটি ব্যবহারের কথা নীচে জানানো হল ঃ

- তাপবিদ্যুৎ উৎপাদনে (Thermal power) কয়লার প্রয়োজনীয়তা সর্বাধিক।
- ইস্পাত নির্মাণে কোক কয়লা (Metallurgical grade) অপরিহার্য।
- অঙ্গারীকরণ প্রক্রিয়ায় কয়লা থেকে 'কোক' (Coke) ছাড়াও উৎপন্ন হয় নানা রাসায়নিক পদার্থ যেমন ফেনল, ন্যাপথালিন, আলকাতরা প্রভৃতি। এছাড়াও রবার, প্লাস্টিক, ঔষধ ও রাসায়নিক দ্রব্যও উৎপন্ন হয়।
- মানুষের নিত্য ব্যবহার্য বহু বস্তু উৎপাদনে কয়লা অপরিহার্য। বহু কোটি বছর পূর্বের বনাঞ্চলের উদ্ভিদ থেকেই কয়লার সৃষ্টি। প্রথম পর্বে উদ্ভিদের প্রধান উপাদান যথা সেলুলোজ, প্রোটিন, রেসিন প্রভৃতির ব্যাপক রাসায়নিক পরিবর্তন হয় এবং এই পর্বের শেষে, এক অঙ্গারময় পদার্থ (Peat) পিটের সৃষ্টি হয়। পরবর্তী পর্বে 'পিট' ভূগর্ভের চাপ ও তাপমাত্রার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে বিভিন্ন খনিজের সৃষ্টি করে যাতে পর্যায়ক্রমে কার্বনের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়; প্রথমে পিট থেকে হয় লিগনাইট (65 থেকে 75 শতাংশ কার্বন); তারপর বিটুমিনাস কয়লা (78 থেকে 92 শতাংশ কার্বন); এবং সর্বশেষে এ্যানথ্রাসাইট (92 শতাংশের বেশি কার্বন) তৈরি হয়।

ভারতবর্ষের বিভিন্ন কয়লা ক্ষেত্রগুলির অবস্থান ম্যাপে দেখান হল। এখানে দুটি ভাগ করা হয়েছে কয়লা এবং লিগনাইট। এছাড়া অবশ্য আরও একটা শ্রেণিবিভাগ ভূবিজ্ঞানীরা করে থাকেন বয়স অনুসারে। আমাদের দেশে বেশির ভাগ কয়লা ক্ষেত্রই গন্ডোয়ানা শিলাসংঘের—এবং অল্পকিছু 'টারশিয়ারী' শিলাসংঘের মধ্যে পাওয়া যায়। আমরা প্রথমে গন্ডোয়ানা যুগের কয়লাক্ষেত্রের আলোচনা করব। তবে সম্পদভান্ডার বর্ণনা করার সময় প্রদেশ হিসেবে দেখানো হবে।

১. ● **রাণীগঞ্জ** কয়লাক্ষেত্রে কয়লার খনি চালু হয়েছিল অষ্টাদশ শতাব্দীতে। এই ক্ষেত্রের অধিকাংশ অংশই বর্ধমান জেলায়—অবশিষ্টাংশ বীরভূম, বাঁকুড়া ও পুরুলিয়া জেলায়। এখানকার কয়লাক্ষেত্রের অধিকাংশ উৎপাদন হয় ভূনিম্নের খাদ থেকে।

● ভারতীয় ভূবৈজ্ঞানিক সর্বেক্ষণের সাম্প্রতিক সমীক্ষাতে বীরভূম জেলার দেওয়ানগঞ্জ, পাচামি প্রভৃতি অঞ্চলে কয়লাক্ষেত্রের সন্ধান পাওয়া গেছে। এই কয়লাক্ষেত্রের উত্তর ভাগে 40টি কয়লাস্তর (0.5 থেকে 8.7 মিটার পুরু) পাচামি অঞ্চলে কোনও কোনও জায়গায় দুটি স্তর মিলিত হওয়ার জন্য 91 মিটার থেকে 159 মিটার পুরু একটি কয়লাস্তরের সৃষ্টি হয়েছে।

● বাঁকুড়া জেলার বারজোড়া অঞ্চলে 1 থেকে 3 মিটার পুরু নয়টি কয়লাস্তর আছে এবং কয়লা যদিও নিম্নমানের কিন্তু অনায়াসে খননযোগ্য।

২. ● **ঝরিয়া** কয়লা ক্ষেত্র বিহারের ধানবাদ জেলায়—এর বিস্তৃতি 450 বর্গকিলোমিটার এবং এখানকার কয়লা ভারতের কয়লাশিল্পে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে। ইস্পাত কারখানার জন্য প্রয়োজনীয় উত্তম শ্রেণির কোক কয়লা একমাত্র এই অঞ্চলেই উৎপাদিত হয়ে থাকে। এখানে 18টি সুবিস্তৃত কয়লাস্তর চিহ্নিত হয়েছে এবং কোনও কোনও স্থানে বিভাজনের দরুন 46 পর্যন্ত কয়লাস্তর লক্ষ্য করা হয়।

৩. ● **পূর্ব বোকারো ঃ** বোকারো কয়লাক্ষেত্র পূর্ব-পশ্চিমে বিস্তৃত হওয়ার দরুন পূর্ব এবং পশ্চিম দুইভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। এই অঞ্চলের কয়লার মধ্যে জলীয় ভাগ খুবই কম; এবং এদের মধ্যমমানের কোক কয়লার মর্যাদা দেওয়া হয়। কারগালি, কাথারা প্রভৃতি স্তরের কয়লা ধৌতাগারে শোধনের পর ঝরিয়ার উত্তম মানের কোক কয়লার সাথে মিশ্রণ করা হয় ইস্পাত শিল্পে ব্যবহারের জন্য।

৪. ● **পশ্চিম বোকারো** অঞ্চলে 13টি সুনির্দিষ্ট কয়লার স্তর বর্তমান। অধিকাংশ ক্ষেত্রে কয়লার ছাই-এর পরিমাণ শতকরা 25 ভাগের বেশি।

৫. ● **রামগড়** ক্ষেত্রটিকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়। পূর্বদিকে প্রধান কয়লাক্ষেত্র এবং পশ্চিমে মহুয়াটুংরির কয়লাক্ষেত্র পূর্বের ক্ষেত্রে 12টি প্রধান কয়লা স্তরকে চিহ্নিত করা হয়েছে। এখানকার কয়লার ছাই-এর পরিমাণ 20 থেকে 28 শতাংশ। সুতরাং ধৌতাগারে এদের শোধনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। মহুয়াটুংরিতে 1 থেকে 20 মিটার পুরু 18টি কয়লাস্তর রয়েছে।

৬. ● **দক্ষিণ করণপুরা ঃ** এই অঞ্চলে বহু কয়লাস্তর এই কয়লাক্ষেত্রকে বিশিষ্টতা আরোপ করেছে। এখানে 1 থেকে 54 মিটার পুরু 42টি বিভিন্ন কয়লাস্তর চিহ্নিত হয়েছে। এই কয়লাক্ষেত্রের আরগাডা, সিরকা, কুরসে প্রভৃতি স্তরের কয়লা উচ্চমানের যাতে ছাই-এর পরিমাণ তুলনামূলকভাবে কম (20 থেকে 24 শতাংশ)।

৭. ● উত্তর করণপুরা ঃ এই ক্ষেত্রের অধিকাংশ কয়লা নিম্নমানের এবং কোক নির্মাণের পক্ষে অনুপযুক্ত। অবশ্য বাদাম, রোণে প্রভৃতি জায়গার কয়লা কোক নির্মাণের পক্ষে উপযুক্ত।

৮. ● কোয়েল উপত্যকার পুটার, আউরাঙ্গা এবং ডাল্টনগঞ্জ অঞ্চলে কারহারবাড়ি স্তরে কয়েকটি পাতলা কয়লাস্তর বর্তমান। এদের ছাই-এর পরিমাণ তুলনামূলকভাবে কম। আউরাঙ্গা ক্ষেত্রের 7টি কয়লাস্তর নিম্নমানের এবং কেবল বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য ব্যবহারযোগ্য।

৯. ● রাজমহল ক্ষেত্র পশ্চিমবঙ্গের বীরভূম জেলার সীমান্ত থেকে উত্তরে গঙ্গার ধারে পিরপইতি পর্যন্ত বিস্তৃত। এই ক্ষেত্রে পাঁচটি কয়লা ক্ষেত্র যথা, হুরা, চুপড়িভাটা, পাঁচওয়াড়া, মহুয়াগাড়ি ও ব্রাহ্মণী—চিহ্নিত আছে।

১০. ● তালচির এবং ইবনদীর কয়লাক্ষেত্র উড়িষ্যায় মহানদীর উপত্যকায় দুইটি গুরুত্বপূর্ণ কয়লার ভাণ্ডার। এখানে কয়লা স্তর অনেকগুলি এবং বিভিন্ন মানের। তালচির ক্ষেত্রে কয়লার মান নিম্নস্তরের। কোশালা অঞ্চলে কয়লাস্তর কয়েকটি একত্রিত হয়ে 180 মিটার পুরু এক বিশাল কয়লাস্তরে পরিণত হয়েছে।

ইবনদীর উপত্যকার কয়লাক্ষেত্র উড়িষ্যার সম্বলপুর ও সুন্দরগড় জেলা থেকে মধ্যপ্রদেশের সীমানা পর্যন্ত বিস্তৃত। মধ্যপ্রদেশে এই কয়লাক্ষেত্র মান্দ-রায়গড় নামে পরিচিত। এই কয়লাক্ষেত্রে ওরিয়েন্ট, রামপুর প্রভৃতি খনিতে ভূগর্ভস্থ খাদ থেকে কয়লা সংগ্রহ করা হয়।

১১. ● মহানদী উপত্যকায় মান্দ-রায়গড়, কোরবা এবং হেসদো-আরন্দ কয়লাক্ষেত্রগুলি অবস্থিত। শোণ নদীর উপত্যকায় সিংরোলি, বিশ্রামপুর সোহাগপুর, সোনহাট, টাটাপানি-রামখোলা প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য কয়লাক্ষেত্র নর্মদা উপত্যকায় পেঞ্চ-কানহান-তাওয়া কয়লাক্ষেত্র সুপরিচিত। কোরবা কয়লাক্ষেত্রে উচ্চমান ও নিম্নমান কয়লাভাণ্ডার আছে। এখানকার উচ্চমানের কয়লা ভূগর্ভস্থ খনি থেকেএবং নিম্নমানের কয়লা বিদ্যুৎ কেন্দ্রের জন্য মানিকপুর, ভেলাই-এর উন্মুক্ত খাদ থেকে সংগ্রহ করা হয়। হেসদো-আরন্দ ক্ষেত্রে কয়লার ছাই ও জলীয় ভাগ একত্রে 24 থেকে 39 শতাংশ। সোহাগপুর কয়লাক্ষেত্রে মোটামুটি 5টি কয়লাস্তর দেখা যায়।

উত্তরপ্রদেশের মির্জাপুর এবং মধ্যপ্রদেশের সিধি জেলায় অবস্থিত সিংরৌলি কয়লাক্ষেত্র ভারতবর্ষে কয়লা উৎপাদনের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ নাম। এই ক্ষেত্রে একাধিক মোটা কয়লাস্তর আবিষ্কৃত হওয়ার ব্যাপকভাবে খোলা খাদ কেটে কয়লা আহরণ করা হয়। এর মধ্যে কিছু কয়লা সিংরৌলি, ওরবা প্রভৃতি তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রে ব্যবহার করা হয়।

সাম্প্রতিককালে আবিষ্কৃত রামখোলা টাটাপানি কয়লাক্ষেত্রে পাঁচটি কয়লাস্তর আছে যাতে ছাইয়ের পরিমাণ খুব কম। পেঞ্চকানহান তাওয়া কয়লাক্ষেত্র নর্মদা নদীর দক্ষিণে পেঞ্চ কানহান ও তাওয়া নদীর অববাহিকায় অবস্থিত। এ অঞ্চলে পেঞ্চ উপত্যকার কয়লা কোক কয়লার পর্যায়ভুক্ত নয় কিন্তু কানহান ক্ষেত্রের কয়লা কোক জাতীয়। তাওয়া উপত্যকায় পাথরখেবাই প্রধান খনি এবং সারণি তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের কয়লার চাহিদা এই অঞ্চল থেকেই পূরণ করা হয়ে থাকে।

১২. ● গোদাবরী নদীর অববাহিকায় অবস্থিত কয়লাক্ষেত্র গোদাবরী কয়লাক্ষেত্র নামে সুপরিচিত। আনুমানিক 17000 বর্গকিলোমিটার বিস্তৃত এই গন্ডোয়ানা অববাহিকা প্রায় 350 কিলোমিটার দীর্ঘ। 1889 খৃষ্টাব্দে এখানে খনন কার্য শুরু হয়—এক শতাব্দীর অধিক কাল ধরে এই কয়লাক্ষেত্র দক্ষিণ ভারতের চাহিদা পূরণ করে আসছে।

এখানকার 53টি বিভিন্ন খনির মধ্যে অধিকাংশই ভূগর্ভস্থ। রামাগুন্দেম, বিজয়ওয়াড়া, মেট্টুর, মাদ্রাজ, রায়চুর প্রভৃতি তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলিতে এই কয়লা ব্যবহৃত হয়। এছাড়া সিমেন্ট কারখানা, মানুগুড়ুর ভারী জল (Heavy Water) উৎপাদন কেন্দ্র, বালকোর এ্যালুমিনিয়াম কারখানা প্রভৃতির প্রয়োজন মেটায় এই কয়লাক্ষেত্র।

১৩. ● মহারাষ্ট্রের উল্লেখযোগ্য কয়লাক্ষেত্রগুলি হল - প্রাণহিতার অববাহিকায় অবস্থিত কয়লাক্ষেত্র; ভানডেব ও উমরের কয়লাক্ষেত্র। প্রাণহিতার কয়লা নিম্নমানের। কামথি কয়লাক্ষেত্রের স্তরগুলি সরু (1.5 থেকে 6 মিটার) এবং নিম্নমানের (ছাই 25 থেকে 40 শতাংশ)।

1.3 Resource Utilization as Secondary Activity Industry—Cotton Textile Industry, Iron and Steel Industry and Petrochemical Industry

1.3.1 কার্পাস বয়ন শিল্প (Cotton Textile Industry)

1.3.2 লৌহ ও ইস্পাত শিল্প (Iron and Steel Industry)

1.3.3 পেট্রোকেমিক্যাল শিল্প (Petrochemical Industry)

উপরোক্ত এই শিল্পগুলি সম্পর্কে একক 3-তে ভারতের আঞ্চলিক ভূগোল অংশে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

1.4 সর্বশেষ প্রশ্নাবলি

1. সম্পদ কাকে বলে? বিশদ আলোচনা করুন।

2. সম্পদ কোন বস্তু বা পদার্থকে নির্দেশ করে না। কোন বস্তু বা পদার্থ যে কার্য সম্পন্ন করতে পারে তাকেই নির্দেশ করে—এই উক্তির যথার্থতা প্রমাণ করুন। কিভাবে সংস্কৃতি ও মানুষের চাহিদা সম্পদের কার্যকারিতা বৃদ্ধি করে, তা বিবৃত করুন।

3. সম্পদ সম্পর্কে সাধারণ ভ্রান্ত ধারণাগুলি উল্লেখ করুন।

4. সম্পদের বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা করুন।

5. সম্পদের ধারণাটি গতিশীল—ব্যাখ্যা করুন।

6. সম্পদ, প্রতিরোধ ও নিরপেক্ষ উপাদানের গতিশীল ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া ব্যাখ্যা করুন।

7. প্রকৃতি, মানুষ এবং সংস্কৃতির গতিশীল ক্রিয়া-বিক্রিয়ার ফলে সম্পদের বিবর্তন ঘটে—এই উক্তিটির বিশ্লেষণ করুন।

8. সম্পদের শ্রেণিবিভাগ করুন।

9. সম্পদ উন্নয়নের সাম্প্রতিক গতিপ্রকৃতি বিশ্লেষণ করুন।

সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন :

1. সম্পদ সৃষ্টির বিভিন্ন উপাদানগুলি কী কী?
2. সম্পদের উন্নয়নের ঐতিহাসিক পটভূমিকা আলোচনা করুন।
3. গচ্ছিত ও প্রবাহমান সম্পদের পার্থক্য কী?
4. জৈবিক ও অজৈবিক সম্পদ বলতে কী বোঝেন?
5. প্রাকৃতিক ও মানবিক বাধা কী?
6. পুনর্ভব সম্পদ কী?
7. সম্পদের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যগুলি কী কী? আলোচনা করুন।
8. সম্পদের কার্যকারিতাতত্ত্ব বিশ্লেষণ করুন।
9. সম্পদের কার্যকারিতাতত্ত্বের মূল বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা করুন।
10. সম্পদের কার্যকারিতা বিবর্তন ধারণাটি পরিস্ফুট করুন।
11. সম্পদের কার্যকারিতা কী কী বিষয়ের উপর নির্ভর করে?

সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন :

1. সম্পদের কার্যকারিতাতত্ত্বের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় কী কী?
2. পদার্থের কার্যকরী শক্তিই সম্পদ—ব্যাখ্যা করুন।
3. সংস্কৃতির কার্যকারিতা সম্পদের উপযোগিতা বাড়ায়—বিশ্লেষণ করুন।
4. চাহিদা সম্পদের কার্যকারিতা বাড়ায়—একথা কেন বলা হয়ে থাকে?
5. সম্পদ সম্পর্কিত ধারণা একান্তভাবে কার্যকারিতা-নির্ভর—ব্যাখ্যা করুন।

একক-2 ❑ জনসংখ্যা ভূগোল

গঠন

2.1 ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে পৃথিবীর জনসংখ্যা বৃদ্ধি

প্রস্তাবনা—উদ্দেশ্য

2.1.1 অতীত থেকে বর্তমানে পৃথিবীর জনসংখ্যা বন্টন

2.1.2 জনবন্টন

2.1.2.1 জনবন্টনের তারতম্যের কারণ

2.1.2.2 পৃথিবীর জনসংখ্যা বন্টন

2.2 পরিব্রাজন

প্রস্তাবনা—উদ্দেশ্য

2.2.1 সংজ্ঞা

2.2.2 পরিব্রাজন পরিসংখ্যান

2.2.3 পরিব্রাজনের শ্রেণীবিভাগ ও প্রকারভেদ

2.2.4 পরিব্রাজন ও মানুষ

2.2.5 পরিব্রাজনের তত্ত্বসমূহ

2.2.6 পরিব্রাজনের কারণসমূহ

2.2.7 পরিব্রাজনের প্রয়াস-আকর্ষণ মতবাদ

2.2.8 পরিব্রাজনের ফলাফল

2.3 জনসংখ্যা গঠন ও গ্রন্থনা ও সামাজিক সমস্যা

প্রস্তাবনা—উদ্দেশ্য

2.3.1 লিঙ্গ অনুপাত

2.3.1.1 লিঙ্গ অনুপাতের পরিমাপ

2.3.1.2 লিঙ্গ অনুপাতের গুরুত্ব

2.3.1.3 বিশ্বব্যাপী লিঙ্গ অনুপাতের বন্টন

2.3.1.4 ভারতের লিঙ্গ অনুপাত

2.3.2 বয়স গ্রন্থনা

2.3.2.1 পরিমাপ ও বয়স গ্রন্থনা

2.3.2.2 বয়স গ্রন্থনার প্রভাবক ও গুরুত্ব

2.3.2.3 বয়স বিশ্লেষণের পদ্ধতি

2.3.2.4 উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশের বয়স পিরামিডের তুলনা

2.3.3 শ্রমশক্তি

2.3.4 সামাজিক সমস্যা

2.3.4.1 দারিদ্র

2.3.4.2 লিঙ্গ সংক্রান্ত

2.3.4.3 সাক্ষরতা ও শিক্ষা সংক্রান্ত

2.3.5 গ্রন্থপঞ্জী

2.3.6 প্রশ্নাবলী

2.1 ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে পৃথিবীর জনসংখ্যা বৃদ্ধি [Population Growth in Historical Perspective]

প্রস্তাবনা

অতীতে মানুষের সংখ্যা কত ছিল, তারা কোথায় বাস করতো, তারা কী করতো, তাদের আচার-আচরণ কী রকম ছিল, জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কি রকম ছিল, কী কী পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে জনসংক্যা বৃদ্ধি ঘটল, গ্রাম কী ভাবে শহরে পরিণত হলো, এ সব সম্বন্ধে, কৌতুহল থাকা স্বাভাবিক। কথায় আছেক্ত'Present is the key to the past.' অনাদি অতীতের বন্ধ দরজা খুললে পৃথিবীর প্রাচীন জনসংখ্যা বিষয়ক বহু তথ্য জানতে পারবো, যা অনেক সময় আমাদের, ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নির্ধারণেও সাহায্য করবে।

উদ্দেশ্য

বর্তমান পরিচ্ছেদ পাঠ করলে মানুষের বাড়-বৃদ্ধি কিভাবে ঘটল, কী কী ধাপের মধ্যে দিয়ে মানুষ বর্তমান অবস্থায় এসে পৌছল বা পৃথিবীতে মানুষের বণ্টন কেমন, তা জানা যাবে।

2.1.1 অতীত থেকে বর্তমানে পৃথিবীর জনসংখ্যা বণ্টন

প্রাক্-ঐতিহাসিক যুগ (pre-historic Age)

খাদ্য সংগ্রহ ও শিকার পর্যায় (Food Gathering and Hunting Stage)

খুব কম হলেও প্রায় দশ লক্ষ বছর আগে প্রস্তরযুগে পৃথিবীতে প্রথম মানুয়ের (যাদের বৈজ্ঞানিক নামক্তহেমো স্যাপিয়েন্স বা ক্রো ম্যাগনন) আর্বিভাব ঘটেছিল। শুধুমাত্র সময়ই নয়, পৃথিবীতে কোথায় তার আবির্ভাব ঘটেছিল, তাও নিশ্চিত করে বলা যায় না। আদিম মানুষের অস্থি বা তার যন্ত্রপাতির খোঁজ মিলেছে ইউরোপে, এশিয়া ও আফ্রিকায়। বেশির ভাগ নৃতাত্বিকের ধারণা আদিম মানুষের প্রথম আর্বিভাব ঘটেছিল পূর্ব গোলার্ধের বিভিন্ন জায়গায়। আফ্রিকা এই বিবর্তনের কেন্দ্রবিন্দুতে ছিল, এশিয়া ছিল গৌণ বিন্দুতে। ইউরোপে ক্রো-ম্যাগনন বা হোমো-সেপিয়েন্সদের অস্তিত্বের খোঁজ মিলেছে 35,000 বছর আগে; আর আমেরিকাতে আরও পরে প্রায় 25,000 বছর আগে।

অনুমান করা হয় যে প্রাচীন পৃধিবীর (old world) কেন্দ্রবিন্দু থেকে সামান্য সংখ্যায় হলেও প্রস্তরযুগের মানুষ শিকার ও খাদ্যসংগ্রহ পেশাকে ভিত্তি করে পৃথিবীর নানাদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল। কৃষিবিপ্লবের আগে–অর্থাৎ প্রায় 10,000 বছর আগে–যখন উত্তর আমেরিকা ও ইউরোপ মহাদেশে বরফ গলতে শুরু করেছিল, তখন মানুষ ইতস্তত বিক্ষিপ্তভাবে আফ্রিকা, অস্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ ও পূর্ব এশিয়ার নানা স্থানে, দুই আমেরিকার অনেকখানি, ইউরোপের –50^0 উত্তর অক্ষাংশের দক্ষিণে অবস্থিত বহু স্থান জুড়ে বাস করতো।

প্রায় 25,000 বছর আগে পৃথিবীর মোট জনসংখ্যা ছিল প্রায় 3.3 মিলিয়ন। 15,000 বছর পর (অর্থাৎ প্রায় 10,000 বছর আগে) এটা বেড়ে সম্ভবত 5.3 মিলিয়ণে পৌছেছিল। অনুমান করা হয় যে এই সময়ে পৃথিবীতে গড় জনঘনত্ব ছিল প্রতি বর্গ কিলোমিটারে 0.44 জন। খাদ্যসংগ্রহ পর্যায়ে যদিও পৃথিবীতে গড় জন ঘনত্ব কম ছিল, তবুও সব সময় ও সব জায়গায় একই রকম জনঘনত্ব ছিল না। Deevey-র মতে বরফ যুগের (Ice- Age) বসূচনায় যখন মানুষ খাদ্যের জন্য ছিল প্রকিতিনির্ভর, তখন প্রতি 100 বর্গকিমিতে জনঘনত্ব ছিল 3 জন। অনুমান করা হয় খাদ্য সংগ্রহের আর একটু উন্নত পর্যায়–অর্থাৎ কিনা বরফযুগের শেষে ও বরফোত্তর (post-glacial) যুগের শুরুতে–এই গড় জনঘনত্ব গিয়ে দাঁড়াল 12.5 জন। যেমন ক্যারিবো (বল্গা হরিণ) শিকারী এক্সিমোদের দেশে জনঘনত্ব

প্রতি 100 বর্গকিমিতে ছিল 1.07 জন, বুনো ধান সংগ্রাহক ওজিবাদের (Ogibwa) 13 জন অস্ট্রেলিয়ার আদিম অধিবাসিদের 8 জন।

যতদুর জানা গেছে প্রস্তরযুগে (stone Age) মানুষের পরিবারের সদস্যসংখ্যা ছিল কম, সম্ভবত 6 থেকে 12 জন সদস্য নিয়ে ছিল এক একটি পরিবার। অবশ্য যেখানে বেশি রকম খাদ্য পাওয়া যেত এই সব জায়গায় কিছু ব্যতিক্রম ছিল। খাবার সংগ্রহে ভাঁটা পড়লে তবেই এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যাবার প্রশ্ন উঠত। পৃথিবীতে মানুষের আর্বিভাবের সময় থেকে আজ পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ে পৃথিবীর কোথায় কতজন লোক বাস করতেন, জনঘনত্ব বা কত ছিল, তা Deevey-র 'Scientific American' পত্রিকায় (Vol.203, 1960) প্রকাশিত "Human Population" নামক প্রবন্ধটি থেকে তুলে দেওয়া হয় (সরণি 2.1)।

সারণি : বিভিন্ন সময়ে পৃথিবীর জনসংখ্যা ও জনঘনত্ব

বছর আগে (আনুমানিক)	সাংস্কৃতিক অবস্থান	বাসস্থান	মোট জনসংখ্যা (মিলিয়ন হিসেবে)	অনুমিত জনঘনত্ব (প্রতি বর্গকিমিতে)
1,000,000	নিম্ন প্রস্তরযুগ (শিকার ও সংগ্রহ)	আফ্রিকা	0.12	0.004
300,000	আদি প্রস্তরযুগ (শিকার ও সংগ্রহ)	আফ্রিকা ইউরেশিয়া	1	0.012
25,000	মধ্য প্রস্তরযুগ (শিকার ও সংগ্রহ)	”	3.34	0.04
10,000	নব প্রস্তরযুগ (শিকার ও সংগ্রহ)	সমস্ত মহাদেশ	5.32	0.04
6,000	গ্রামীণ কৃষি ও নতুন নগরয়ণ	পুরনো পৃথিবী নতুন পৃথিবী	86.5	1.0 0.04
2,000	গ্রামীণ কৃষি ও নগরয়ণ	সমস্ত মহাদেশ	133	1.0
310(1650)	কৃষি ও শিল্প	ঐ	545	3.7
210(1750)	ঐ	ঐ	728	4.9
160(1800)	ঐ	ঐ	906	6.2
60(1900)	ঐ	ঐ	1,610	11.0
10(1950)	ঐ	ঐ	2,500	16.4
2,00(খ্রিঃ অঃ)	ঐ	ঐ	6,270	46.0

কৃষি বিপ্লবের পর থেকেই পৃথিবীর জনসংখ্যার বড় রকমের বাড়-বৃদ্ধি ঘটেছিল (চিত্র 2.1)। তবে এটা ঠিক যে খাদ্যসংগ্রহ থেকে কৃষিকাজে অংশ নিতে কয়েক হাজার বছর কেটে যায়। চাষবাসের শুবুর সময় থেকে কিছু কিছু

এলাকায় ও পরবর্তীকালে বিস্তীর্ণ এলাকায় শস্যচাষ ও পশুপালন শুরু হয়েছিল, এর ফল ছিল ব্যাপক। বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর মধ্যে যে দূরত্ব ছিল, তা আস্তে আস্তে সরে গেল। বিনিময়ের জন্য উদ্বৃত্ত পণ্যসামগ্রীর যোগান পাওয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে যোগাযোগ ব্যবস্থার প্রয়োজন দেখা দিল। ব্যবধানই স্থান করে দিল সম্পর্কের। ফলে পরিবর্তন ঘটল তাড়াতাড়ি।

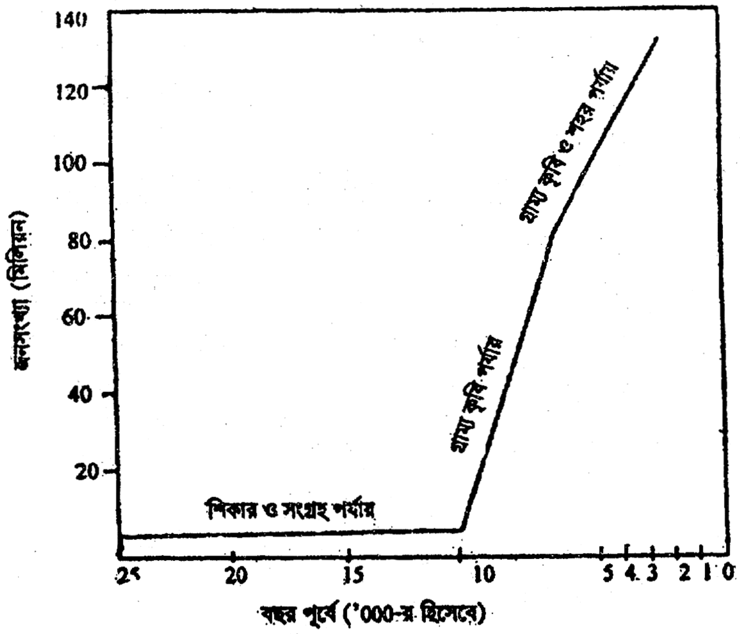

চিত্র 2.1 : অতীতে অর্থনীতির বিবর্তন ও জনসংখ্যা (Trewartha-র অনুকরণে)

প্রাচুর্য আর খাদ্য যোগানের নিরাপত্তা প্রতি বর্গ পরিমাপ জায়গায় আরো বেশি-সংখ্যক লোকের বসবাসের সুযোগ করে দিল। আর খাদ্যসামগ্রী উৎপাদন করতে কিছু সংখ্যক লোকের প্রয়োজন হল, ফলত কিছু লোক নতুন নতুন কাজের জন্য পাওয়া গেল। তাই কৃষি আবিষ্কারের পর তাঁত, লাঙল, চাকা, ধাতব জিনিসের প্রয়োজন ঘটল। Zelinsky-র ভাষায়—"This was the first decisive step toward control of the environment (P.84)." Zelinsky আরো লিখেছেন যে, "Socio-economic development was hardly more advanced than it had been in the favoured localities among specialised collectors, hunters and fishermen."

কৃষিভিত্তিক জীবন স্থায়ী গ্রামীণ বসতির জন্ম দিয়েছিল। প্রায় 8,000-9,000 বছর আগে দক্ষিণ-পশ্চিম এশিয়ার জেরিকোতে (Jericho) যে কৃষিবিপ্লব দেখা দেয় (চিত্র 2.2), তার ফল ছিল ব্যাপক। প্রথমত, খাদ্য উৎপাদনের মাধ্যমে মানুষ ধীরে ধীরে প্রকৃতিকে আয়ত্তে এনে খাদ্যে স্বয়ংভর হতে পেরেছিল, ফলে মানুষ যাযাবর জীবন থেকে মুক্তি পাবার স্বাদ পেয়েছিল। দ্বিতীয়ত, খাদ্য-সংগ্রহের অহেতুক ঝুঁকি নেবার প্রয়োজনীয়তা কমে গেল। ফলে অপঘাতজনিত মৃত্যু কমে গিয়ে জনসংখ্যা বাড়ার সম্ভাবনা দেখা দিল। তৃতীয়ত, যাযাবর জীবনে প্রতিটি মানুষকেই খাদ্য-সংগ্রহে ব্যস্ত থাকতে হত, কিন্তু কৃষিকাজে প্রতিটি মানুষের শ্রমের প্রয়োজন ছিল না। ফলে উদ্বৃত্ত খাদ্যের

ওপর নির্ভরশীল কিছু লোক নতুন নতুন সৃষ্টির কাজে হাত দিল। চতুর্থত, স্থায়ী বসতিতে সমাজ জীবনের বিকাশ ঘটল। কারণ পরস্পরের ওপর নির্ভরশীলতা, বৃত্তি (occupation) বণ্টন ও সমাজ জীবনে শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা করার প্রয়োজনীয়তা ধীরে ধীরে একটা সমাজ জীবনের রূপ দিল। Zelinsky-র ভাষায়—"Assured of relative abundance, these hunters, fishermen and collectors were able to build larger, more complex societies." (P. 83)

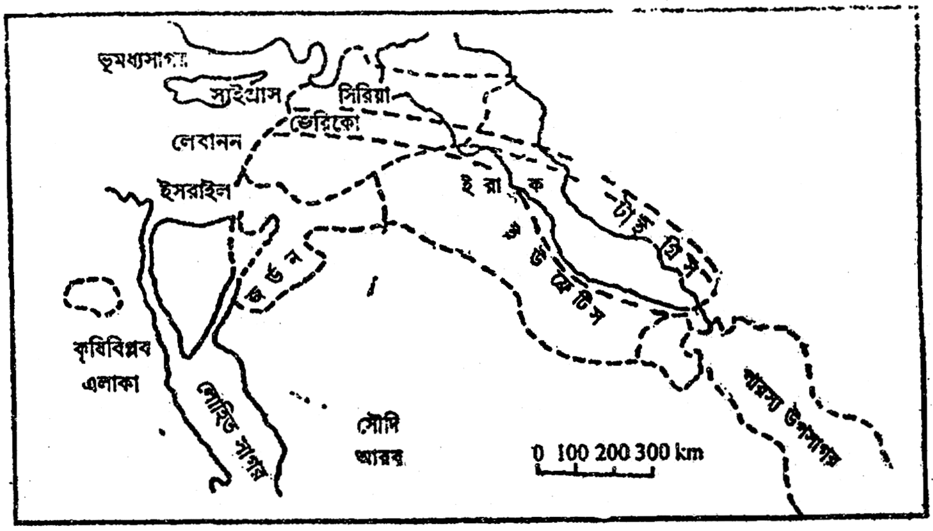

চিত্র 2.2 : পৃথিবীতে কৃষিবিপ্লবের প্রথম এলাকা (Trewartha-র অনুকরণে)

পঞ্চমত, এই সময় থেকে মানুষ পাথরের বদলে ধাতুর ব্যবহার শিখল। এর ফল ছিল ব্যাপক। বর্তমানে প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কারের ফলে জানা গেছে যে এই সময় আমেরিকায় বিক্ষিপ্তভাবে বিশেষত মেক্সিকোর তেহুকান (Tehukan) উপত্যকায় কিছু কিছু চাষবাস শুরু হয়েছিল। Braidwood, Krozman ও Tax সেই সময়কার পৃথিবীকে তিন ভাগে ভাগ করেছেন :

(1) ইউরেশিয়া ও উত্তর আমেরিকায় বিস্তীর্ণ উত্তর অঞ্চল ক্রান্তীয় দক্ষিণ আমেরিকার পূর্বাংশ ও দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকার শুষ্ক অঞ্চল যা এর আগে ছিল জনবসতিহীন।

(2) সিন্ধু উপত্যকা, চিন, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া—এখানে চাষবাসের পাশাপাশি খাদ্যসংগ্রহ চালু ছিল। স্বভাবতই এই সব এলাকা ছিল ঘনবসতিপূর্ণ।

(3) দু'য়ের মাঝামাঝি বিস্তীর্ণ অঞ্চল—এখানে মানুষ পুরনো খাদ্যসংগ্রহ প্রথার ওপর নির্ভর করে জীবন ধারণ করত, আর জনঘনত্ব ছিল মাঝারি রকমের।

এবার নগরায়ণের কথায় ফিরে আসা যাক। জেরিকোতে প্রথম নগরায়ণ থেকে শুরু করে পরবর্তী 3,000-4,000 বছরের মধ্যে নগরায়ণ আরও প্রসার লাভ করে। আনুমানিক 4,000 বছরের আগে ইউফেটিস, টাইগ্রিস নদী উপত্যকায় ইরেখ, এরিডু, উর, লাগাস, লারমা প্রভৃতি শহর গড়ে উঠেছিল (ভট্টাচার্য ও ভট্টাচার্য, 1977) আরও উত্তরে ছিল কিশ ও জেমদেত নামে দুটো শহর। ঐ একই সময়ে মিশরের নীল নদের নিম্ন উপত্যকায়

থিস, মেমফিস, হেলিও, পলিস, এরিডস, নেখের ইত্যাদি শহরগুলো গড়ে উঠেছিল। ধীরে ধীরে নগরায়ণ নীল নদের উচ্চ উপত্যকায় ছড়িয়ে পড়ে। এরও কিছু পরে আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব 2,500-1,500 অব্দের মধ্যে সিন্ধু উপত্যকায় মহেঞ্জোদারো ও ইরাবতী উপত্যকায় হরপ্পাকে কেন্দ্র করে এক উন্নত নগর-সভ্যতা জন্মলাভ করে। আরও কিছু পরে আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব 1,500-র কাছাকাছি সময়ে চিনের হোয়াংহো অববাহিকায় নগরায়ণ ছড়িয়ে পরে। খ্রিস্ট জন্মের কয়েকশ শতাব্দী আগে উত্তর আমেরিকার দক্ষিণে ইউকাটান, গুয়াতেমালা ও মেক্সিকোয় নগরসভ্যতা বিকাশ লাভ করে। এদের মধ্যে মেক্সিকোয় মায়া সভ্যতাই বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে।

প্রাচীন-মধ্য যুগ (খ্রিস্টাব্দের শুরু থেকে 1650 খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত)
[The Ancient-Medieval Period (A.D. 0 to 1650)]

অনুমান করা যায় যে খ্রিস্টাব্দের শুরুতে পৃথিবীতে 133 থেকে 300 মিলিয়ন লোক বাস করতেন। বিভিন্ন সূত্র ও পরোক্ষ প্রমাণের ওপর ভিত্তি করে এইরকম একটা অনুমান করা হয়েছে। সে যাই হোক, এবার সেই সময়কার—অর্থাৎ প্রায় 2,000 বছর আগেকার—জনবসতির প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো নিয়ে আলোচনা করা যাক। উল্লেখ করা যেতে পারে যে এই সময়টা ছিল গ্রীক-রোমীয় যুগ (Greek-Roman Age)। এটা আবার ছিল সাম্রাজ্য বিস্তারেরও যুগ। এই সময় নগর ও সংস্কৃতি তিনটি প্রধান রাজনৈতিক ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দুতে সীমাবদ্ধ হয়েছিল। চিন ও হান্ বংশের নেতৃত্বে বিবদমান সমস্ত রাষ্ট্রগুলো চিনে একীকরণ হয়েছিল। ভারতবর্ষে সম্রাট অশোকের নেতৃত্বে মৌর্য সাম্রাজ্য সমস্ত উত্তর ভারত ও দক্ষিণে দাক্ষিণাত্য থেকে 10^{0} উঃ অঃ পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছিল। ভমধ্যসাগরের আশেপাশের অংশ ও ইউরোপের অনেকাংশ রোমান সাম্রাজ্যের অধীনে ছিল।

প্রতিটি সাম্রাজ্যেই বিরাট সংখ্যক জনতা বাস করতেন, বিশেষত ভারতীয় উপমহাদেশে। এখানে খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীর শুরুতে জনসংখ্যা 100 থেকে 140 মিলিয়ন (Trewaertha, 1969) ছিল। জনসংখ্যার কেন্দ্রবিন্দুতে ছিল মূল চিনা ভূখণ্ড। মাঞ্চুরিয়া, কোরিয়া, মঙ্গোলিয়া, তুর্কিস্তান ও ভিয়েতনামকে নিয়ে গঠিত এই চিন সাম্রাজ্যের জনসংখ্যা খ্রিস্টীয় 2 সালে (A.D.2) 57.7 মিলিয়নে পৌঁছেছিল। চিন সাম্রাজ্যের বাইরে অবস্থিত ফুকিনকে বাদ দিয়ে চিনের বর্তমান সীমানায় অবস্থিত 18টি প্রদেশের জনসংখ্যা ছিল 55 মিলিয়ন। 'হান্ চিনের'' সমম্ভবত তিন-চতুর্থাংশ জনসংখ্যা অব-আর্দ্র ও প্রায়-শুষ্ক উত্তর অঞ্চলে, বিশেষত হোয়াং হো বদ্বীপ অঞ্চলে বাস করতেন। জনবসতির তৃতীয় কেন্দ্রবিন্দুতে ছিল সম্রাট অগাস্টাসের রোম সাম্রাজ্য। এখানকার জনসংখ্যা ছিল প্রায় 54 মিলিয়ন। এটা ঠিক যে এই বিরাট সংখ্যক জনতাকে নিয়ে রোম প্রশাসনের খুব একটা মাথাব্যথা ছিল না, কারণ এই প্রশাসন ব্যক্তিসাম্যে বিশ্বাস করত না।

ভূমধ্যসাগরের আশেপাশে রোমান-সাম্রাজ্যকে বাদ দিয়ে মধ্য ও দক্ষিণ-পশ্চিম এশিয়ার শুষ্কাঞ্চলে বাসিন্দারা প্রধানত এশিয়ার পশ্চিমাঞ্চলে বাস করতেন। সমগ্র মধ্য এশিয়ার 48,00,000 বর্গকিমি এলাকায় খুব সম্ভবত 5 মিলিয়নের কম লোক বাস করতেন। খ্রিস্টীয় যুগের শুরুতে মধ্যপ্রাচ্যের জনসংখ্যা ও জনবণ্টন সম্পর্কে খুব কম তথ্য রয়েছে। তবে 600 খ্রিস্টাব্দে সমগ্র মধ্যপ্রাচ্যের জনসংখ্যা 18-19 মিলিয়নের মত ছিল, এর মধ্যে আরবে বাস করতেন 1 মিলিয়ন, সিরিয়ায় 4 মিলিয়ন, মেসোপটেমিয়ায় 9.1 মিলিয়ন ও উচ্চভূমিতে 4.6 মিলিয়ন জনতা।

উপরের তিনটি অঞ্চল ছাড়া অন্যান্য স্থানের জনবণ্টন সম্বন্ধে খুব কম তথ্যই পাওয়া যায়। খাদ্য-সংগ্রাহকরা এ্যাংলো-আমেরিকা, দক্ষিণ আমেরিকার দক্ষিণ ও দক্ষিণ পূর্বাংশ, দক্ষিণ আফ্রিকা, অস্ট্রেলিয়া, উত্তর ইউরেশিয়ার

সরলবর্গীয় বনাঞ্চলের কিছু জায়গা জুড়ে বাস করতেন। বেশির ভাগ কৃষি-জনতা বাস করতেন ক্রান্তীয় ল্যাতিন আমেরিকা, দক্ষিণাংশে বাদে সম্পূর্ণ আফ্রিকা ও ইউরেশিয়ার উত্তরাংশ ছাড়া সর্বত্র। রোমান সাম্রাজ্যে জনঘনত্ব খুব বেশি ছিল, কারণ সেখানে নগরায়ণ ব্যাপকভাবে ঘটেছিল। এ ছাড়া বহুদূরব্যাপী বাণিজ্য এখানকার অর্থনীতির একটা অঙ্গ ছিল।

মধ্য যুগ (The Medieval Period)

মধ্যযুগের শেষ ও আধুনিক যুগের (1650 খ্রিঃ) শুরুতে পৃথিবীর জনসংখ্যা 50 থেকে 600 মিলিয়নের মধ্যে ছিল বলে অনুমান করা হয়। এই বৃদ্ধির হার খুব ধীরে ধীরে ঘটেছে। এক অঞ্চলের বৃদ্ধির হার অন্য অঞ্চলের বৃদ্ধির হারের সমান ছিল না, বা বৃদ্ধির হার সব সময়েই একরকম ছিল না। আবার কিছু কিছু দুর্যোগপূর্ণ বছরে মৃত্যুহার জন্মহারকে ছাড়িয়ে যেত। বিভিন্ন দেশে জনসংখ্যা ও জনবৃদ্ধির হার এইরকম ছিল—1600 খ্রিঃ চিনে 150 মিলিয়ন লোক বাস করতেন। খ্রিস্টাব্দের শুরু থেকে এই সময় (1600 খ্রিঃ) পর্যন্ত জনসংখ্যা 2 থেকে 3 গুণ বেড়েছিল। অন্যদিকে দক্ষিণ এশিয়া বিশেষ করে হিন্দুস্থান লোকসংখ্যা খুব ধীরগতিতে বেড়েছিল। সাধারণ বছরগুলোতে এই বৃদ্ধির হার ছিল ধীরগতিতে, কিন্তু দুর্ভিক্ষ, মহামারী ও যুদ্ধের বছরগুলোতে বেশি মৃত্যুহার এই বৃদ্ধির হারকে ম্লান করে দিত।

মধ্যযুগে ইউরোপীয় অঞ্চলে জনসংখ্যা বৃদ্ধি ঘটলেও দ্বিতীয়, তৃতীয়, ষষ্ঠ ও চতুর্দশ শতাব্দীতে মহামারীর দরুণ তা কমে যায়। উত্তর আফ্রিকা ও এশিয়া মাইনরে চতুর্দশ শতাব্দীতে উপরোক্ত কারণে জনসংখ্যা খুব কমে যায়। সামগ্রিকভাবে মধ্যযুগে আল্পস্ ও কার্পেথিয়ান পর্বতের উত্তরে জনসংখ্যা বেড়েছিল, কারণ বন পরিষ্কার করে কৃষকেরা বসবাস শুরু করেছিলেন। তাই দেখা যায় জুলিয়াস সিজারের সময় যে জার্মানির জনসংখ্যা ছিল 2 থেকে 3 মিলিয়ন, ষোড়শ শতাব্দীর শেষে তা বেড়ে দাঁড়াল 17 মিলিয়ন। অনুরূপভাবে, স্লাভজাতি-অধ্যুষিত পূর্ব-মধ্য ইউরোপে 1000 খ্রিঃ 8.5 মিলিয়ন লোক বাস করতেন, 1700 খ্রিঃ তা বেড়ে দাঁড়াল 18 মিলিয়ন। দক্ষিণ ও পশ্চিম ইউরোপ (গ্রীক, স্পেন ও ইতালি বাদে যেখানে জনসংখ্যা কমে গিয়েছিল) ও ভূমধ্যসাগরের তীরবর্তী দেশগুলোতে জনসংখ্যা কম হারে বেড়েছিল, যদিও বৃদ্ধির হারে আঞ্চলিক বৈষম্য ছিল।

সপ্তদশ শতাব্দীতে উত্তর-পূর্ব চিন, দক্ষিণ জাপানের পলি গঠিত নিম্ন সমভূমি, মেসোপটেমিয়া, ভূমধ্যসাগরের তীরবর্তী আফ্রিকা বিশেষত নীল উপত্যকা, মধ্য ও পশ্চিম ইউরোপ, ল্যাতিন আমেরিকার কিছু স্থানে বিশেষত মেক্সিকো, মধ্য আমেরিকা ও পেরু-বলিভিয়া আন্দিজ অঞ্চলে জনঘনত্ব বেশি ছিল।

বর্তমান যুগ (1650 খ্রিঃ-র পর) (The Medieval Period after 1650)

আমরা আগেই দেখেছি যে একসময় কৃষিবিপ্লব জনবৃদ্ধিতে সাহায্য করেছিল। পরবর্তীকালে শিল্প-বিজ্ঞান বিপ্লব এই ব্যাপারে সাহায্য করেছিল। তবে বিজ্ঞানের নতুন নতুন আবিষ্কার একদিকে যেমন চাষবাস বা বিভিন্ন কর্মপ্রচেষ্টায় জোয়ার এনেছিল, তেমনি মৃত্যুহার রোধ করে জনবৃদ্ধির ক্ষেত্রে এক বিপ্লব এনেছিল। 1650 থেকে 1950—অর্থাৎ তিনশ বছরে—লোকসংখ্যা বেড়েছিল 5 গুণ। তবে 1850 থেকে 1950 এই এক শতাব্দীর মধ্যে বৃদ্ধির হার ছিল একটু বেশি [চিত্র 2.3 (b)], শতকরা 100 ভাগ। Dudley Stamp-এর Our Developing World থেকে পৃথিবীর (1650-1950 খ্রিঃ-র মধ্যে) জনবৃদ্ধির শতকরা হারটি তুলে দেওয়া হল :

বছর	% বৃদ্ধির হার	বছর	% বৃদ্ধির হার
1650-1750	16.8	1800-1850	29.2
1700-1750		1850-1900	37.3
1750-1800	24.4	1900-1950	53.9
		1950-2001	143.4

1900-1950 এই পঞ্চাশ বছরে যদিও বৃদ্ধির হার 53.9 শতাংশ হয়েছে, তবুও বৃদ্ধির হার সব দশকে সমান ছিল না [চিত্র 2.3(a)]। কারণ, এই পঞ্চাশ বছরের মধ্যে দুটি বিশ্বযুদ্ধ (প্রথম বিশ্বযুদ্ধ 1914-1918 ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ 1939-1945) ঘটেছে। তাতে বহু প্রাণহানি ঘটেছে, বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হয় যুদ্ধক্ষেত্রে পুরুষদের

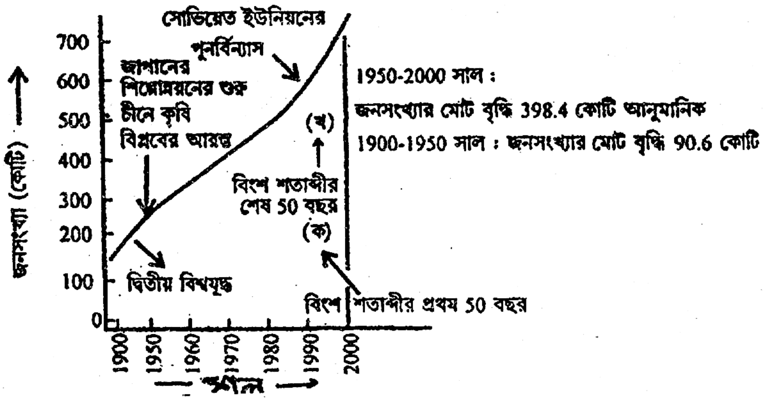

চিত্র 2.3 (a) : পৃথিবীতে জনসংখ্যা (1900-2000)

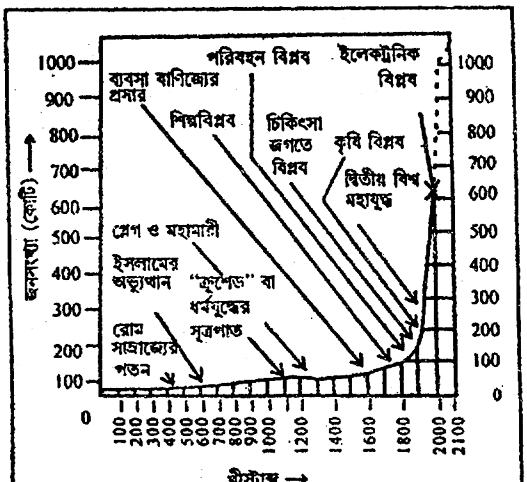

চিত্র 2.3 (b) : পৃথিবীতে জনসংখ্যা বৃদ্ধি : খ্রীস্টাব্দের শুরু থেকে 2100 পর্যন্ত

মৃত্যু। এছাড়া 1930-এর দশকে অর্থনৈতিক মন্দা জনবৃদ্ধিকে প্রতিহত করেছিল। 1950-এর পর থেকে পৃথিবীর জনবৃদ্ধির হার কিছুটা কমে গেছে। জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নতি ও আধুনিক চিকিৎসার প্রসার এর জন্য দায়ী [চিত্র 2.3(b)]। 1820 সালের মধ্যে পৃথিবীর জনসংখ্যা 1,000 মিলিয়নে পৌঁছেছিল। 1930 সাল নাগাদ তা হল 2,000 মিলিয়ন, 1960 সালে 3,000 মিলিয়ন, 1975 সালে 4,000 মিলিয়ন ও 1996 সালে 5,804 মিলিয়ন। বলা যায় যে, পৃথিবীর জনসংখ্যা 1,000 মিলিয়নে পৌঁছাতে কয়েক হাজার বছর লেগেছিল; 2,000 মিলিয়নে পৌঁছতে মাত্র

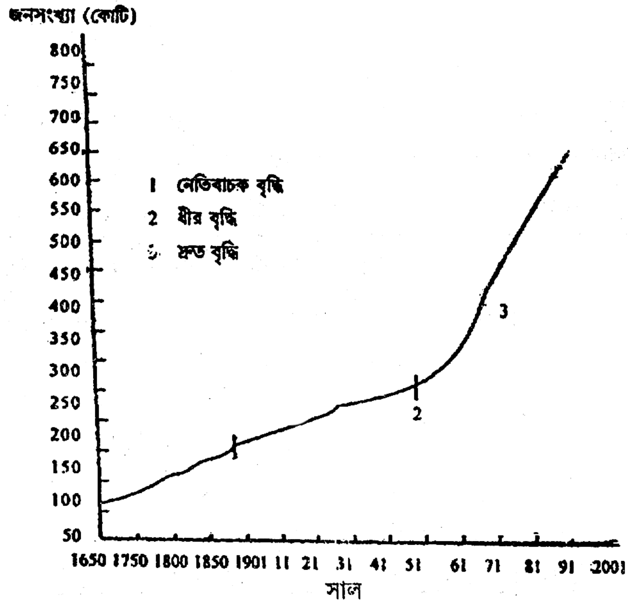

চিত্র 2.4 : পৃথিবীতে জনসংখ্যা বৃদ্ধি (1650-2001)

100 বছর, 3,00 মিলিয়ন হতে প্রায় 30 বছর, আর 4,000 মিলিয়ন হতে মাত্র 15 বছর লেগেছে। 2001 সালে পৃথিবীর লোকসংখ্যা 613.7 মিলিয়ন হয়েছে (চিত্র 2.4)। সারণি 2.2-তে প্রায় 350 বছরের জনসংখ্যার চিত্রটি তুলে ধরা হল।

সারণি 2.2 : পৃথিবীর জনসংখ্যা (1650 খ্রিঃ থেকে 2001 খ্রিঃ)

খ্রিঃ	জনসংখ্যা (কোটি)	খ্রিঃ	জনসংখ্যা (কোটি)
1650	54.5	1950	240.0
1750	72.8	1960	298.6
1800	90.6	1970	361.2
1850	100.0	1980	442.7
1900	161.0	1984	476.8
		1996	580.4
		2001	613.7

1951 সালে U.N.O থেকে প্রকাশিত "The Future Growth of World Population" পুস্তিকায় উল্লেখ করা হয়েছে যে পৃথিবীর 2,500 মিলিয়ন জনসংখ্যা পূরণ হতে 2,00,000 বছর লেগেছিল। কিন্তু আর 2000 মিলিয়ন লোকসংখ্যা পূরণ হতে মাত্র 30 বছর লাগবে। Trewartha যথার্থই বলেছেন যে পৃথিবীর জনবসতি ও অর্থনৈতিক কার্যাবলীর বড় রকমের পরিবর্তন ছাড়া জনসংখ্যা বৃদ্ধির এই হার বহুদিন ধরে চলতে পারে না। গণতত্ত্ববিদরা (Demographers) সকলে একমত যে এই অনিয়ন্ত্রিত জনবৃদ্ধি এক বিলাসিতা এবং ভবিষ্যতে জনসংখ্যা বিস্ফোরণের (Population Explosion) অবস্থা সৃষ্টি করবে।

এতক্ষণ আমরা পৃথিবীর জনবৃদ্ধির হার নিয়ে আলোচনা করলাম। উল্লেখ করা যেতে পারে যে, গত দু'দশকে এই বৃদ্ধির হার পৃথিবীর জনবৃদ্ধির হারকে বেশি নাড়া দিয়েছে। সারণি থেকে তা সহজেই পরিষ্কার হবে। অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতাব্দীতে ইউরোপীয়রাও যথেষ্ট সংখ্যায় বেড়েছেন। শুধুমাত্র নিজেদের মহাদেশেই নয়, মহাদেশের বাইরে যেখানে তারা উপনিবেশ গড়েছেন, সেখানেই তাদের বংশবৃদ্ধি ঘটেছে।

সারণি : পৃথিবীর জনসংখ্যা বৃদ্ধির গতি-প্রকৃতি : 1650-2001 (কোটিতে)

মহাদেশ	1650	1750	1900	1950	1960	1970	1980	1990	2001
আফ্রিকা	10.0	9.5	12.4	22.4	28.2	36.4	47.6	63.3	81.8
উঃ আমেরিকা	0.1	0.1	8.1	16.6	19.9	22.6	25.2	27.8	31.6
ল্যাতিন আমেরিকা	1.2	1.1	6.3	16.6	21.7	28.3	35.8	44.0	52.5
এশিয়া	30.0	48.0	94.0	140.3	170.3	214.7	264.2	318.6	372
ইউরোপ	10.0	14.0	40.0	54.9	60.5	65.6	69.3	72.2	72.7
ওশেনিয়া	0.2	0.2	0.6	1.3	1.6	1.9	2.3	2.6	3.1
পৃথিবী	55.0	72.9	161.4	252.1	302.1	369.5	444.4	528.5	613.7

অবশ্য বর্তমান শতাব্দীতে এই বৃদ্ধির হার বেশ কিছুটা কমে গেছে (সারণি 2.3)। বর্তমানে রাশিয়ার এই (C.I.S.) অংশ বাদে ইউরোপের জনসমষ্টি পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার মাত্র 12 শতাংশ। কিন্তু 1920 সালে এই ভাগ ছিল 18 শতাংশ। 1800 সাল থেকে শুরু করে আজ অবধি দুই আমেরিকার (উত্তর ও দক্ষিণ) জনসংখ্যার 10 শতাংশেরও বেশি বেড়েছে। নিচের সারণিতে মহাদেশগুলোর অন্তবর্তী জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার তুলে ধরা হল।

সারণি : মহাদেশসমূহের অন্তর্বর্তী জনসংখ্যা বৃদ্ধির % হার

মহাদেশ	1750-1800	1800-1850	1850-1900	1900-1950	1950-1980	1980-2001
এশিয়া	0.5	0.5	0.3	2.0	1.8	2.0
আফ্রিকা	0.01	0.1	0.4	2.4	2.9	3.6
উত্তর আমেরিকা	--	2.7	2.3	4.1	0.6	1.3
ল্যাতিন আমেরিকা	0.08	0.9	1.3	2.9	2.7	2.3
ইউরোপ	0.4	0.6	0.7	0.8	0.2	0.2
ওশেনিয়া	--	--	--	1.8	1.3	1.7
পৃথিবী	0.4	0.5	0.5	0.8	1.8	2.9

সারণি থেকে যা আমাদের চোখে পড়ে, তা হল পৃথিবীর অনুন্নত (আফ্রিকা) ও উন্নয়নশীল (দঃ আমেরিকা ও এশিয়া) মহাদেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির বিপুল হার। এই সব ক'টি মহাদেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণ হল আধুনিক চিকিৎসার সুযোগ বৃদ্ধি পাওয়া। এর ফলে মৃত্যুহার কমে গেল, কিন্তু সেই তুলনায় জন্মহার বেশি থেকে গেল। বিগত দু'শো বছরে এই সব মহাদেশের বিভিন্ন দেশে ইউরোপীয়রা উপনিবেশ স্থাপন করেছিলেন। ঔপনিবেশিকদের দৌলতে বিংশ শতাব্দীতে চিকিৎসা-বিজ্ঞানের সুযোগ-সুবিধে বৃদ্ধি পায়। ফলে এখানে মৃত্যুহার কমে যায়। কিন্তু জন্মহার বেশি থাকায় জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার বেশি থেকে যায়। যেমন বলা চলে ভারতে গড়ে একজন নারী 3 জন সন্তানের জন্ম দেন। অবশ্য এর মধ্যেও কিছুটা পার্থক্য আছে। শহরাঞ্চলে এই হার কিছুটা কম, আবার উত্তর ভারতের চারটে রাজ্যে এই হার 5 জন। আফ্রিকায় গড়ে একজন নারী 6 জন সন্তানের জন্ম দেন। অবশ্য এদের মধ্যে 2/3 জন শিশু-সন্তান মারা যায়। পৃথিবীতে মৃত্যুহার কমার একটি বড় কারণ হল শিশুমৃত্যুর সংখ্যা কমে যাওয়া। এশিয়ার মধ্যে একমাত্র জাপানই কঠোরভাবে জন্ম নিয়ন্ত্রণ করেছে। এখানকার জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ইউরোপীয় দেশগুলোর সাথে তুলনীয়। এশিয়া, ইউরোপ ও আমেরিকার মহাদেশগুলোতে জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফল হল চরম দারিদ্র্য, বেকারী, অনাহার ও অপুষ্টি।

ইউরোপ, উত্তর আমেরিকা ও ওশেনিয়ার জনসংখ্যা বৃদ্ধি এবং কৃষি ও শিল্প উৎপাদনের গতির মধ্যে সংগতি রয়েছে। ইউরোপে কিছু দেশ আছে যেখানে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার শূন্যের কাছাকাছি। কানাডা ও ওশেনিয়ায় এমন কিছু স্থান রয়েছে যেখানে সম্পদের তুলনায় জনসংখ্যা নিতান্তই অপ্রতুল। স্বভাবতই সেখঅনে সম্পদের পূর্ণ ব্যবহার করা সম্ভব হচ্ছে না। অন্যদিকে, দক্ষিণ আমেরিকায় জনবৃদ্ধির একটি কারণ হল সেখানকার অনাবিষ্কৃত প্রাকৃতিক সম্পদ সম্পর্কে মানুষের মনে অতিরিক্ত উচ্চাশা পোষণ, অর্থাৎ আগামী দিনের সম্পদের তুলনায় জনসংখ্যা কম রয়েছে বলে সেখানকার বাসিন্দারা মনে করবেন। আশার কথা হল, এশিয়া, দঃ আমেরিকা ও আফ্রিকার বিভিন্ন রাষ্ট্র দেরীতে হলেও জনাধিক্যের বিপদ সম্পর্কে সতর্ক হয়েছেন এবং পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ে যত্নবান হয়েছেন। এর বিপরীত মেরুতে রয়েছে যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা ও ইউরোপের কিছু দেশ যেখানে জনসংখ্যা বৃদ্ধিতে উৎসাহ দেবার জন্য বেশ কিছু সরকারি প্রকল্প চালু রয়েছে।

পৃথিবীর জনসংখ্যা বৃদ্ধির ইতিহাস আলোচনা করলে কয়েকটা জিনিস চোখে পড়ে। প্রথমত, পৃথিবীর জনসংখ্যা তিনবার হঠাৎ বৃদ্ধি পেয়েছে—(i) 8000 খ্রিঃ পূঃ, (ii) 1750 খ্রিঃ এবং (iii) 1950 খ্রিঃ (Rubenstein, 1990)। প্রতিবারই নতুন নতুন কৌশলের উন্নতি লক্ষ্য করা গেছে। কলা-কৌশলের অগ্রগতি মানুষকে প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশের ওপর আরও বেশি নিয়ন্ত্রণ করতে শিখিয়েছে। শুধু তাই নয়, কলা-কৌশলের এই অগ্রগতি পৃথিবীকে আরোও বেশি জনসংখ্যা ধারণ করার ক্ষমতা জোগালো। পৃথিবীতে জনসংখ্যা বৃদ্ধি (i) প্রথমবার কৃষিবিপ্লব, (ii) দ্বিতীয়বার শিল্পবিপ্লব এবং (iii) তৃতীয়বার চিকিৎসা-বিজ্ঞানের বিপ্লবের ফলে সম্ভব হয়েছে।

দ্বিতীয়ত, যতদিন গেছে, ততই জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার বেড়েছে। মানুষের ইতিহাসের প্রথম অবস্থায় পৃথিবীতে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ছিল বছরে মাত্র 0.0015 শতাংশ। আর বর্তমানে তা দাঁড়িয়েছে 1.7 শতাংশ। অবশ্য এই বৃদ্ধির হার সর্বত্র সমান হয়নি। উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলোর মধ্যে বৃদ্ধির হারে যথেষ্ট ফারাক রয়েছে। পরবর্তী অধ্যায়ে বিভিন্ন দেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির গতি-প্রকৃতি ও বৃদ্ধিজনিত সমস্যা নিয়ে আলোচনা করা হল।

2.1.2 জনবণ্টন [Distribution of Population]

2.1.2.1 জনবণ্টনের তারতম্যের কারণ (Causes for Varying Distribution of Population)

পৃথিবীর সর্বত্র জনবসতি দেখা যায় না। তাই অঞ্চল ভেদে জনঘনত্বের বিরাট হেরফের রয়েছে। বর্তমানে (2000) পৃথিবীতে 600 কোটিরও বেশি লোক বসবাস করেন। এই বিপুল জনসংখ্যা কিন্তু পৃথিবীর সবখানে সমানভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে নেই। কারণ হল প্রাকৃতিক এবং আর্থ-সামাজিক অবস্থা।

এ জন্য Zelinsky বলেছেন যে কোন স্থানের বর্তমান জনসংখ্যার প্রকৃতিকে বুঝতে হলে ঐ স্থানের প্রাকৃতিক পরিবেশ ও অর্থনৈতিক গতিপ্রকৃতি, তার সংস্কৃতি, সামাজিক বিন্যাস এবং সর্বোপরি, মানবীয় ভূগোলের সব কয়টি দিকই খতিয়ে দেখতে হবে।

বসতি গড়ে ওঠার কারণসমূহ

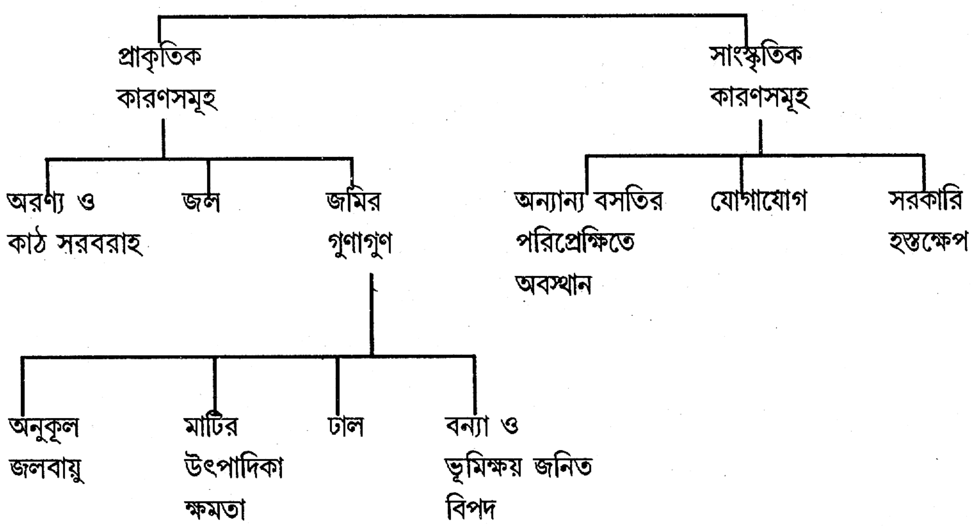

প্রাকৃতিক কারণসমূহ (Physical Factors)

জ্ঞান-বিজ্ঞানের যথেষ্ট অগ্রগতি সত্ত্বেও আজও নানারকম প্রাকৃতিক বাধা বসতি বিস্তারে বাধা দান করে। এই কারণে শীতল তুন্দ্রা অঞ্চলে, মরুভূমি, বন্ধুর পার্বত্যভূমি, জলাভূমি এবং আর্দ্র-ক্রান্তীয় অঞ্চল আজও বলতে গেলে জনশূন্য রয়ে গেছে।

জনসংখ্যার বণ্টন ও জনঘনত্বের ওপর প্রভাব বিস্তারকারী প্রাকৃতিক কারণগুলোর মধ্যে রয়েছে—ভূমিরূপ, জলবায়ু, মরুভূমি, শক্তিসম্পদ এবং খনিজ কাঁচামাল ও গম্যতা (accessibility)।

(1) ভূমিরূপ : ভূ-প্রকৃতি—ভূ-প্রকৃতি জনবণ্টনের অন্যতম নিয়ামক। পার্বত্য বন্ধুর ভূমি, ধসপ্রবণ ঢালুজমি, জলমগ্ন জলাভূমি প্রভৃতি "নেতিবাচক অঞ্চল" মানুষের বসবাসের অনুপযুক্ত। কিন্তু নদীর বিস্তীর্ণ অববাহিকা, নদীমঞ্চ, উপকূলবর্তী সমভূমি প্রভৃতি জনপদ গড়ে তোলার আদর্শ স্থান।

পৃথিবীর আদি সভ্যতার অঞ্চলগুলো—টাইগ্রিস-ইউফ্রেটিস, গঙ্গা-সিন্ধু-ব্রহ্মপুত্র সমভূমিতে গড়ে উঠেছিল, তাই তারা অতি স্বাভাবিক কারণেই জনাকীর্ণ।

আমরা জানি, অনুকূল ভূ-প্রাকৃতিক স্থানে মানুষ বসবাস করে। তুলনামূলকভাবে প্রতিকূল বন্ধুর ভূ-প্রাকৃতিক অঞ্চলে সীমিত কৃষিজমি ও চাষের কাজে খুব বেশি ব্যয়ের জন্য বেশি বসতি গড়ে ওঠে না।

(i) জনবসতির ক্ষেত্রে জমির উচ্চতা ও ঢালের প্রভাব : পৃথিবীর জনসংখ্যার মাত্র 20% লোক 500 মিটারের বেশি উচ্চতায় বসবাস করেন। Semple-এর ভাষায়—"Mountain regions are as a rule more sparsely settled than plains", **(Influence of Geographic Environment)**। আবার Clarke বলেছেন যে পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার 56% লোক সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে 200 মিটারেরও কম উচ্চতায় বাস করেন।

আমরা দেখতে পাই যে, উচ্চতা ও বসতি গভীর সম্পর্কযুক্ত। যথা—

(i) অধিকাংশ বসতি সমতল এলাকায় গড়ে উঠেছে।

(ii) কারণ সমতলে চাষবাসের জন্য প্রচুর উর্বর জমি পাওয়া যায়।

(iii) এ অঞ্চলে শিল্প ও যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত।

(iv) খাড়া ঢালযুক্ত এলাকায় চাষ কষ্টসাধ্য ও ব্যয়বহুল, ফলে জনঘনত্ব কম।

(ii) সূর্যের পরিপ্রেক্ষিতে বসতির অবস্থান : সূর্যের অবস্থান, সূর্যরশ্মির পতনকোণ (angle of inclination) ও সূর্যালোকের সময়ের (duration of sunshine) ওপর নির্ভরশীল হয়ে বসতি গড়ে ওঠে। পার্বত্য অঞ্চলে উপরোক্ত প্রভাবসমূহ বেশি হলেও সমভূমি অঞ্চলেও বাড়ি তৈরিতে সূর্যালোকের প্রভাব দেখা যায় (চিত্র 2.5)। দক্ষিণ বাংলায় নিম্নোক্ত বহুল প্রচলিত শ্লোকটি থেকে এ কথাটির সত্যতা বোঝা যাবে—

"দক্ষিণ দুয়ারী ঘরের রাজা,
পূর্ব দুয়ারী তাহার প্রজা,
পশ্চিম দুয়ারী সদাই তাপ
উত্তর দুয়ারী ঘরের পাপ।

[সূত্র : সুবলচন্দ্র মিত্র : বাংলা প্রবাদ ও প্রবচন]

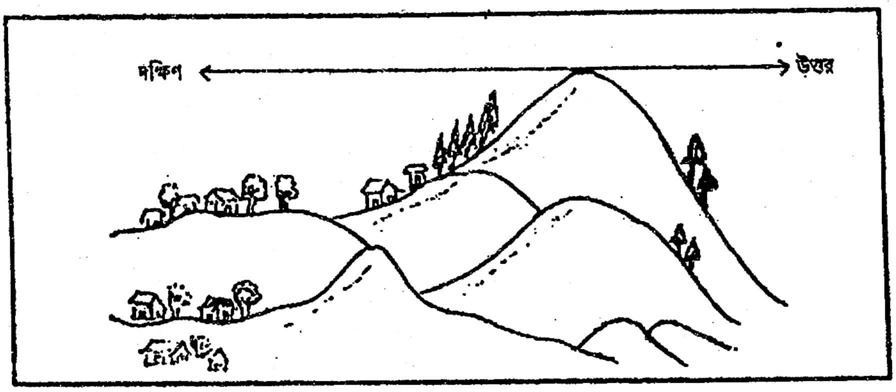

চিত্র 2.5 : হিমালয়ের দক্ষিণঢালে বসতি

দক্ষিণবঙ্গে বঙ্গোপসাগর থেকে গরমকালে বিকেলের দিকে মনোরম বাতাস বয়। তাই বেশির ভাগ লোক এই দিকে মুখ করে বাড়ি করতে চেষ্টা করেন। আর উত্তরদিক থেকে শীতে ঠাণ্ডা বাতাস বয় বলে সেইদিকে মুখ করে বাড়ি করলে ঠাণ্ডা ভোগ করতে হয়। পূর্বদিকে উদীয়মান সূর্যের (rising sun) তাপ গৃহস্থেরা ভালোভাবে উপভোগ করেন। কিন্তু পশ্চিমদিকে মুখ করে বাড়ি করলে দুপুরের পর থেকে বাড়ি সূর্যের তাপে তেতে ওঠে। প্রচণ্ড ঠাণ্ডার হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য ইউরোপের অধিকাংশ বাড়ি উদীয়মান সূর্যের দিকে মুখ করে তৈরি করা হয়, যাতে বাড়িগুলো বেশি সূর্যালোক পেতে পারে। অনুরূপভাবে, হিমালয় অঞ্চলের অনেক জায়গায় বাড়িগুলো উদীয়মান সূর্যের দিকে মুখ করে তৈরি করা হয়। যেমন—নৈনিতাল, কুমায়ুন ও গাড়োয়াল হিমালয়।

(2) জলাশয়ের ভিত্তিতে বসতির অবস্থান : জলনিকাশী ব্যবস্থা, ভৌম জলস্তরের গভীরতা ইত্যাদি বসতি স্থাপনে প্রভাব ফেলে। শুধু পানীয় হিসেবেই নয়, ফসল উৎপাদন ও পশুপালনের জন্যও জল খুব দরকারি। আমাদের বাংলাতে একসময় জলপথই ছিল পরিবহনের প্রধান উপায়। এছাড়া, জলাশয়ে বাঙালির প্রিয় খাদ্য মাছ মেলে। Brunhes লিখেছেন—"The rivers are both roads and fisheries."

জলের অভাবের দরুন পৃথিবীর অনেকাংশে বসতির বিস্তার ঘটেনি। তাই একদিকে যেমন সাহারা ও আরবের ধূ ধূ মরু প্রান্তরে মরূদানগুলোকে কেন্দ্র করে বিচ্ছিন্ন দ্বীপের মতন বসতি গড়ে উঠেছে, অন্যদিকে জার্মানির রাইন নদী, উত্তর আমেরিকার সেন্ট লরেন্স, চিনের হোয়াংহো ও ভারতের গঙ্গা নদীকে কেন্দ্র করে খুব ঘনবসতি গড়ে উঠেছে।

বসতি স্থাপনে জলনিকাশী ব্যবস্থার একটা ভূমিকা আছে। ত্রুটিপূর্ণ জলনিকাশের ফলে সৃষ্ট জলাভূমি ও ঝোপঝাড় ঐ স্থানে জনবসতি গড়ে ওঠার পক্ষে এক বাধাস্বরূপ। Zelinsky (1969) বলেছেন বসতির দিক দিয়ে ভারত ও চীনের বদ্বীপ সমভূমির কাছে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বদ্বীপগুলো [টোংকিন (Tongkin) অঞ্চল বাদে] এক বৈসাদৃশ্য মনে হয়। কারণ উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ পর্যন্ত এই অঞ্চলটি জলাভূমি ছিল। অনুরূপভাবে, অনুন্নত জলনিকাশী ব্যবস্থার দরুন গুজরাট সমভূমির তুলনায় কচ্ছের রণ এলাকায় বিক্ষিপ্ত জনবসতি গড়ে উঠেছে।

ভৌম জলস্তরের গভীরতা গ্রাম্য জনবসতির আকৃতি ও বিস্তারের ক্ষেত্রে প্রভাব ফেলে। এটা দেখা গেছে যে যেখানে ভৌম জলস্তর ভূপৃষ্ঠের কাছাকাছি রয়েছে, সেখানকার জনবসতির আকৃতি ছোট ও সংঘবদ্ধ হয়। বিপরীতভাবে, ভৌম জলস্তর মাটির অনেক গভীরে থাকলে জনবসতি বড় ও বিক্ষিপ্ত হয়। ইরানের উত্তর উপকূলীয় সমভূমিতে ভৌম জলস্তর ভূপৃষ্ঠের কাছাকাছি থাকাতে জনসংখ্যার বিস্তার খুব ছোট হলেও তা ঘনসন্নিবিষ্ট। অন্যদিকে, ইরানের মধ্যভাগে ভৌম জলস্তর খুব গভীর হওয়াতে জলের উৎসের কাছাকাছি বিক্ষিপ্তভাবে জনবসতি গড়ে উঠেছে। ভারতের পাঞ্জাব ও হরিয়ানাতে দেখা গেছে যে উচ্চ অংশের সমভূমির তুলনায় নিম্ন প্লাবনভূমিতে জনবসতির আকৃতি খুব ছোট।

(3) জলবায়ু (Climate) : জনসংখ্যার স্থানীয় বণ্টন, উষ্ণতা, বৃষ্টিপাতের পরিমাণ, দীর্ঘকালীন শীত ইত্যাদি কারণগুলোর দ্বারা প্রভাবিত হয়। মানুষের ওপর জলবায়ুর প্রভাব অপরিসীম। Finch এবং Trewartha তাঁদের **Elements of Geography—Physical and Cultural** গ্রন্থে শীতল মরুভূমি, উষ্ণ মরুভূমি ও আর্দ্র-ক্রান্তীয় অঞ্চলকে বসতিহীন এলাকা হিসেবে চিহ্নিত করেছেড়। Lowry-এর মতে দীর্ঘস্থায়ী শীত ও স্বল্পকালীন গ্রীষ্মের দরুন তুন্দ্রা অঞ্চলের জলবায়ু, স্বল্পস্থায়ী গ্রীষ্মে জলনিকাশের অভাবের দরুন জলাভূমি সৃষ্টি হওয়ায় শীতল অঞ্চল বসতি বিস্তারের পক্ষে অনুকূল নয়। প্রচণ্ড গরম ও কম বৃষ্টিপাতের দরুন উষ্ণ মরু অঞ্চল, প্রচুর উত্তাপ

ও বৃষ্টিপাত, জঙ্গল ভূমিকায়, ধৌত মৃত্তিকা প্রভৃতি কারণে আর্দ্র ক্রান্তীয় অঞ্চল বসতি গড়ে ওঠার পক্ষের প্রতিকূল। উপরোক্ত সব প্রকার জলবায়ু মানুষ ও উদ্ভিদের স্বাভাবিক বিকাশের পক্ষে বাধাস্বরূপ।

নাতিশীতোষ্ণ জলবায়ু মানুষের বসবাসের পক্ষে সবচেয়ে উপযুক্ত। Huntington-এর মতে এ ধরনের জলবায়ু মানুষের স্বাস্থ্য ও মানসিক বিকাশের পক্ষে সবচেয়ে ভালো। "Temperate marine climate with their stimulating and invigorating effects on the physiological and mental framework of men are among the climates par excellence the best area for maximum concentration of human settlement."

মনুষ্যবসতির উপর জলবায়ুর প্রভাব তিন রকম : (i) শৈত্য : মেরু অঞ্চল ও পার্বত্য উচ্চভূমিতে সারা বছরই শীত থাকে ও শীতকালে শৈত্যের তীব্রতা বাড়ে ও তুষারাবৃত থাকে। তুন্দ্রা অঞ্চলের প্রান্তভাগে অভ্যন্তরীণ মৃত্তিকা স্থায়ীভাবে হিমায়িত থাকে। গ্রীষ্মে খুব সামান্য সময়ের জন্য ভূ-পৃষ্ঠের মৃত্তিকা স্তরে বরফ গলে যায়। ফলে বিস্তীর্ণ অঞ্চল জল প্লাবিত হয়ে কৃষিকাজের অনুপযুক্ত হয়ে পড়ে। পশুশিকার ও মৎস্যশিকার এ অঞ্চলের উপজীবিকা হলেও বরফে ঢাকা জল থেকে মাছ ধরা কষ্টকর, আবার তীব্র শীতে বেঁচে থাকা পশু কম বলে পশুশিকার সীমাবদ্ধ।

তুন্দ্রার দক্ষিণভাগে বৃহৎ পত্রযুক্ত সরলবর্গীয় গাছের অরণ্য 'তৈগা' নামে পরিচিত। অত্যধিক তুষারপাতের জন্য এ অঞ্চলের কৃষিকাজ কষ্টসাধ্য। এখানে কাঠ চেরাই শিল্প ও খনি বিকাশ লাভ করেছে। উচ্চতা শৈত্যকে প্রভাবিত করে। যত ওপরে ওঠা যায় তত বেশি শীতলতা অনুভূত হয়। তাই উচ্চস্থান বসবাসের অনুপযুক্ত হয়। ভারতের ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে, 3,000 মিটার অধিক উচ্চতায় জনবসতি প্রায় নেই বললেই চলে।

(ii) **উষ্ণতা :** নিরক্ষীয় অঞ্চল যথা—আমাজন, জাইরে অববাহিকা ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অংশবিশেষে সারাবছর উষ্ণতা ও আর্দ্রতা (বৃষ্টিপাত) বেশি। এরূপ জলবায়ুতে গভীর অরণ্য ছাড়াও বিভিন্ন রোগ-জীবাণুর প্রাদুর্ভাব ও হিংস্র জীবজন্তু দেখা যায়। এখানকার যোগাযোগ ব্যবস্থা অনুন্নত ও এই জলবায়ুতে কর্মক্ষমতা সাধারণত কমে যায়। ফলে উষ্ণ অঞ্চলে ঘন জনবসতি গড়ে ওঠেনি।

(iii) **খরা :** জলবায়ুর মধ্যে উষ্ণতা ও বৃষ্টিপাত জনবসতির বণ্টনকে নিয়ন্ত্রণ করে। আবার এই দুয়ের মধ্যে বৃষ্টিপাত অধিক গুরুত্বপূর্ণ। বলা হয়ে থাকে যে, "The population map of India follows the rainfall map." কারণ বৃষ্টি হলে কৃষির জন্য পর্যাপ্ত জল পাওয়া যায়। আর কৃষি হল ভারতীয় জনতার আর্থিক ভিত্তি। তাই যত পশ্চিমে যাওয়া যায় বৃষ্টিপাত তত কমতে থাকে। সেইসঙ্গে জনসংখ্যার ঘনত্ব কমতে থাকে। এইজন্য থর মরুভূমিতে জনসংখ্যা বিরল।

একই কথা খাটে ক্রান্তীয় মরুভূমির ক্ষেত্রে। এইসব স্থানে উষ্ণতা অত্যন্ত বেশি। অত্যধিক উষ্ণতা, রুক্ষতা, দীর্ঘকালীন বৃষ্টিহীনতা এখানে বসতির প্রধান অন্তরায়। উদ্ভিদের অভাব হেতু পশুপালন মরু অঞ্চলের প্রধান জীবিকা এবং অধিবাসীরা মূলত যাযাবর জীবনযাপন করেন। মরুভূমির জনবসিত বিরল ও অস্থায়ী। খনি অঞ্চলে ও মরূদ্যানে মূলত জনবসতি চোখে পড়ে।

(4) মৃত্তিকা : মাটির গুণাগুণ আংশিকভাবে জনবসতির ঘনত্বকে নিয়ন্ত্রণ করে। মাটির গঠন ও অন্যান্য বৈশিষ্ট্য জনঘনত্বের ক্ষেত্রে পার্থক্য ঘটায়। পৃথিবীর হিমবাহ ও বরফঢাকা অঞ্চলগুলোতে মাটি না থাকায় সেগুলো জনশূন্য বললেই চলে। এই কারণে কাশ্মীর, নেপাল ও ভূটানের অনেক অঞ্চল বাসযোগ্য নয়। Wolfanger তাঁর **World Population Centres in Relation of Soils**—এ দেখিয়েছেন যে, উচ্চ-মধ্য অক্ষাংশের পড্সল মাটি ও ক্রান্তীয় অঞ্চলের ল্যাটেরাইট মাটি নিবিড় কৃষিকার্যের পক্ষে বাধাস্বরূপ বলে এ সমস্ত অঞ্চল বিরল জনবসতিযুক্ত।

অন্যদিকে জাপান, ইন্দোনেশিয়ার আগ্নেয়গিরি অঞ্চলের কৃষ্ণমৃত্তিকা, সিন্ধু ও হোয়াংহো নদীর অববাকির পলিমাটি, মধ্য ও উপক্রান্তীয় অক্ষাংশের তৃণভূমির মাটি উর্বর বলে জনঘনত্ব বেশি দেখা যায়।

মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, থাইল্যান্ড ও বাংলাদেশের কোনো কোনো অঞ্চলের মাটিতে এত বেশি পরিমাণ গন্ধক থাকে যে সেই সব অঞ্চলে চাষবাস করা সম্ভব নয়। ফলে জনবসতিও তেমন গড়ে ওঠেনি।

ভারতের বন্ধ্যা ল্যাটেরাইট মাটি বা কিছুউ আর্কিয়ান যুগের নাইস শিলা দ্বারা গঠিত বন্ধ্যা ভূমিভাগও জনবসতি গড়ে ওঠার পক্ষে অনুকূল নয়।

(5) শক্তিসম্পদ : জনসংখ্যা বণ্টনের ক্ষেত্রে শক্তিসম্পদ ও খনিজ কাঁচামালের একটি বিশেষ ভূমিকা আছে। শীতল সাইবেরিয়া বা উষ্ণ সাহারা মরুভূমির মত প্রতিকূল পরিবেশে খনিজ তেলকে কেন্দ্র করে জনবসতি গড়ে উঠেছে। এছাড়া, দক্ষিণ আমেরিকার আটাকামা মরুভূমি, আলাস্কা, গ্রেট ব্রিটেন, অস্ট্রেলিয়া, ভারতের ছোটনাগপুর মালভূমিতে প্রতিকূল পরিবেশ থাকা সত্ত্বেও শক্তিসম্পদ ও বাণিজ্যের অবস্থান প্রচুর জনসমাবেশ ঘটিয়েছে।

আর্থ-সামাজিক কারণসমূহ :

(ক) জীবিকার সুযোগ : খাদ্য বস্ত্র, বাসস্থান মানুষের মৌলিক চাহিদা। এই সার্বজনীন চাহিদা পূরণ করার প্রাথমিক উপায় হল উপযুক্ত জীবিকার সন্ধান। তাই উপার্জনের সুযোগ যেখানে যত বেশি ও জীবনধারণ করা সেখানে যত সহজ, বাসভূমি হিসেবে সেই স্থান তত আকাঙ্ক্ষিত। সেই কারণে রুক্ষভূমি থেকে শ্য-শ্যামল ক্ষেত্রের দিকে, গ্রাম থেকে শহরের দিকে, শহর থেকে আরও সুযোগ-সুবিধাপূর্ণ নগরের দিকে মানুষের ঢল নামে, যাকে ভৌগোলিক পরিভাষায় 'পরিব্রাজন' বলে।

(খ) প্রশাসনিক শহর : দেশের শাসনকার্য পরিচালনার জন্য প্রশাসনিক কেন্দ্র থাকে, যেখান থেকে দেশের বিভিন্ন কাজকর্ম ও শাসন পরিচালনা করা হয়। যেমন—ভারতের রাজধানী দিল্লি। এই শহরটি প্রশাসনিক কেন্দ্র হিসেবে গড়ে উঠেছে, আর এখানে নতুন নতুন জনবসতি স্থাপিত হয়েছে। কারণ প্রশাসন কেন্দ্র থাকায় রাস্তাঘাট ও যানবাহনের সুযোগ-সুবিধা থাকে। বিভিন্ন সংস্থার অফিস, আদালত থাকায় মানুষের বিশেষ সুবিধে হয়। তাই প্রশাসনিক কেন্দ্রে জনবসতির ঘনত্ব বেশি হয়।

(গ) ধর্মীয় স্থান : বিভিন্ন দেশের মানুষ নানা ধর্মের সাথে জড়িত থাকে। প্রতিটি ধর্মের ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান রয়েছে। ঐ ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলি যেখানে স্থাপিত হয় সেখানে জনবসতি গড়ে উঠতে শুরু করে। কেননা ঐ স্থানে বহু লোক আসে। তাদের নানা দ্রব্যের প্রয়োজন হয়। তখন দোকান, বাজার ইত্যাদি গড়ে উঠে। এভাবে বসতি বাড়তে থাকে। যেমন—ভারতের বারাণসী ও কাশী শহর। ঐ দুই স্থানে বহু মানুষ বসবাস করেন। এ ছাড়াও আরো অনেক ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান রয়েছে যেখানে ঐ ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানকে কেন্দ্র করে শহর গড়ে উঠেছে, যেমন মক্কা, জেরুজালেম। কোন শহর গড়ে উঠলে স্বাভাবিকভাবেই সেখানে জনবসতি বাড়তে শুরু করে। তখন ঐ অঞ্চলটি একটি বড় জনবসতিতে পরিণত হয়।

(ঘ) শিল্পকেন্দ্র : কোন কোন স্থানে দেখা যায় যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থাকার ফলে জনবসতি গড়ে উঠতে থাকে। সেখানে নানা দেশ ও বিদেশ থেকে শিক্ষালাভের আশায় বহু শিক্ষার্থী আসেন তারা ঐ স্থানে বসবাস করেন। তাদের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সরবরাহের জন্য বাজার ও দোকানপাট গড়ে ওঠে। এইভাবে একে একে জনবসতি স্থাপিত হয়। উদাহরণস্বরূপ প্রাচীনকালের নালন্দার কথা বলতে পারি। আমাদের দেশে শান্তিনিকেতন একটি অন্যতম শিক্ষাকেন্দ্র ও শহর। এর প্রধান কারণ বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় থাকায় এইখানে বহু দেশ ও বিদেশের শিক্ষার্থীরা

শিক্ষালাভের জন্য আসেন। আর ঐ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা নামা বসতি ও বাজার শান্তিনিকেতনকে একটি ছোট শহরে পরিণত করে।

(ঙ) শিল্পকেন্দ্র : অনেক স্থানে কোন শিল্পকে কেন্দ্র করে বসতি গড়ে ওঠে। শিল্প স্থাপনের সাথে সাথে ঐ এলাকায় শিল্পকর্মীরা বসবাস করেন। তাদের সুবিধার্থে ঐ স্থানে বাজার গড়ে ওঠে। তখন ধীরে ধীরে জনবসতির পরিমাণ বাড়তে থাকে। এভাবে একটি শহরের জন্ম হয়। যেমন—দুর্গাপুর, পশ্চিমবঙ্গের একটি শিল্পনগরী। এছাড়া হলদিয়াকেও একটি শিল্পনগরী বলা যেতে পারে। শিল্পকেন্দ্রের জন্য বসতির ঘনত্ব বেশি হয়।

(চ) সরকারি ও বেসরকারি নীতি : কোনও দেশের রাজনৈতিক পরিবেশ, সরকারি ও বেসরকারি নীতির সাফল্য ইত্যাদি কারণগুলোও জনসংখ্যার বিন্যাসে সাহায্য করে। যেমন, 1947-এ ভারত ভাগ ও পাকিস্তান নামে নতুন একটি দেশ তৈরি হওয়ার ফলে লক্ষ লক্ষ মানুষ রাতারাতি উদ্বাস্তু হয়ে যান। ফলে ভারতীয় উপমহাদেশে জনবণ্টনের সামগ্রিক চিত্রটি দ্রুত বদলে যায়। একইভাবে 1948 সালে ইজরায়েল সৃষ্টি হওয়ার পরে পশ্চিম এশিয়ার জনবণ্টনে তারতম্য ঘটে। আবার সাম্প্রতিককালে ইরাক-কুয়েত যুদ্ধ, আলজেরিয়া এবং বসনিয়ার রাজনৈতিক অস্থিরতা, কিংবা ইরাক-আমেরিকা যুদ্ধ (2003) ইত্যাদির প্রভাবেও আন্তর্জাতিক পরিব্রাজন ঘটেছে। ফলে জনসংখ্যার বণ্টন ব্যবস্থা বদলে গেছে।

(ছ) যোগাযোগ : কোন জায়গার জনবসতির ঘনত্ব, বাসস্থান ও তার প্রধান যোগাযোগের মাধ্যমের ওপর নির্ভর করে। যোগাযোগ ব্যবস্থা অনুন্নত হলে অতি উর্বর মৃত্তিকাতেও তেমন একটা জনবসতি গড়ে ওঠে না। সাধারণত দেখা গেছে যে, বিভিন্ন মহাদেশগুলোর মধ্যভাগ অপেক্ষা প্রান্তভাগে জনবসতি ঘন। অর্থনৈতিক দিক থেকে অনগ্রসর এলাকায় জনবসতি বিকাশের সুযোগ কম থাকে। বিপরীতভাবে, অর্থনৈতিক দিক দিয়ে সমৃদ্ধ এলাকায় বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষের পরিব্রাজন ঘটে।

(জ) প্রযুক্তিবিদ্যা : বর্তমান দিনে প্রযুক্তিবিদ্যা ও বিজ্ঞানে উন্নতি, জনসংখ্যা বণ্টনে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে। Clarke বলেছেন যে দ্রুত নগরায়ণের ফলে জনসংখ্যা বণ্টনের ক্ষেত্রে প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রভাব কমছে। বিদ্যুৎচালিত যন্ত্রশক্তি, আধুনিক কৃষি, শিল্পায়ন প্রভৃতির ফলে ইউরোপে জনবসতির ঘনত্ব বাড়ে।

(ঝ) সভ্যতার ধারা : Majid Hussain (Human Geography)-র মতে জনসংখ্যা বৃদ্ধি, জনঘনত্ব ইত্যাদির ক্ষেত্রে দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হল সভ্যতার প্রাচীনত্ব। সাধারণভাবে, যে স্থান যত পুরনো, সেখানে ততদিন ধরে কৃষকরা চাষবাস করে আসছেন। ফলে সেখানে আরও মানুষের সমাগম ঘটে ও জনঘনত্ব বাড়তে থাকে। সিন্ধু-গঙ্গা সমভূমি কিংবা পূর্ব চিন সমভূমির তুলনায় যুক্তরাষ্ট্রের মিসিসিপি সমভূমি, কিংবা আর্জেন্টিনার পম্পাস নিতান্তই হাল আমলের বসতি। তাই সেখানে তুলনামূলকভাবে জনঘনত্ব কম।

(ঞ) জনমিতি উপাদান (Demographic Elements) : প্রজনন হার, মৃত্যুহার ও পরিযানের কারণে জনসংখ্যা জনঘনত্বের বণ্টনে অঞ্চলগত হেরফের দেখা যায়। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ যখন স্থায়ী রাজনৈতিক সীমারেখা দিয়ে ভাগ হলো, তখন অধিকাংশ দেশই পরিযান নিয়ন্ত্রণে নিজেরাই আইন প্রণয়ন করল। সেই সঙ্গে স্বাভাবিক প্রজনন-হারকে নিয়ন্ত্রণে রাখল। কিন্তু এর বিপরীতে জনবহুল পুরনো পৃথিবী আরও জনাকীর্ণ হয়ে পড়ল।

(ট) জাতীয় সীমানার বিধিনিষেধ : প্রতিটি দেশের নিজস্ব আন্তর্জাতিক সীমানা থাকে। আন্তর্জাতিক আইন অনুসারে ঐ সীমানা লঙ্ঘন করা যায় না। এই বিধিনিষেধের দরুন, অত্যধিক জনসংখ্যার দেশ থেকে মানুষ অল্প সংখ্যক জনতার দেশে গিয়ে বসবাস করতে পারেন না। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় বাংলাদেশের জনঘনত্ব পৃথিবীর

মধ্যে বেশি অথচ অস্ট্রেলিয়া, কানাডা, যুক্তরাষ্ট্রের জনঘনত্ব খুব কম। আর্ন্তজাতিক আইন যদি না থাকত, তবে বাংলাদেশীরা ঐ সব দেশে গিয়ে বাস করতে (1950 অন্যভাবে বলা যায়, মানুষের আর্ন্তাতিক পরিব্রাজনের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক বিধি নিষেধ "helps to explain the exciting distributional pattern of world population" (Majid Hussain, Human Geography)।

এইসব কারণগুলো ছাড়াও কতকগুলো প্রাকৃতিক ও সামাজিক বিপর্যয় অস্থায়ীভাবে জনসংখ্যার মানচিত্রকে পরিবর্তিত্ত করে। Zelinsky-র মতে ভুমিক্ষয়, ধস, অগ্ন্যুৎপাত, বন্যা, হিমবাহের প্রসারণ, ঝড়, মহামারি, আগুন, খরা, ইত্যাদি হলো প্রাকৃতিক বিপর্যয়। কোনো জাতিকে নির্মূলকরণ (হিটলার কর্তৃক ইহুদিদের) বা বিরাট সংখ্যক জনতার জন্মভূমিতে ফিরে আসা–এসব হল সামাজিক বিপর্যয়।

সবশেষে বলতে পারি যে এই সব উপাদানের মিলিত প্রভাবে জনবসতির বণ্টনে তারতম্য ঘটে থাকে। তবে অনেক সময় একটি বিশেষ উপাদানকে কেন্দ্র করে জনবসতি গড়ে উঠেছে। মধ্যপ্রাচ্যে খনিজ তেলকে কিংবা পশ্চিম অস্ট্রেলিয়ার মরু অঞ্চলে শুধুমাত্র সোনাকে কেন্দ্র করে বসতি গড়ে উঠেছে।

2.1.2.2 পৃথিবীর জনসংখ্যা বণ্টন (World Population Distribution)

2001 সালের মাঝামাঝি পৃথিবীতে জনসংখ্যা ছিল 6.173 এর মাত্রখ্যা 21 শতাংশ উত্তর আমেরিকা, ইউরোপ, জাপান, C.I.S, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ডের মতো উন্নত দেশগুলিতে বাস করেন। বাকি 79 শতাংশ আফ্রিকা, লাতিন আমেরিকা, এশিয়ার মত অনুন্নত দেশগুলিতে বাস করেন মহাদেশগুলোর মধ্যে এশিয়া-ই পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে ঘনবসতিপূর্ণ। এখানে পৃথিবীর 60 ভাগের বেশি (মোট জনসংখ্যা 3,720 মিলিয়ন) লোক বাস করেন। এর পরের স্থান হলো যথাক্রমে আফ্রিকা, ইউরোপ, দক্ষিণ আমেরিকা, উত্তর আমেরিকা ও ওশিয়ানিয়া। মজার ব্যাপার হলো এই যে অনুন্নত দেশগুলোতে জনসংখ্যা বেড়ে চলেছে। এইসব দেশগুলো জনমিতিক পরিবর্তনের দ্বিতীয় ধাপে থাকায় এখানে জনবিষ্ফোরণ লক্ষ করা যায়। 1950 সালে পৃথিবীর 70 শতাংশ জনতা উন্ননশীল দেশগুলোতে বাস করতেন। কিন্তু, 1996 সালে তা বেড়ে 80 শতাংশে দাঁড়াল। পক্ষান্তরে, উন্নত দেশগুলো জনমিতি পরিবর্তনের শেষ ধাপে পৌঁছনোর দরুন সেখানে জনবৃদ্ধি খুব কম হচ্ছে। তাই পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার ক্ষেত্রে এই সব দেশদুলোর অবদান কমে যাচ্ছে। 1950 সালে পৃথিবীর জনসংখ্যার 30 শতাংশ লোক ওসব দেশে বাস করতেন। কিন্তু 1996 সালে তা মকে 20 শতাংশ দাঁড়িয়েছে।

2001 সালে পৃথিবীর সবচেয়ে জনবহুল দেশে অর্থাৎ চিনে লোকসংখ্যা ছিল 1,273 মিলিয়ন, যা উন্নয়নশীল দেশগুলোর মোট জনসংখ্যার তুলনায় সামান্য কিছু কম ছিল। এর পরের স্থান হল ভারতের (1,033 মিলিয়ন)। তারপর রয়েছে (2001 সাল) যথাক্রমে যুক্তরাষ্ট্র (285), ইন্দোনেশিয়া (206), ব্রাজিল (172), পাকিস্তান (145), রাশিয়া, (144) ও জাপান (119)। বলা যেতে পারে এই সাতটি পৃথিবীর প্রধান জনবহুল দেশ। পৃথিবীর বেশির ভাগ জনবহুল দেশগুলো এশিয়া মহাদেশে অবস্থিত। এমনকি, জনঘনত্বের দিক দিয়ে এশিয়া ইউরোপকে ছাড়িয়ে গেছে। 1970-71 সালে ইউরোপের জনঘনত্ব ছিল প্রতি বর্গকিমিতে 94 জন। আর 1984 সালে তা হল 99। ঐ সময়ের মধ্যে এশিয়ার জনঘনত্ব 75 থেকে 101-এ পৌঁছেছে। প্রতি বর্গকিমিতে এই অতিরিক্ত জনঘনত্ব এশিয়া মহাদেশের পক্ষে সত্যি এক বোঝা, বিশেষ করে যখন এখানে সম্পদ সীমাবদ্ধ এবং সামাজিক, অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতি খুবই মন্থর। সারণি থেকে দেখা যাচ্ছে যে অনুন্নত দেশগুলোতে 1970 থেকে 1984 সালের মধ্যে জনঘনত্ব প্রতি বর্গকিমিতে 34 থেকে 48-এ পৌঁছেছে। কিন্তু একই সময়ে উন্নত দেশগুলোতে এই ঘনত্ব বেড়েছে মাত্র 1 জন, 18 থেকে 19। এশিয়া, আফ্রকা, ল্যাতিন আমেরিকায় এই ঘনত্ব লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে।

স্থানিক বণ্টনের অসমতা পৃথিবীর জনসংখ্যা বণ্টনের আর একটি বৈশিষ্ট্য। পৃথিবীর জনসংখ্যা 90 শতাংশের বেশি লোক উত্তর গোলার্ধে বাস করেন। উত্তর গোলার্ধে আবার অক্ষাংশ ভেদে জনঘনত্বের হেরফের লক্ষ্য করা যায়। যেমন, বলা চলে 0^0 থেকে 20^0 উত্তর অক্ষাংশে 10% লোক বাস করেন। Trewartha (1969) অনুমান করেছেন যে পৃথিবীর জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক তার মোট আয়েতনের 5 শতাংশেরও কম স্থানে, আর বাকি অর্ধেক 50 থেকে 60 শতাংশ স্থানে বাস করেন। আরেকটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হলো এই যে প্রতিটি মহাদেশের প্রান্তভাগে জনঘনত্ব বেশি। সেই তুলনায় মহাদেশগুলোর মধ্যভাগ বলতে গেলে জনবিরল। Clarke (1965) বলেছেন যে বিশ্বের জনসংখ্যার তিন-চতুর্থাংশ লোক সমুদ্র থেকে 2,000 কিমির মধ্যে বাস করেন, আর দুই-তৃতীয়াংশ 500 কিমির মধ্যে বাস করেন। জনবসতি ঘনত্বের এই তারতম্য জলবায়ু ও যোগাযোগ ব্যবস্থার দরুণ ঘটে থাকে। Trewartha-র বিশ্লেষণে দেখা যায় যে স্থানিক উচ্চতাভিত্তিক (spatial height) জনসংখ্যার গড় বণ্টনে দক্ষিণ আমেরিকার (644 মিটার) স্থান সবার আগে, আর অস্ট্রেলিয়ার স্থান সবার শেষে (95 মিটার)। মোটামুটিভাবে বলা যায় যে পৃথিবীর জনসংখ্যার 80 শতাংশ লোক সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে 500 মিটার উচ্চতার মধ্যে বাস করেন।

লক্ষ্য করার মতো ব্যাপার হলো এই যে বেশি ও কম বসতি উভয়ই সনাতন ও প্রযুক্তিবিদ্যায় অগ্রণী সমাজ, নতুন ও পুরনো পৃথিবীতে ক্রান্তীয় ও মধ্য অক্ষাংশের অঞ্চলসমূহে দেখতে পাওয়া যায়। যেমন, আর্দ্র ক্রান্তীয় অঞ্চলের জাভা সনাতন সমাজের, মধ্য অক্ষাংশের বেলজিয়াম ও হল্যাণ্ড পশ্চিমী সংস্কৃতির ও নদীকেন্দ্রিক শুষ্ক পরিবেশে গড়ে ওঠা মিশর দেশ। মোটামুটিভাবে বলা হয় ঘনবসতি মূলত পূর্ব এশিয়া, দক্ষিণ এশিয়া, পশ্চিম ইউরোপ ও যুক্তরাষ্ট্রের উত্তর-পূর্বে সীমিত। এইসব অঞ্চলের কোন কোন স্থানে জনঘনত্ব প্রতি বর্গকিমিতে 1,000 থেকে 2,500 পর্যন্ত হয়ে থাকে। অপরদিকে, ইউরোপ ও অ্যাংলো-আমেরিকায় জনঘনত্ব নগর ও শিল্পোন্নয়নের মাত্রার ওপর নির্ভর করে। এশিয়ার জনবসতি প্রধানত কৃষিনির্ভর। তাই এখানে পৌর জনঘনত্ব খুব কমই দেখা যায়।

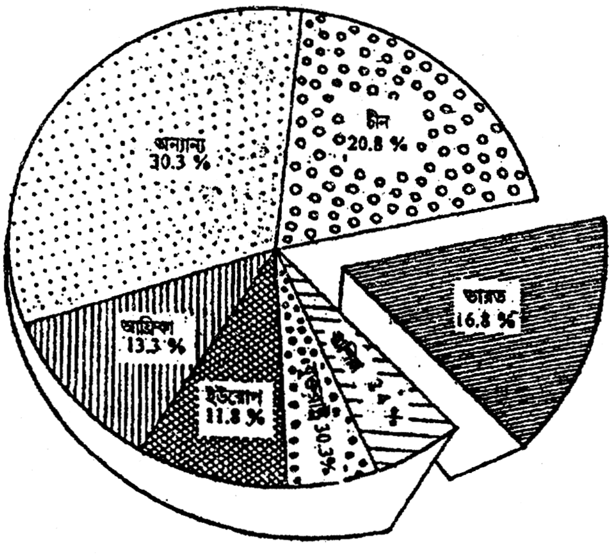

চিত্র 2.6 : পৃথিবীর জনসংখ্যার বণ্টন (%), 2001 সাল

সাধারণভাবে, পৃথিবীর দু'ভাগে ভাগ করা যায় : স্থায়ী বসতি অঞ্চল (Ecumene) এবং জনহীন অঞ্চল (Non-ecumene)। যা হোক, এই দুই ধরনের জনবসতির মধ্যে সুস্পষ্ট সীমারেখা টানা সম্ভব নয়। এটা অনুমান করা হয় যে পৃথিবীর মোট ভূ-ভাগের এক-তৃতীয়াংশ শীতলতা বা শুষ্কতার দরুন অনুর্বর। তাই সে সব অঞ্চল জনবিরল। মহাদেশগুলোর প্রায় 60 শতাংশ ভূমিভাগকে স্থায়ী বসতি হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। সব স্থায়ী বসতিগুলোর জনঘনত্ব সমান নয়। এর মূলে রয়েছে সামাজিক-অর্থনৈতিক কারণসমূহ। পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার তিন-চতুর্থাংশ চারটি প্রধান বলয়ে সীমাবদ্ধ, যার মধ্যে দুটি রয়েছে এশিয়ায়, একটি ইউরোপ ও অপরটি উত্তর আমেরিকায়। প্রধান বলয়টিতে (মোট জনসংখ্যা এক-চতুর্থাংশ) রয়েছে চিন ও জাপান। দ্বিগুতয় বলয়টি দক্ষিণ এশিয়ার ভারত, পাকিস্তান ও বাংলাদেশকে নিয়ে গঠিত। এখানে পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার এক-চতুর্থাংশের বাস। ইউরোপীয় বলয়টির মধ্যে রাশিয়ার জনসংখ্যা দক্ষিণ এশিয়ার বলয়ের মতই। এখানে পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার এক-পঞ্চমাংশ বাস করেন। উত্তর আমেরিকার পূর্বাংশের জনসংখ্যা বলয়টি সবচেয়ে ছোট। এখানে পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার প্রায় ৫ শতাংশ লোক বাস করেন।

এই চারটি প্রধান বলয়কে আবার জনসংখ্যার ঘনত্বের দিক থেকে দুটি শ্রেণিতে ভাগ করা যায়। এশিয়ার দুটি বলয়কে একটি শ্রেণিতে এবং ইউরোপীয় ও উত্তর আমেরিকার বলয়টিকে অপর শ্রেণিতে ভাগ করা যায়। এশিয়ার বলয়গুলোর বৈশিষ্ট্য হলো যে এগুলো প্রাক্-আধুনিক সভ্যতার পীঠস্থান। এখানকার গরিব চাষী নিবিড় পদ্ধতিতে চাষবাস করেন। এখানে জমির ওপর জনসংখ্যার চাপ রয়েছে। সবশেষে বলা যায় যে কৃষিযোগ্য জমি জনসংখ্যা ঘনত্বের প্রধান নিয়ন্ত্রক।

পৃথিবীর জনসংখ্যার এক-চতুর্থাংশ ইউরোপ ও উত্তর আমেরিকা এই দুই বলয়ে বাস করেন। এই বলয় দুটো ইউরোপীয় সংস্কৃতির ধারক ও বাহক। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার দিক থেকে এরা খুবই উন্নত।

শীতল, শুষ্ক ও আর্দ্র উষ্ণ জলবায়ু অঞ্চল মানুষের বসবাসের অযোগ্য স্থান হিসেবে পরিচিতি পেয়েছে। উচ্চ অক্ষাংশের শীতল স্থানগুলো বসবাসের অযোগ্য কুমেরু ও গ্রীণল্যাণ্ড, উত্তর আমেরিকা ও ইউরেশিয়ার তুন্দ্রা অঞ্চলে জলবায়ুর প্রতিবন্ধকতা লক্ষ্য করা যায়। জলবায়ুর বিরূপতার জন্য স্বল্পসংখ্যক লোকবসতি লেখা গেলেও অদূর ভবিষ্যতে এখানে জনসংখ্যা বাড়ার সম্ভাবনা খুবই কম।

শুষ্ক অঞ্চলের প্রধান সমস্যা হল জল। সেজন্য এই সব অঞ্চলে মুষ্টিমেয় কিছু পশুপালক যাযাবর অস্থায়ীভাবে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে বাস করেন। মরু অঞ্চলের মধ্যে মরুদ্যানে ঘনবসতি লক্ষ্য করা যায়। লক্ষ্য করা গেছে যে জলসেচ ব্যবস্থার উন্নতির ফলে মরুভূমিতে জনবসতির বিস্তার ঘটেছে এবং এই ব্যবস্থার দ্বারাই অদূর ভবিষ্যতে কার্যকরী জনবসতি গড়ে তোলার সম্ভাবনা রয়েছে, বিশেষ করে রাশিয়ায়।

Pokshishevski-র মতে মানুষ তার কারিগরী বিদ্যার উন্নতি ঘটিয়ে জলের পুনবণ্টন ও জলধারার নিয়ন্ত্রণ করে চলেছে। একটা সময় হয়তো আসবে যখন আমরা বর্তমান দিনের মরুভূমি ও ক্রান্তীয় বনভূমি অঞ্চলগুলোকে আগামী দিনের পৃথিবীর প্রধান শস্যভাণ্ডার হিসেবে দেখতে পাব (Quoted from Chandna, 1972)।

আর্দ্র ক্রান্তীয় অঞ্চল পূর্বোক্ত জনবিরল অঞ্চলগুলো থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। পরিবেশের হেরফেরের দরুন ক্রান্তীয় অঞ্চলের কোন কোন স্থান জনহীন, আবার কোন স্থান ঘনবসতিপূর্ণ। ভবিষ্যতে এই আর্দ্র ক্রান্তীয় অঞ্চল আরো জনবসতিপূর্ণ হয়ে উঠবে, তবে এ ব্যাপারে নির্দিষ্ট সময় বলা সম্ভব নয়। (Kellogg-এর মতে উপযুক্ত ভূমি ব্যবহারের দ্বারা আর্দ্র ক্রান্তীয় অঞ্চলের 20 শতাংশ জমি চাষযোগ্য করা যাবে ও ভবিষ্যতে তা জনবসিত বিস্তারে সাহায্য করবে।

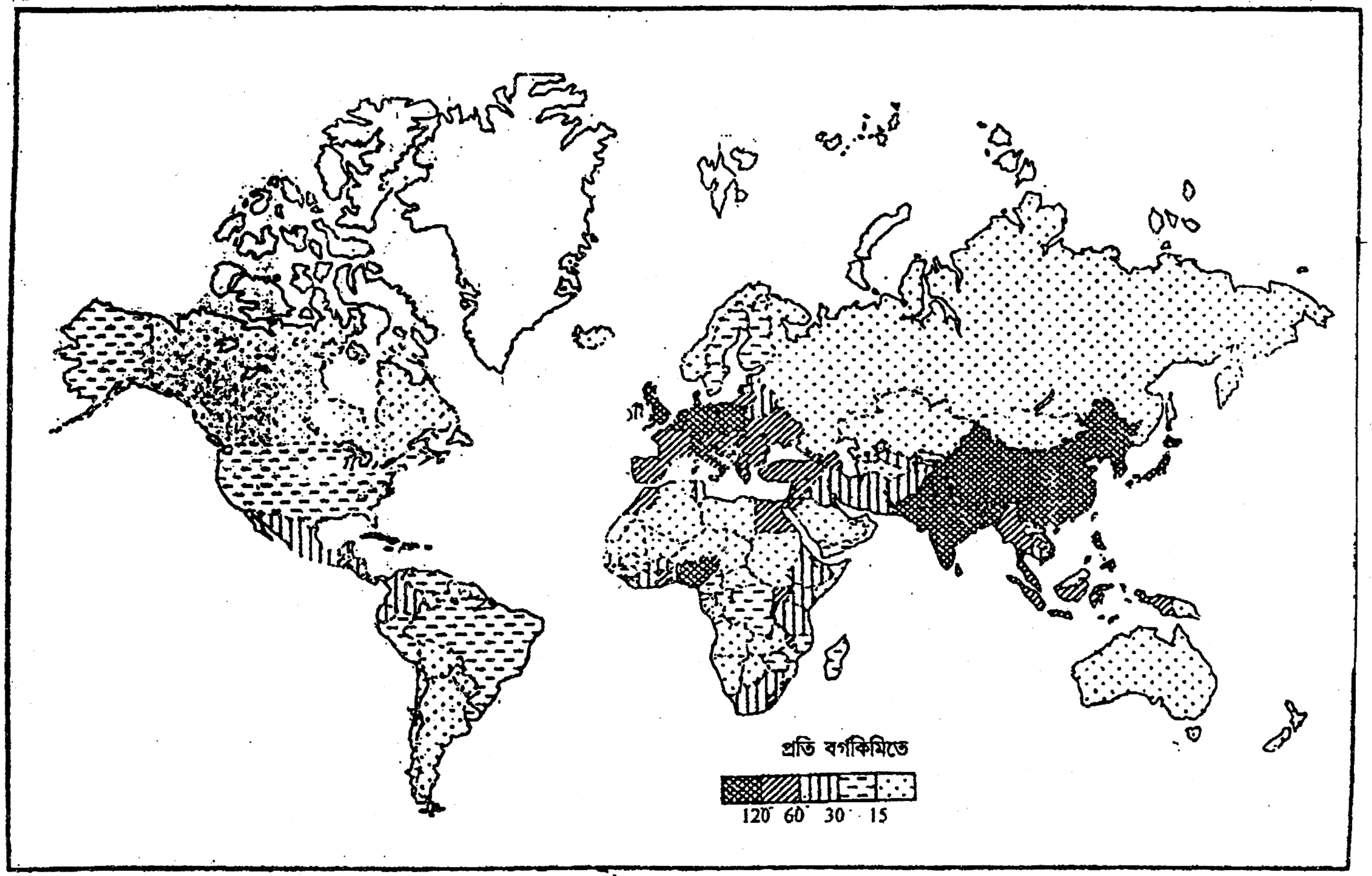

চিত্র 2.7 : পৃথিবীর জনসংখ্যার বণ্টন

বিশেষ আলোচনা

জনহীন অঞ্চলে বসতি বিস্তারের পথে বাধাসমূহ

(Hindrances for Expansion of Settlement in Non-Ecumene Regions)

পৃথিবীর কিছু কিছু স্থান রয়ে গেছে যেখানে জনবসতি নেই বললেই হয়। এখন দেখা যাক কি কি কারণে পৃথিবীর কয়েকটি অঞ্চল জনহীন রয়ে গেছে।

অত্যাধিক শৈত্য : অত্যাধিক শৈত্য মানুষের বসবাসের পক্ষে প্রধান অন্তরায়। মেরু অঞ্চলে শীত এত তীব্র হয় যে মানুষের চেতনা লোপ পায়। দীর্ঘস্থায়ী প্রচণ্ড শীত মানুষের স্নায়ুর ওপর বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। দক্ষিণ মেরুতে কিছু বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান কেন্দ্র ছাড়া বসতি নেই বললেই চলে। প্রাণী বলতে পেঙ্গুইন। উত্তর মেরুর তুন্দ্রাতে এস্কিমোদের দেখা মেলে। তৈগ্য (সরলবর্গীয় অরণ্য) অঞ্চলে 'লগ হাউস' দেখা যায়। শীতের সময় কাঠ বরফ চাপা পড়ে যায়। এখানে ফসল ফলানো কষ্টকর। স্বভাবতই লোকবসতি এখানে খুব অল্প।

উচ্চতা : পার্বত্য অঞ্চলে সমভূমি ও এমনকি মৃদু ছালেও জমির অভাব, অগভীর মাটি ও শীতল আবহাওয়ার জন্য চাষবাস বাধা পায়। এজন্য এখানে বসতি গড়ে ওঠে না। 4,000 মিটারের বেশি উচ্চতায় হাল্কা বায়ুমণ্ডলের জন্য মানুষের শ্বাস নিতে কষ্ট হয় আর কাজকর্ম করতে অবসন্নতা আসে। মালভূমির যে সব জায়গায় চাষবাস সম্ভব হয় ও যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে ওঠে সেখানেই জনবসতি দেখা যায়। পার্বত্য এলাকার নদী উপত্যকাতে সামান্য জনবসতি গড়ে উঠতে দেখা যায়।

উষ্ণতা : নিরক্ষীয় জলবায়ুর আমাজন অববাহিকা, জাইর অববাহিকা ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অংশবিশেষের সারা বছর উষ্ণতা, বৃষ্টিপাত ও আর্দ্রতা বেশি থাকে। এই ধরনের জলবায়ু অধিবাসীদের দুর্বল করে দেয়। এরূপ জলবায়ুতে নানা রকম রোগ হয়। এখানকার নদী উপত্যকা ও ইদানীংকালে তৈরি করা পথের ধারে কিছু কিছু জনবসতি দেখা যায়।

খরা : ক্রান্তীয় মরুভূমিগুলোতে উষ্ণতা খুব বেশি। অত্যাধিক উষ্ণতা বিশেষ করে দীর্ঘকালীন রুক্ষতা, বৃষ্টিহীনতা ও বছরের পর বছর খরা মরুভূমিতে জনবসতির প্রধান অন্তারয়। এখানকার মরুদ্যানগুলোতে জনবসতি গড়ে উঠেছে। অন্যত্র যাযাবররা বাস করেন, পশুপালন তাদের উপজীবিকা। যেখানে যেখানে ঘাস জন্মায়, সে সব অঞ্চলে ঐ যাযাবর গোষ্ঠীর লোকেরা তাদের পশুর দল নিয়ে ঘুরে বেড়ান। ঘাস ও গুল্মাদির লভ্যতার সময়সীমা অনুযায়ী এদের বসতির সময়সীমা নির্ধারিত হয়। মাঝারি অক্ষাংশের মরুভূমিগুলোতে (যথা -- গোবি মরুভূমি) শৈত্য ও জলের অভাব জনবসতি বিস্তারের পক্ষে বাধাস্বরূপ। কোন কোন মরুভূমির খনিজ সম্পদের আকর্ষণে ও খনিজ দ্রব্য উত্তোলনের ব্যাপারে মরুভূমিতে জনবসতি গড়ে ওঠে ঠিকই, কিন্তু খনিজ সম্পদ নিঃশেষ হবার সাথে সাথে ঐসব জনবসতি স্থায়িত্ব হারায়।

অনুর্বর মাটি : অনুকূল জলবায়ু থাকা সত্ত্বেও যেসব অঞ্চলের মাটি অনুর্বর ও স্থানীয় আদিবাসীদের প্রচলিত ধ্যান-ধারণা অনুযায়ী ফসল উৎপাদন সম্ভব হয় না সে সব অঞ্চলে জনবসতি গড়ে ওঠে না। মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, থাইল্যাণ্ড ও বাংলাদেশের কোন কোন স্থানের মাটিতে এত বেশি গন্ধক (Sulpphur) থাকে যে সে সব এলাকায় চাষ করা সম্ভব নয়। এইসব অঞ্চলে কৃষিকাজ যেমন সম্ভব নয় তেমনি জনবসিতও গড়ে ওঠেনে।

দুর্গমতা (Inaccessibility) : জনবসতির ঘনত্ব পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থার ওপর নির্ভরশীল। সুষ্ঠু প্রবহন ব্যবস্থা ও আধুনিক যোগাযোগ সমৃধ কোন অঞ্চলে অন্যান্য অসুবিধে থাকলেও ভাল জনবসতি গড়ে ওঠে। বাজারের সাথে যোগাযোগ ব্যবস্থার অবাব হেতু যেমন কোন অতি উর্বর জমিতে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে চাষ করা হয় না, তেমনি অনুরূপ অবস্থানের উর্বর মৃত্তিকাযুক্ত অঞ্চলে তেমন জনবসিত গড়ে ওঠে না।

পূর্বের আলোচনার ভিত্তিতে এবার আমরা মহাদেশ ভিত্তিক জনঘনত্ব নিয়ে আলোচনা করব।

মহাদেশভিত্তিক জনসংখ্যা ও ঘনত্ব (Distribution and Density of Population : Continent-wise)

এশিয়া (Asia)

এশিয়ার জনঘনত্বের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল যে পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার 60 শতাংশের বেশি লোক এখানে বাস করেন। পৃথিবীর জনঘনত্ব যেখানে প্রতি বর্গমাইলে 120 জন, এশিয়ায় সেখানে 2,495 জন। তবে এখানকার জনবণ্টনে খুব হেরফের লক্ষ্য করা যায়। মঙ্গোলিয়াতে প্রতি বর্গমালে 4 জন, বাংলাদেশে 2,401 জন, সিঙ্গাপুরে 17,320 জন বাস করেন। আর একটি বৈশিষ্ট্য হল এখানে জনাকীর্ণ অঞ্চলের চেয়ে জনহীন অঞ্চল আয়তনে বড়। এশিয়ার বিশাল মধ্যভাগ হয় শুষ্ক, নয় শীতল, নয় বন্ধুর। স্বাভাবিক কারণেই এই ধরনের পরিবেশে বসতি গড়ে ওঠা খুব মুশকিল। এবার এশিয়ার অঞ্চলভিত্তিক জনবণ্টন (মোট জনসংখ্যা 3,720 মিলিয়ন, 2001) নিয়ে আলোচনা করা হল।

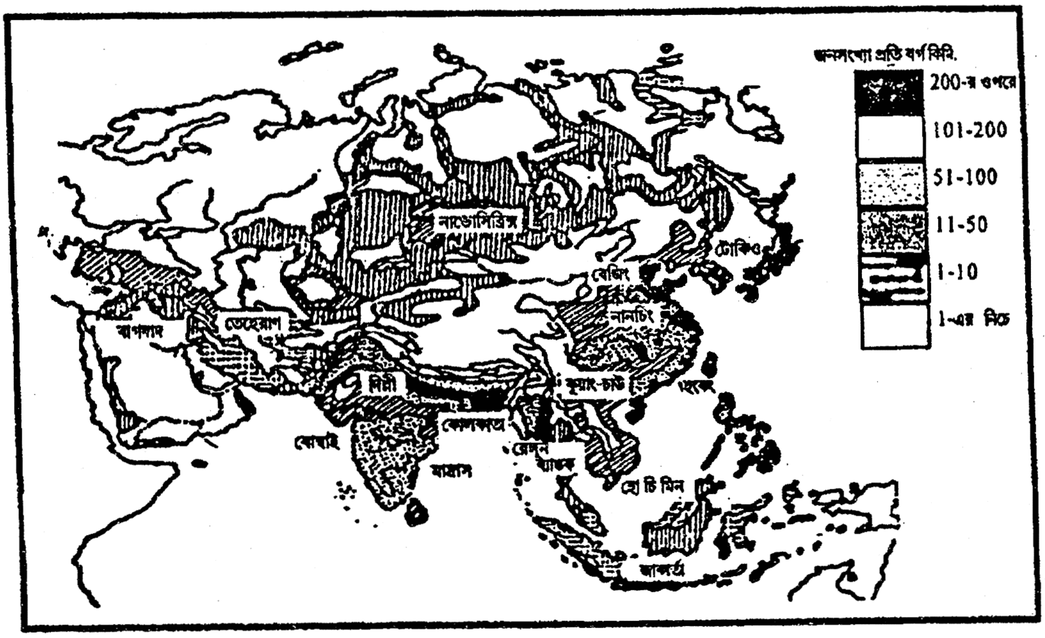

চিত্র 2.8 : এশিয়ার জনঘনত্ব (প্রতি বর্গকিমি.)

দক্ষিণ-পশ্চিম এশিয়া (South-West Asia)

এই অঞ্চলের মধ্যে রয়েছে ইরান, ইরাক, তুরস্ক, সিরিয়া, ইয়েমেন, সৌদি আরব, ওমান, সংযুক্ত আরব আমিরশাহী ইত্যাদি দেশ। এখানকার জনঘনত্ব প্রতি বর্গমাইলে 106 জন। প্রধানত বালিয়াড়ি, লবণাক্ত হ্রদ, লাভা গঠিত অঞ্চল, ক্ষয়জাত পর্বত ও উদ্ভিদের অভাব এখানকার বিরাট এলাকাকে জনহীন করে রেখেছে।

অন্যদিকে, তুরস্ক, উপকূলের সেচপ্রধান বদ্বীপ বা পার্বত্য নদীর জলে পুষ্ট মরুদ্যানে প্রতি বর্গমাইলে কয়েকশ লোক বাস করেন। কিছু কিছু কৃষি এলাকায় প্রতি বর্গমাইলে প্রায় 221 জন লোক বাস করেন (Cressey, 1963)।

সারণি : দক্ষিণ-পশ্চিম এশিয়ার জনসংখ্যা ও জনঘনত্ব (2001 সাল)

দেশ	জনসংখ্যা (মিলিয়ন)	জনঘনত্ব (প্রতি বর্গমাইলে)
বাহরিন	0.7	2,688
সাইপ্রাস	0.9	247
জর্জিয়া	5.5	203
ইরাক	23.6	139
ইস্রায়েল	6.4	791
জর্ডন	5.2	150
কুয়েত	2.3	297
লেবানন	4.3	1,061
ওমান	2.4	29
প্যালেস্টাইন	3.3	1,395
কোয়াতার	0.6	139
সৌদি আরব	21.1	25
সিরিয়া	17.1	231
ইউ. এ. ই.	3.3	103
ইয়েমেন	18.0	88
তুরস্ক	66.3	221

দক্ষিণ-পশ্চিম এশিয়ার তিনটি উপকূল অঞ্চলে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয় : (i) পূর্ব ভূমধ্যসাগরের দক্ষিণ-পূর্ব উপকূল অঞ্চল, (ii) কৃষ্ণসাগরের দক্ষিণ-পূর্ব উপকূল, (iii) কাস্পিয়ান সাগরের লাগোয়া এলবুর্জ (Elburz) পর্বতের পাদদেশ অঞ্চল। এখানকার গ্রামীণ জনঘনত্ব মোটামুটিভাবে ভালো। আবার বর্ষার জলে পুষ্ট উর্বর কৃষি এলাকাগুলোর মধ্যে রয়েছে ইয়েমেনের উচ্চাঞ্চল বা তুরস্কের আর্দ্র ভূ-ভাগ।

দক্ষিণ-পশ্চিম এশিয়ায় জলসেচের সুবিধের ওপর নির্ভর করে জনবসতি গড়ে উঠেছে। প্রায় প্রতিটি প্রধান নদীর নিম্ন গতিপথে আর পর্বতের পাদদেশে পলিসঞ্চিত ত্রিকোণাকার ভূখণ্ডে লাইনবন্দী বসতির দেখা মেলে। আরবে যেখানে ঝর্না বা অন্য কোন জলের উৎসের দেখা পাওয়া যায়, সেখানেই বসতির দেখা মেলে। ইরান বা আপগানিস্থানের অধিকাংশ গ্রাম-ই বরফে ঢাকা পর্বতকে আশ্রয় করে গড়ে উঠেছে। এখানে বসতি গড়ে ওঠার পেছনে ভূপ্রকৃতির প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। কিছু কিছু ক্ষেত্র ছাড়া পর্বতের ঢালু অংশ জনহীন।

দক্ষিণ-পশ্চিম এশিয়ায় খনিজ তেল বা খনিজ সম্পদকে কেন্দ্র করে বসতি স্থায়ী রূপ পেয়েছে। মহাদেশের অন্যান্য শহরের মতো এখানকার শহরগুলোতেও দারুনভাবে জনসংখ্যা বেড়েছে, বিশেষ করে খনিজ তেলকে কেন্দ্র করে। পাঁচ লাখ লোকসংখ্যার বেশি শহরগুলো হলো কনস্টান্টিনোপল (ইস্তানবুল), আঙ্কারা, বেইরুট, দামাস্কাস, বাগদাদ ও তেহরান। 1 লাখ থেকে 5 লাখের মধ্যে রয়েছে কুড়িটির বেশি শহর। লেবানন-ই একমাত্র সমুদ্রের ধারে গড়ে ওঠা রাজধানী শহর। জেরুজালেম ও মক্কা ধর্মীয় শহর। ইরান ও তুরস্কে 50,000-র বেশি লোকসংখ্যার বেশ কয়েকটি বড় শহর রয়েছে।

দক্ষিণ-পশ্চিম এশিয়ার মোট জনসংখ্যার 65 ভাগ লোক চাষবাস করেন, 8 ভাগ যাযাবর, 12 ভাগ শহরবাসী, 1 ভাগ আশ্রয়হীন প্যালেস্টাইনীয়, বাকি 14 ভাগ গ্রামবাসী।

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া (South-East Asia)

থাইল্যাণ্ড, সুমাত্রা, জাভা, বোর্নিও, ফিলিপাইনস্, কাম্পুচিয়া, ভিয়েতনাম ইত্যাদি দেশ নিয়ে হল এই অঞ্চল। এখানেও জনসংখ্যা অসমানভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। কয়েকটি পলিগঠিত সমভূমিতে বেশ ঘনবসতি রয়েছে। এর বিপরীতে উঁচু পার্বত্য এলাকায় লোকবসতি নেই বললেই চলে। এখানকার গড় জনঘনত্ব প্রতি বর্গমাইলে 299। উত্তর ভিয়েতনামের হং (লাল) নদীর Red River বদ্বীপ, দক্ষিণ ভিয়েতনামের কেমং নিম্নভূমি, থাইল্যাণ্ডের মেনাম ও মায়ানমারের (ব্রহ্মদেশের) ইরাবতী বদ্বীপ ঘনবসতি এলাকা। দক্ষিণ সেলেবিয়া, সুমাত্রা উপকূলের কিছু অংশ, ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জের কিছু কিছু স্থানের ঘন বসতি চোখে পড়ে, যেমন জাভা ও বালি। এখানকার গড় ঘনত্ব হল প্রতি বর্গমাইলে 200 জন, কোথাও আবার 2,800 জন। কৃষিজমির উর্বরতার হেরফের জন বণ্টনে পার্থক্য ঘটিয়েছে। এখানকার 88 শতাংশ লোক হলেন কৃষিজীবী ও 12 শতাংশ শহরবাসী (Cressey, 1963)

সারণি : জনসংখ্যা ও জনঘনত্ব 2001 সাল : দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া

দেশ	জনসংখ্যা (মিলিয়ন)	জনঘনত্ব (প্রতি বর্গমাইল)
ব্রুনি	0.3	156
কাম্বোডিয়া	13.1	187
ইস্ট তাইমোর	0.8	134
ইন্দোনেশিয়া	206.1	280
ল্যাওস	5.4	59
মাসয়েশিয়া	22.7	178
মায়ানমার	47.8	183
ফিলিপাইনস্	77.2	666
সিঙ্গাপুর	4.1	17,320
থাইল্যাণ্ড	62.4	315
ভিয়েতনাম	78.7	623

অঞ্চলটির সবকটি মহানগরই বলতে গেলে সমুদ্রবন্দর। ব্যাংকক ছাড়া সব মহানগরগুলোতে বিদেশী ছাপ দেখা যায়। এই সমস্ত নগরগুলোর জনসংখ্যার একটা বড় অংশ হলেন চিনাভাষী।

দক্ষিণ এশিয়া (South Asia)

ভারত, পাকিস্তান ও বাংলাদেশ নিয়ে হল এই অংশ। এখানে 1,313 মিলিয়নেরও বেশি লোক বাস করেন। মোট জমির আয়তন ধরলে গড় জলঘনত্ব দাঁড়ায় প্রতি বর্গমাইলের 362 জন। আক কৃষিজমির হিসেবে ধরলে এই ঘনত্ব (গ্রাম্য) কোথাও 300, আবার কোথাও 4,000। এখানকার অর্ধেক লোক উত্তরের সমভূমিতে বাস করেন, যা আয়তনে দক্ষিণ এশিয়ার 20 শতাংশ স্থান জুড়ে আছে। Clard (1971) *Population Geography and the Devel-*

oping Countries-এ লিখেছেন, "Overall population distribution in South Asia are high" ...তিনি আরও লিখেছেন যে, "In South Asia POpulation distribution in nearly as irregular as in South-West Asia or South-East Asia or East Asia." ...কারণ অঞ্চলটি কৃষিপ্রধান। তাছাড়া, বহুকাল ধরে খালের সাহায্যে জলসেচের ফলে প্রচুর ফসল ফলে। নিম্ন গাঙ্গেয় সমভূমিতে প্রধান ফকল হল ধান। এছাড়া উপকূলে প্রচুর ধান জন্মায়। সিন্ধু অববাহিকায় অবস্থিত মরুভূমি ও নিম্ন গাঙ্গেয় সমভূমিতে অবস্থিত সুন্দরবন অঞ্চলে লোকসংখ্যা খুব কম। সিন্ধুর নিম্ন উপত্যকা অঞ্চলের মাটি উৎকৃষ্ট হলেও এখানকার জলবায়ু খুব শুকনো। অবশ্য কিছু কিছু জায়গায় জলসেচ করা হয়। যেমন রাজস্থানের মরুভূমিতে জলসেত করে তা চাষযোগ্য করে তোলা হয়েছে। মরুভূমির অন্যান্য স্থানে খনিজ পদার্থ বা জলের উৎসকে কেন্দ্র করে ছোট ছোট গ্রাম গড়ে উঠেছে।

সারণি : জনসংখ্যা ও জনঘনত্ব (প্রতি বর্গমাইলে) : দক্ষিণ এশিয়া (2001 সাল)

দেশ	জনসংখ্যা (মিলিয়ন)	জনঘনত্ব (প্রতি বর্গমাইলে)
আফগানিস্থান	26.8	106
বাংলাদেশ	133.5	2,401
ভুটান	0.9	50
ভারত	1,033.0	814
ইরান	66.1	108
মালদ্বীপ	0.3	2,495
নেপাল	23.5	413
পাকিস্তান	145.0	472
শ্রীলঙ্কা	19.5	771

এখানকার হিমালয় পর্বতমালার অনেক স্থানই বসতি বিস্তারের পক্ষে প্রতিকূল। খনিজ সম্পদ বা বনজ সম্পদকে কেন্দ্র করে কয়েকটি ছোট ছোট শহর গড়ে উঠেছে। তবে হিমালয়ের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যকে কেন্দ্র করে অনেক শৈলাবাস গড়ে উঠেছে, যেমন দার্জিলিং, কালিম্পং, উটি, নৈনিতাল ইত্যাদি।

পূর্ব এশিয়া (East Asia)

এর মধ্যে আছে জাপান, চিন ও অন্যান্য দেশ। পূর্ব এশিয়ার গড় ঘনত্ব হল প্রতি বর্গমাইলে 331 জন। জাপানের জনবণ্টন ভূ-প্রকৃতির ওপর নির্ভরশীল। যেখানেই সমতল জায়গা ও উর্বর মাটি পাওয়া যায়, সেখানেই জনবসতি গড়ে উঠেছে, তা সে পর্বতময় হোক বা সমতলভূমি হোক বা সমতলভূমি হোক। পর্বত সেখানেই বসতি বিস্তারে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাই এক গ্রাম থেকে অপর গ্রাম বিচ্ছিন্ন অবস্থায় রয়েছে। সেজন্য অধিকাংশ জাপানিরাই সমুদ্রোপকূলে বসবাস করতে চান। জাপানে 400-রও বেশি স্থান আছে, যা জাপানের মোট আয়তনের এক শতাংশ জায়গা জুড়ে থাকলেও সেখানে প্রতি বর্গমাইলে 10,000-এর বেশি লোক বাস করেন। এর বিপরীতে (শহরাঞ্চল বাদে) রয়েছে এখানকার এক-চতুর্থাংশ এলাকা, যার জনঘনত্ব প্রতি বর্গমাইলে 4 জন। এক কারণ হল এখানকার খাড়া ঢালু ভূমিভাগ। জাপানে 4টি মহানগর (Metropolis) রয়েছে : টোকিও, ইয়াকোহামা, ওসাকা-কোবে ও কিয়োটো।

সারণি : জনসংখ্যা ও জনঘনত্ব (প্রতি বর্গমাইলে) : পূর্ব এশিয়া (2001 সাল)

দেশ	জনসংখ্যা (মিলিয়ন)	জনঘনত্ব (প্রতি বর্গমাইলে)
চিন	1273.3	344
হংকং	6.9	16,743
ম্যাকাও	0.4	56,721
জাপান	127.1	872
উত্তর কোরিয়া	22.0	472
দক্ষিণ কোরিয়া	48.8	1,274
মঙ্গোলিয়া	2.4	4
তাইওয়ান	22.5	1,608

এবার চিনের কথায় আসা যাক। এখানকার অধিকাংশ লোকই গ্রামে বাস করেন, কারণ চাষবাসই এখানকার প্রধান জীবিকা। দেশটি অয়তনে বড় 3,696,100 বর্গমাইল, আবার এখানকার জনসংখ্যাও প্রচুর (1,273.3 মিলিয়ন)। জনসংখ্যার দিক দিয়ে চিন পৃথিবীতে প্রথম স্থানাধিকারী হলেও দেশের কম অংশই বসবাসের পক্ষে উপযুক্ত। চিনের অনেকখানি জায়গা জুড়ে আছে পর্বত। ক্ষয়ের দরুন এই পার্বত্য এলাকার বহু স্থান চাষবাসের অনুপযুক্ত। চিনের কিছু অংশ আবার সমভূমি।

উত্তর চিন সমভূমি ও বদ্বীপ, দক্ষিণের সোয়েল সমভূমি ও সিকিয়াং অববাহিকার সমভূমি চাষের পক্ষে খুবই অনুকূল বলে চিনের প্রায় 85 শতাংশ লোক এখানে বাস করেন। ফলে এইসব স্থানে জনঘনত্ব সবচেয়ে বেশি। উত্তরের সমভূমির ইয়াংসি অববাহিকা, বদ্বীপ এবং আরও কয়েকটি অনুকূল স্থানে জনঘনত্ব প্রতি বর্গমাইলে 800 থেকে 1,000 জন। এর ঠিক বিপরীত চিত্রে রয়েছে মঙ্গোলিয়া (জনঘনত্ব 4 জন)। তিব্বত পর্বতঘেরা মালভূমি। সেখানকার ভূপ্রকৃতি বন্ধুর ও জলবায়ু শুষ্ক। তিব্বতে যোগাযোগ ব্যবস্থা, শিল্প, সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিকাশ কম। জনবলহীন ও সামরিক শক্তিহীন দেশটিকে চিন তার নিজের অধিকারে রেখেছে। কম লোকসংখ্যার দরুন মঙ্গোলিয়াকে চিন আর্থিক দিক থেকে শোষণ করে।

কোরিয়া হল ভৌগোলিক বৈপরিত্যের দেশ। উত্তর কোরিয়ার এলাকা বেশি, লোকসংখ্যা কম। এটি আবার খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ। এখানে প্রচুর জলবিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়। দক্ষিণ কোরিয়ার এলাকা কম, কিন্তু লোকসংখ্যা বেশি। দেশটি কৃষিসমৃদ্ধ। এখানকার বেশিরভাগ লোক নদী উপত্যকা ও উপকূলের সমভূমিতে বাস করেন। যদিও চাষযোগ্য নিচু জমি খুব কম (মোট এলাকার মাত্র 10 ভাগ) তবুও নদী অববাহিকা--বিশেষ করে টেডঙ (Taedong) ও ছোট ছোট উপত্যকা--থেকে প্রচুর ফসল পাওয়া যায়। এখানকার প্রায় 75 শতাংশ লোক কৃষিজীবী। কিন্তু যোগাযোগের দিক দিয়ে সবচেয়ে সুবিধাজনক স্থানে লোকজন বেশি বাস করেন। এশিয়ার সবচেয়ে উত্তরের দেশটি হল রাশিয়া (C.I.S.)। এখানকার গড় ঘনত্ব প্রতি বর্গমাইলে 22 জন। কিন্তু এই ঘনত্বেরও হেরফের আছে। কারণ দেশটি আয়তনে বড় বলে এখানে বিভিন্ন ধরনেক্র জলবায়ু বিরাজ করে। সবচেয়ে উত্তরে রয়েছে তুন্দ্রা অঞ্চল। আমরা আগেই জেনেছি যে এখানকার বেশিরভাগ প্রচণ্ড ঠাণ্ডা ও বছরের বেশিরভাগ সময় ভূমিভাগ ভরফে ঢাকা থাকায় এখানে লোকজন প্রায় থাকেই না।

সারণি : রাশিয়ার জনসংখ্যা (মিলিয়ন) ও জনঘনত্ব (প্রতি বর্গমাইলে) (2001 সাল)

দেশ	জনসংখ্যা (মিলিয়ন), 2001 সাল	জনঘনত্ব (প্রতি বর্গমাইলে)
কাজাখস্তান	14.8	14
কিরখিজস্তান	5.0	65
তাজাকিস্তান	6.2	112
তুর্কমেনিস্তান	5.5	29
উজবেকিস্তান	25.1	145
আজারবাইজান	8.1	243
লাটভিয়া	2.4	95
লিথুনিয়া	3.7	147
এস্টোনিয়া	1.4	78
রাশিয়া	144.4	22
মলডোভিয়া	4.3	328
ইউক্রেন	49.1	211
আর্মেনিয়া	3.8	330

বেশির ভাগ বাসিন্দা শিকারের ওপর নির্ভরশীল। বেঁচে থাকার তাগিদে এখানকার বাসিন্দাদের সব সময়ই বিরুধ প্রকৃতির সঙ্গে সংগ্রাম করতে হচ্ছে। স্বভাবতই, এই অঞ্চলের গড় জনঘনত্ব প্রতি বর্গমাইলে 1 জনেরও কম। তুন্দ্রার দক্ষিণে রয়েছে অব-সুমেরু অঞ্চল বা সরলবর্গীয় বনভূমি অঞ্চল। প্রতিকূল জলবায়ু ও বড় বড় শহরের সঙ্গে যোগাযোগের অসুবিদের জন্য এই অঞ্চল মানুষের বসবাসের পক্ষে লোভনীয় নয়। একানকার গড় ঘনত্ব প্রতি বর্গমাইলে 2 জন। এখানে ভারখয়নস্ক (Verkhoynask), ইরকুটস্ক (Irkutsk), নারিলক্স, উদ ইত্যাদি শহর রয়েছে। বৈকাল হ্রদের পূর্বে ঘনত্ব বেশি থাকলেও কাস্পিয়ান সাগরের কাছে ঘনত্ব মাত্র 4 জন। শুষ্কপ্রধান এই অঞ্চলের মুখ্য উপজীবিকা হল পশুচারণ। এখানে কয়েকটি পুরনো শহর রয়েছে : সমরখন্দ,তাসখন্দ, নোভোসিরিবস্ক, ওমস্ক, টমস্ক (Tomsk)। ব্লাডিভস্টক সামুদ্রিক বন্দর।

ইউরোপ (Europe)

জনসংখ্যার দিক থেকে ইউরোপের (727 মিলিয়ন, 2001) স্থান এশিয়া (3,720 মিলিয়ন) ও আফ্রিকার (818 মিলিয়ন) পরেই। ইউরোপের জনবণ্টন সম্পর্কে সবচেয়ে বড় কথা হল এই যে এখানকার দুই-তৃতীয়াংশের বেশি লোক একটা জায়াগায় এসে জড়ো হয়েছেন (চিত্র 2.9)। স্বভাবতই ঐ অঞ্চলের জনঘনত্ব বেশি। ইউরোপের জনবণ্টন প্রধানত পরিবেশ ও ঐ মহাদেশের সংস্কৃকিপ্তুতর ওপর নির্ভশীল।

এখানকার পরিবেশগত উপাদান হচ্ছে জলবায়ু, ভূ-প্রকৃতি, মাটির উর্বরতা ও খনিজ সম্পদ, বিশেষ করে কয়লার বণ্টন। অন্যান্য এলাকার মতো এখানকার বদ্বীপগুলোতে লোকবসতি ঘন। তবে চিন বা ভারতের মতো অত ঘন নয়। বড় রকমের জনসমাবেশ শিল্পাঞ্চলে দেখা যায়। বৈদেশিক বাণিজ্যের ওপর নির্ভরশীল কয়েকটি শহরের উপকূলীয় অবস্থান চোখে পড়ার মতো।

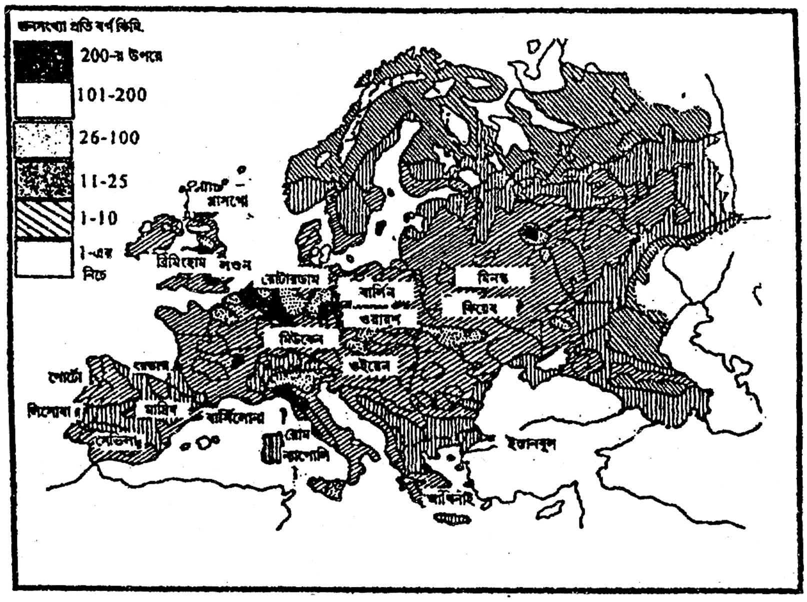

চিত্র 2.9 : ইউরোপের জনঘনত্ব (প্রতি বর্গকিমি.)

ইউরোপের জনবসতির আর একটি বৈশিষ্ট্য হল যে এখানকার প্রায় 80 শতাংশ অধিবাসী শহরের বাসিন্দা। বাকিরা হলেন কৃষিজিবী। রেলপথ ও সড়কপথ দিয়ে বসতিগুলো একে অপরের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করছে।

ইউরোপের ইংলিশ চ্যানেল ও উত্তর সাগর উপকূলের দেশগুলোতে জনঘনত্ব বেশি, কারণ এটি শিল্পসমৃদ্ধ অঞ্চল। এখানেই ফ্রান্স, জার্মানি ও বেলজিয়ামের মতো বড় বড় দেশ রয়েছে। ফ্রান্স ও জার্মানির কয়লাখনি এলাকায় জনঘনত্ব খুব বেশি। Taylor-এর মতে ইউরোপের জনঘনত্ব সোয়ানসিয়া থেকে সাইলেসিয়া পর্যন্ত কয়াখনি অঞ্চলে লক্ষ্য করা যায়। বেলজিয়ামে কয়লাখনিগুলো দক্ষিণ থেকে উত্তরদিকে সরে যাবার ফলে জনবসতিও উত্তরদিকে সরে গিয়েছে। কেমপেনল্যাণ্ডে নতুন কয়লাখনি আবিষ্কারের ফলে সেখানে লোকসমাগম হয়েছে। এখানকার পতিত জমি পুনরুদ্ধার ও জলসেচের সম্প্রসারণের দরুন কিছু এলাকা বসতিযোগ্য হয়েছে। এইসব অঞ্চলের জনঘনত্ব প্রতি বর্গমাইলে 500 জনের বেশি।

সারণি : উত্তর ইউরোপ : জনসংখ্যা (মিলিয়ন) ও জনঘনত্ব (প্রতি বর্গমাইলে)

দেশ	জনসংখ্যা	জনঘনত্ব
ডেনমার্ক	54	322
ফিনল্যাণ্ড	52	40
আইসল্যাণ্ড	0.3	7
আয়ারল্যাণ্ড	3.8	142
নরওয়ে	4.5	36
সুইডেন	8.9	51
যুক্তরাজ্য	60.0	635

অন্য একটি ঘনবসতি অঞ্চল হল জার্মানির রাইন উপত্যকা। Taylor-এর মতে রাইন ও পো (Po) উপত্যকার 180 মিটারের কম উচ্চতায় এবং বোহেমিয়া উচ্চভূমির প্রায় 400 মিটার ঢালু অংশের ইউরোপের সবচেয়ে বেশি জনঘনত্ব লক্ষ্য করা যায়। স্পেন ও বুলগেরিয়ায় 900 মিটারেরও বেশি উচ্চতায় অনেক বসতি দেখা যায়। পোল্যাণ্ডের অনেক জলামজি পুনরুধার করা হয়েছে। পোল্যাণ্ডের অনেক লোক কৃষিজীবী।

সারণি : পশ্চিম-ইউরোপ : জনসংখ্যা ও জনঘনত্ব (2001 সাল) (প্রতি বর্গমাইলে)

দেশ	জনসংখ্যা (মিলিয়ন)	জনঘনত্ব (প্রতি বর্গমাইলে)
অস্ট্রিয়া	8.1	251
বেলজিয়াম	10.3	872
ফ্রান্স	959.2	278
জার্মানি	82.2	597
লিটেনস্টিন	0.03	534
লাক্রামবার্গ	0.4	446
মোনার্কো	0.03	45,333
নেদারল্যাণ্ড	16.0	1,018
সুইজারল্যাণ্ড	7.2	453

এই মহাদেশের ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে মধ্য ইউরোপের মতো অত বেশি জনসমাবেশ দেখা যায় না। কারণ এটি প্রধানত পার্বত্য এলাকা। ফ্রান্সের সবচেয়ে জনবিরল এলাকা হল বেস (Base) আলপস্ (প্রতি বর্গমাইলে 50 জন) ও হাউটি (Houti) আল্পস্ (60 জন)।

বলতে গেলে, গোটা নরওয়েই পার্বত্য এলাকা। এখানকার জনঘনত্ব প্রতি বর্গমাইলে 36 জন। এই দেশটিতে চাষের জমি প্রায় 400 বর্গমাইলের মত। এগুলো আবার ফিয়র্ডের উৎস অঞ্চলে কিংবা পশ্চিম উপকূলের আশেপাশে ছোট ছোট অংশে বা দক্ষিণ-পূর্ব পার্বত্য অপত্যকায় দেখা যায়। এই সব অঞ্চলেই নরওয়ের বেশির ভাগ লোক বাস করেন। গ্রানাইট পাথর থেকে সৃষ্ট অনুর্বর মাটি, প্রচুর বৃষ্টিপাত, অসমতল জমি ও বহুলোকের দেশত্যাগের ফলে নরওয়ের জনসংখ্যা কমই রয়ে গেছে।

ফিনল্যাণ্ডের বেশিরভাগ জায়গাতেই বসতি খুব কম। দেশটি প্রধানত অরণ্যময় হওয়ায় এখানকার বেশিরভাগ অধিবাসীদের পেশা হলো কাষ্ঠাহরণ।

গ্রেট ব্রিটেনের শতকরা 80 ভাগ লোক শহরে বসবাস করেন। এখানকার বেশিরবাগ বসতি কয়লাখনিকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। মধ্য ইংল্যাণ্ডে পেনাইন পর্বতের তিনদিকে কয়লাখনিকে কেন্দ্র করে তিনটি ঘনবসতি অঞ্চল গড়ে উঠেছে। যেমন পেনাউনের পশ্চিমে ল্যাঙ্কাশায়ারকে কেন্দ্র করে ম্যাঞ্চেষ্টার ও লিভারপুল শহর, আর পেনাইনের পূর্বে ইয়র্কশায়ারকে কেন্দ্র করে লিডস্, বেডপোর্ড, শেফিল্ড শহর গড়ে উঠেছে। উত্তর-পূর্ব ইংল্যাণ্ডে কয়লা ও লোহা আকরিকের সাহায্যে নর্দাম্বালল্যাণ্ড ও ডারহামে লোহা-ইস্পাত ও অন্যান্য শিল্প গড়ে উঠেছে। এইসব শিল্পের সমাবেশ এখানে একটি ঘনবসতি গড়ে উঠতে সাহায্য করেছে। দক্ষিণ-পূর্ব ইংল্যাণ্ডে টেমস্ নদীর তীরে ব্রিটেনের রাজধানী লণ্ডনকে কেন্দ্র করে দেশের সবচেয়ে জনবহুল এলাকা গড়ে উঠেছে। ব্যবসা-বাণিজ্য এই শহরের গুরুত্বকে আরও বাড়িয়েছে। এছাড়া ইংল্যাণ্ডের মধ্যে সমভূমি অঞ্চলে বার্মিংহাম, স্টোক ইত্যাদি শিল্প শহর রয়েছে। স্কটল্যাণ্ডের অনুর্বর

পাহাড়ি এলাকা বলতে গেলে জনমানবহীন। এখানকার জনঘনত্ব প্রতি বর্গমাইলে 12 জন। স্কটল্যান্ডের পশ্চিমদিকের (4 থেকে 40) চেয়ে পূর্বদিকে জনঘনত্ব (75 থেকে 150) অনেক বেশি। স্কটল্যান্ডের মধ্য উপত্যকায় গ্লাসগো ও এডিনবরার কয়লা ও লোহা আকরিককে কেন্দ্র করে একটি জনবসতি অঞ্চল গড়ে উঠেছে। ওয়েলসের রাডনর (Radnor), মন্টগোমারীতে (Montogomery) জনঘনত্ব 50-এর কম কারণ এগুলো পাহাড়ি এলাকা। দক্ষিণ ওয়েলসের কয়লাখনিকে আশ্রয় করে সোয়ানসীতে একটি ঘনবসতি এলাকা বিকাশ লাভ করেছে। দেশের মধ্যভাগ ছাড়া আয়ারল্যান্ডের ঘনত্ব প্রতি বর্গমাইলে 100 থেকে 500 জন।

লোকসংখ্যার দিক দিয়ে পৃথিবীতে সাবেকী রাশিয়ার স্থান আগে ছিল তৃতীয় (273 মিলিয়ন, 1984)। অবশ্য বিরাট দেশের তুলনায় এখানকার লোকসংখ্যা কমই। এখানকার ইউরোপীয় অংশে সমতল ভূমিভাগ, তুলনামূলকভাবে মৃদু জলবায়ু, প্রচুর খনিজ সম্পদ ও উন্নত যোগাযোগের দরুন বেশি লোক বাস করেন (মোট জনসংখ্যার 60 ভাগেরও বেশি)। যখন সমগ্র রাশিয়ার গড় জনঘনত্ব প্রতি বর্গমাইলে 22 জন, তখন ইউরোপীয় রাশিয়ার ঘনত্ব হল 28 জন। এই দেশের প্রায় 50 শতাংশ লোক শহরবাসিন্দা।

সারণি : পূর্ব ইউরোপ : জনসংখ্যা ও জনখনত্ব (2001 সাল)

দেশ	জনসংখ্যা (মিলিয়ন)	জনঘনত্ব (প্রতি বর্গমাইলে)
বেলারাস	10.0	125
বুলগেরিয়া	8.1	190
চেক রিপাবলিক	10.3	337
হাঙ্গেরী	10.0	278
পোল্যাণ্ড	38.6	328
রুমানিয়া	22.4	243
শ্লোভাকিয়া	5.4	286

সারণি : দক্ষিণ ইউরোপ : জনসংখ্যা ও জনঘনত্ব (2001 সাল)

দেশ	জনসংখ্যা (মিলিয়ন)	জনঘনত্ব (প্রতি বর্গমাইলে)
আলবানিয়া	3.4	.310
আরডোরা	0.1	380
বসনিয়া-হার্জগোভিনা	3.4	173
যুগোশ্লাভিয়া	10.7	270
ক্রোশিয়া	4.7	197
গ্রিস	10.9	214
ইতালি	57.8	497
মাসেডোনিয়া	2.0	205
মাল্টা	0.4	3,157
পর্তুগাল	10.0	282
সান মেরিনো	0.03	1,166
শ্লোভেনিয়া	2.0	256
স্পেন	39.8	204

ইউরোপের প্রধান ভূখণ্ডের সবচেয়ে জনবহুল অঞ্চলগুলো হল :

1. রাইন, সোম (Somme), স্রেড (Seheldt) ও নিম্ন সীনের (Lower Seine) উর্বর অববাহিকা ও কয়েকটি কয়লাখনি অঞ্চল।
2. মধ্য জার্মানির অধিকাংশ এলাকা যা দক্ষিণ-পূর্বে চেক রিপাবলিক ও পোল্যাণ্ড পর্যন্ত বিস্তৃত। অঞ্চলটে খনিজ সম্পদে ভরপুর।
3. ইতালির উত্তরাংশে অর্থাৎ উব'র পো-উপত্যকা।
4. উত্তর-পশ্চিম ইউরোপের শিল্পাঞ্চল।

উত্তর আমেরিকা (North America)

এই মহাদেশের মোট জনসংখ্যা হল 316 মিলিয়ন (2001 সাল)। এখানকার প্রায় 85 শতাংশ লোক 100^0 পশ্চিম দ্রাঘিমাংশের পূর্বে বসবাস করেন। এর কারণ হলো এখানকার ইউরোপীয় বাসিন্দারা পূর্বদিক থেকে এসে বসবাস শুরু করেছিলেন। পূর্বদিকে জনসমাগম হবার পর পশ্চিম ও উত্তরদিকে জনবসতি শুরু হল। প্শচমদিকের খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ ও জলসেচ সেবিত এলাকায় ঘনবসতি দেখা যায়। উত্তর আমেরিকার জনবসিতর আর একটি বৈশিষ্ট্য হল যে এই মহাদেশের অধিকাংশ লোক যুক্তরাষ্ট্রে বাস করেন। এর পরের স্থান হলো সেক্সিকো ও কানাডার।

কানাডার জনবণ্টন খুব অসম। কানাডা হল পর্বত, অরণ্য, হ্রদ, নদী-নালা, গমবলয়, খনিজসম্পদ, আধুনিক কলকারখানা ও অপূর্ব প্রাকৃতিক শোভার দেশ। কানাডার উত্তরে লরেন্সীয় শীল্ড অঞ্চলে সোনা, তামা ছাড়াও প্রচুর পরিমাণে ইউরেনিয়াম, নিকেল, অ্যাসবেস্টস পাওয়া যায়।

কানাডার জনবসতি খাদ্য উৎপাদক অঞ্চল ও শিল্পকেন্দ্রকে ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। দেশের তিনটি প্রধান ঘনবসতি এলাকা হল (চিত্র 2.10)

1. পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরীয় উপকূলে ব্রিটিশ কলম্বিয়া ও নদী উপত্যকা। এই দেশের 20 শতাংশ লোক এখানে বাস করেন।
2. পূর্বে অন্টারি উপদ্বীপ ও সেন্ট লরেন্স উপত্যকা, ম্যারিটাইম প্রদেশের শিল্পপ্রধান অঞ্চল। এখানে কানাডার 60 ভাগ লোক বাস করেন। যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডার মধ্যবর্তী এই অঞ্চলটি কৃষি-শিল্প সমৃদ্ধ।
3. কৃষিপ্রধান প্রেইরি অঞ্চল। মোট জনসংখ্যার 16 ভাগ লোক এখানে বাস করেন।

সারণি : উত্তর ইউরোপ : লোকসংখ্যা ও জনঘনত্ব (2001 সাল)

দেশ জনসংখ্যা (মিলিয়ন) জনঘনত্ব (প্রতি	(প্রতি বর্গমাইলে)	
যুক্তরাষ্ট্র	284.5	77
মেক্সিকো	99.6	132
কানাডা	31.0	8
কিউবা	11.3	264
ডোমিনিয়ান রিপাবলিক	8.6	456
হাইতি	7.0	650
হণ্ডুরাস	6.7	155
এল সালভাডোর	6.4	788
নিকারাগুয়া	5.2	104

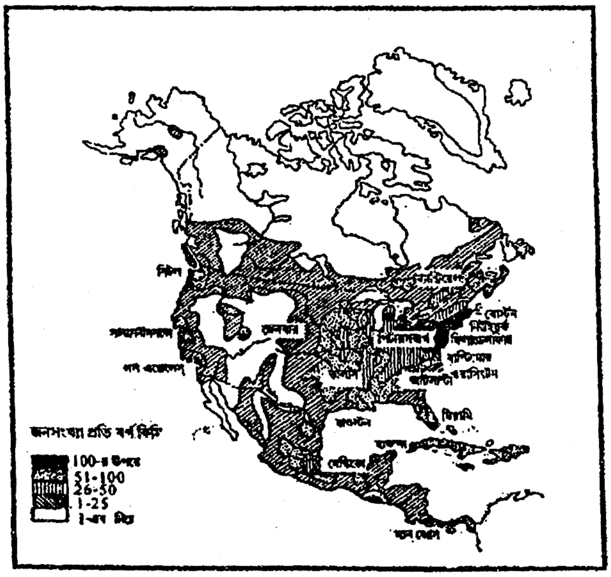

চিত্র 2.10 : উত্তর আমেরিকা জনঘনত্ব (প্রতি বর্গকিমি)

নর্দান টেরিটোরি ও ইউক্রেন উপত্যকা কানাডার মোট এলাকার 40 ভাগ জায়গা জুড়ে থাকলেও এখানে দেশের মাত্র 0.3 শতাংশ লোক বাস করেন। অঞ্চলটি আংশিকভাবে তুন্দ্রা অঞ্চলের অন্তর্গত। এখানকার বেশিরভাগ বাসিন্দা হলেন রেড ইন্ডিয়ান ও এস্কিমো।

যুক্তরাষ্ট্রের লোকসংখ্যা হল 284.5 মিলিয়ন (2001)। লোকসংখ্যা অনুসারে এই দেশেক্র স্থান পৃথিবীতে চতুর্থ, চিন, ভারত ও রাশিয়ার পরই। পৃথিবীর মোট জনবসতির 5 শতাংশের মত লোক এখানে বাস করেন। আয়তনের তুলনায় এদেশের লোকবসতি খুব কম। আবার জনঘনত্ব হল প্রতি বর্গমাইলে 8 জন। এই দেশের বেশির ভাগ লোক 100^0 পশ্চিম দ্রাঘিমারেখার পূর্বাংশে বাস করেন। এই অংশের গড় ঘনত্ব হল প্রতি বর্গমাইলে 70 জন। আর্দ্র ও সমতল এই অঞ্চলটি চাষবাসের পক্ষে উপযুক্ত। তবে এই এলাকার বেশির ভাগ লোক দক্ষিণের তুলা ও ভুট্টা বলয়ে বাস করেন। তবে পূর্ব আটলাণ্টিকের উপকূলস্থ মেরীল্যাণ্ড থেকে মেইন পর্যন্ত শিল্পপ্রধান অঞ্চল সর্বপেক্ষা জনাকীর্ণ। এখানকার শিল্পপ্রধান ঘনবসতি এলাকাগুলো হল :

1. ডেট্রয়েট, ক্লীভল্যাণ্ড, বাফেলো ও অ্যাক্রন-কে কেন্দ্র করে ইরি হ্রদের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল।
2. চিকাগো-মিলওয়াকি-কে কেন্দ্র করে মিচিগান হ্রদের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল।
3. রচেস্টার ও সাইরোকাস্।
4. অন্টারিও এবং মহাওক (Mahawuk) উপত্যকা অঞ্চল।
5. পেনসিলভেনিয়া এবং পূর্বে ওহিও নদীর উপত্যকা অংশে পিটস্‌বার্গ শিল্পশহর।

100^0 পশ্চিম দ্রাঘিমারেখার পশ্চিমাংশ যুক্তরাষ্ট্রের মোট আয়তনের 30 ভাগ জায়গা জুড়ে থাকলেও পর্বত ও মালভূমি-প্রধান এই শুষ্ক এলাকার জনঘনত্ব (প্রতি বর্গমাইলে) মাত্র 5 জন। ভূমধ্যসাগরীয় জলবায়ু ও জলসেচের

সুবিধের জন্য ক্যালিফোর্নিয়া উপত্যকায় ঘনবসতি গড়ে উঠেছে। প্রশান্ত মহাসাগরীয় উপকূলের তিনটি ঘনবসতি এলাকা হল :

1. সানফ্রানসিসকো, আয়ারল্যাণ্ডকে ঘিরে ক্যালিফোর্নিয়া উপত্যকা।
2. দক্ষিণ লস্ এঞ্জেলস্-সানডিয়াগো-র সমভূমি অঞ্চল।
3. উত্তরে ওয়াশিংটন এবং ওরিগন রাজ্যের পোর্টল্যাণ্ড, সিয়াটেল প্রভৃতি শহর।

এর বিপরীতে রয়েছে ইসাহো (10), মন্টানা (6), উইওমিং (5) ও নেভাদা (4) ইত্যাদি জনবিরল এলাকা। এখানকার অনুর্বর মাটি বিরাট সংখ্যক কৃষিজীবী জনতার ভরণপোষণে অক্ষম।

মেক্সিকোর জনঘনত্ব প্রতি বর্গমাইলে 132 জন। কিন্তু দেশের উত্তরাংশ মরুপ্রায় বলে সেখাে খুব কম লোক বাস করেন। অবশ্য এই অঞ্চলে যেকানে খনিজদ্রব্য পাওয়া যায় ও যেখানে পশুচারণের সুবিধে আছে সেখানেই কেবল বিক্ষিপ্তভাবে বসতি গড়ে উঠেছে। ইদানিং জলসেচের সাহায্যে চাষবাস শুরু হওয়ায় এখানে কিছু মানুষ বসবাস করছেন। মেক্সিকো উপসাগরের উপকূলবর্তী আর্দ্র উষ্ণ এলাকা চাষবাসের পক্ষে উপযুক্ত। এছাড়া এই এলাকা খনিজ সম্পদে সমৃধ্ব বলে মেক্সিকোর বেশির ভাগ লোক এখানে বসবাস করেন। এর বিপরীতে প্রশান্ত মহাসাগরের তীরবর্তী এলাকা ও ক্যালিফোর্নিয়া উপদ্বীপ প্রায় শুকনো বলে এইসব এলাকায় লোকবসতি কম। মেক্সিকোর উচ্চ মালভূমি অঞ্চলে উচ্চতার জন্য নাতিশীতোষ্ণ আবহাওয়া বিরাজ করে। এটি শ্বেতকায় অধিবাসীদের বাসস্থান বলা চলে।

মধ্য আমিরিকার জনবসতি প্রধানত খনিজ ও কৃষিনির্ভরশীল। এখানকার আর্দ্র ও উষ্ণ জলবায়ু চাষবাসের পক্ষে খুব উপযুক্ত। মধ্য আমেরিকার সবচেয়ে বেশি ঘনবসতি এলাকা হল প্রশান্ত মহাসাগরের তীবর্তী এল-সালভালোর (788 জন)

(সূত্র : *2001 Population Data sheet of the Population Reference Bureau)*

আফ্রিকা (Africa)

আফ্রিকার জনসংখ্যা (818 মিলিয়ন, 2001) নিয়ে আলোচনা করার আগে এই মহাদেশের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট সম্বন্ধে কিছু জানা দরকার। যেমন, পৃথিবীর কৃষি উৎপাদনের 3 শতাংশ, খনিজ পদার্থের 5 শতাংশ, বাণিজ্যের 5 শতাংশ এই মহাদেশ থেকে আসে। পৃথিবীর রেলপথের 5 শতাংশ এদেশ্যজশে বিস্তৃত। আবার এই মহাদেশ গোটা পৃথিবীর 22 শতাংশ স্থান জুড়ে থাকলেও এখানে বিশ্বের মাত্র 13 শতাংশ লোক বাস করেন। একমাত্র অস্ট্রেলিয়া (9 জন) ছাড়া এত কম ঘনত্ব (70 জন) আর কোন মহাদেশে নেই। কিছুটা জলবায়ু, আর কিছুটা ভূপ্রকৃতি এর জন্য দায়ী।

কর্কটক্রান্তি ও মকরক্রান্তি রেখা যথাক্রমে দেশের উত্তর মধ্যাংশ ও দক্ষিণ মধ্যাংশের ওপর দিয়ে যাওয়ার জন্য এখানে দুটে মরুভূমির সৃষ্টি হয়েছে। রাষ্ট্রপুঞ্জের খাদ্য কৃষিসংস্থার (FAO) হিসেব অনুযায়ী আফ্রিকার শতকরা 40 ভাগের বেশি এলাকা খরাপ্রবণ। এছাড়া নিরক্ষরেখা দেশের মাঝখান দিয়ে গেছে বলে এই মহাদেশের বিরাট এলাকা অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর। এই নিরক্ষীয় অঞ্চলে প্রচুর বৃক্ষ জন্মালেও তাদের অর্থনৈতিক ব্যবহার খুব সীমিত। মাটির অনুর্বরতা ছাড়াও এখানকার ফসলের বড় শত্রু হল কীটপতঙ্গ। মোটের ওপর, এখানকার প্রাকৃতিক ও অর্থনৈতিক পরিবেশ বসবাসের পক্ষে মোটের উপর অনুকূল নয়। আফ্রিকার উত্তর-পশ্চিম কোণটি ভূমধ্যসাগরীয় জলবায়ুর জন্য বসবাসের পক্ষে আরামদায়ক। অনুরূপ একটি এলাকা হল ইথিওপিয়ার মালভূমি। নিরক্ষীয় অঞ্চলে অবস্থিত হলেও উচ্চতার জন্য এখানকার জলবায়ু নাতিশীতোষ্ণ। উষ্ণ সমুদ্রস্রোতের জন্য উপকূলের কিছু কিছু এলাকা বসবাসযোগ্য। ওপরের আলোচনার ভিত্তিতে আফ্রিকার জনঘনত্ব নিয়ে এবার আলোচনা করা যাক :

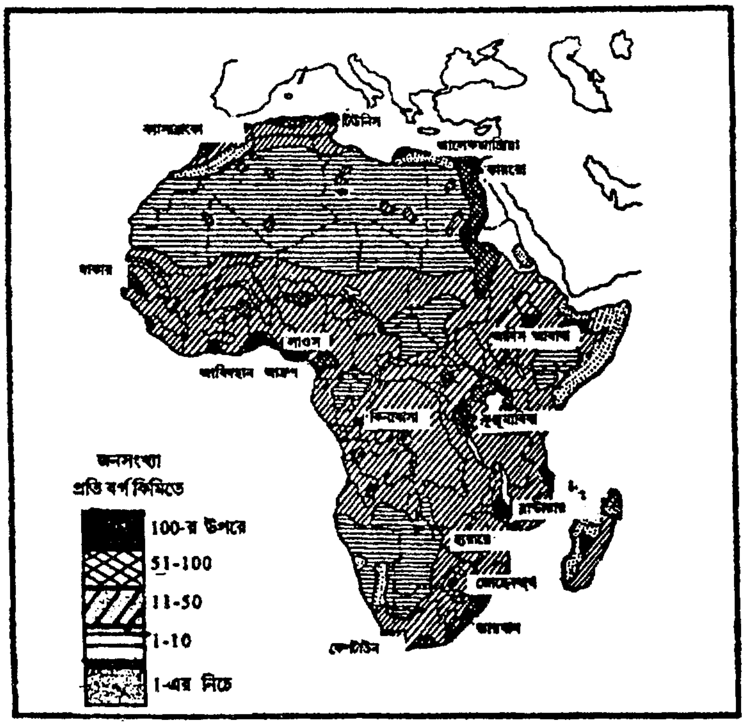

চিত্র 2.11 : অফ্রিকার জনঘনত্ব (প্রতি বর্গকিমি)

মহাদেশটি কৃষিপ্রধান। নীল উপত্যকা ছাড়া এখানে তেমন কোন লোভনীয় চাষের জমি খুব একটা নেই। বহুদিন ধরেই নীলনদ মিশরবাশীদের বিভিন্ন চাহিদা পূরণ করে আসছে। এইসব কারণেই এখানে জনঘনত্ব বেশি। যুক্তরাষ্ট্রের মতো আয়তনবিশিষ্ট সাহারা মরুভূমি বলতে গেলে জনহীন। মরূদ্যানগুলোকে আশ্রয় করে কিছু কিছু ছোট গ্রাম গড়ে উঠেছে। দক্ষিণ আফ্রিকার কালাহারিতে নিকৃষ্ট লতাগুল্ম মহাদেশের এক তৃতীয়াংশ জায়গা জুড়ে আছে। প্রকৃতির সঙ্গে তাল মিলিয়েই হয়তো এখানকার বড় নদী উপত্যকাগুলোতে ঘনবসতি গড়ে ওঠেনি। আবার একটানা লম্বা খরার দরুন নদী থেকে সময়মত সেচের জল পাওয়া যায় না। আবার নদীতে নৌ চলাচলও সম্ভব হয় না। এ কারণে ওরেঞ্জ (Orange) ও উচ্চ (Upper) জাম্বিয়া অববাহিকায় বসতি ঘন নয়। দক্ষিণ ও দক্ষিণ-মধ্য আফ্রিকায় খনিজ সম্পদ ও বসতির মধ্যে একটা সম্পর্ক আছে। ঐ সব অঞ্চলে (নীলনদ উপত্যকা বাদ দিয়ে) জনঘনত্ব ও গড় বাৎসরিক বৃষ্টিপাতের মধ্যে একটা সম্পর্ক লক্ষ্য করা যায়।

আফ্রিকার গড় ঘনত্বের চেয়ে পাঁচটি বেশি জনঘনত্বের অঞ্চল হল :

1. আইভরি কোস্টের কিছুটা অংশ বাদে পশ্চিমে গিনি থেকে পূর্বে ইকোয়েটেরিয়াল গিনি পর্যন্ত বিরাট এলাকা।

2. পূর্বে আফ্রিকার মালভূমির বৃহৎ হ্রদ অঞ্চল, বিশেষ করে ভিক্টোরিয়া হ্রদের আশেপাশের এলাকা।

3. পূর্ব ও দক্ষিণ আফ্রিকার উপকূল অঞ্চল যা মোসাম্বার কাছ থেকে কেপ টাউন পর্যন্ত বিস্তৃত। অবশ্য এই গোটা এলাকাটিতে একই রকম জনঘনত্ব দেখা যায় না।

4. ভূমধ্যসাগরের লাগোয়া এলাকা--টিউনেশিয়া, আলজিরিয়া ও মরক্কোর উত্তরদিকের কিছু অংশ।

5. পূর্বে ইথিওপিয়ার মালভূমি।

কৃষিপ্রধান এই সব এলাকার জীবনযাত্রা গড় বাৎসরিক বৃষ্টিপাতের (75 সেমির বেশি) ওপর নির্ভরশীল (Titxerald, 1967)

দক্ষিণ আমেরিকা (South America)

সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দী ছিল ইউরোপীয়দের বহির্বিশ্বে প্রভুত্ব কায়েম করার যুগ। দক্ষিণ আমেরিকাও এর ছোঁয়া পেয়েছিল। এইসব বিদেশী প্রভুরা পূর্ব উপকূলে এসে ডেরা বেঁধেছিলেন, তারপর ধীরে ধীরে দেশের ভেতরে সরে গিয়েছিলেন। আফ্রিকার মতন এই মহাদেশের উত্তরাংশের ওপর দিয়ে নিরক্ষরেখা গেছে। ফলে এখানকার বিরাট এলাকার জলবায়ু অস্বাস্থ্যকর। আবার মহাদেশের দক্ষিণাংশ কুমেরু অঞ্চলের কাছাকাছি অবস্থিত বলে সেখানে

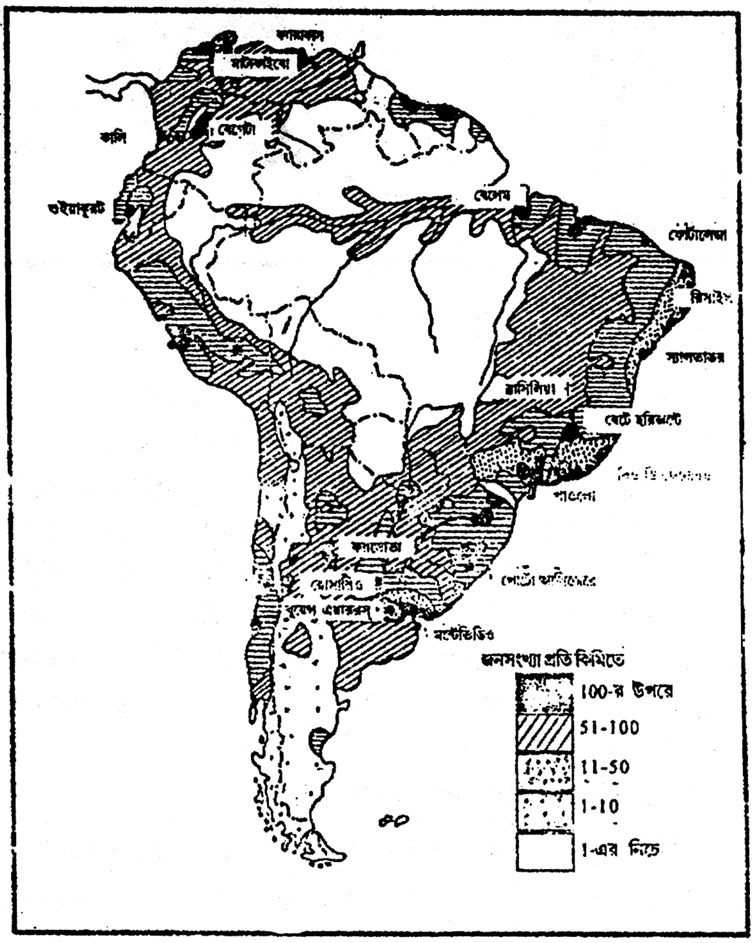

চিত্র 2.12 : দক্ষিণ আমেরিকার জনঘনত্ব (প্রতি বর্গকিমি)

শীতকালে কনকনে মেরু বাতাস বয়। তাই বলা চেল জলবায়ুর জন্যই এই মহাদেশের উত্তর, দক্ষিণ ও মধ্যাংশে বসতি বিকাশ লাভ করেনি। এইজন্য একমাত্র উপকূল ছাড়া মহাদেশের অন্যান্য অংশে জনবসতি খুব একটা গড়ে ওঠেনি। এই কারণেই আয়তনের দিক দিয়ে এই মহাদেশের স্থান পৃথিবীর পঞ্চম (মাত্র 13 শতাংশ) হলেও বিশ্বের মাত্র 5 শতাংশ লোক এখানে বাস করেন, যদিও মহাদেশটির গড় জনঘনত্ব 51 জন।

নিম্নের সারণি থেকে দেখা যাচ্ছে যে ব্রাজিলে সবচেয়ে বেশি লোক বাস করেন (52.29%), কিন্তু ইকোয়েডরে জনঘনত্ব সবচেয়ে বেশি (118)। গায়ানার একটা বড় অংশ বিরল বসতির।

এখানকার শতকরা 95 ভাগ লোকই দেশের মাত্র 4 শতাংশ জায়গায় বাস করেন। বাকি লোক পার্বত্য এলাকা, বনাঞ্চল, সাভানা অঞ্চলে বাস করেন। আখ এখানকার প্রধান অর্থকারী ফসল। দেশের একটা বড় অংশে ধান উৎপন্ন হয়। কিন্তু দেশের চাহিদা মিটিয়ে তা বাইরে পাঠানো সম্ভব হয় না। খনিজ পদার্থের মধ্যে বক্সাইট বিদেশে রপ্তানি হয়। অন্যান্য খনিজ পদার্থের মধ্যে আছে সোনা ও হীরে। বন থেকে বিভিন্ন উপজাত দ্রব্য ও উপকূলীয় এলাকা থেকে নারকেল পাওয়া যায়।

দক্ষিণ আমেরিকার পশ্চিমাংশ (পেরু, ইকোয়েডর, কলম্বিয়ার অংশবিশেষ) পার্বত্যময় (নদী উপত্যকাগুলো খুব সরু। ঢালু অঞ্চলে কিছু চাষবাস করা হয়। বলিভিয়ার জনঘনত্ব কম। দেশের আয়তনের (4,24,162 বর্গমাইল) তুলনায় এখানকার জনসংখ্যা খুব কম। ভেনেজুয়েলা (352,143 বর্গমাইল) ও সুরিনামে (63,039 বর্গমাইল) লোকসংখ্যা খুব কম। ব্রাজিলের এক বড় অংশ বনে ঢাকা পার্বত্য এলাকা। চাষবাসই এখানকার প্রধান পেশা। আয়তনের (3,300,154 বর্গমাইল) তুলনায় এখানকার লোকসংখ্যা খুব কম। কারণ আমরা আগেই জেনেছি যে এই দিশটির ওপর দিয়ে নিরক্ষরেখা গেছে। এখানকার জলবায়ু ও পরিবেশ বসতি গড়ে ওঠার পক্ষে একটা বিরাট বাধা। আমাজন উপত্যকাতে জনঘনত্ব প্রতি বর্গমাইলে 4 থেকে 12 জন, অন্যত্র 52 জন। ব্রাজিলের পূর্ব উপকূলে কয়েকটি বড় শহর রয়েছে। সাধারণভাবে, পূর্ব উপকূলের জনঘনত্ব 25 থেকে 40 জন, আর শহর ও তার লাগোয়া অঞ্চলে 45 থেকে 300-র বেশি।

সারণি : দক্ষিণ আমেরিকার লোকসংখ্যা ও জনঘনত্ব (2001 সাল)

দেশ	জনসংখ্যা (মিলিয়ন)	জনঘনত্ব (প্রতি বর্গমাইলে)
ব্রাজিল	171.8	52
আর্জেন্টিনা	537.5	35
কলম্বিয়া	43.1	98
পেরু	26.1	53
ভেনেজুয়েলা	24.6	70
চিলি	15.4	53
ইকুয়েডর	12.9	118
বলিভিয়া	8.5	20
প্যারাগুয়ে	5.7	36
উরুগুয়ে	3.4	49
গায়ানা	0.7	8
সুরিনাম	0.4	7
ফরাসি গায়ানা	0.2	6

অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ড (Australia and Newzealand)

অস্ট্রেলিয়া হল উত্তর আমেরিকার মতই এক নতুন আবিষ্কৃত মহাদেশ। স্বভাবতই, আগন্তুকরা এখানে এসে উপকূলের দিকে অর্থাৎ মহাদেশের পূর্বভাগে বসবাস শুরু করেছিলেন। পূর্বদিকে বেশি বৃষ্টিপাত হয়, আর এর অভাবে পশ্চিমদিকে বিরাট মরুভূমি সৃষ্টি হয়েছে। দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূলে অবশ্য বৃষ্টিপাত হয়, যদিও তা পশ্চিম উপকূলের মত অত কম নয়। আমরা আগেই দেখেছি যে পূর্ব উপকূল বরাবর রয়েছে পর্বতশ্রেণি (গ্রেট ডিভাইডিং রেঞ্জ)। তাছাড়া, উত্তর, দক্ষিণ, মধ্যাংশ এবং পশ্চিমাংশেও পর্বতশ্রেণি রয়েছে। স্বভাবতই, এই মরুভূমি ও পার্বত্য এলাকা বাদ দিলে এই মহাদেশে চাষের জমি কম। দুই উপকূল (পূর্ব ও পশ্চিম) ও মরুভূমির কোন কোন জায়গায় কিছু কিছু খনিজদ্রব্য পাওয়া যায়। মহাদেশের চাষ ও শিল্পে নিযুক্ত লোকসংখ্যা পশুপালকদের তুলনায় বেশি।

আগের আলোচনার সূত্র ধরে এবার অস্ট্রেলিয়ার জনঘনত্ব বিচার করা যাক। আয়তনে সবচেয়ে ছোট এই মহাদেশে (মাত্র 6 শতাংশ) পৃথিবীর মোট লোকসংখ্যার (6,137 মিলিয়ন) মাত্র 0.5 শতাংশ (31 মিলিয়ন, 2001) বাস করেন। এই মহাদেশে 25 সেমির কম বৃষ্টিপাতের এলাকায় কোন বড় জনবসতি গড়ে ওঠেনি। তা সত্ত্বেও কিছু কিছু বিক্ষিপ্ত বসতি মধ্য কুইন্সল্যান্ড থেকে নদার্ন টেরিটোরির পশুচারণ ক্ষেত্রের দিকে বাড়ছে। ক্রান্তীয় আবহাওয়ার দরুন উত্তরে বসতি খুব কম। ফ্লাইন্ডার্স পর্বতমালার দক্ষিণে তুলনামূলকভাবে ভালো বৃষ্টিপাতের দরুন দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়ায় কিছু ঘনবসতি দেখা যায়। নিউ সাউথ ওয়েলসের দক্ষিণ-পূর্বের ভূপ্রকৃতি বন্ধুর। তাই প্রচুর জল থাকা সত্ত্বেও এখানকার বেশ কিছু এলাকা প্রায় জনশূন্য। অস্ট্রেলিয়ায় এই রকম আটটি অনুর্বর ও বন্ধুর অঞ্চল আছে, যেখানে জনসংখ্যা খুব কম। তা সত্ত্বেও আর্মিডেল, কাটুম্বা ও কুম্পা-র আশেপাশে মাঝারি মাপের জনবসতি দেখা যায়। এখানে কোথাও কোথাও পশুচারণ, আবার কোথাও কোথাও পর্যটন শিল্প বিকাশ লাভ করেছে। এসব অঞ্চলে 62 সেমির মত বৃষ্টিপাত হয়।

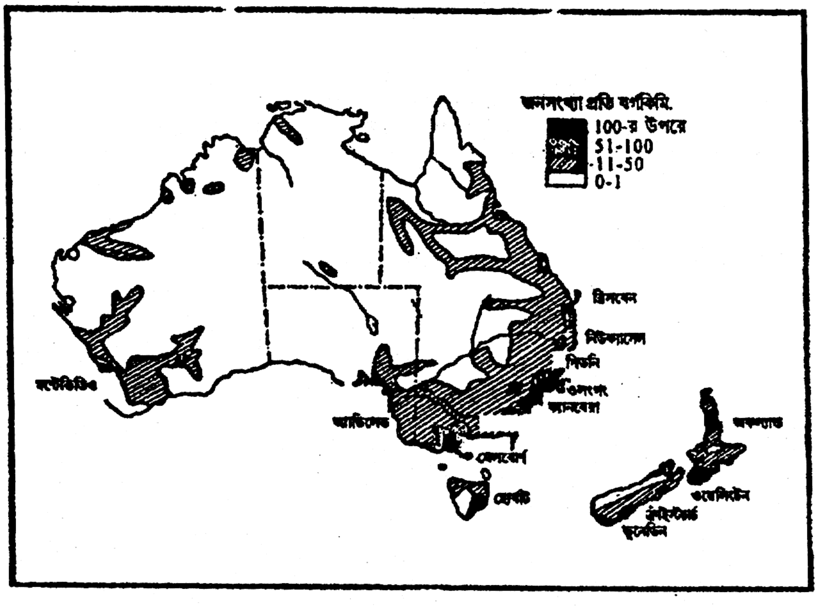

চিত্র 2.13 : অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ডের জনঘনত্ব (প্রতি বর্গকিমি)

জনঘনত্বের বিচারে অস্ট্রেলিয়ায় পাঁচটি বড় মাপের ঘনবসতি অঞ্চল রয়েছে (Taylor, 1959)। এগুলো হল— (1) সিডনির পশ্চিমে পর্বতের ঢাল, (2) ভিক্টোরিয়ার একটি বড় অংশ, (3) কুইন্সল্যান্ডের দক্ষিণ-পূর্ব দিক, (4) দক্ষিণ অস্ট্রেলিযার ফ্লাইন্ডার্স রেঞ্জের দক্ষিণদিক ও (5) সোয়ানল্যান্ডের দক্ষিণ-পশ্চিম দিক। টাসমানিয়া ও নর্দান টেরিটোরিতে বিস্তীর্ণ কৃষিক্ষেত্র নেই।

এবার অঞ্চলভিত্তিক কৃষিজমি, পশুচারণ ক্ষেত্র ও জনবসতির মধ্যে সম্পর্ক খোঁজ যাক :

কুইন্সল্যান্ডে সুন্দর নাতিশীতোষ্ণ তৃণভূমি ছাড়াও পূর্ব উপকূলে উর্বর চাষের জমি আছে। এখানকার মূল্যবান খনিজ সম্পদের মধ্যে রয়েছে কুলি (Coolie)-র কয়লা। জনবসতির দ্বিতীয় ধাপে রয়েছে ভিক্টোরিয়া ও দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়া। কৃষিসম্পদের দিক দিয়ে উভয় রাজ্যই সমান পর্যায়ের। দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়ার প্রচুর তৃণভূমি আছে। অবশ্য এর বেশির ভাগই নিম্নমানের। উপরন্তু, দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়ার বিস্তীর্ণ এলাকা মরুভূমি। তাই অর্থনৈতিক বিচারে এই রাজ্যটি অনেকটা গুরুত্বহীন। ভিক্টোরিযার মোরওয়েলে (Morewell) প্রচুর কয়লা আছে। এখানে সারা বছর একই রকম বৃষ্টিপাত হয়। তাসমানিয়ার দক্ষিণ-পশ্চিম অংশ কনকনে ঠাণ্ডা বলে এখানে জনবসতি খুব কম। তা সত্ত্বেও এখানকার সীমিত চাষের জমি নর্দান টেরিটোরির বিরাট এলাকার তুলনায় অনেক কাজে লাগে।

নাতিশীতোষ্ণ জলবায়ু, উর্বর মাটি আর খরামুক্ত বলে নিউজিল্যান্ডে দোহশিল্প গড়ে উঠেছে। ফলে এখানে জনঘনত্ব মধ্যম রকমের।

2.2 পরিব্রাজন ঃ

প্রস্তাবনা

পরিযান, পরিব্রাজন, প্রবহমানতা বা সঞ্চারমানতা, যে বিশেষণেই আমরা মানুষের বাস্তুত্যাগকে আখ্যায়িত করি না কেন, তা মানুষের এক স্বাভাবিক চরিত্র। অতীতেও দেখা গেছে গুহাচারী মানুষ খাদ্যের সন্ধানে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে ঘুরে বেড়িয়েছেন, আবার দেখা গেছে সভ্যতা বিকাশের সাথে সাথে লোভী মানুষের দল এক স্থান থেকে অন্য স্থানে অভিযান করেছেন, যেমন এদেশে শক, হুন, পাঠান ও মোগলদের অভিযান বা বিপরীতভাবে ভারতীয়দের মরিশাস ও ফিজিদ্বীপে জবরদস্তি পরিযান, কিংবা ব্রিটিশদের অস্ট্রেলিয়া ও উত্তর আমেরিকায় পাড়ি জমানো। আর এক বিপরীত চিত্রে রেয়েছেন ফা-হিয়েন, হিউ-এন-সাঙ, উবন-বতুতার মত মনীষীরা যাঁরা তাঁদের জ্ঞানপিপাসা মেটাতে বিস্তর বাধা পেরিয়ে এদেশে এসেছেন। উন্নত দেশগুলোতে ছাত্রছাত্রীরা পড়াশুনার ফাঁকে ফাঁকে দেশ দেখতে বেরিয়ে পড়ে। এতে করে তারা যেমন অবসর উপভোগ করতে পারে, তেমনি আবার দেশ দেখার ফাঁকে ফাঁকে সেখানকার শিক্ষা-সংস্কৃতিকে জানার সুযোগ পায়। এ সমস্তই পরিযানের মধ্যে পড়ে, তবে ক্ষেত্রবিশেষে পরিযানের কারণ ভিন্ন ভিন্ন।

তাই কবিদের লেখনীতে ফুটে উঠেছে সেই আর্তির সুর—

"থাকব নাকো বদ্ধ ঘরে
দেখব এবার জগৎটাকে,
কেমন করে ঘুরছে মানুষ
যুগান্তরের ঘূর্ণিপাকে।" (—নজরুল)
'বিপুলা এ পৃথিবীর কতটুকু জানি
দেশে দেশে কত না নগর রাজধানী
মানুষের কত কীর্তি রয়ে গেল অগোচরে।" (—রবীন্দ্রনাথ)

"To the west, to the west, to the land of the free*
Where mighty Missouri rolls down to the sea;
Where a man is a man if he's willing to toil,
And the humblest may gather the fruits of the soil.
Where children are blessings and he who hath most
Has aid for his fortune and riches to boast.
Where the young may exult and the aged may rest,
Away, far away, to the land of the west.
Away, far away, let us hope for the best
Ans build up a home in the land of the west."

উপরোক্ত সব পঙ্ক্তিগুলোতেই পরিযানের যৌক্তিকতাকে তুলে ধরা হয়েছে।

---

* ঊনবিংশ শতাব্দীর যুক্তরাষ্ট্রের এক জনপ্রিয় গান। বিখ্যাত স্টীল নির্মাতা ও দানবীর Andrew Carnegie মন্তব্য করেছিলেন যে ঐ লোমহর্ষক গান তাঁর পিতাকে যুক্তরাষ্ট্রে আসতে প্রেরণা জুগিয়েছিল।

উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করে পরিযাণের সংজ্ঞা, কেন মানুষ পরিযাণ করে, পরিযাণ কত প্রকারের, পরিযাণ সংক্রান্ত নিয়ম এবং সবশেষে পরিযাণের ফলাফল সম্বন্ধে জানা যাবে।

2.2.1 সংজ্ঞা (Definition)

The Dictionary of Human Geography-র মতে পরিব্রাজন হল—"Permanent or semi-permanent change of residence of an individual or a group of people." পরিব্রাজন বা **Migration** বলতে সাধারণত কোন জায়গায় বহুদিন স্থায়ীভাবে বসবাসের উদ্দেশ্যে মানুষের স্থান থেকে স্থানান্তরে বিচলন বা বিচলনের প্রক্রিয়াকে বোঝায়। "Migration is the act or process of moving from one place to another with the intent of staying at the destination permanently or for a relatively long period of time." সমাজবিজ্ঞানীরা বলেন যে পরিব্রাজন হল—"Change of usual place of residence with a view to permanently reside elsewhere." (স্থায়ীভাবে থাকবার উদ্দেশ্যে এক স্থান থেকে আর এক স্থানে সচরাচর ব্যবহৃত বাসস্থানের পরিবর্তন)। সমাজবিজ্ঞানীদের মতে, তাকেই আমরা প্রব্রজন বলব যখন কোন ব্যক্তি স্থায়ীবাবে বসবাসের উদ্দেশ্যে পূর্বের বাসস্থান ও প্রশাসনিক অঞ্চল ত্যাগ করে নতুন প্রশাসনিক অঞ্চলে আগমন করেন। আমরা তাদেরকেই বিচলনকারী বলব যারা বাসস্থান পরিবর্তন করেন এবং এই পরিবর্তন করতে গিয়ে তাঁরা পুরাতন প্রশাসনিক অঞ্চলেই থেকে গেলেন, না নতুন প্রশাসনিক অঞ্চলে এলেন, তা বিবেচ্য নয়। অর্থাৎ সব প্রব্রজনই বিচলন কিন্তু কিছু কিছু বিচলনই প্রব্রজন।

বর্তমান যুগে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতির জন্য এবং প্রথাগত বৃত্তির পরিবর্তে মানুষ আধুনিক বৃত্তি গ্রহণে অধিক মাত্রায় আগ্রহান্বিত হবার ফলে প্রতিটি উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশে প্রব্রজনের মাত্রা বেড়েছে। এই সব কারণে সাধারণ চলাচল বা বিচলন (movement) এবং প্রব্রজনের মধ্যে একটি ভেদরেখা টানা প্রয়োজন।

2.2.2 পরিযাণ পরিসংখ্যান (Migration Data)

পরিযাণের সংজ্ঞা থেকে আমরা বুঝলাম যে এটি হল এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় গিয়ে মানুষের স্থায়ীভাবে ঘর বাঁধা। কিন্তু কত সংখ্যক মানুষ এর সঙ্গে জড়িত বা কোথা থেকে তাদের এখানে আগমন বা কোথায় তাদের গন্তব্যস্থল, এই ধরনের পরিসংখ্যান নিয়ে এবার আলোচনায় আসা যাক। প্রথমেই বলে নেওয়া ভালো যে এই ধরনের তথ্য পাওয়া আর বিশ্লেষণের জন্য তার ব্যবহারে অসুবিধে আছে। কারণ একটি প্রাথমিক সমস্যা হল স্বল্পস্থায়ী ও অস্থায়ী প্রবহমানতার মধ্যে পার্থক্য টানা। যেমন কোন নবাগত ব্যক্তিতে (new comer) স্থায়ী বাসিন্দা বলে গণ্য হতে গেলে তাঁকে কতদিন ধরে নতুন স্থানে বাস করতে হবে? সত্যি বলতে কি, প্রবাসী সংক্রান্ত পরিসংখ্যান (statistics) ব্যবহারে খুব সাবধানতা অবলম্বনের প্রয়োজন আছে। কারণ পরিযাণের সংজ্ঞা ও তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতি এক এক দেশে এক এক রকম।

পরিযাণ পরিসংখ্যান ব্যবহারে অনেক বাধা আছে। বিশেষ করে সেইসব প্রবাসীকে নিয়ে যাঁরা দেশের মধ্যেই এক স্থান থেকে অন্য স্থানে গিয়ে বাস করেন। এইসব ক্ষেত্রে প্রতিটি প্রকৃত প্রবহমানতাকে সঠিকভাবে চিহ্নিত করা মুশকিল। যে সব দেশ প্রতিটি নাগরিক সম্পর্কে তথ্য রাখে, কেবলমাত্র তারা দেশের সব লোকের গতি-প্রকৃতির হদিস দিতে পারে যে সব দেশের লোকগণনার (census) পরিসংখ্যান নির্ভুল ও বিশদ, সেখানকার জনগণনা-দপ্তরের প্রকাশিত পুস্তিকা থেকে পরিযাণ সম্পর্কে ধারণা করতে পারা যায়। কিন্তু অধিকাংশ দেশেই

এই ধরনের তথ্য প্রতি 10 বছর অন্তর প্রকাশিত হয়। কিন্তু 10 বছরের মধ্যবর্তী কোন বছরের পরিযাণ সম্বন্ধে তথ্য পাওয়ার জন্য অনুমানের আশ্রয় বা নমুনা সমীক্ষা ছাড়া আর কোন উপায় নেই। কিছু কিছু তথ্যের ব্যবহার এক্ষেত্রে সাহায্য করতে পারে, যেমন সময় সময় প্রকাশিত ভোটদাতাদের তালিকা, কৃষক সমিতির সদস্য তালিকা বা পাশ্চাত্য দেশে সামাজিক নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠান (Social Security Organisation) থেকে প্রাপ্ত তথ্য। কিন্তু এই সব তালিকা থেকে প্রত্যেক ব্যক্তির জন্মস্থান ও চলতি বা পুরনো ঠিকানা ছাড়া অন্য কিছু হদিশ পাওয়া যায় না। এ প্রসঙ্গে এটা উল্লেখ করলে বোধ হয় বেশি বলা হবে না যে নরওয়েতে প্রতি কমিউনে (commune) একটি নিবন্ধগ্রন্থ (register) আছে। তাতে কোন ব্যক্তি কোন জেলা ছেড়ে যাচ্ছেন বা কোন জেলায় বাস করতে আসছেন, তা নথিভুক্ত (registration) করা থাকে, কিন্তু অন্য দেশে এই রকম সরাসরি গণনার ঘটনা দুর্লভ।

বহু সংস্থাই কোনো না কোনো উদ্দেশ্যে প্রব্রজনের হিসেব রাখেন। এরা মূলতঃ দু'ধরনের পরিসংখ্যান সংগ্রহ করেন। প্রথমত, যারা সীমান্ত পথ (check-point) অথবা বন্দর পথ (সমুদ্র অথবা আকাশপথ) অতিক্রম করছেন। একে সংক্রমণ পরিসংখ্যান (transit statistics) বলে। দ্বিতীয়টি হলো সেই সব লোকদের নাম বা বিবরণ নথিভুক্ত করা যারা গণনার সময় গণনা স্থলে ছিলেন কিন্তু তার আগে অন্য কোথাও ছিলেন। আদমশুমারির সময় সাধারণত এই ধরনের তথ্য নথিভুক্ত করা হয়। 1981 সালে ভারতবর্ষের লোকগণনায় ব্যবহৃত তপসিলে প্রতিটি ব্যক্তির জন্মস্থান লিপিবধ্ব করবার ব্যবস্থা ছিল। জন্মস্থান দিয়ে কোনও অঞ্চলের লোকদের খুব সহজেই দু'ভাগে ভাগ করা যায়—যারা গণনাকৃত অঞ্চলেই জন্মগ্রহণ করেছেন, আর যারা অন্য কোথায়ও জন্মগ্রহণ করেছেন কিন্তু গণনাকৃত অঞ্চলে বর্তমানে বসবাস করছেন।

সংক্রমণ পরিসংখ্যানে একটি নির্দিষ্ট সময়ে ঐ অঞ্চল দিয়ে কত জন প্রবেশ করলেন এবং কত জন বা বাইরে গেলেন তার আলাদা আলাদা হিসেব পাওয়া যায়। সোজা কথায়, A স্থান থেকে B স্থানে একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কত জন চলে গেলেন এবং B থেকে A-তে ঐ একই সময়ে কত জন এলেন তার হিসেব পাওয়া যায়। $A \rightarrow B$ এবং $B \rightarrow A$ প্রব্রজনের সংখ্যায় যোগফলকে স্থূল প্রব্রজন বলে। বেশিরভাগ গবেষণাতেই এটি খুব একটা কাজে লাগে না। যা কাজে লাগে তা হল—(i) বহিঃপ্রব্রজন (out-migration) অথবা (ii) অন্তঃপ্রব্রজন (inmigration) এবং দুয়ের পার্থক্য অর্থাৎ 'নীট' প্রব্রজন। লোকগণনার ফলাফলেও এই 'নীট' প্রব্রজনেরই তথ্য থাকে।

এখন প্রশ্ন হল কিভাবে স্থূল প্রব্রজন, বহিঃপ্রব্রজন বা অন্তঃপ্রব্রজনের হার নির্ণয় করা যায়?

$$\text{(i) স্থূল প্রব্রজনের হার} = \frac{\text{কোন নির্দিষ্ট অঞ্চলে একটি পূর্ণ বৎসরে কত ব্যক্তি এক বাসস্থান ত্যাগ করে অন্য বাসস্থানে যাচ্ছেন}}{\text{ঐ একই অঞ্চলে ঐ বৎসরের মধ্যবর্তী সময়ে মোট জনসংখ্যা}} \times 1000$$

$$\text{(ii) বহিঃপ্রব্রজনের হার} = \frac{\text{কোন নির্দিষ্ট অঞ্চলে এক বৎসরে মধ্যে কত লোক সেই অঞ্চল ত্যাগ করে চলে গেছেন}}{\text{ঐ একই অঞ্চলে ঐ বৎসরের মধ্যবর্তী সময়ে মোট জনসংখ্যা}} \times 1000$$

$$= \frac{O}{N} \times 1000$$

(iii) অনুরূপভাবে অন্তঃপ্রব্রজনের হার = (1/N) × 1000

(iv) নীট্ প্রব্রজনের হার $= \frac{I - O}{N} \times 1000$

উপরোক্ত সূত্রগুলোর সাহায্যে আরো বহুপ্রকার প্রব্রজনের হার নির্ণয় করা সম্ভব। বয়স, স্ত্রী-পুরুষ, পেশা, জাতি-ধর্ম ইত্যাদির পরিপ্রেক্ষিতে বয়স-নির্দিষ্ট, পেশা-নির্দিষ্ট ইত্যাদি প্রব্রজনের হার নির্ণয় করা যেতে পারে।

মনে রাখতে হবে যে জন্ম ও মৃত্যু-সংক্রান্ত তথ্য যত নির্ভুলভাবে পাওয়া সম্ভব, প্রব্রজন সংক্রান্ত তথ্য তত নির্ভুলভাবে পাওয়া সম্ভব নয়।

2.2.3 পরিযাণ বা পরিব্রাজনের শ্রেণীবিভাগ ও প্রকারভেদ (Types of Migration)

জনগণ কোথা থেকে কোথায় যাচ্ছেন (শহর বা গ্রাম থেকে শহরে, না গ্রাম থেকে গ্রামে), কতদূর যাচ্ছেন, কতদিনের জন্য যাচ্ছেন, কি ধরনের অর্থনৈতিক কাজের জন্য লোক বাইরে যাচ্ছেন, পরিব্রাজনকারীরা স্বেচ্ছায় বাইরে যাচ্ছেন না বাধ্য হয়ে বাইরে যাচ্ছেন ইত্যাদি বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে আমরা পরিযাণকে নিম্নলিখিত আটটি প্রধান ভাগ ও কয়েকটি উপবিভাগে ভাগ করতে পারি। পরের পৃষ্ঠায় সেই ভাগগুলো দেখানো হল :

ভারত : জন্মস্থান অনুযায়ী পরিযাণকারী, 1981			
প্রবাহ	মোট পরিযায়ীদের কত শতাংশ	মোট পরিযায়ীদের % পুরুষ	মোট পরিযায়ীদের % মহিলা
গ্রাম থেকে গ্রাম	63.24	13.30	51.94
গ্রাম থেকে শহর	17.60	8.77	8.83
শহর থেকে শহর	11.20	5.07	6.13
শহর থেকে গ্রাম	5.96	2.04	3.92
100.00	29.18	70.82	70.82

1. গ্রাম থেকে শহরে পরিব্রাজন (Rural-Urban Migration) : বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক কারণে মানুষ গ্রাম থেকে শহরে পাড়ি জমান। এই প্রকার পরিব্রাজন অন্তর্দেশীয়, স্বল্পমেয়াদী বা দীর্ঘমেয়াদী বা ঋতুভিত্তিক হতে পারে। সাধারণত জীবিকার উদ্দেশ্যে বিশ্বের উন্নতিশীল দেশগুলোতেও এই ধরনের পরিব্রাজন লক্ষ্য করা যায়। আমাদের দেশে প্রায় 60% পরিব্রাজন এই শ্রেণির অন্তর্গত।

গ্রাম থেকে শহরে : পরিব্রাজনের কারণগুলোকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায়। যথা—

(ক) অর্থনৈতিক কারণ :

(1) প্রান্তিক কৃষি এবং ছদ্ম বেকারত্ব গ্রাম থেকে শহরাঞ্চলে পরিব্রাজনে সাহায্য করে।

(2) শস্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে ঋতুগত তাততম্য এবং ফসল কাটার পরে সাময়িক কর্মহীনতা গ্রাম থেকে শহরে পরিব্রাজনের অন্যতম কারণ।

(3) গ্রামাঞ্চলে জীবিকা অর্জনের অল্প সুযোগ এবং টার্সিয়ারি বা তৃতীয় স্তরের অর্থনৈতিক কাজকর্মের স্বল্প আশা গ্রাম থেকে শহরে পরিব্রাজনে সাহায্য করে।

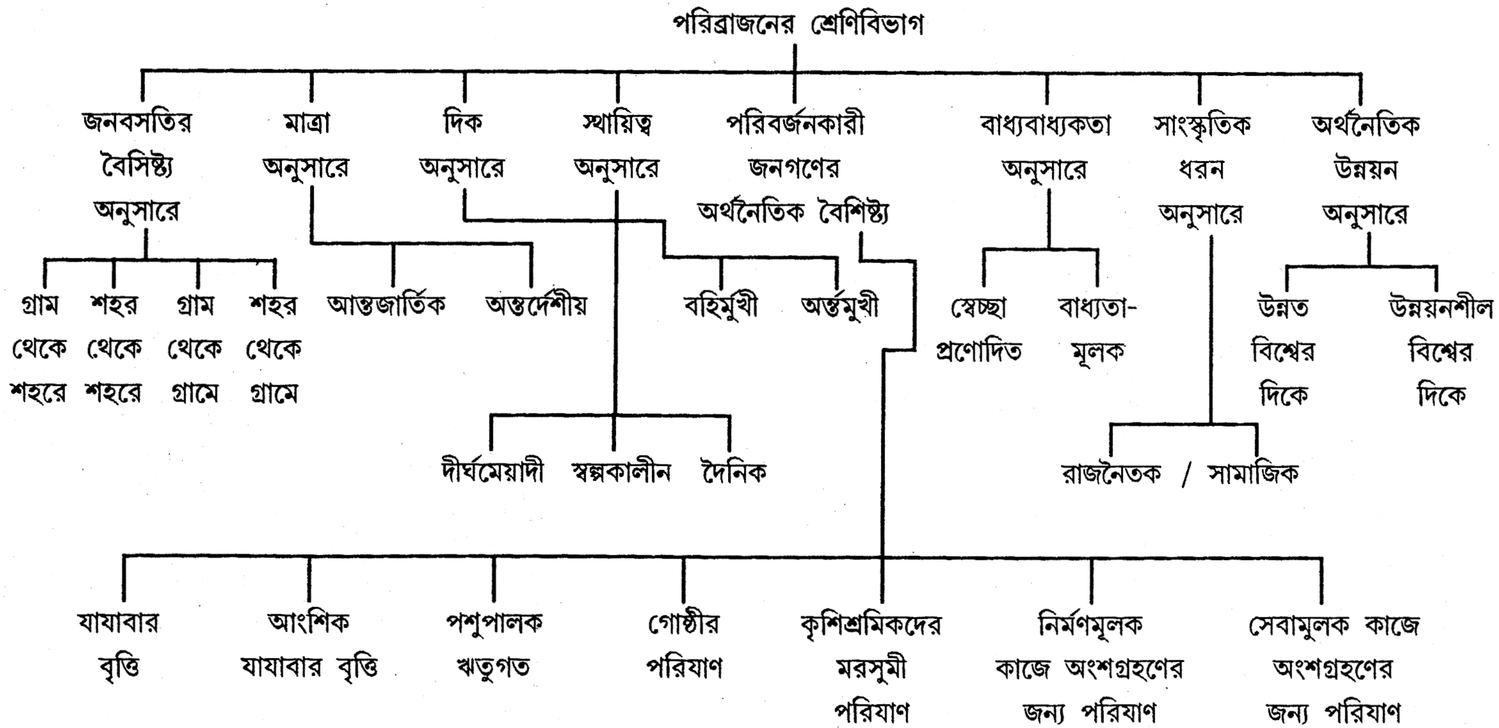
পরিব্রাজনের শ্রেণিবিভাগ
জনবসতির বৈসিষ্ঠ্য অনুসারে
মাত্রা অনুসারে
দিক অনুসারে
স্থায়িত্ব অনুসারে
পরিবর্জনকারী জনগণের অর্থনৈতিক বৈশিষ্ট্য
বাধ্যবাধ্যকতা অনুসারে
সাংস্কৃতিক ধরন অনুসারে
অর্থনৈতিক উন্নয়ন অনুসারে
গ্রাম থেকে শহরে
শহর থেকে শহরে
গ্রাম থেকে গ্রামে
শহর থেকে গ্রামে
আন্তজার্তিক
অন্তর্দেশীয়
বহির্মুখী
অর্ন্তমুখী
স্বেচ্ছা প্রণোদিত
বাধ্যতা-মূলক
উন্নত বিশ্বের দিকে
উন্নয়নশীল বিশ্বের দিকে
দীর্ঘমেয়াদী
স্বল্পকালীন
দৈনিক
রাজনৈতক / সামাজিক
যাযাবার বৃত্তি
আংশিক যাযাবার বৃত্তি
পশুপালক ঋতুগত
গোষ্ঠীর পরিযাণ
কৃশিশ্রমিকদের মরসুমী পরিযাণ
নির্মণমূলক কাজে অংশগ্রহণের জন্য পরিযাণ
সেবামুলক কাজে অংশগ্রহণের জন্য পরিযাণ

(খ) সামাজিক কারণ : বিয়ে এবং বিয়ের পরের পারিবারিক অবস্থা অনেক ক্ষেত্রে শহরাভিমুখী পরিব্রাজন ঘটায়।

2. শহর থেকে শহরে পরিব্রাজন (Urban to Urban Migration) : এর দ্বারা এক শহর থেকে অন্য শহরে মানুষের পরিব্রাজনকে বোঝায়। এই প্রকার পরিব্রাজন অন্তর্দেশীয় বা আন্তঃরাজ্য, স্বল্পমেয়াদী বা দীর্ঘমেয়াদী বা ঋতুভিত্তিক ও ধারাবাহিক হতে পারে। ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্প এবং নতুন নতুন অর্থনৈতিক কাজকর্মের সঙ্গে যুক্ত মানুষ এক শহর থেকে আর এক শহরে পরিযাণ করেন। ভারতবর্ষে প্রায় 10 শতাংশ পরিব্রাজন এই ধরনের। উন্নত দেশগুলোতে শহর থেকে শহর পরিব্রাজনের প্রবণতা বেশি। শহর থেকে শহরমুখী পরিব্রাজনের কারণগুলো হল নিম্নরূপ :

(ক) অর্থনৈতিক কারণ :

(1) এক শহর থেকে অন্য শহরে বেশি আয়ের সুযোগ পাওয়া যায়। ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, বিজ্ঞানী ও ব্যবসায়ীরা এই ধরনের পরিব্রাজনে অংশগ্রহণ করেন।

(2) এক শহর থেকে অন্য শহরে অনেক সময় সুবিধাজনক শর্তে বসবাসের সুযোগ মেলে।

(3) যে শহরে শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্যের সুবিধে বেশি, সেখানে বিনিয়োগ ও সঞ্চয়ের সুযোগ স্বাভাবিকভাবেই বেশি। তাই মানুষজন সেখানে পরিযাণ করেন।

(খ) সামাজিক কারণ :

(1) অনেক সময় সামাজিক প্রতিপত্তি বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে মানুষ এক শহর থেকে অন্য শহরে চলে যান। ডাক্তার, অধ্যাপক, ব্যবসায়ী শ্রেণির মানুষজনের মধ্যে এই ধরনের প্রবণতা বেশি।

(2) উচ্চশিক্ষার জন্য অনেক সময়ে মানুষজন এক শহর থেকে অন্য শহরে পরিব্রাজন করেন।

(3) বৈবাহিক সূত্রেও এই পরিযাণ ঘটে।

(গ) রাজনৈতিক কারণ : রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য বিভিন্ন সময়ে রাজনীতিবিদ ও ব্যবসায়ীরা শহর থেকে শহরাঞ্চলে পরিব্রাজন করেন।

3. গ্রাম থেকে গ্রামে পরিব্রাজন (Rural to Rural Migration) : এর দ্বারা এক গ্রাম থেকে অন্য গ্রামে পরিব্রাজনকে বোঝায়। এই ধরনের পরিব্রাজন অন্তর্দেশীয়, স্বল্পমেয়াদী বা দীর্ঘমেয়াদী বা ঋতুভিত্তিক হতে পান্দের। পৃথিবীর উন্নতিশীল দেশগুলোতে গ্রাম থেকে গ্রামমুখী পরিব্রাজন লক্ষ্য করা যায়। ভারতের ক্ষেত্রে এই শ্রেণির পরিব্রাজন প্রায় 10%। এক্ষেত্রে পরিব্রাজনের কারণ হল নিম্নরূপ :

(ক) অর্থনৈতিক কারণ : কৃষিশ্রমিক হিসেবে জীবিকা নির্বাহের সুযোগ যে গ্রামে বছরের যে সময়ে বেশি, প্রান্তিকভাবেঅনগ্রসর গ্রামাঞ্চল থেকে বছরের সেই সময়ে এক গ্রাম থেকে অন্য গ্রামে পরিব্রাজন ঘটে। যেমন, বিহার ও উত্তরপ্রদেশ থেকে কৃষিশ্রমিক পাঞ্জাব, হরিয়ানা অঞ্চলে গম কাটার জন্য বছরের নির্দিষ্ট সময়ে চলে যান। প্রতি বছরই এ রকম ঘটনা ঘটে যাকে আমরা স্বল্পমেয়াদী ঋতুভিত্তিক পরিব্রাজন বলি।

(খ) সামাজিক কারণ : বিয়ের দরুন মেয়েরা এক গ্রাম থেকে অন্য গ্রামে ঘরসংসার পাততে চলে যান। মাতৃতান্ত্রিক সমাজে পরিব্রাজনের চিত্রটি এরা বিপরীত, উত্তর-পূর্ব ভারতের খাসিয়া, নাগা উপজাতি সমাজে ছেলেরা বিয়ের পর মেয়ের বাড়ি চলে যান।

(গ) শহর থেকে গ্রামে পরিব্রাজন (Urban to Rural Migration) : এটি শহর থেকে গ্রামাঞ্চলে পরিব্রাজনকে বোঝায়। এটি অন্তর্দেশীয়, স্বল্পমেয়াদী, দীর্ঘমেয়াদী বা ঋতুভিত্তিক হতে পারে। পৃথিবীর উন্নত ও উন্নতিশীল দেশগুলোতে বিশেষ পরিস্থিতিতে শহর থেকে গ্রামমুখী পরিব্রাজন ঘটে। সরকারি আদেশে বদলি (transfer) অনেক ক্ষেত্রে এই প্রকার পরিব্রাজনের অনুঘটক। ভারতের ক্ষেত্রে এই ধরনের পরিব্রাজন প্রায় 10 শতাংশের মত।

শহর থেকে গ্রামে পরিব্রাজনের কারণ

(ক) অর্থনৈতিক কারণ

(1) গ্রামাঞ্চলে সেবামূলক কাজকর্মের সুযোগ।

(2) চাকরি থেকে অবসর নেওয়ার পর গ্রামের বাড়িতে আয়ের চেষ্টা।

(3) কৃষি সম্পর্কিত ব্যবসায়ে অংশগ্রহণ।

(4) খালি-পা ডাক্তারদের (bare-foot doctor) ক্ষেত্রে গ্রামে আয় বৃদ্ধির সুযোগ।

(খ) সামাজিক কারণ

(1) সামাজিক প্রতিপত্তি বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে গ্রামে চলে আসা অর্থাৎ পরিব্রাজন।

(2) বৈবাহিক সূত্রে পরিব্রাজন।

(3) উচ্চ শিক্ষার শেষে প্রতিজ্ঞা রক্ষার জন্য পরিব্রাজন।

(4) গ্রামে স্বল্প খরচ ও সহজ, সরল, দূষণমুক্ত জীবনযাত্রার সুযোগ গ্রহণের উদ্দেশ্যে পরিব্রাজন।

(5) ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান পালনের জন্য পরিব্রাজন।

(গ) রাজনৈতিক কারণ

(1) রাজনৈতিক অস্থিরতা, যুদ্ধ ইত্যাদি কারণে পরিব্রাজন। যেমন—দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় বহু লোক কোলকাতা ছেড়ে গ্রামের বাড়িতে চলে গিয়েছিল।

(2) রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য পরিব্রাজন।

(ঘ) অন্যান্য কারণ

(1) দূষণের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য এবং স্বাস্থ্য উদ্ধারের জন্য পরিব্রাজন।

(2) প্রাকৃতিক বিপর্যয় থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য পরিব্রাজন।

আন্তর্জাতিক প্রবহমানতা (International Migration)

যখন প্রবাহমান জনগোষ্ঠী আন্তর্জাতিক সীমানা ছাড়িয়ে বিদেশী গিয়ে বসবাস শুরু করেন তখন তাকে আন্তর্জাতিক প্রবহমানতা বলে (চিত্র 2.14)। দেশে স্বাধীন মত প্রকাশের সুযোগ না থাকা, যুদ্ধ কিংবা দেশের সীমা বদল, কোন বিশেষ ধর্মের প্রতি অসহিষ্ণুতা, উপনিবেশ স্থাপনের মনোগত বাসনা, খনি—বিশেষ করে সোনার খনির আবিষ্কার, বিদেশে জমি পাওয়ার সুযোগ কিংবা বিদেশে বেশি পারিশ্রমিকের জন্য দেশত্যাগ এ সবই আন্তর্জাতিক পরিযাণের মধ্যে পড়ে। আন্তর্দেশীয় প্রবহমানতার ফলে যেমন দেশের জনবণ্টন রদবদল ঘটে,

তেমনি আন্তর্জাতিক পরিযাণের ফলে কোন দেশে মোট জনসংখ্যা কম-বেশি হতে পারে। আরও লক্ষ্য করার মত যে আন্তর্জাতিক প্রবাসীদের অনেক সময় নিজের দেশ ছেড়ে বসবাসের উদ্দেশ্যে বহুদূরের নতুন দেশে যেতে হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাঁদের নতুন প্রাকৃতিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশে গিয়ে ঘর বাঁধতে হয়। স্থায়ী বাসিন্দা ও নবাগতদের মধ্যে অনেক ব্যাপারে মিল হয় না। আন্তর্দেশীয় প্রবহমানতার ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে এই ধরনের পরিযাণ স্বল্পস্থায়ী, কিন্তু আন্তর্জাতিক প্রবহমানতা দীর্ঘস্থায়ী, এমনকি অনেক ক্ষেত্রে চিরস্থায়ী। অতীতে দেখা গেছে যে বিদেশের সঙ্গে বাণিজ্য ও উপনিবেশ স্থাপনের উদ্দেশ্যে এক দেশের লোকেরা অন্য দেশে যাচ্ছেন। ষষ্ঠদশ শতাব্দী থেকে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের সঙ্গে সঙ্গে ইউরোপীয় বণিকেরা ছলে-বলে-কৌশলে তাদের ঔপনিবেশিক

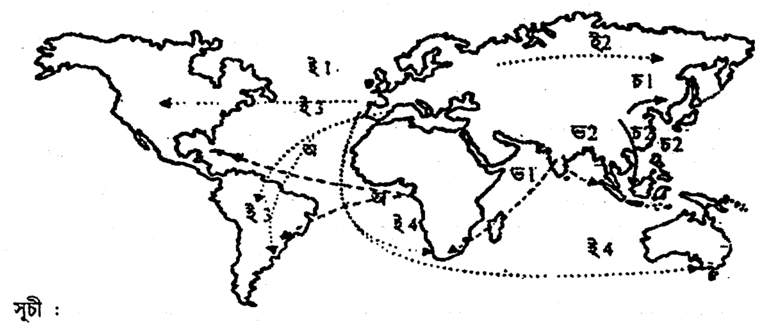

সূচী :
অ : আফ্রিকা মহাদেশের অধিবাসীদের উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকায় পরিব্রাজন
ই 1 : ইউরোপীয়দের উত্তর আমেরিকায় পরিব্রাজন
ই 2 : ইউরোপীয়দের পূর্ব রাশিয়ার দিকে পরিব্রাজন
ই 3 : ইউরোপীয়দের দক্ষিণ আমেরিকায় পরিব্রাজন
ই 4 : ইউরোপীয়দের দক্ষিণ আফ্রিকা ও অস্ট্রেলিয়ায় পরিব্রাজন
ভ 1 : ভারতীয়দের দক্ষিণ আফ্রিকায় পরিব্রাজন
ভ 2 : ভারতীয়দের দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় পরিব্রাজন
চ 1 : চীনাদের মাঞ্চুরিয়ায় পরিব্রাজন
চ 2 : চীনাদের দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় পরিব্রাজন

চিত্র 2.14 আন্তর্জাতিক পরিব্রাজন

লালসা চরিতার্থ করতে শুরু করেছেন। এছাড়া, উত্তর আমেরিকা, ওশেনিয়া, ল্যাতিন আমেরিকায় তাঁরা উপনিবেশ বিস্তার করেছিলেন। এককালে সাম্রাজ্য বিস্তাররের স্বার্থে কিছু কিছু জাতি ব্যাপকভাবে বাস্তুত্যাগ করতেন, কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে দ্রুত রাজনৈতিক পট-পরিবর্তনের ফলে এই ধরনের বাস্তুত্যাগ কমে গেছে। এ ছাড়াও বর্তমান দিনে আন্তর্জাতিক আইন ও বর্ণপ্রথার কড়াকড়ির সাথে সাথে এই ধরনের প্রবহমানতা অনেকাংশে কমে গেছে (Beaujeu-Garnier, 1966)।

বর্তমান দিনে বাণিজ্যিক, সাংস্কৃতিক ও কূটনৈতিক আদান-প্রদানের তাগিদে বন্ধুভাবপন্ন দেশগুলো বিশেষজ্ঞ আদান-প্রদান করে থাকেন। উল্লেখ করা যেতে পারে যে এই ধরনের আদান-প্রদানের বিশেষ তাৎপর্য আছে, কারণ এতে করে বিভিন্ন দেশের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে ওঠে। ক্ষেত্রবিশেষে আন্তর্জাতিক প্রবহমানতা দেশের অর্থনীতিতে মিশ্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। দেশ বিভাগের পর পূর্ব পাকিস্তান (বর্তমান বাংলাদেশে) থেকে বিপুলসংখ্যক আগত শরণার্থীরা এদেশের অর্থনীতির ওপর প্রথম কয়েক বছর চাপ সৃষ্টি করেন। উদ্বাস্তু কৃষকরা

বন্ধ্যা ও পতিত জমি চাষবাস করতে লাগলেন। এর সঙ্গে যুক্ত হল কৃষিতে প্রযুক্তির ব্যবহার। ফলে কৃষিতে দারুণ পরিবর্তন এল। এছাড়া দেশ বিভাগের পর পশ্চিমবঙ্গের এক বিরাট পরিমাণ পাট এলাকা পূর্ব পাকিস্তানে চলে যায়। কিন্তু পূর্ব বাংলা থেকে আগত চাষীদের অভিজ্ঞতা এদেশকে পাটচাষে স্বয়ংসম্পূর্ণ করে তুলছে।

যুদ্ধোত্তরকালে ইজরায়েলের কৃষি ও শিল্পক্ষেত্রে অগ্রগতি আন্তর্জাতিক প্রবহমানতার একটি উল্লেখযোগ্য নজীর ১৯৪৮-১৯৫৭ এই দশ বছরের মধ্যে চাষের জমির পরিমাণ শতকরা 124 ভাগ, সেচভূমি শতকরা 400 ভাগ, শিল্প শতকরা 60 ভাগ ও জলবিদ্যুৎ শতকরা 300 ভাগ বেড়েছে। জার্মানি থেকে আগত দক্ষ ও কারিগরি-জ্ঞানসম্পন্ন ইহুদীদের ইজরায়েলে বসবাস ও তাদের চারিত্রিক গুণই এই উন্নতির মূলে।

নিচের সারণিতে ইউরোপের বিভিন্ন দেশ থেকে যুক্তরাষ্ট্রে আন্তর্জাতিক পরিব্রাজনের একটি হিসেব দেওয়া হল। বলা বাহুল্য যুক্তরাষ্ট্রের আর্থিক উন্নতিই সেদেশে পরিযাণের মূল কারণ।

সারণি : ইউরোপের পরিব্রাজন

সাল	ইউরোপ থেকে মোট অভিবাসন (হাজার জন)	প্রধান অঞ্চল/দাতা দেশসমূহ (হাজার জন)
1821-1830	144	আয়ারল্যান্ড-51, গ্রেট-ব্রিটেন-25, জার্মানি এবং অন্যান্য দেশ থেকে বাকি অংশ।
1871-1880	2,272	জার্মানি-718, গ্রেট ব্রিটেন-584, আয়ারল্যান্ড-437, সুইডেন-116 এবং অন্যান্য।
1901-1910	8,136	অস্ট্রিয়া, হাঙ্গেরী-21,145, ইত্যালি-204, রাশিয়া-1,597, গ্রেট ব্রিটেন-526 এবং অন্যান্য।
1961-1970	1,134	দক্ষিণ ইউরোপ-421, উত্তর-পূর্ব ইউরোপ-39, মধ্য ইউরোপ-93, জার্মানি-211 এবং অন্যান্য।

সূত্র ঃ Broek and Webb, Geography of Mankind, 1978

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ঠিক পর পরই পশ্চিমজগতে বড় মাপের আন্তর্জাতিক পরিযাণ ঘটে গেল। এই সময় প্রায় 12,00,000 উদ্বাস্তুও এক দেশ থেকে অন্য দেশে গিয়ে বসবাস শুরু করল। নিচের সারণিতে 1945-1952 সালের মধ্যে আন্তর্জাতিক পরিযাণের চিত্রটি তুলে ধরা হল :

সারণি : আন্তর্জাতিক পরিযাণ

মহাদেশ	সংখ্যা
ইউরোপ থেকে পরিযাণ	4,452,000
ইউরোপে পরিযাণ	1,150,000
অন্যান্য আন্তর্মহাদেশীয় পরিযাণ	710,000
মোট	6,312,000

***Source** : Spencer, J.E., et. al.,* **Cultural Geography,** 1954

এই সময়কার (1945-1952) বিভিন্ন দেশ থেকে পরিযায়ী জনতা এবং বিভিন্ন দেশে আগত জনসংখ্যা নিচের সারণিতে দেখানো হল :

সারণি : ইউরোপ থেকে পরিযাণ (1945-1952)

বহির্পরিযাণ	সংখ্যা	অন্তর্পরিযাণ	সংখ্যা
গ্রেট ব্রিটেন	1,107,000	যুক্তরাষ্ট্র	1,104,000 (27%)
ইতালি	741,000	আর্জেন্টিনা, ব্রাজিল, ভেনিজুয়েলা	883,000 (21%)
নেদারল্যান্ডস্	318,000	কানাডা	726,000 (17%)
স্পেন	272,000	অস্ট্রেলিয়া	697,000 (17%)
পর্তুগাল	152,000	ইজরায়েল	526,000 (13%)
		নিউজিল্যান্ড	75,000 (2%)
		দক্ষিণ আফ্রিকা	125,000 (3%)

Source : পূর্বের ন্যায়

অন্তর্দেশীয় বা আন্তঃরাজ্য প্রবহমানতা (Inland or Inter-state Migration)

যখন কোন ব্যক্তি এক রাজ্যের মধ্যেই বা একরাজ্য থেকে অন্য রাজ্যে গিয়ে স্থায়ী বা অস্থায়ীভাবে বসবাস করেন, তখন তাকে আমরা অন্তর্দেশীয় বা অন্তরাজ্য প্রবহমানতা বলি। প্রবহমানতার বিচারে আন্তর্জাতিকতার চেয়ে অন্তর্দেশীয় প্রবহমানতা দীর্ঘস্থায়ী, চিরস্থায়ী ও স্বল্পস্থায়ী হতে পারে। ধরা যাক রাশিয়া ও কানাডার মেরু অঞ্চল, কঙ্গো অববাহিকার নিরক্ষীয় বনভূমি অঞ্চলের অংশবিশেষ, মধ্য ভারতের দণ্ডকারণ্য ও আন্দামান-নিকোবরের জনহীন, বন্ধ্যা ও অকর্ষিত অঞ্চলে বসতি স্থাপন। প্রতিটি নতুন ক্ষেত্রেই সরকারি সহায়তায় উপনিবেশ স্থাপন সম্ভব হয়েছে। কারণ বর্তমান দিনে একক প্রচেষ্টায় প্রতিকূল প্রকৃতিকে বশে আনা কষ্টসাধ্য ব্যাপার।

বর্তমানে অন্তর্দেশীয় প্রবহমানতার আরও প্রকৃষ্ট উদাহরণ হল গ্রাম্য জনশূন্যতা। প্রবহমানতার ফলে খুব বেশি সংখ্যায় জনবল কমে যাওয়ার ঘটনা লক্ষ্য করা গেছে। বিচ্ছিন্ন এলাকা ও দেশের শেষ সীমানায় অথবা চরম প্রাকৃতিক অসুবিধাজনক এলাকাতে প্রেরণা উদ্দীপক (Push Stimuli) শক্তি বেশি কাজ করে। স্কটল্যান্ডের উত্তর-পশ্চিম উচ্চভূমি, আল্পসের উচ্চ পার্বত্য উপত্যকা অঞ্চল, নরওয়ের উপকূল থেকে দূরে অবস্থিত স্কেরী দ্বীপগুলোতে এই ধরনের জনশূন্যতা লক্ষ্য করা গেছে। আগেই বলা হয়েছে যে যুবক-যুবতীরা প্রব্রজনে বেশি রকম অংশ নেন। ফলে জন্মহার কমে যায়। এসব কারণের ফলে গ্রামে লোকসংখ্যা ক্রমশ কমতে থাকে।

এই অবস্থায় গ্রামবাসীদের একটা বড় অংশ শহরে গিয়ে ভিড় করেন। সত্যি কথা বলতে কি, এই ধরনের সঞ্চারমানতা সাম্পরিতককালে দ্রুত নগরায়ণে (urbanisation) সাহায্য করেছে। বড় বড় শহরগুলো আরও ফুলে-ফেঁপে উঠছে। কয়েকটি শহর ও নগর একত্রিত হয়ে মহানগর সৃষ্টি করেছে। কয়েকটি দেশের উদাহরণ দিলে বিষয়টি পরিষ্কার হবে। 1925 সালে জাপানে মোট জনসংখ্যার 22 শতাংশ শহরে বাস করতেন। 1970 সালে তা বেড়ে দাঁড়াল 72; রাশিয়ায় 1925 সালে শতকরা 18 ভাগ ছিলেন শহরবাসী; 1973-এ গিয়ে তা দাঁড়াল 57; ফরাসিদেশে 1921 সালে শতকরা 46 ভাগ ছিলেন শহরবাসী, 1974 সালে তা বেড়ে দাঁড়াল 72, আর ভারতে 1901 সালে শতকরা 11 ভাগ ছিলেন শহরবাসিন্দা, 1991-তে তা বেড়ে গিয়ে দাঁড়িয়েছে 26 ভাগ।

এখন প্রশ্ন উঠতে পারে যে শহরায়নের শেষ সীমা কোথায়? বিভিন্ন শহরের জনসংখ্যা সংক্রান্ত পরিসংখ্যান থেকে এটা দেখা গেছে যে অনেক শহরেই জনসাধারণ ক্ষমতা তাদের শেষ পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে। মাত্রাতিরিক্ত

জনসংখ্যা, পথে মানুষ ও গাড়ি-ঘোড়ার ভীড়, জমির আকাশ ছোঁয়া দাম ও স্বাস্থ্যহানির কারণে অনেক শহরেই বহির্মুখী প্রবাহ (Outward Flow of Population) লক্ষ্য করা গছে। ফলে, শহরতলি এলাকা ক্রমশই জনাকীর্ণ হচ্ছে। তবে এ ঘটনা এখনও পর্যন্ত পাশ্চাত্য দেশগুলোতে সীমাবদ্ধ। উপরোক্ত পরিবেশ ও শহরায়ন সমাজব্যবস্থায় দেখা গেছে যে মানুষ বংশ-পরম্পরায় তার পারিবারিক পেশাকে আঁকড়ে রেখেছিলেন। কিন্তু অর্থনৈতিক অবস্থা পাল্টানোর দরুন অনেক পুরোনো পেশা থেকে সংসার চালানো কঠিন হয়ে পড়েছে। তাই বর্তমান আর্থ-সমাজব্যবস্থায় অনেকেই তাঁদের ধারাবাহিক জীবিকা ছেড়ে শহরের দিকে পাড়ি দিচ্ছেন। এছাড়া নতুন নতুন শিল্পনগরীতে চাকরির আশায় তাঁরা ভিড় করছেন। ফারাক্কায় তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার ফলে অনেকেই সেখানে কর্মোপলক্ষ্যে স্থায়ীভাবে অভিবাসন করেছেন। স্বাধীনতার পরপরই দুর্গাপুর শিল্পনগরী প্রতিষ্ঠা হলে অনেকেই সেখানে চাকরি নিয়ে পাকাপাকিভাবে বসবাস করছেন। নিয়মমাফিক বদলি অনেক চাকরির এক স্বাভাবকি অঙ্গ। রাজ্য সরকারি চাকরিতে বদলি রাজ্যের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে, কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকারি চাকরিতে—বিশেষ করে আধিকারিক (অফিসার) পর্যায়ে বদলি ভারতের যে কোন প্রান্তেই হতে পারে।

ব্যবসা-বাণিজ্যের খাতিরে অনেকেই দেশের বাইরে থাকেন। বহুক্ষেত্রে এই সঞ্চারমানতা কাছাকাছি অঞ্চলের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে, আবার বহুদূরবর্তী দেশেও তা হতে পারে। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে মারোয়াড়ী সম্প্রদায়ের অধিকাংশ মানুষ ব্যবসার খাতিরে সুদূর মারোয়ার (রাজস্থান) থেকে ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছেন ও সেইসব স্থানে পাকাপাকিভাবে বসবাস করছেন। বিয়ের পর মেয়েদের শ্বশুরবাড়িতে বাস করতে হয়। এটা একটা স্থায়ী অন্তর্দেশীয় প্রবহমানতার ্দাহরণ। উপরোক্ত প্রায়-স্থায়ী প্রবহমানতা ছাড়া কিছু স্বল্পমেয়াদী প্রবহমানতা লক্ষ্য করা যায়। যেমন শীতের সময় উচ্চ পার্বত্য অঞ্চলের বাসিন্দাদের উঁচু এলাকা থেকে নিচের উপত্যকায় নেমে আসা, আবার শীতের শেষে পুরনো জায়গায় ফিরে যাওয়া কিংবা জনবহুল অঞ্চলের কৃষিশ্রমিকের চাষের মরসুমে (শস্য বোনা ও কাটা) অপেক্ষাকৃত জনবিরল অঞ্চলে বা সামাজিক উৎসব উপলক্ষ্যে আত্মীয়দের যাওয়া-আসা এ সবই স্বল্পমেয়াদী সঞ্চারমানতার মধ্যে পড়ে। পরে আমরা এই সব স্বল্পমেয়াদী সঞ্চারমানতা সম্বন্ধে আলোচনা করব।

মরসুমী পরিযাণ (Seasonal Migration)

প্রকৃতিতে যেমন দিনের পর রাত আসে তেমনি শীতের পর আসে গরমকাল, গরমকালের পর শীতকাল। তার-ই তালে তালে চলে কিছু লোকের জীবিকা সংস্থান। যাযাবর বৃত্তি এমনই এক ঋতুভিত্তিক সঞ্চারমানতার উদাহরণ। প্রকৃত যাযাবররা ইতস্তত বিক্ষিপ্ত বৃষ্টিপাত ও অন্যান্য অনুকূল পরিবেশের ওপর নির্ভর করে একস্থান থেকে অন্যস্থানে ঘুরে বেড়ান। মধ্যপ্রাচ্যে, বিশেষ করে আরবের মরুভূমিতে, ইরাক, জর্ডন ও সিরিয়াতে 30 থেকে 40 লক্ষ যাযাবরের সন্ধান মেলে। অনুমান করা হয় যে সিরিয়ায় এ রকম বেদুইনের সংখ্যা কয়েক কোটি, বিরাটাকার আরব মরুভূমিতে সম্ভবত 30 লাখ, ইরাক ও জর্ডনে 10 লাখ। স্বাধীনতাপ্রিয় বেদুইনদের মধ্যে এক শ্রেণির পর্যবেক্ষক (স্লইব) থাকেন। তাঁদের কাজ ছিল বিক্ষিপ্ত বৃষ্টিপাতের খবর দেওয়া। খবর পাওয়া মাত্র তাঁরা অস্থায়ী তাঁবু তুলে নিয়ে সেই স্থানে যান। তাঁরা একস্থানে বেশিদিন থাকেন না। এছাড়া, মরুদ্যান এবং যেখানে উপজাতিদের কুয়ো রয়েছে, অল্প গাছপালা ও ঘাস রয়েছে, সেখানেই তাঁরা উটের পাল নিয়ে হাজির হন। আরবের হায়িল (Hayil) ও রিয়াধের (Riadh) মধ্যে প্রায় অধিকাংশই যাযাবর। এঁরা অস্থায়ীভাবে বাস করেন। ইরান ও সিরিয়ার মমৌরা অঞ্চলের তৃণক্ষেত্রে কয়েকটি উপজাতি বাস করেন। সাহারার বিস্তীর্ণ অঞ্চলে আজও কয়েক লাখ যাযাবর বাস করেন। সাহারার উত্তর-পশ্চিমে রিকুইবাট (Requibats) নামে এক যাযাবর জাতি আজও প্রাণশক্তিতে উচ্ছল। সামান্য বৃষ্টিপাতের ওপর নির্ভর করে তাঁরা মরক্কো ও পশ্চিমে আলজিরিয়া ও

সাহারায় 300 কিমি থেকে 1,000 কিমি পর্যন্ত পথ পাড়ি দেন। ভেড়ার ছেয়ে উট মরুভূমিতে পথ চালর পক্ষে আদর্শ প্রাণী। তাই যে সব বেদুইনদের উই আছে তাঁরা বেশি পথ চলতে পারেন। বহুদিন যাবৎ রিকুইবাটরা মরক্কো বাজারে পশু, পশম ও নুন বিক্রয় করতেন। আর বিনিময়ে, কাপড় ও অন্যান্য জিনিসপত্র কিনতেন। আস্তে আস্তে এঁরা উন্নত জীবনযাপনের দিকে এগাচ্ছেন—ময়দা, চা ও চিনি কিনছেন। কেউ কেউ শ্রমিকের কাজ বা সেনাবিভাগে যোগ দিচ্ছেন। এতে করে কোন কোন পরিবার সুখের মুখ দেখছেন (Brunhes, 1952)।

সত্যিকারের যাযাবররা বাস করেন সাহারার পূর্ব, পশ্চিম ও দক্ষিণে। এঁদেরকে বাল হয় আহগ্গার (Ahaggar)। এঁদের সামাজিক শ্রেণিবিন্যাসে লক্ষ্য করা যায় যে মোট জনসংখ্যার 33 ভাগ দাস শ্রেণির, 12 ভাগ প্রভু শ্রেণির, আর অবশিষ্ট 55 ভাগ নির্ভরশীল প্রজা। দাস শ্রেণির যাযাবররা পশুর পাল নিয়ে খাবারের খোঁজে দক্ষিণদিকে 1,000 কিমি পর্যন্ত পথ চলেন। তাঁদের পরিবাররা ছাগল, গাধা ইত্যাদি নিয়ে তাঁবুতে বাস করেন। দূরত্ব অনুযায়ী এই সব যাযাবরদের সঙ্গে স্থানীয় অধিবাসীদের জিনিসপত্রের আদান-প্রদান এক এক রকম হয়। এই ধরনের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ভাঙনের মুখে। আজ উটের স্থান নিয়েছে লরি। চাষীরা সরকারি সাহায্য পাচ্ছেন। মানুষের চাহিদাও দিন দিন বাড়ছে। দোকানেও হরেক রকমের লোভনীয় উপকরণ পাওয়া যাচ্ছে। মোটের ওপর বলা চলে যে যাযাবরদের অবস্থা দিনে দিনে খারাপ হয়ে পড়ছে। সভ্যতার ছোঁয়া, সরকারি নিয়ন্ত্রণ, উন্নত পরিবহন ব্যবস্থা ক্রমশই যাযাবরদের পরিব্রাজন এলাকা কমিয়ে দিচ্ছে। তাই যাযাবর বৃত্তি শুধুমাত্র পশুচারণ পর্যায়ে এসে ঠেকেছে। এ ছাড়া, কিছু কিছু গোষ্ঠীর জনসংখ্যা এত তাড়াতাড়ি বেড়েছে যে তাঁদেরকে যাযাবর বৃত্তির বদলে অন্য জীবিকা অবশ্যই খুঁজে নিতে হবে। মরুভূমিতে খনিজ তেলের আবিষ্কার ও জলসেচের আধুনি ব্যবস্থাও তাঁদের নতুন জীবিকার প্রতি হাতছানি দিচ্ছে।

আংশিক-যাযাবর বৃত্তি (Semi-nomadism)

অনেক রদবদলের মধ্যে দিয়ে যাযাবররা আজ এক ধরনের জীবিকার খোঁজ পেয়েছেন, যা আংশিক যাযাবর বৃত্তি নামে পরিচিত। এই বৃত্তি হয় একটি নির্দিষ্ট স্থানে সীমাবদ্ধ (যা মরূদ্যান ও বিশাল তৃণক্ষেত্রের সঙ্গে যুক্ত), নয় দুই বিপরীত ধরনের জলবায়ু অঞ্চলে গড়ে উঠেছে।

উত্তর সাহারায় আংশিক যাযাবর বৃত্তির এক বিশেষ বৈশিষ্ঠ্য লক্ষ্য করা যায়। মরুভূমির এই প্রান্তে যাযাবরদের আসা যাওয়া আছে। অতীতে খুব বেশি রকম আংশিক যাযাবর বৃত্তি চালু থাকলেও বর্তমানে কৃষিকে কেন্দ্র করে কিছু উপনিবেশ গড়ে উঠেছে। ফলে, এই ধরনের পরিবেশ আংশিক যাযাবর বৃত্তির পক্ষে সহায়ক নয়। উত্তর আফ্রিকার এই সীমান্তে ফরাসি শাসন যাযাবর বৃত্তিকে প্রায় শেষ পর্যায়ে এনে ফেলেছে। আজকের দিনে এই বৃত্তি মুষ্টিমেয় কিছু ব্যক্তির মধ্যে ও কয়েকটি নির্দিষ্ট জায়গায় সীমাবদ্ধ রয়েছে। এর কারণ হল চাষবাসের উন্নতি, সম্পত্তি আইনের রদবদল, ফসল কাটার নির্দিষ্ট সময়, কুয়ো বানান ও যাতায়াতের পথে চটির ব্যবস্থা।

মধ্যপ্রাচ্যে মেষপালকরা নিয়ন্ত্রিতভাবে প্রব্রজন করে তাকেন। তাঁরা চাষের জমির কাছাকাছি বাস করেন। শুধুমাত্র পশুদের খাবারের খোঁজে তাঁরা বের হন। আজকাল মোটরগাড়ির দৌলতে একটি নির্দিষ্ট জায়গা থেকে লরি থেকে পশুপালকে তৃণক্ষেত্রে নিয়ে যাওয়া হয়। এইভাবে চিরাচরিত যাযাবর বৃত্তির শেষ সীমায় স্থায়ী বসতির জন্ম হচ্ছে। এই নতুন ধরনের যাযাবররা প্রতিবেশী স্থায়ী বাসিন্দাদের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কে গনে তুলেছেন, তা সে সাধারণ পশুচারণ ভূমির (যাযাবর পশুচারণের উদ্দেশ্যে) জন্যই হোক বা সামী (Samme) নামে বেড়ার দুধ থেকে তৈরি জনপ্রিয় মাখনের (স্থায়ী বাসিন্দাদের কাছে বিনিময়ের উদ্দেশ্যে) জন্যই হোক (Beaujeu-Garnier, 1966)।

পৃথিবীর সবখানেই যাযাবর বৃত্তির পরিবর্তন ও ক্ষেত্রবিশেষে পরিবর্জন লক্ষ্য করা গেছে। আজকের দিনে অল্প কয়েকজন বিশেষজ্ঞ পশুপালদের নিয়ে দূরে চড়াতে যান। অধিকাংশ যাযাবর স্থায়ী বাসিন্দায় পরিণত হচ্ছেন। দক্ষিণ সাহারা ও সুদানে উপনিবেশ স্থাপন, মধ্য এশিয়ায় সরকারি প্রচেষ্টায় সেখানকার বাসিন্দারা যাযাবর বৃত্তির বদলে স্থায়ী কৃষিজীবন বেছে নিচ্ছেন।

একসময়ে উত্তরাঞ্চলে (কুমায়ুন ও গাড়োয়াল এলাকায়) 'ভাটিয়া' নামে এক জনগোষ্ঠীর মধ্যে আংশিক যাযাবর বৃত্তি চালু ছিল। কারণ এই সুউচ্চ পার্বত্যাঞ্চলের রুক্ষ ভূমিভাগ, প্রতিকূল আবহাওয়ায় চাষবাসকে জীবনধারণের একমাত্র অবলম্বন হিসেবে গ্রহণ কার অসম্ভব ছিল। পাহাড়ি অঞ্চলের মাটির স্তর খুব পাতলা, ফলে তার ফসল ফলাবার ক্ষমতাও কম। তাই এ অঞ্চলে চাষবাস কার এক কষ্টসাধ্য ব্যাপার। এই সব কারণেই তাঁরা ব্যবসাকে জীবনের প্রধান অবলম্বন হিসেবে নিয়েছিলেন। তিব্বতের সঙ্গে তাঁদের বাণিজ্যিক লেনদেন ছিল। বছরে তাঁরা সেখানে দু'বার করে বাণিজ্য করতে যেতেন। প্রথমবার, জুনের শেষে বা জুলাইয়ের প্রথমে অর্থাৎ ফসল বোনার পর। আর, দ্বিতীয়বার ফসল তোলার পর সেপ্টেম্বর মাসে। তাঁদের মালবহন ও যাতায়াতের প্রধান অবলম্বন ছিল ঝাব্বু, টাট্টু ঘোড়া, তিব্বতী ঘোড়া ও ভেড়া। এই সব পশুদের চারণভূমি বা বুগিয়ালের খোঁজে এদের ক্রমাগত একস্থান থেকে আরেক স্থানে যেতে হত। ভোটিয়ারা যখন তিব্বতে বাণিজ্য করতে যেতেন, তখন তিব্বতী চারণবূমিতে চরাবার জন্য বেড়াদেরকে আলওয়াল বা পশুপালকদের অধীনে রেখে যেতেন। তিব্বন থেকে তাঁরা কিছু মাল নিয়ে আসতেন। সেগুলো উত্তরাঞ্চলের বিভিন্ন অংশে নভেম্বর থেকে এপ্রিল মাস পর্যন্ত যে বাণিজ্য মেলা বসত তাতে বিক্রি করা হত। তাঁরা তিব্বত থেকে বোরক্স বা সোহাগা, নুন, পশম, গুঁড়ো সোনা, টাট্টু ঘোড়া নিয়ে আসতেন। নানা রকম ফসল, পশমী জামা, দাতুর তৈরি জিনিষপত্র নিয়ে তাঁরা তিব্বতে যেতেন। কিন্তু 1962 সালে ভারত-চিন যুদ্ধের পর থেকে তিব্বতের সঙ্গে এই বাণিজ্যে ভাঁটা পড়েছে (Negi, 1993-94)।

পার্বত্যাঞ্চলে পশুপালকগোষ্ঠীর ঋতুভিত্তিক সঞ্চারমানতা (Transhumance of Pastoral Herders in Mountain Areas)

বাইবেলের বিভিন্ন আখ্যানে পশুপালক সমাজের মধ্যে যাযাবরী পশুপালনের উল্লেখ আছে। ভারতে গুজ্জর, গাদ্দি, নিলাং, মার্চিয়া, আনওয়াল, জোহরি উপজাতির লোকজন যাযাবরী পশুপালক সমাজের উদাহরণ।

এই ধরনের প্রব্রজনের বৈশিষ্ট্য হল ঋতু অনুযায়ী বিভিন্ন উচ্চতায় পশুপালক গোষ্ঠীর ভ্রাম্যমাণ জীবন। পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে বহুকাল ধরে এই ধরনের সঞ্চারমানতা চলে আসছে। শীতকালে প্রচণ্ড শীতের দ্রুন পর্বতের খুব উঁচু অঞ্চলের বাসিন্দারা সেই স্থান ত্যাগ করে উপত্যকায় আশ্রয় নিতে বাধ্য হন। এই সময় তাঁরা পশুদের আস্তাবলে রেখে দেন। বসন্তকালে বরফ গললে আবার তাঁরা উঁচু এলাকায় উঠে যান। ইউরোপের সমস্ত পার্বত্যাঞ্চলে এক সময় ঋতুগত সঞ্চারমানতা লক্ষ্য করা যেত। পাদ্রী, স্কুলশিক্ষক থেকে শুরু করে সমস্ত গ্রামবাসী এতে অংশ নিতেন। পর্বতের ঢালে একটু দূরে দূরে সে সব কাঠের কুঁড়েঘরের (htment) চিহ্ন আজও যৌথ-সঞ্চারমানতার কথা মনে করিয়ে দেয়। সমতল ভূমি ও নিচু উপত্যকায় চাষবাসের এলাকা বাড়ার ফলে গ্রামবাসীরা স্থায়ীভাবে পার্বত্যাঞ্চল থেকে আস্তানা গুটিয়েছেন। পক্ষান্তরে, শুফের (Souf) রেবাইয়া (Rebaia)-রা আংশিক যাযাবর বৃত্তিকে আজও অক্ষত অবস্থায় রেখে দিয়েছেন। তাঁদের প্রত্যেকের নিজস্ব উট, ভেড়া ও ছাগল রয়েছে। তাঁদের সুসংবদ্ধ যাযাবর জীবন আজও স্থায়ী ঘর বাঁধতে বাধা দান করছে। শরৎকালে 2 থেকে 4 মাস পর্যন্ত তাঁরা তাল চাষ, খেজুর সংগ্রহ ইত্যাদি করে থাকেন। ডিসেম্বর থেকে ফ্রেব্রুয়ারি মাস পর্যন্ত উপজাতিরা চারদিকে ঘাসের খোঁজে বেরিয়ে পড়ে। কেউ কেউ উত্তরদিকে নেমেঞ্চা (Nemencha) পর্বত পর্যন্ত

যান। অন্যরা আর্গ (Erg) পর্যন্ত যান। গবাদি পশুরা আচেব (Acheb) নামে এক ধরনের ঘাস খায় ও প্রচুর দুধ দেয় (Brunhes, 1952)। মে মাসে তাঁরা মরূদ্যানে ফিরে আসেন। জনহিতকর কার্য, জলসেচ ও পরিবহন ব্যবস্থার উন্নতি এবং গত কয়েক বছর ধরে সামরিক তৎপরতার দরুন গবাদি পশুর মৃত্যু তাঁদেরকে স্থায়ী বাসিন্দা হতে বাধ্য করেছে। যেমন ওউরাগলাতে (Ouragla) পুরোনো যাযাবরদের প্রায় অর্ধেকই স্থায়ী বাসিন্দায় পরিণত হয়েছেন। তবে নতুন জীবনের মধ্যে পুরোনো কিছু ছোঁয়া রয়েই গেছে। যেমন প্রাক্তন যাযাবরদের স্ত্রীরা আজও চাষবাস অংশ নেন যা স্থায়ী বাসিন্দাদের স্ত্রীলোকেরা করেন না। নতুন গ্রাম ঐ পুরোনো তাঁবুর ধারেই তৈরি করা হয়। সুতরাং বাড়িগুলো এক সারিতে থাকে, কিন্তু অনেকখানি জায়গার ওপর ঘর তোলা হয়।

পূর্ব আফ্রিকায় যাযাবর বৃত্তির প্রবণতা আজও রয়ে গেছে। এখানে মরুবুমির প্রাকৃতিক পরিবেশ তো রয়েই গেছে। সরকারি হিসেব অনুযায়ী শতকরা 15 ভাগ লোক যাযাবর, কিন্তু বেসরকারি মতে প্রায় 40 ভাগ। বর্ষার সময় তাঁরা স্থায়ী গ্রামে বাস করেন। সেই সময় তাঁরা ফসল ফলান, গ্রামের আশেপাশে পশু চরান। তারপর বর্ষার শেষে তাঁরা ডিসেম্বর মাসে পশুদের নিয়ে চরাতে বের হন ও প্রতি রাতে ফিরে আসেন। ফেব্রুয়ারি মাসে যখন প্রচণ্ড খরা চলে, তখন তাঁরা পশুর পালকে নদীতে বা জাল জায়গায় নিয়ে যান।

সোমালি সাধারণতন্ত্রের তিন ভাগ লোক যাযাবর, যাদের একমাত্র কাজই হল পশুদের জন্য তৃণক্ষেত্র ও জলাশয় খুঁজে বেড়ানোর।

ট্রান্সহিউম্যান্স বা যাযাবরী পশুপালন ছাড়া ধর্মীয় উদ্দেশ্যে ঋতুগত পরিব্রাজন লক্ষ্য করা যায়। যেমন—কেদারনাথ, বদ্রীনাথ, পঞ্চকেদার, অমরনাথ প্রভৃতি ধর্মীয় স্থানগুলোতে পূজা-উপসনার উদ্দেশ্যে গ্রীষ্মের শুরুতে মন্দির অভিমুখে পরিব্রাজন, আবার শীতের গোড়ায় নেমে আসা হল ধর্মীয় কারণে যাযাবরী পশুপালনের উদাহরণ।

দৈনিক সঞ্চারমানতা (Daily Movement)

পৃথিবীর সব দেশেই ঋতুগত প্রবহমানতা কমে আসছে, কিন্তু দৈনিক সঞ্চারমানতা বাড়ছে, কী দূরত্বের দিক দিয়ে, কী লোকসংখ্যার দিক দিয়ে। এটা সম্ভবপর হয়েছে আধুনিক পরিবহন ব্যবস্থার দৌলতে।

এখন প্রশ্ন উঠতে পারে কেন এই দৈনিক সঞ্চারমানতা? উত্তর হল কর্মীদের বাসস্থানের কাছে তাদের কর্মস্থল নাও থাকতে পারে। সুতরাং কোন শহরে বড় কারখানা বা কয়েকটি কারখানা থাকলে বা অনেক অফিস বা বড় ব্যবসা কেন্দ্র থাকলে সেখানেই শ্রমিক বা চাকুরিজীবীরা কাজের খাতিরে আসবেন। সত্যিকারের দৈনিক সঞ্চারমানতা বলতে আমরা বুঝি প্রতিদিন জীবিকার তাগিদে যে জনতা শহরতলি বা গ্রামাঞ্চল থেকে নগরে হাজির হন, আবার কাজের শেষে তাঁদের বাসস্থানে পিরে যান। এর ফলে দিনের বিশেষ সময় সেই জায়গা জনাকীর্ণ হয়, আবার অন্য সময় সেই জায়গা খাঁ খাঁ করতে থাকে। উদাহরণ হিসেবে কলকাতার ডালহৌসী অঞ্চলের কথা বাল যেতে পারে। এখানে অফিসের সময় সকাল 9-30 মিঃ থেকে সন্ধ্যা 6-টা পর্যন্ত দৈনিক যাত্রীদের (commuter) সমাবেশ দেখা যায়। তারপরই এই অঞ্চল ফাঁকা হয়ে পড়ে। আজ বৈদ্যুতিক ট্রেনের দৌলতে প্রায় 200 কিমি দূর থেকেও কলকাতা শহরে প্রায় কয়েক লাখ দৈনিক যাত্রীর সমাবেশ ঘটে। এখানে স্মরণ করা যেতে পারে যে এই দৈনিক সঞ্চারমানতা দূরত্ব নির্ভর করে কোন শহরের আকর্ষণশক্তির ওপর। সন্দেহ নেই যে পরিবহন ব্যবস্থার উন্নতি এই দৈনিক সঞ্চারমানতার দূরত্ব নির্ভর করে কোন শহরের আকর্ষণশক্তি ওপর। সন্দেহ নেই যে পরিবহন ব্যবস্থার উন্নতি এই দৈনিক সঞ্চারমানতায় সাহায্য করছে। অবশ্য এটাও সত্যি যে মানুষ শহরের কোলাহল থেকে দূর থাকতে চান।

এ কথা ঠিক যে পৃথিবীর বড় বড় নগরে দৈনিক যাত্রীর সংখ্যা বাড়ছে। ধরা যাক, কলকাতা শহরের কথা। এখানে গত কয়েক বছরে যাতায়াত ব্যবস্থার মিনিবাস, স্পেশাল, চাটার্ডবাস, মেট্রোরেল ইত্যাদি যোগ হয়েছে।

এ ছাড়াও বেসরকারি বাসের অনেক নতুন রুট চালু হয়েছে। তবুও দৈনিক যাত্রীদের যাতায়াত-সমস্যা মেটেনি। এই দৈনিক যাত্রীদের সংখ্যা বাড়ার কারণই হল উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থার সুযোগ, ব্যক্তিগত অভিরুচি, পূর্বতন পরিকল্পনাবিদ্‌দের দূরদৃষ্টির অভাব অর্থাৎ বিভিন্ন এলাকায় অফিস, বাণিজ্যকেন্দ্র গড়ে তোলার বদলে মহানগরীর একটি স্থানে সমস্ত কিছুর কেন্দ্রীকরণ। ইদানীংকালে কলকাতার কেন্দ্রবিন্দু (ডালহৌসী বা 'বিবাদী বাগ') থেকে কিছু অফিস সল্টলেক উপনগরীতে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হলেও তা প্রয়োজনের তুলনায় কম।

কোথায় বাস করবেন এটা কর্মীরা নিজে থেকেই ঠিক করেন অথবা ঠিক করতে বাধ্য হন। কর্মস্থলে গৃহসমস্যা থাকতেই পারে, আবার নিজ জন্মস্থানের বা পরিচিত স্থানের প্রতি মমত্ববোধও এক্ষেত্রে কর্মীকে কর্মস্থল থেকে দূরে থাকতে উৎসাহিত করে। এছাড়া, পৈতৃক বাড়িতে বিনা ভাড়ায় থাকা যায়। ভালো বাড়ি ভাড়া পাওয়া একটি বিরাট সমস্যা। বাসস্থান থেকে কর্মস্থলে যাতায়াত করতে দিনের অধিকাংশ সময়ই কেটে যায়। তবুও অনেকটা বাধ্য হয়েই অল্প ও মাঝারি আয়ের ব্যক্তিরা বহু দূর-দূরান্ত থেকে কর্মস্থলে আসতে বাধ্য হন। এক্ষেত্রে পশ্চিমী দেশগুলোর কথা আলোচনা করা যেতে পারে। সেখানে শহরের কেন্দ্রস্থলগুলো হল পুরোনো ও ঘিঞ্জি এলাকা, যেখানে কলকারখানা ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। তাই উচ্চ আয়বিশিষ্ট ব্যক্তিরা ধোঁয়া-ধুলো এড়াতে শহর থেকে দূরে প্রশস্ত সবুজ অঞ্চল বেছে নেন বাসস্থান হিসেবে। সবশেষে বলা যায় শহরে বেশি আয়ের সুযোগই অনেককে কোন গ্রাম বা ছোট শহর থেকে নগরে যাতায়াত করতে বাধ্য করেন।

অবসর ও প্রবহমানতা (Leisure and Movement)

বিশ্রাম কাজেরই অঙ্গ, এক সূত্রে গাঁথা। দৈনিক একঘেয়েমি কাজে ক্লান্তি আসে। তাই মানুষ কাজের ফাঁকে ফাঁকে চায় বিশ্রাম। প্রতিদিন কাজের শেষে মানুষ বাড়ি ফিরে রাতে বিশ্রাম করেন, আর বিশ্রামই তাকে পরদিন কাজে স্পৃহা যোগায়। দৈনিক বিশ্রাম ছাড়াও মানুষ সপ্তাহে দেড় দিন বা ক্ষেত্রবিশেষে দু'দিন ছুটি পান। অনেকে ক্ষেত্রে দেখা যায় বৈচিত্র্য-পিয়াসী মানুষ এই সুযোগে কাছাকাছি কোথাও দু-একদিনের জন্য ঘুরে আসেন। পশ্চিমী দেশগুলোতে এই সপ্তাহ ভ্রমণ (week end) খুবই জনপ্রিয়। এতো গেল সপ্তাহে দু'দিন ছুটির ব্যাপার। একটানা লম্বা ছুটি পাওয়া যায় বছরের কোন নির্দিষ্ট সময়ে। আর তখনই ভ্রমণপিয়াসী মানুষ দীর্ঘ পথ-পরিক্রমায় বের হন। এক এক অঞ্চলে এক এক ঋতুতে কাজে ফুরসত মেলে। যেমন, নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলের কর্মীরা শীতকালে কর্মক্ষেত্রে অবসর পান, আর ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের কৃষিজীবীরা গরমকালে, পশ্চিমী দেশগুলোর স্কুল-কলেজের ছাত্রছাত্রীরা গরমকালের সুন্দর আবহাওয়ায় ছুটি উপভোগ করতে বাইরে বেরিয়ে পড়ে। স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা বাৎসরিক ক্লাসের ফাঁকে ফাঁকে মাঝে মাঝে ছুটি পান। বলতে গেলে তাঁরাই সবচেয়ে বেশি অবসরভোগী। ছুটি হয়ে গেলে মা-বাবারা বাড়ি থেকে দূরে তাঁদের অন্য পরিবার বা আত্মীয়-স্বজনদের কাছে বা বিশেষ শিবিরে পাঠিয়ে নদ। বছরে কয়েকবার তাঁরা এই ধরনের ভ্রমণে অংশ নেন। কোন কোন সময় মায়েরা তাঁদের সঙ্গে যান ও বাবার বাৎসরিক অফিস ছুটিতে ঐ অস্থায়ী বাসস্থানে মিলিত হন। এ ভাবেই ভ্রমণের মধ্যে দিয়ে কর্ম ও আনন্দ দু'য়েরই খোরাক মেলে। এই ধরনের অবসরকালীন ভ্রমণ ক্রমশ বাড়ছে, আর তা সম্ভব হয়েছে আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার উন্নতির ফলে। তাই দেখা যায় একশ বছর আগেও মাত্র কিছু সংখ্যক ব্যক্তি এই ধরনের ভ্রমণে অংশ নিতেন। কিন্তু আজ অনেক দেশেই শ্রমজীবী মানুষ স্বল্পকালীন ভ্রমণে অংশ নেন।

কৃষিগত পরিযাণ (Agricultural Migration)

কৃষিতে সব সময় সমানসংখ্যক শ্রমিকের দরকার হয় না। জলবায়ুর ওপর নির্ভর করে এক এক দেশে এক এক সময়ে চাষবাস হয়। অন্য সময় চাষীদের হাতে কাজ থাকে না। এমন অনেক স্থান আছে যেখানে জনসংখ্যা

খুব কম, আবার কিছু এলাকা আছে যা আর্থিক দিক দিয়ে সমৃদ্ধশালী। উভয় অঞ্চলেই ক্ষেতমজুরের অভাব থাকা স্বাভাবিক। এই কারণে জনাকীর্ণ অঞ্চল থেকে ঐ দুই অঞ্চলে চাষবাসের সময় কৃষিশ্রমিক জীবিকার তাড়নায় ছুটে আসেন। উন্নতশীল দেশগুলোতে কৃষিকাজে যন্ত্র প্রচলনের আগে এই ধরনের পরিযাণ খুব লক্ষ্য করা যেত। তবে আজও এই ধারা সেখানে লক্ষ্য করা যায়। যেমন ইতালীয়রা শরৎকালে আর্জেন্টিনায় ফসল কাটতে যান ও গরমকালে উপার্জিত অর্থ নিয়ে নিজের দেশে ফিরে আসেন। বিভিন্ন স্থানে কৃষিতে আধুনিকীকরণ সত্ত্বেও যে কারণের জন্য কোন অঞ্চলে মরসুমী কৃষিশ্রমিকের প্রয়োজন হয় তা হল ঐ স্থানের কম জনসংখ্যা। যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়াতেই মরসুমী কৃষিশ্রমিকের প্রয়োজন সবচেয়ে বেশি হয়। আগন্তুক মরসুমী শ্রমিকেরা, যাদের বেশিরভাগ মেক্সিকোবাসী, নিজের দেশে ফসল কাটা হয়ে গেলেই এখানে চলে আসেন ও নিজ নিজ পরিবারের সঙ্গে সঙ্গে এঁদের সঞ্চারমানতা শুরু হয়। এর পর আরো উত্তরে দক্ষিণ ক্যালিফোর্নিয়ায় অম্লজাতীয় ফল, লস এঞ্জেলস অঞ্চলের সব্জি, কেউ কেউ আরও উত্তরে এগিয়ে ফ্রেসনো (Fresno)-তে প্রাক্-শরৎকালের শুরুতেই আঙুর তোলেন। শীতকালে ফসল হয় না। সেই সময় তাঁরা দক্ষিণে নিজেদের পুরোনো ডেরায় ফিরে যান। এইভাবে 3,000 কিলোমিটারের এক লম্বা কৃষিগত পরিযাণ চক্র শেষ হয়। শুধু মেক্সিকোবাসীরাই নয়, বৃহৎ সমভূমি (Great Plains) অঞ্চল থেকে শ্রমিকরা ফসল কাটার জন্য ক্যালিফোর্নিয়ায় যান। মেক্সিকোবাসীদের মত ইম্পেরিয়াল ভ্যালি থেকে এঁরা যাত্রা শুরু করেন। সেখান থেকে পীচ ফল সংগ্রহ করতে সাক্রামেন্টো (Sacramento) উপত্যকায় যান। এর পর তাঁরা দক্ষিণে তুলো তুলতে ফিরে যান। এই তুলো তোলার কাজটায় এখনও যন্ত্রীকরণ সম্ভব হয়নি। কৃষিতে মোটামুটি আংশিক যন্ত্রীকরণ সত্ত্বেও ফ্রান্সের প্রায় নব্বই ভাগ কৃষিশ্রমিক বিদেশ থেকে আসেন যাদের মধ্যে অধিকাংশই স্পেনীয়। 1970 সাল থেকে পর্তুগীজরা ও উত্তর আফ্রিকার মরোক্কোবাসীরা মরসুমী কৃষিশ্রমিক হিসেবে ফ্রান্সে আসছেন। উল্লেখ করা যেতে পারে যে এইসব কৃষিশ্রমিকদের এক-তৃতীয়াংশই হলেন নারী শ্রমিক।

ঝুমচাষও একধরনের ভ্রাম্যমাণ পরিযাণের উদাহরণ। এই প্রথায় কোন জমির গাছপালা কেটে তাকে পরিষ্কার করে কাজে লাগান হয়। গাছের ডালপালা জমির ওপরই পুড়িয়ে ফেলা হয়। ফলে সাময়িকবাবে জমির উর্বরাতা বাড়ে। 3/4 বছর চাষ করার পর জমির উর্বরতা কমে গেলে পুনরায় অন্য জমিতে চাষ করা হয়। এইভাবে ঘুরতে ঘুরতে তাঁরা আবার পুরোনো জমিতে ফিরে আসেন। উত্তর-পূর্ব ভারতে আজও এই প্রথা চলে আসছে। এবার কৃষিগত পরিযাণ সম্পর্কে দুই ভিন্ন অর্থনীতির দেশ থেকে উদাহরণ দেওয়া যাক—

(1) উন্নয়নশীল দেশ (Developed Country) : ভারতে বিপুলসংখ্যক ভূমিহীন ক্ষেতমজুর ফসল তোলা ও কাটার সময় সমৃদ্ধশালী অঞ্চলে কাজ করতে যান। পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ জোলর কথাই ধরা যাক। কিছুদিন আগে পর্যন্ত বাগড়ী (গঙ্গার পূর্ব পাড়) অঞ্চল থেকে কৃষিশ্রমিকরা গঙ্গার অপর (পশ্চিম) পাড়ে অবস্থিত কৃষিসমৃদ্ধ রাঢ় অঞ্চলে প্রতিবছর ফসল বোনা ও কাটার সময় যেতেন। আজ অবশ্য এই ধারা ক্রমশ কমতির দিকে। আজ সারা পশ্চিমবঙ্গেই (খরাপ্রবণ পশ্চিমাংশ বাদে) কৃষিতে আগের তুলনায় গতিসঞ্চার হয়েছে। বলতে গেলে সারা বছর ধরেই চাষীরা ক্ষেতখামার নিয়ে ব্যস্ত থাকেন। তা সত্ত্বেও এখানকার (বাগড়ী) প্রচুরসংখ্যক ভূমিহীন ক্ষেতমজুর প্রত্যেকদিন মুর্শিদাবাদের লাগোয়া নদীয়া জেলায় জনমজুর (মুনিষ) ঘাটতে যান। বিশেষ করে নদীয়া জেলার গোয়ালা ও তাঁতিরা তাঁদের জমিতে এঁদেরকে রোজ-ভিত্তিতে মুনিষ হিসেবে খাটান (Sen, 1988)।

(2) অনুন্নত দেশ (Undeveloped Country) : আফ্রিকায় কিছু কিছু ফসল আছে যা তুলতে অতিরিক্ত শ্রমিকের দরকার হয়। কারণ ঐ সব অঞ্চলে লোকসংখ্যা কম। তাছাড়া, চাষবাসে যন্ত্রীকরণও খুব কম। যেমন

সেনেগালের বাদাম চাষ, ঘানা এবং পশ্চিম নাইজেরিয়ার কোকো চাষ, সুদানে তুলোর চাষ। উত্তরের জনবহুল অঞ্চল থেকে ক্ষেত মজুরেরা ঐ সব দেশে কাজ করতে আসেন।

মরসুমী কৃষিশ্রমিকদের সবারই একই লক্ষ্য থাকে। তা হল, আয় থেকে বাঁচিয়ে যত বেশি সম্ভব টাকা বাড়ি আনা যায়। তাই দেখা যায় যে কর্মস্থলে অস্বাস্থ্যকর ও ঘিঞ্জি পরিবেশের মধ্যেই তাঁরা দিন কাটাচ্ছেন। মনিবরা তাঁদেরকে তাঁবু বা ব্যারাকে থাকার ব্যবস্থা করেন। খাবার ব্যবস্থা যদি মনিব না করেন, তবে অনেক সময় শ্রমিকরা খুব অল্প খেয়ে কাটিয়ে দেন। এইভাবে তাঁরা নতুন পরিবেশে মানিয়ে নেন।

অন্যান্য ঋতু প্রব্রজমানতা (Other Seasonal Migrations)

উপরোক্ত পরিযাণ ছাড়াও আর কতকগুলো প্রব্রজমানতা আছে যেগুলো হয় ঋতুভিত্তিক কাজকর্মের ওপর নির্ভর করে, নয়তো বছরের কোন বিশেষ বিশেষ সময়ে সাময়িক কার্যকলাপের ওপর নির্ভর করে গড়ে ওঠে। চিনিশিল্প প্রথমটির আর বাড়ি তৈরি, খানি সংক্রান্ত বা জনহিতকর কাজকর্ম দ্বিতীয়টির উদাহরণ। চিনিশিল্পে বছরে 6 মাস কাজ হয়, অন্য সময়ে কাজ বন্ধ থাকে। তাই বছরের ঐ কটি মাসে (নভেম্বর থেকে মার্চ/এপ্রিল) আশেপাশের এলাকা থেকে শ্রমিকরা এই শিল্পে কাজ করতে আসেন। ইউরোপের পার্বত্যাঞ্চলে কাঠকল (saw mill) শীতকালে বন্ধ থাকে, কারণ সেই সময় গাছগুলো বরফে ঢেকে যায়, দ্বিতীয়ত এই সময় নদীর জল বরফে পরিণত হয়ে যায় বলে জলবিদ্যুৎ উৎপাদন বন্ধ হয়ে যায়। ফ্রেঞ্চ আল্পসের উত্তরাংশে উৎপন্ন জলবিদ্যুৎ প্রধানত গরমকালে মাঝারি মাপের শিল্পে (যেমন কার্বাইড, এ্যালুমিনিয়াম) ব্যবহার করা হয়। এইসব শিল্পে উত্তর আফ্রিকা থেকে শ্রমিক আসেন। তাঁরা বসন্তের শেষে এখানে আসেন। কারণ, তখন তাঁদের দেশে চাষবাসের কাজ শেষ হয়ে যায়। তারপর তাঁরা শরৎকালে দেশে ফিরে গাছ থেকে জলপাই তোলেন।

2.2.4 প্রব্রজন ও মানুষ (Migration and Man)

মানুষই প্রব্রজন করে এটা ধ্রুব সত্য। কিন্তু সব মানুষের প্রব্রজনে আগ্রহ নেই, আবার সব প্রব্রজনকারী একই ধরনের বিচলন (movement) করেন না। কেউ এক শহর থেকে অন্য শহরে যান, বা গ্রাম থেকে শহরে যান, আবার কেউ কেউ বা দুর দূরান্তরে যান। তাই স্বভাবতই প্রশ্ন ওঠে; (i) প্রব্রজনে আগ্রহী ও প্রব্রজনে অনাগ্রহী ব্যক্তিদের মধ্যে কোন কোন বিষয়ে তফাত দেখা যায় আর তার মাত্রাই বা কতখানি? (ii) ভিন্ন ভিন্ন ধরনের বিচলনকারীদের মধ্যে কি কি বৈশিষ্ট্য সাধারণভাবে দেখা যায় আর তাদের মিল বা অমিল কতখানি (মজুমদার, 1991)?

এর উত্তর খুঁজতে গেলে আমাদের প্রব্রজনকারীদের জৈবিক, সামাজিক ও ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে অবহিত হতে হবে। নিচে প্রব্রজনকারীদের ঐ তিনটি বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনা করা হল।

প্রব্রজনকারীর জৈবিক বৈশিষ্ট্য (Biolocical Characteristics of Migrants)

(1) বয়স (Age) : অন্তর্দেশীয় ও আন্তঃরাষ্ট্রীয় উভয় ধরনের প্রব্রজনকারীদের মধ্যে বয়ঃবৃদ্ধদের সংখ্যা তুলনামূলকভাবে কম। বেশির ভাগ প্রব্রজনকারীদের বয়স 15-35 বৎসরের মধ্যে। প্রধানত উচ্চশিক্ষালাভ এই সময়কার প্রব্রজনের অন্যতম প্রদান কারণ। অন্যান্য কারণের মধ্যে আছে বাবা-মা'র স্থানান্তরে গমন ও বিয়ে (মেয়েদের ক্ষেত্রে)। 20-30 বৎসর বয়সের প্রব্রজনকারীদের বেশিরভাগই চাকুরি বা পেশার প্রয়োজনে স্থানান্তরে গমন করেন। 30 বা তার বেশি অনেকেই বিয়ের পর নতুন বাসস্থানের খোঁজ করেন। বয়স যখন কম থাকে

সংসারের দায়দায়িত্বও কম থাকে। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে নানান দায়দায়িত্বে মানুষ আটকে পড়ে। প্রব্রজনে আগ্রহ থাকলেও তখন উপায় থাকে না। একই সাথে ঝুঁকি নেবার মানসিকতাও কমে যায়।

(2) স্ত্রী-পুরুষভেদ (Sex Difference) : দূর প্রব্রজনকারীদের মধ্যে পুরুষরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ। দূরত্ব বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রব্রজনকারী মহিলাদের আনুপাতিক হার কমতে থাকে। আন্তঃরাষ্ট্রীয় প্রব্রজনেও পুরুষেরা সংখ্যাগরিষ্ঠ। চাকুরি বা পেশাগত কারণই দূর প্রব্রজনের প্রধান কারণ। মহিলাদের মধ্যে বিয়ে প্রব্রজনের অন্যতম প্রধান কারণ। আমাদের মত সমাজে স্ত্রীকে ঘর বাঁধতে স্বামীর বাড়ি যেতে হয়। এছাড়া পরিবারের কর্তা যদি স্থানান্তরে যাওয়া মনস্থ করেন তাহলে তাঁর ওপর নির্ভরশীল অন্যান্যদেরও স্থানান্তরে যেতেই হয়। মেয়েদের মধ্যে স্বল্পে দূরত্বে প্রব্রজনের আধিক্য দেখা যায়।

(3) জাতিগত ভেদ (Racial Difference) : শ্বেতকায় ইউরোপীয়রা পৃথিবীর দূরদূরান্তে যত সহজে ছড়িয়ে পড়েছেন, অ-শ্বেতকায়রা তেমনভাবে কখনই ছড়িয়ে পড়েন নি। ভারতীয়দের মধ্যে মারোয়াড়ী ও পাঞ্জাবীদের মধ্যে স্থানান্তরে যাওয়ার যে সহ প্রবণতা দেখা যায় অন্যান্যদের মধ্যে তা দেখা যায় না।

(4) বোধশক্তির তারতম্য (Difference in Intelligence) : সাধারণভাবে শিক্ষিত ও স্মার্টরা দূর প্রব্রজনে অংশ নেন, কারণ অপরিচিত পরিবেশ এবং ভিন্ন ভিন্ন ভাষাভাষীদের মধ্যে এঁদের খাপ খাইয়ে নেবার ক্ষমতা বেশি। কম দূরত্বের বিচলনে, বিশেষ করে গ্রাম থেকে গ্রামে বা গ্রাম থেকে শহরে বিচলনকারীদের মধ্যে অল্পবুদ্ধি লোকদেরই প্রাধান্য।

(5) শারীরিক সক্ষমতা (Physical Strength) : প্রব্রজনকারীরা প্রায়শই শারীরিক দিক থেকে সুস্থ, সবল ও অনেক বেশি কর্মঠ হন। দুর্বল মানুষরা স্থানান্তরের ধকল সহ্য করতে চান না।

প্রব্রজনকারীর সামাজিক বৈশিষ্ট্য (Social Characteristics of Migrants)

(a) প্রব্রজনের, বিশেষ করে পুরুষদের ক্ষেত্রে, অন্যতম প্রধান কারণই হলো চাকুরি বা কর্মসংস্থানের সুযোগ-সুবিধা। এটা দেখা গেছে যে নতুন বাসস্থানে স্থিতিলাভ করবার আগে প্রব্রজনকারীদের আয় কম ছিল। বেকার বা আধা বেকারদের মধ্যে প্রব্রজন প্রবণতা তুলনামূলকভাবে বেশি (মজুমদার, 1991)।

(b) বুদ্ধিজীবী ও পেশাদারী ব্যক্তিদের মধ্যেই পরিযাণের অনুপাত বেশি। অতীতে জার্মানি, রাশিয়া প্রভৃতি দেশ থেকে বহু বৈজ্ঞানিক যুক্তরাষ্ট্রে চলে যান। ভারতবর্ষ থেকেও মস্তিষ্ক চালান (brain drain)-এর ঘটনা প্রচুর পরিমাণে ঘটে। এর কারণ হল বিদেশে উন্নততর গবেষণাগার, শিক্ষার পরিবেশ, গবেষণার নানান সুযোগ-সুবিধে ও অর্থনৈতিক সাচ্ছল্য।

(c) গ্রাম থেকে শহরে চলে আসার উদ্দেশ্য জীবিকার পরিবর্তন—কৃষি থেকে অকৃষি জীবিকা।

(d) ধর্মীয় বা গোষ্ঠীগত কারণেও প্রব্রজন ঘটে তাকে। এই ধরনের ঘটনা সাধারণত দলগতভাবে ঘটে থাকে। ধর্মীয় সম্ভব সামাজিক বা রাজনৈতিক কারণে কোনো গোষ্ঠীর ওপর অত্যাচার হবার ঘটনা ঘটলে ঐ বিশেষ গোষ্ঠীর লোকেরা এক স্থান থেকে অন্য স্থানে চলে যান। ইহুদীদের দলে দলে জার্মানি ত্যাগ ও ইস্রারেয়েলে গমন, আমেরিকান নিগ্রোদের দক্ষিণাঞ্চলে সরে যাওয়া হিন্দু ও মুসলমানদের বারত ভাগের পর দেশত্যাগ, অসমে 'বাঙালি খেদাও' আন্দোলনের ফলে দলে দলে বাঙালিদের পশ্চিমবঙ্গে চলে আসাক্তএই ধরনের প্রব্রজনের ভালো উদাহরণ।

(e) বিবাহিতদের তুলনায় অবিবাহিতদের মধ্যে পরিযাণের সংখ্যা বেশি। সংসার বড় হয়ে গেলে দায়দায়িত্ব অনেক বেড়ে যায়, ফলে স্বাধীনভাবে চিন্তাভাবনা ও সিদ্ধান্তগ্রহণের স্বাধীনতা কমে যায়।

(f) প্রব্রজনকারীদের মধ্যে বিচলন প্রবণতা তুলনামূলকভাবে বেশী। কারণ একবার যে 'দেশ' ছেড়েছে তার পক্ষে দ্বিতীয়, তৃতীয় বা চতুর্থ বার দেশ পাল্টানো খুব সহজ ব্যাপার।

(g) প্রব্রজনকারীদের মধ্যে শিক্ষিতের হার খুব বেশি। এরা নানা বিষয়ে বিশেষ শিক্ষণপ্রাপ্ত হয়ে থাকেন।

প্রব্রজনকারীর নিজস্ব বৈশিষ্ট্য (Individual Characteristics of the Migrants)

1. প্রব্রজনকারীরা প্রায়শ উচ্চাভিলাষী ও উদ্যমী হন।
2. আধুনিক সমাজভাবনা ও জীবনযাত্রায় তাঁরা অভ্যস্ত।
3. উচ্চ রুচিসম্পন্ন ও গতিময় জীবন এঁরা পছন্দ করেন।
4. প্রব্রজনকারীদের মধ্যে তুলনামূলকভাবে মানসিক ভারসাম্য কম। সেই কারণে মানসিক অসুস্থতার ঘটনাও এদের মধ্যে তুলনামূলকভাবে বেশি (মজুমদার, 1991)।

অনেক সময় ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও পূর্বপুরুষের ভিটে ছেড়ে দূরে যাওয়া অনেকের পক্ষেই সম্ভব হয় না। পরিচিত মুখ ও পরিবেশ ছেড়ে সম্পূর্ণ অজানা-অচেনা পরিবেশে যেতে স্বভাবতই আমাদের দ্বিধা হয়। দূরত্ব মানেই যোগাযোগের সূত্রটি ক্ষীণ হয়ে যাওয়া, আত্মিক বন্ধন শিথিল হওয়া। অবশ্য যখন চেনাজানা লোক পাওয়া যায়, তখন বিচলনে অনাগ্রহের জোরটা কম হয়। সেই কারণেই সব দেশেই স্বল্প দূরত্বের প্রব্রজনের ঘটনা তুলনামূলকভাবে বেশি ঘটে। ছোটোনাগপুর অঞ্চলের খনি শ্রমিক বা আসাম-দার্জিলিঙের চা-বাগানের শ্রমিক কিংবা কয়লাখনি, ইটভাটা শ্রমিকদের মধ্যে এই ধরনের পরিযাণ দেখা যায়। উচ্চাভিলাষীরা সাধারণত দূর দূরান্তেই পরিযাণ করেন, কেননা মধ্যবর্তী পরিসরে (intervening) প্রায়ই তাঁদের আকাঙ্ক্ষার উপযুক্ত কাজ ও পরিবেশ পাওয়া যায় না।

প্রব্রজনের কারণগুলো এতই জটিল ও ব্যক্তিনির্ভর যে প্রতিটি কার্যকারণ সম্পর্কের বিশ্লেষণ সম্ভব নয়।

2.2.5 পরিযাণের তত্ত্বসমূহ (Theories of Migration)

পরিব্রাজনের কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে সমাজবিজ্ঞানীরা কিছু মতবাদ খাড়া করানোর দিকে বেশি নজর দিয়েছেন। জনসংখ্যা ভূগোলে (Population Geography) তত্ত্ব (Theory) বাতলানো মুশকিল, কারণ স্থান ও কাল ভেদে মানুষের আচার-আচরণ পাল্টায়। দ্বিতীয়ত, প্রত্যেক মানুষের আচার-আচরণকে একটি নিয়মের সূত্রে বাঁধা শক্ত কাজ। পরিযাণের ব্যাপারটা খুব জটিল। আর যে যে কারণের জন্যে কোন মানুষ পরিযাণের শিকার হন, তা আরও জটিল। এ প্রসঙ্গে Humphrey মন্তব্য করেছেন যে পরিযাণের তত্ত্ব খাড়া করানো শক্ত। তবু সাম্প্রতিককালে এ সম্পর্কে কিছু মডেল (model)-ভিত্তিক আলোচনা উল্লেখের দাবি রাখে। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে যে Ravenstein (1889)-এর প্রচেষ্টাকে শুরু হিসেবে ধরলে পরিযাণ তত্ত্বের সময়কাল 100 বছরেরও বেশি বলে ধরতে হবে। Ravenstein ঊনবিংশ শতাব্দীতে ব্রিটেনের জনগণনা (Census) থেকে সেখানকার অধিবাসীদের জন্মস্থান সংক্রান্ত তথ্য নিয়ে তাঁদের অন্তর্দেশীয় পরিযাণ সম্পর্কে বিশ্লেষণ করেছেন। এখানে সংক্ষেপে তা আলোচনা করা হল।

*Ravenstein-র মতবাদ

(1) পরিযাণ ও দূরত্ব (Migration and Distance) : প্রবাসীদের একটা বড় অংশ কেবলমাত্র অল্প দূরত্বে পরিব্রাজন করেন। এ ধরনের পরিযাণ সব দেশের জনগণের মধ্যে লক্ষ্য করা যায়। এ থেকে 'পরিযাণ ঢেউ'

(currents of migration) তৈরি হয়, যার লক্ষ্য থাকে বড় বড় বাণিজ্য ও শিল্পকেন্দ্র। উপরের আলোচনা থেকে আমরা কতকগুলো সিদ্ধান্তে আসতে পারি। তা হল—(i) দূরত্বের সঙ্গে পরিযাণের সম্পর্ক আছে। (ii) অনেক দূরের প্রবাসীরা পরিযাণের ক্ষেত্রে বড় বাণিজ্য ও শিল্পকেন্দ্রে যাওয়া পছন্দ করেন।

Revenstein (1889) দেখিয়েছেন যে অধিকাংশ প্রব্রজনকারীরা কম দূরত্বে পরিযাণ করেন এবং অল্পসংখ্যক মানুষ দূরে যান। এই মনোভাবকে Ravenstein '*distance decay*' বলেছেন (চিত্র 10.2)।

X-নগর থেকে পরিযায়ীদের বিচলন (কিমিতে)

জেলার নাম	শহর থেকে দূরত্ব (কিমি)	পরিযায়ী ব্যক্তিদের সংখ্যা (প্রতি বছর)
A	15	1000
B	30	500
C	45	350
D	60	250
E	75	200
F	90	175
G	105	150

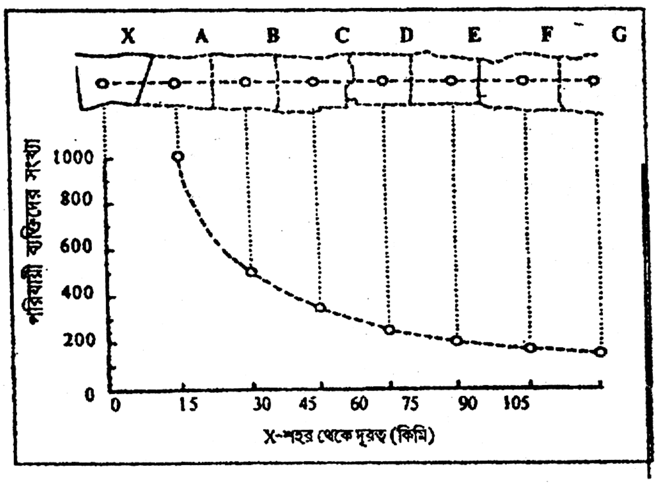

(A) X-নগরের কাছে জেলাসমূহের অবস্থান।

(B) X-নগর থেকে দূরত্বের সম্পর্ক ও X-নগর পরিযায়ী ব্যক্তিদের সংখ্যা

চিত্র 2.15 : পরিযাণ : Distance-Decay Model

(2) **পর্যায়ক্রমে পরিযাণ (Migration by Stages) :** দ্রুত বিকাশশীল শহরের আশেপাশে গ্রামাঞ্চলের বাসিন্দারা ঐ শহরে এসে জড়ো হন। এর ফলে গ্রামাঞ্চলে যে জনশূন্যতা সৃষ্টি হয়, তা আরও দূরের প্রবাসীদের অভিবাসনের (immigration) ফলে পূর্ণ হয়। এই পরিযাণ ততক্ষণ চলতে থাকবে, যতক্ষণ পর্যন্ত না অন্য কোন দ্রুত বিকাশশালী শহরের প্রভাব ধাপে ধাপে দেশের সবচেয়ে দূরবর্তী প্রান্তে গিয়ে পৌঁছায় (চিত্র 10.3)।

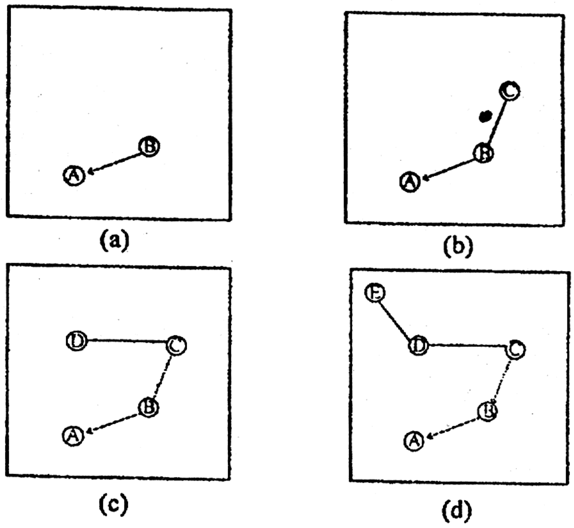

চিত্র 2.16 : Ravenstein-পর্যায়ক্রমে পরিযাণ

(3) **ঢেউ ও বিপরীত ঢেউ (Curretn and Counter current)** : প্রব্রজনের প্রতিটি প্রধান ঢেউ-এর পরিপূরক (eompensating) হিসেবে বিপরীত ঢেউ (counter current) সৃষ্টি হয়।

(4) **গ্রাম-শহরের পার্থক্য** : গ্রামবাসীদের তুলনায় শহরের বাসিন্দাদের মধ্যে পরিযাণ প্রবণতা কম।

(5) **মহিলাদের প্রাধান্য** : কম দূরত্বের পরিযাণের ক্ষেত্রে মহিলাদের প্রাধান্যই বেশি।

(6) **কারিগরি বিদ্যা ও পরিযাণ** : কারিগরি অগ্রগতির সাথে সাথে মাত্রা বাড়ে।

(7) **পরিযাণের পেছনে উদ্দেশ্য** : প্রধানত অর্থনৈতিক কারণ পরিযাণের মাত্রাকে নিয়ন্ত্রণ করে। পরবর্তীকালে আলোচনায় দেখা গেছে Ravenstein-এর সাধারণ সূত্রগুলো নীতিগতভাবে ঠিক। কারণ তাঁর অনেক ধারণা বাস্তবের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ।

*Lee-র মতবাদ

Lee (Everette Lee), (1965) Ravenstein-র মতবাদকে কিছুটা পরিবর্তন করে গ্রহণ করেছেন। তিনটি অবশ্য তিনটি মতবাদের ওপর জোর দিয়েছেন। এগুলো হল—(1) প্রব্রজনের আয়তন সম্পর্কিত মতবাদ, (2) প্রব্রজন প্রবাহ ও (3) প্রব্রজনকারীদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। পরের পৃষ্ঠায় বিস্তারিতভাবে সেগুলো নিয়ে আলোচনা করা হল।

প্রব্রজনের আয়তন সম্পর্কিত মতবাদ (Hypothesis Related to Volume of Migration)

(a) কোনো নির্দিষ্ট অঞ্চলের মধ্যে প্রব্রজনের মাত্রা ঐ অঞ্চলের বিভিন্ন অংশের বৈচিত্র্যের ওপর (diversity of areas) নির্ভরশীল।

(b) প্রব্রজনের আয়তন জনসাধারণের বৈচিত্র্যের (diversity of people) ওপর নির্ভরশীল।

(c) প্রব্রজনের আয়তন বিচলনে বাধাদানকারী শক্তিগুলির কার্যকারিতার ওপর নির্ভরশীল।

(d) আর্থিক অস্থিরতার সাথে পরিযাণের আয়তন নির্ভরশীল।

(e) কঠোর বাধানিষেধ না থাকলে সময়ের সাথে সাথে প্রব্রজনের আয়তন ও হার বাড়ার প্রবণতা দেখা যায়।

(f) কোনো দেশ বা অঞ্চলের সমৃদ্ধির গতি-প্রকৃতির ওপর প্রব্রজনের আয়তন ও হার নির্ভরশীল।

প্রবাহ ও বিপরীত প্রবাহ সম্পর্কিত মতবাদ (Hypothesis Related to Stream and Counter-Stream of Migration)

(a) সুনির্দিষ্ট প্রবাহগুলোর মধ্যেই বেশিরভাগ বিচলন ঘটে থাকে।

(b) প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ প্রবাহেই একটি বিপরীত প্রবাহের (Counter Current) তৈরি হয়।

(c) প্রব্রজন প্রবাহের উৎপত্তির কারণসমূহ যখন উৎসস্থলের ঋণাত্মক ঘটনাবলীর সঙ্গে সম্পর্কিত হয় তখনই ঐ প্রব্রজন প্রবাহের উচ্চ কার্যকারিতা দেখা দেয়।

(d) উৎস ও গন্তব্যস্থলের মধ্যে সাদৃশ্য যত বেশি হবে প্রব্রজন প্রবাহ ও তার বিপরীত প্রবাহ ততই দুর্বল হবে।

(e) মধ্যস্থতাকারী বাধাসমূহ (intervening obstacles) যতই প্রবল হবে প্রব্রজন প্রবাহের কার্যকারিতা ততই বাড়বে।

(f) প্রব্রজন প্রবাহের কার্যকারিতা অর্থনৈতিক অবস্থার সাথে গভীরভাবে যুক্ত। অর্থনৈতিক মন্দাবস্থার তুলনায় অর্থনৈতিক প্রাচুর্যের সময় প্রব্রজন প্রবাহের কার্যকারিতা বেশি।

প্রব্রজনকারীর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যসমূহের সঙ্গে প্রব্রজনের সম্পর্কিত মতবাদ (Hypothesis Related to the Characteristics of Migrants)

(a) প্রব্রজন ব্যক্তি-নির্ভর।

(b) গন্তব্যস্থলের ধনাত্মক প্রভাবে যাঁরা প্রভাবিত হবেন তাঁরা যথার্থই নির্বাচিত প্রব্রজনকারী।

(c) উৎসস্থলের ঋণাত্মক প্রভাবে যারা প্রভাবিত হয় তাঁরা নঞর্থক প্রব্রজনকারী। উৎসস্থলের ঋণাত্মক প্রভাব যদি খুব প্রবল ও ব্যাপক হয় তাহলে কে বিচলন করবে, কে করবে না তা নির্ধারণ করা সম্ভব নাও হতে পারে।

(d) সমস্ত প্রব্রজনকারীকে হিসাবের মধ্যে ধরলে নির্বাচিত প্রব্রজনকারীদের বিন্যাস bi-model ধরনের হবে।

(e) মধ্যবর্তী বাধাসমূহ যত বেশি হবে প্রব্রজনকারীরাও তত সুনির্দিষ্ট হবে (চিত্র 10.4)।

(f) জীবনের একটি বিশেষ সময়ে প্রব্রজনের মাত্রা সব থেকে বেশি এবং ঐ বয়সের নিরিখেই প্রব্রজন নির্ধারিত হবে।

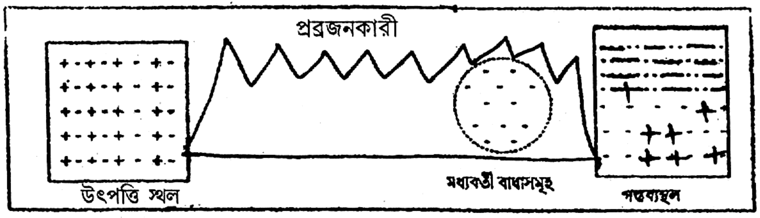

চিত্র 2.17 : Lee-র পরিযাণ মডেল

*Zelinsky-র প্রচলন পরিবর্তন মডেল (Mobility Transition Model)

জেলেনস্কি 1971 সালে পরিযাণ সম্বন্ধে এক সুন্দর মত দিয়েছিলেন, যা Mobility Transition Model নামে খ্যাত। তাঁর এই মডেল জনমিতি পরিবর্তন (Demographic Transition) মডেলের সাথে সম্পর্কিত। এই মডেলে Zelinsky যে চার প্রকার পরিযাণের (আন্তর্জাতিক, আঞ্চলিক, গ্রাম থেকে শহর, শহর থেকে শহর) কথা বলেছেন তা ঐ জনমিতি পরিবর্তন মডেলের সাথে সম্পর্কিত।

এই মডেলের প্রথম পর্যায়ে যখন জনবৃদ্ধি কম ছিল (কারণ মৃত্যুহার ছিল খুব বেশি) তখন পরিযাণও খুব কম ছিল। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় 1931 সালে ভারতবর্ষে মাত্র 10 শতাংশ মানুষ তাঁদের জন্মভিটার বাইরে বাস করতেন। এই সময় বাইরের খবরাখবর মিলত কম এবং অধিকাংশ মানুষ তাঁদের জন্মভিটাতেই জীবন কাটিয়ে দিতেন। এই সময় মানুষ কাজের জন্য চাষের ক্ষেতে যেতেন এবং কদাচিৎ বাজার ও উৎসবের জন্য বাইরে যেতেন।

দ্বিতীয় পর্যায়ে মৃত্যুহার কমে যাওয়ায় জনসংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পেল। উচ্চ জন্মহারও জনসংখ্যা বৃদ্ধিতে সাহায্য করেছিল। জমির ওপর অত্যধিক চাপ, আরও ভালো পরিবহনের সুযোগ, দেশ আবিষ্কার, বাণিজ্যের পরিমাণ বৃদ্ধি

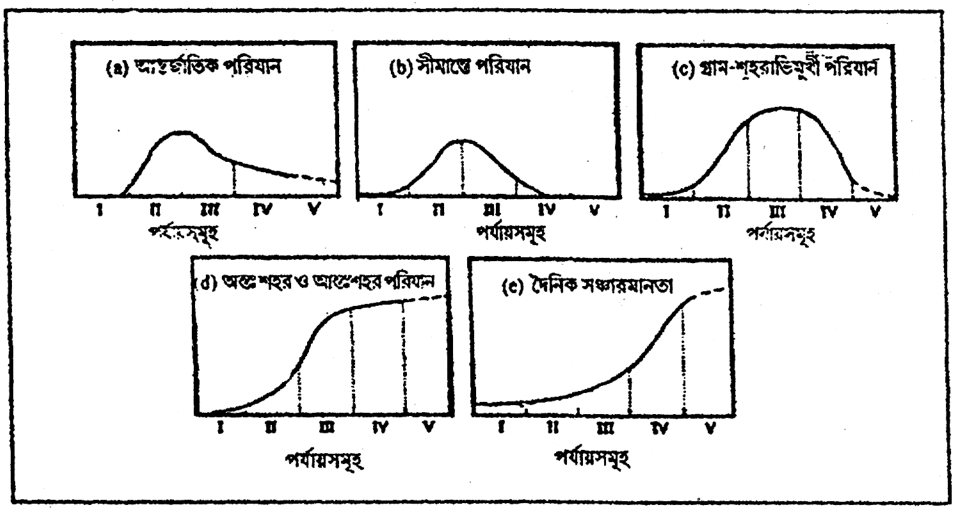

চিত্র 2.18 : Zelinsky-র প্রচলন পরিবর্তন মডেল

ও অন্যান্য স্থান সম্পর্কে আরো তথ্য মানুষকে বহির্মুখী করে তুলল। মানুষ এক দেশ থেকে অন্যদেশে পরিযাণ করল [চিত্র 2.18 (a)]। বসত এলাকা ছেড়ে নতুন দিগন্তের পথে পাড়ি জমাল [চিত্র 2.18 (b)], গ্রাম থেকে বিকাশশীল শহরের দিকে [চিত্র 2.18(c)] এবং শহর থেকে নগরের দিকে [চিত্র 2.18(d)] পাড়ি জমাল। ইউরোপ থেকে ঊনবিংশ শতাব্দীতে যুক্তরাষ্ট্রমুখী মানুষের ঢল এই ধরনের (নতুন বসত এলাকায় বসবাসের জন্য গমন) পরিব্রাজনকে বোঝায়।

Zelinsky-র তৃতীয় পর্যায় প্রচলন। এটি জনমিতি পরিবর্তনশীল মডেলের তৃতীয় পর্যায়ের সাথে খাপ খায়। এই সময় জন্মহার কমে গেছে। সেই সঙ্গে জনবৃদ্ধিও। আন্তর্জাতিক পরিযাণের সংখ্যা কমে গেছে। নতুন কৃষিজমি পাবার আশাও কম (যেমনটি যুক্তরাষ্ট্রে 1930 সালে ঘটেছিল)। কিন্তু এই সাথে গ্রাম থেকে শহরে পরিযাণ এবং

বিভিন্ন শহরের মধ্যে ও দুই শহরের মধ্যে পরিযাণ ঘটে চলল। দ্বিতীয় ও দ্বিতীয় পর্যায়ের কর্মকাণ্ড বাড়ার সাথে সাথে বিশেষ ধরনের বৃত্তির (ডাক্তারী, অধ্যাপনা) খোঁজে মানুষ বেরিয়ে পড়ল।

চতুর্থ ও পঞ্চম পর্যায়ে কম জন্ম ও মৃত্যুহার নতুন উন্নত সমাজে কম জনবৃদ্ধি ঘটাল। এই সময় দুই শহরের মধ্যে ও আন্তঃশহর পরিযান প্রাধান্য লাভ করেছিল। কম উন্নত দেশ থেকে বেশি উন্নত দেশে দক্ষ শ্রমিকের পরিযান ঘটল।

সমাজ যখন আধুনিক হল তখন দৈনিক সঞ্চারমানতা [চিত্র 2.18 (e)] বাড়ল। ব্যক্তিগত মোটরযানের দৌলতে মানুষ সহজেই এক ঘণ্টার মধ্যে বহুদূরে যেতে পারে এবং এটাই বর্তমানে ঘটে চলেছে।

2.2.6 পরিযাণের বিভিন্ন কারণসমূহ (Various Causes of Migration)

পরিযাণের প্রধান কারণ তিনটি—(1) রাজনৈতিক, (2) অর্থনৈতিক ও (3) প্রাকৃতিক। নিচে সেগুলো নিয়ে আলোচনা করা হল :

(1) **রাজনৈতিক কারণ (Political Factor)** : রাজনৈতিক কারণে যে সব ব্যক্তি এক দেশ থেকে অন্যদেশে বাস করতে বাধ্য হন তাঁদের 'বাস্তুচ্যুত ব্যক্তি' (Refugee) বলে। বর্তমান দিনে এই ধরনের ব্যক্তির সংখ্যা বাড়তির দিকে, তা কমিউনিস্ট দেশ হোক বা সামরিক শাসনভুক্ত দেশ হোক। কমিউনিস্ট দেশগুলোতে মত প্রকাশের স্বাধীনতা থাকে না, স্বাধীনভাবে কাজ করার সুযোগ থাকে না, তাই কিছু স্বাধীনচেতা মানুষ অন্য দেশে গিয়ে রাজনৈতিক আশ্রয় গ্রহণে বাধ্য হন। ইদানাং সারা পৃথিবীতেই কমিউনিস্ট আন্দোলন এক চ্যালেঞ্জের মুখে। পূর্ব ইউরোপের দেশগুলো, এমনকি খোদ রাশিয়ার দিকে তাকালেই এ কথা পরিষ্কার হয়। খুব সাম্প্রতিকালে কমিউনিস্ট বিরোধী আন্দোলনের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছিল পূর্ব জার্মানিতে, যার ফলে দুই জার্মানির মিলন ঘটেছে।

অন্যত্র দেখা গেছে 1970-এর দশকে দক্ষিণ ভিয়েতনাম ও কাম্পুচিয়ায় (কাম্বেডিয়া) কমিউনিস্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত হবার পর থেকে প্রায় দশ লক্ষ মানুষ ঐ দুই দেশ ত্যাগ করছেন। কিছু ব্যক্তি যুক্তরাষ্ট্রে, আর বেশিরভাগই থাইল্যান্ডে অস্থায়ী ছাউনিতে আশ্রয় দিতে বাধ্য হয়েছেন।

যুদ্ধের ফলেও অনেক সময় মানুষ বাস্তুচ্যুত হন। যুদ্ধের সময় শত্রুসেনার ভয়ে (যেমনটি হয়েছিল 1970 সালে বাংলাদেশ স্বাধীনতা যুদ্ধের সময়) বা যুদ্ধ বিরচির পর দেশের সীমানা পরিবর্তিত হলেও কোনো দেশের অধিবাসীরা সেই দেশ ছেড়ে অন্য দেশে চলে যেতে বাধ্য হন। চিন কর্তৃক তিব্বত আক্রমণের ফলে দলাইলামা তাঁর সঙ্গীদের নিয়ে ভারতে রাজনৈতিক আশ্রয় গ্রহণে বাধ্য হয়েছেন। খুব সাম্প্রতিকালে শ্রীলঙ্কায় অভ্যন্তরীণ গণ্ডগোলের দরুন বেশকিছু সিংহলী জাফনা থেকে মাদ্রাজে এসে আশ্রয় নিয়েছেন। আবার দেশ বিভাগের পর হিন্দুস্থান (ভারত) থেকে এদেশের সংখ্যালগু মুসলিমরা ধর্মীয় কারণে পাকিস্তানে (পূর্ব ও পশ্চিম) গিয়ে ঘর বেঁধেছেন। অন্যদিকে, মুসলিমপ্রধান পাকিস্তান (পূর্ব ও পশ্চিম) থেকে বহুসংখ্যক সংখ্যালঘু হিন্দু ভারতে এসে পাকাপাকিভাবে ডেরা বেঁধেছেন। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে পূর্ব পাকিস্তান (বর্তমান বাংলাদেশ) থেকে পশ্চিমবঙ্গে হিন্দু উদ্বাস্তুদের স্রোতের ধারা আজও অব্যাহত আছে। শুধু হিন্দু কেন, ইদানীংকালে অর্থনৈতিক কারণেও বাংলাদেশ থেকে বেশকিছু মুসলিম পশ্চিমবঙ্গের সীমান্ত জেলাগুলোতে অবৈধভাবে প্রবেশ করে বসবাস শুরু করেছেন।

এতো গেল আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক কারণে দেশত্যাগ। এবার আমাদের দেশের ভেতরকার রাজনৈতিক অস্থিরতার দরুন গৃহত্যাগের ঘটনার দিকে নজর দেওয়া যাক। যেমন কয়েক বছর আগে অসমের রাজনৈতিক অস্থিরতার

দরুন বেশকিছু বাঙালি পরিবার পশ্চিমবঙ্গের আলিপুরদুয়ারের ডাঙ্গি শিবিরে এসে পাকাপাকিভাবে আশ্রয় নিয়েছেন। দার্জিলিং-এ গোর্খাল্যান্ড আন্দোলনের ফলে কয়েকটি বাঙালি পরিবার তাদের সম্পত্তি বিক্রি করে সমতলে চলে এসেছেন। কিছু কিছু ক্ষেত্রে সরকারি চাকুরিরত বাঙালিকেও সমতলে বদলি করে আনা হয়েছে। হাল আমলে পাঞ্জাবে খালিস্তানপন্থীদের স্বাধীন রাষ্ট্র গঠনেসর দাবিজনিত কারণে সেখানে রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড কিংবা কাশ্মীর উপত্যকায় রাজনৈতিক অস্থিরতার দরুন উভয় রাজ্য থেকেই বেশকিছু শরণার্থী দিল্লির আশেপাশে সাময়িকভাবে আশ্রয় নিয়েছেন। মোটকথা, কোন স্থানে রাজনৈতিক গণ্ডগোল কখনো পাকাপাকিভাবে, কখনো সাময়িকভাবে কিছু লোককে সেই স্থান ত্যাগ করতে বাধ্য করে।

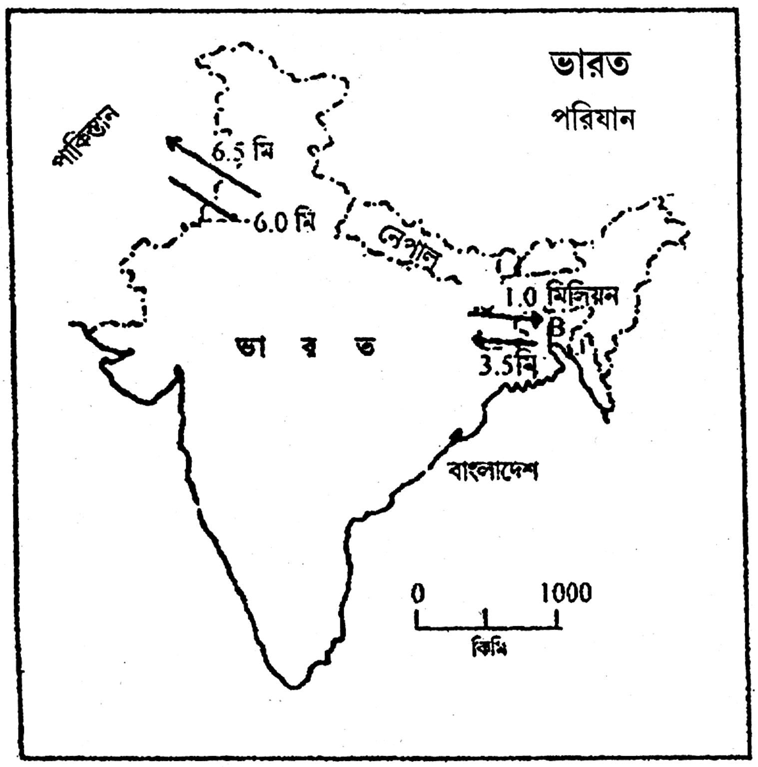

চিত্র 2.19 : ভারতীয় বাধ্যতামূলক পরিযান, 1947

(2) **অর্থনৈতিক কারণ (Economic Factor) : (i) কাজের সুযোগ (Employment Opportunities) :** অর্থনৈতিক কারণ অনেক সময় কেনো দেশের বাসিন্দাদের বাস্তুত্যাগী করে তোলে। বেঁচে থাকতে গেলে অন্নের প্রয়োজন। আর অন্নের সংস্থানে টান পড়লেই লোকে রুজি-রোজগারের তাগিদে অন্যত্র চলে যেতে বাধ্য হবেন*। ঠিক এমনটি ঘটেছিল আয়ারল্যান্ডে 1845 থেকে 1851 সালের মধ্যে। ঐ সময়ে আয়ারল্যান্ডের প্রধান খাদ্য আলুতে মড়ক লেগেছিল। আর দেশের অধিকাংশ জমি ছিল অনাবাসী ব্রিটিশের হাতে, জমির ভালোমন্দের দিকে তাঁদের কোন রকম নজর ছিল না। অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধারে অক্ষম কয়েক লক্ষ আইরিশ ভালো কাজের সন্ধানে দেশ ত্যাগ করেছিলেন।

---

* অরণ্যের কবি ভবতোষ শতপথির কবিতায় এই দুঃখী মানুষের যন্ত্রণার কথা বর্ণিত হয়েছে—

'এমন ঘরে জন্ম দিলি, কেন আমায় মা,
সারা জীবন ঘুরে ঘুরেও শান্তি পেলাম না।
অনেক দুঃখে রাতারাতি হলাম দেশান্তর,
রইল পড়ে বাস্তুভিটে, করুণ কুঁড়েঘর।'

বেকাররা চাকরি বা কাজের আশায় কোন বড় শহর, খনি এলাকা, এমন কি বিদেশেও পাড়ি জমান। ঊনবিংশ শতাব্দীতে নতুন আবিষ্কৃত দেশগুলোতে যে সব প্রবাসী বসবাস করতে যেতেন তাঁরা ছিলেন গ্রামবাসী। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিককার অধিকাংশ প্রবাসী হলেন শহরবাসী। কলকাতা শহরই এর জ্বলন্ত উদাহরণ। এই শহরের বয়স তিনশ হলেও এখানে বিংশ শতাব্দীর শুরু থেকে প্রচুর লোকসমাগম হয়েছে। আর তার মূলে রয়েছে প্রাদেশিক রাজধানী হিসেবে এখানে হরেক রকম রুজি-রোজগারের উপায়। যে সব দেশে পারিশ্রমিক বেশি, সেখানে মানুষজন ভিড় করেন। যেমন বর্তমান দিনে উপসাগরীয় দেশগুলোতে (Gulf Coungtries) ভারত থেকে অনেক লোক গেছেন। সাম্প্রতিককালে উত্তরবঙ্গের বৃহত্তম শহর শিলিগুড়িতে রুজি-রোজগারের প্রচুর সুযোগ থাকায় বহুদূরের গ্রাম, এমন কি আশেপাশের ছোটখাটো শহর থেকে প্রচুর লোকজন আসছেন।

(ii) **জমি পাওয়ার সুযোগ (Availability of Land) :** জমির অভাব বা জমি খুব অনুর্বর বলে যে সব চাষী পরিবার নিজের জমিটুকু দিয়ে সংসার চালাতে পারনে না, তাঁরা যদি অন্য দেশে সুবিধে মত বেশি জমি পান, তবে সেখানে বসবাস করতে যান। কৃষিপ্রধান অর্থনীতিতে এই ধরনের ঘটনা ঘটে থাকে। অতীতে এই ধরনের ঘটনা ঘটত বেশি। কারণ তখন লোকজন ছিল কম। জমিও অনাবাদী থাকত। অতীতে দেখা গেছে যে ইউরোপীয়রা যুক্তরাষ্ট্র, অস্ট্রেলিয়া ও দক্ষিণ আফ্রিকায় এসে বসবাস শুরু করেছিলেন। এই সব প্রবাসীদের অধিকাংশই ছিলেন হয় ভূমিহীন, নয় কম জমির মালিক। বিংশ শতকের গোড়ায় পশ্চিমবঙ্গের দিকে তাকালেও দেখা যাবে যে এখানে জমি ছিল অপর্যাপ্ত, মানুষ ছিল কম। কারণ ম্যালেরিয়ার প্রকোপে ফি-বছর অনেক লোক মারা যেতেন। ফলে জমি পতিত থাকত। নদীয়া, মুর্শিদাবাদ জেলার বহু গ্রাম সমীক্ষা থেকে জানা গেছে যে অনেক জমিদার তাঁদের এলাকায় বসবাসের জন্য বিনে পয়সায় জমি দিতেন। এমন কি, যতদিন না পর্যন্ত জমি ফসল উৎপাদনের উপযোগী হত, ততদিন পর্যন্ত কর মুকুব করে দিতেন। অনেকটা একই কারণের জন্য দেখা যায় যে পশ্চিমবঙ্গের বন্যা-কবলিত মেদিনীপুর জেলার ময়না থানা বা মুর্শিদাবাদ জেলার বন্যা-কবলিত কালান্তর অঞ্চলে (নওদা থানা), উর্বর জমির টানে আশেপাশের এলাকা থেকে লোকজন এসে বসবাস করছেন।

খুব একটা অসচ্ছল অবস্থায় না থাকলেও মেক্সিকোর কিছুসংখ্যক চাষী তাঁদের ভাগ্য ফেরাতে যুক্তরাষ্ট্রে চলে এসেছেন। সচরাচর এ ক্ষেত্রে দেখা যায় যে কোন দু'দেশের মধ্যে জীবনযাত্রার মানের আকাশ-পাতাল পার্থক্য দরিদ্র দেশের অধিবাসীদের সচ্ছল দেশের প্রতি আকর্ষণ করে, যেমন মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোতে উচ্চ বেতনের লাভ অনেক ভারতবাসী, বিশেষ করে কেরলবাসীদের সেখানে আকর্ষণ করেছে।

(iii) **সম্পদের আশায় (Lure of Wealth) :** অনেক বাস্তুত্যাগী ভাবেন যে বিদেশে গেলে তাঁদের আয় বাড়বে, সংসারেরও সচ্ছলতা আসবে। কিন্তু কেউ কেউ রাতারাতি বড়লোক হবার স্বপ্ন দেখেন। কোন জায়গায় সোনার খনি আবিষ্কৃত হলে বহু দেশ থেকে লোকজন সেখানে গিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়েন। এজন্য তাঁরা প্রতিকূল পরিবেশে চরম দুঃখ-কষ্ট পর্যন্ত স্বীকার করেন। ষষ্ঠদশ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে মধ্য আমেরিকা ও দক্ষিণ আমেরিকায় সোনার খনি আবিষ্কার পর্তুগীজ ও স্পেনীয়দের সে দেশে টেনে এনেছিল। তবে মজার ব্যাপার হল যে সোনা ফুরিয়ে গেলে খনিভিত্তিক এই সব শহর খুব তাড়াতাড়ি জনশূন্য হয়ে পড়ে। যুক্তরাষ্ট্রের পশ্চিমাংশে এই রকম অনেক 'ভুতুড়ে শহর' (Ghost Town) দেখতে পাওয়া যায়।

সারণি : ভারত : পরিযানের কারণ, 1981 (শতকরা হিসেবে)							
কারণ	মোট পরিযানের % হার	গ্রামীণ			শহর এলাকা		
		মোট	পুরুষ	স্ত্রী	মোট	পুরুষ	স্ত্রী
বিবাহ	51.51	58.18	4.87	79.46	28.61	1.05	46.78
পরিবারের অন্যত্র চলে যাওয়া	19.23	16.17	33.23	9.61	30.47	26.89	32.07
চাকরি	10.67	9.11	20.07	1.28	18.15	43.10	4.24
শিক্ষা	2.23	2.08	4.06	0.47	3.13	6.81	2.40
অন্যান্য	16.36	14.46	37.77	9.18	19.64	22.15	14.51
মোট	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

Source : Census of India 1981, Geographicsl Distribution of Internal Migration

(3) **প্রাকৃতিক কারণ (Physical Factor) :** যে সব প্রাকৃতিক কারণের জন্য মানুষ ঘরবাড়ি ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হন, তার মধ্যে আছে বন্যা, নদীজনিত ভূমিক্ষয় ও খরা। বিজ্ঞানীরা লক্ষ্য করেছেন যে পৃথিবীর শতকরা 40 ভাগ ও 20 ভাগ প্রাকৃতিক দুর্যোগ যথাক্রমে বন্যা ও ঘূর্ণিঝড় থেকে ঘটে থাকে--(i) বন্যা-কবলিত

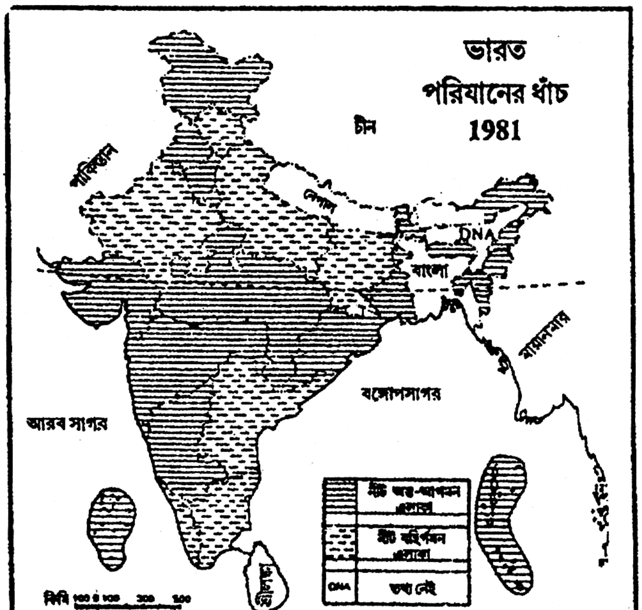

চিত্র 2.20 : ভারত পরিযাণের ধাঁচ, 1981

এলাকা থেকে মানুষ সরে আসতে বাধ্য হন, তবে সবসময় বন্যা বা জলোচ্ছ্বাস যে মানুষের ক্ষতি করে তা নয়। সমীক্ষায় দেখা গেছে যে মুর্শিদাবাদ জেলার পদ্মার চর এলাকায় প্রায় প্রতি বছরই বন্যা হয়। তা সত্ত্বেও চর এলাকায় বাসিন্দারা নিজেদের ডেরা ছেড়ে যান না। অবশ্য উল্লেখ করতে হয় যে এখানকার ঘরবাড়িগুলো খুবই অস্থায়ী ধরনের। বন্যার জল বাড়লে তা সরিয়ে নেওয়া হয় (Sen and Sen, 1989)। বন্যার পর পরি পড়ার দরুন এখানকার জমি উর্বর হয়ে ওঠে। "চাঁই মণ্ডল" নামে তপশিলি সম্প্রদায়ের এক শ্রেণির লোক এখানে বাস করেন যাদের প্রধান কাজই হল মাছ ধরা। বাংলাদেশের সন্দীপ বা ভোলাদ্বীপ কোন কোন বছর প্রবল জলোচ্ছ্বাসের কবলে পড়ে। আর তাতে করে হাজার হাজার মানুষ মারা যান। তবুও অর্থনৈতিক কারণেই এখানকার বাসিন্দারা এই দ্বীপগুলোতে বাস করেন। (ii) অন্যদিকে, নদীর ভাঙনে কোন গ্রাম ধ্বংস হতে বসলে তবেই গ্রামবাসীরা সে গ্রাম ছেড়ে অন্যত্র আশ্রয় নেন। ভাঙালায় 'নারায়ণ' রচয়িতা মহাকবি কৃত্তিবাসের জন্মস্থান ভাগীরথী তীরস্থ ফুলিয়া এমনি এক গ্রাম (Sen and Sen, 1978)। (iii) নদীর গতিপথ ক্রমাগত পরিবর্তনের জন্যও অধিবাসীরা গ্রাম ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হন। গঙ্গা বা পদ্মা পশ্চিমবঙ্গের এমনি এক নদী। এর গতিপথ বার বার পরিবর্তনের জন্যও ফলে বহুলোকের অনেক কীর্তি নষ্ট হয়ে গেছে। তাই একে 'কীর্তিনাশা' বলা হয়। (iv) বন্যার মত আর এক প্রাকৃতিক বিপর্যয় হল খরা। প্রচণ্ড উত্তাপ ও অনাবৃষ্টি থেকে যেমন খরা হতে পারে তেমনি আবার পর পর কয়েক বছরের অনাবৃষ্টি থেকেও খরা হতে পারে। উত্তর আফ্রিকার 'সাহেল' অঞ্চলে শেষোক্ত কারণে খরা দেখা দিয়েছিল। এখানে জমি খুব একটা উর্বর নয়, তদপুরি খরার কারণে জমির উৎপাদন ক্ষমতা কমে গিয়েছিল। শত শত বাসিন্দা--যাদের অধিকাংশই হলেন যাযাবর--তারা ঐ অঞ্চলে তাঁবুতে কিংবা শহরে আশ্রয় নিলেন। 1930-র দশকে যুক্তরাষ্ট্রে খরার দরুন আনেকে ওকালাহামা ও তার লাগোয়া সমতল রাজ্যগুলো থেকে ক্যালিফোর্নিয়ায় চলে গিয়েছিলেন।

প্রাকৃতিক পরিবেশের বদান্যতা মানুষকে সেখানে ঘর বাঁধতে হাতছানি দেয়। কিছুদিন আগেও দেখা যেত যে আমাদের দেশের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা প্রকৃতির নির্মল ও স্নিগ্ধ পরিবেশ উপভোগ করার জন্য শহরের কোলাহল থেকে দূরে অথচ শহরে উপকণ্ঠে বাগানবাড়ি বানাচ্ছেন। পাশ্চাত্য দেশগুলোতে মোটরগাড়ি থাকার সুবিধের জন্য লোকে শহর থেকে দূরে বসবাস করেন।

নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলের জলবায়ু মানুষকে বেশি টানে। ইংল্যান্ডের দক্ষিণ উপকূল, ভূমধ্যসাগরীয় তীরস্থ স্পেন ও ফ্রান্স, কিংবা যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূলে মনোরম জলবায়ু সেখানে লোকসমাবেশ ঘটিয়েছে।

আজ থেকে 100 বছর আগেও দার্জিলিং (শহর) ছিল অখ্যাত এক গ্রাম। কিন্তু এর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও পরিবেশ ব্রিটিশদেরকে এখানে টেনেছিল। তাঁরাই একে পরবর্তীকালে বাংলার গ্রীষ্মকালীন রাজধানী হিসেবে ব্যবহার করতে শুরু করেন। সেই থেকেই এই শহরের বাড়বাড়ন্ত।

পূর্ববর্তী কারণগুলো মানুষকে যেমন ঘর ছাড়তে বাধ্য করে, তেমনি এর বিপরীত অবস্থা কোন স্থানে লোক সমাগম ঘটায়। কোন জায়গায় সুবিধেজনক শর্তে জমি পাওয়া, কাজের সুযোগ এবং প্রবাসীদের অবস্থা ফেরানোর আকাঙ্ক্ষা মানুষকেনগ সেই স্থানে ঘর বাঁধতে হাতছানি দেয়। এ ছাড়াও কোন দেশে একটি বিশেষ ধর্মের প্রতি অসঞ্ছিতা সেই সম্প্রদায়ের লোকদের অন্য দেশে যেতে বাধ্য করে। এইসব স্বতঃস্ফূর্ত কারণ ছাড়াও মানুষ অনেক সময় অন্যখানে যেতে বাধ্য হন। পরে বিস্তারিতভাবে সেগুলো নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে

(4) সামাজিক কারণ : ধর্মীয় সহিষ্ণুতা (Religious Tolerance) : কোন কোন দেশে বিশেষ ধর্মের প্রতি আনুগত্যতে অবজ্ঞার চোখে দেখা হয়। আবার কোন দেশে সংখ্যালঘু সমস্তপ্রদায় নির্দ্বিধায় তাদের ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান পালন করতে পারেন না। সেই সব ক্ষেত্রে ঐ সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোকেরা যেখানে বা যে সব দেশে তাদের

সম্প্রদায়ের লোকেরা বেশি বাস করেন, সেখানে চলে যান। যেমন ইহুদীদের জার্মানি থেকে ইজরায়েলে চলে আসা কিংবা স্বাধীনতার পর হিন্দুদের পূর্ব পাকিস্তান থেকে পশ্চিমবঙ্গে পরিযান বা বিপরীতভাবে মুসলিমদের পশ্চিমবঙ্গ থেকে পূর্ব পাকিস্তানে পরিযাণ ধর্মীয় কারণের জন্যেই ঘটেছে।

(5) বাধ্যতামূলক পরিযান (Force Migration) : যদিও অধিকাংশ পরিযাণই স্বেচ্ছাপ্রণোদিত অর্থাৎ পরিযায়ী ব্যক্তি তাঁর ভাগ্য ফেরানোর উদ্দেশ্যে যেশ ছাড়েন, তবুও এমন কিছু ক্ষেত্র আছে যেখঢঘানে অন্যদের স্বার্থে কিছু ব্যক্তি কে পারিযাণে বাধ্য করা হয় (i) অতীতে দেখা গেছে যে অস্ট্রেলিয়ায় উপনিবেশ স্থাপন করতে বন্দীদের নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। অনুরূপভাবে রাশিয়াতে বন্দীদের সাইবেরিয়ায় নির্বাসন দেওয়া হয়েছিল। (ii) ক্রীতদাসদের বন্দী করে অন্য দেশে পাঠানোও বাধ্যতামূলক পরিযাণের মধ্যে পড়ে। অনেকে দেশে কয়েক শতাব্দী ধরে ক্রীতদাস প্রথা চালু ছিল। সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে যুক্তরাষ্ট্র, ল্যাতিন আমেরিকা ও পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে বাগিচা চাষের প্রয়োজনে দাসদের (slaves) আনা হয়েছিল। পশ্চিম আফ্রিকা থকে নিগ্রোদের এত বেশি সংখ্যায় যুক্তরাষ্ট্রে আনা হয়েছিল যে বর্তমানে তাঁরা সেখানকার জনসংখ্যার এক বিরাট অংশ জুড়ে আছেন। (iii) বাধ্যতামূলক পরিযাণের আর একদিক দেখা যায় যে কোন দেশে কিছু কিছু ব্যক্তি বা সম্প্রদায়কে অবাঞ্ছিত মনে করা হয় ও তাদেরকে দেশ ছাড়তে বাধ্য করা হয়। কোন দেশে থেকে বিদেশি কূটনৈতিকদের বিতাড়ন এই পর্যায়ে পড়ে। কোন দেশের সঙ্গে আন্তর্জাতিক বোঝাপড়া বন্ধ হলে সেই দেশের কূটনীতিকদের দেশ ছাড়তে বাধ্য করা হয়। (iv) অতি সাম্প্রতিকালে পল পটের (Pol Pot) শাসনকালে কাম্পুচিয়ার শহরবাসীদের গ্রামে অভিবাসন, কিংবা (v) উগাণ্ডা থেকে এশিয়াবাসীদের নির্বাসন ও বাধ্যতামূলক পরিযাণের আওতায় আসে।

2.2.7 পরিযাণে প্রয়াস-আকর্ষণ মতবাদ

একথা ঠিক যে বিভিন্ন প্রকার অসামান্যই হল পরিযাণের প্রাথমিক কারণ। এ রকম একটা ধারণা থেকে 'প্রয়াস-আকর্ষণ' (Push Pull) মতবাদ জন্ম নিয়েছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে পরিযাণের কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বিশেষ বিশেষ মতবাদ প্রয়োগ করা হয়। 'প্রয়াস' (Push) উপাদানগুলো হলো সেইসব প্রভাব যা পরিযাণ সৃষ্টি করে। এগুলো হল সেইসব প্রতিকূল অবস্থা যা কোন ব্যক্তির অন্য কোন স্থানে গিয়ে বাস করার কারণ। এগুলোর মধ্যে আছে কম বেতন,

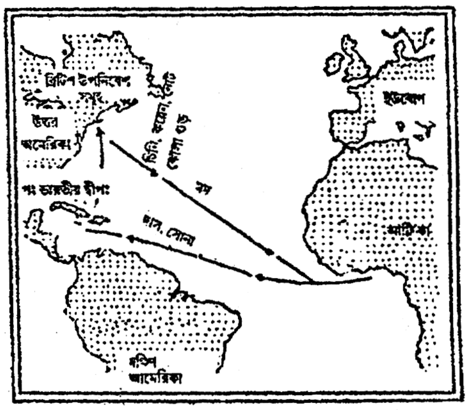

চিত্র 2.21 : আফ্রিকার ক্রীতদাসদের প্রতিস্থাপন ও গন্তব্যস্থল   চিত্র 2.22 : ত্রিমুখী দাস-ব্যবসা

দারিদ্র, দুর্ভিক্ষ, বেকারী, প্রাকৃতিক প্রতিকূলতা, রাজনৈতিক অস্থিরতা ও ধর্মীয় অসহিষ্ণুতা। 'আকর্ষণ' উপাদানগুলো হল গন্তব্যস্থলের (আকাঙ্ক্ষিত স্থানের) প্রতি প্রলোভন, তা সে বাস্তব হোক বা কাল্পনিক হোক। এগুলোর মধ্যে আছে উচ্চ বেতন, সস্তায় জমি, বসবাসের পক্ষে কাম্য আকর্ষনীয় অবস্থা ও অর্থনৈতিক উন্নতির সুযোগ-সুবিধে। নিচে আমরা সেগুলো নিয়ে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করব।

প্রব্রজনের প্রয়াস উপাদান (Push Factors of Migration)

পরিযাণের প্রয়াসজনিত উপাদানগুলো নিম্নরূপ :

(1) লোকসংখ্যা দ্রুত স্বাভাবিক বৃদ্ধির তরুন প্রাকৃতিক সহায় সম্পদের ওপর অসম্ভব চাপ। জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে মানুষ ও চাষযোগ্য জমির মধ্যে যে স্বাভাবিক অনুপাত তা ব্যাহত হওয়ার তরুন শ্রমশক্তির পূর্ণ ব্যবহার আর সম্ভবপর নয়। উদ্বৃত্ত এই শ্রমিকদের বিকল্প কোনো শ্রমের ব্যবস্থা না থাকায় তাঁরা জীবিকান্বেষণে স্থানান্তরে যেতে বাধ্য হন। গ্রামাঞ্চল থেকে শহরাঞ্চলে বা শিল্পাঞ্চলে দলে দলে লোক চলে আসার এটি একটি অন্যতম কারণ। সাধারণ অদক্ষ শ্রমিকরাই এতে বেশি অংশ নেন।

(2) প্রাকৃতিক সহায় সম্পদের দ্রুত অবলুপ্তি। বন্যা, ধ্বংস, ভূমিক্ষয়, বনজ ও খনিজ সম্পদ ইত্যাদি নষ্ট হবার ফলে জীবনধারণ অনেক কঠিন হয়ে পড়ে।

(3) প্রাকৃতিক দুর্যোগ, বছর বছর বন্যার তাণ্ডব, উপর্যপরি খরা বা আবহাওয়ার ঘন ঘন পরিবর্তন।

(4) সামাজিক, রাজনৈতিক বা ধর্মীয় জীবনে গভীর অস্থিরতা।

(5) ব্যক্তিগত গোযগ্যতা অনুযায়ী উপযুক্ত কাজের অভাব।

প্রব্রজনের আকর্ষণ উপাদান (Pull Factors of Migration)

গন্তব্যস্থলের আকর্ষণজনিত প্রভাবসমূহ নিম্নরূপ :

(1) নতুন কোনো সম্পদের আবিষ্কার। যেমন--আফ্রিকা, আলাস্কা ও কালিফোর্নিয়ায় সোনার আবিষ্কার পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে মানুষকে ঐ সব স্থানে টেনে এনেছে।

(2) শিল্পস্থাপন ও নতুন নতুন প্রযুক্তির ব্যবহার। চিত্তরঞ্জন, দুর্গাপুর, ভিলাই ইত্যাদি শিল্পনগরীদুলো সহজেই মানুষকে আকর্ষণ করে।

(3) রাজনৈতিক ও সামাজিক স্থিতিশীতলা।

(4) মনোরকম আবহাওয়া ও পরিবেশ।

প্রব্রজনে আকর্ষণ-বিকর্ষণ উপাদান

নিচের আলোচনা থেকে আমরা দেখব যে কিছু কিছু উপাদান আয়ে যা একদিকে যেমন মানুষকে তার স্বদেশ ছাড়তে ইন্ধন জোগায়, তেমনি কিছু কিছু কারণ আছে যা মানুষকে কোন স্থানে বসতি স্থাপনে হাতছানি দেয়। সেইসব উপাদানগুলো হল--

(1) উন্নত ধরনের প্রযুক্তি ও শিল্প শহরাঞ্চলে বহু লোককে যেমন টেনে আনে, তেমনি চাষবাসে ট্রাকটার বা পাওয়ার টিলারের ব্যবহার বহু কৃষিশ্রমিককে অন্যত্র কাজের সন্ধানে যেতে বাধ্য করে

(2) কিছু কিছু সরকারি বা প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত। চাষের জমির ঊর্ধ্বসীমা নির্ধারণের ফলে বহু লোক যেমন চাষবাসের বিকল্প সন্ধান করছে, উদ্বৃত্ত জমি ভূমিহীনদের মধ্যে বিতরণের ফলে অনেকেই তেমনি চাষবাসে উৎসাহী হন।

(3) উন্নত জীবনযাত্রার প্রতিশ্রুতি যেমন অনেককে আকর্ষণ করে, জীবনযাত্রার মান উঁচু হওয়ায় উপেক্ষাকৃত দরিদ্র শ্রেণির মানুষরা স্থানান্তরে যেতে আগ্রহী হন।

(4) আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুবান্ধবের উপস্থিতি যেমন অনেককে বাসস্থান নির্বাচনে প্রত্যক্ষভাবে প্রবাবিত করে, তেমনি অনেকেই আবার নিকট আত্মীয়দের থেকে দূরে থাকাই শ্রেয় মনে করেন।

প্রব্রজনের আপেক্ষিক পছন্দের ভূমিকা (Role of Relative Desirability in Migration)

প্রব্রজনের কার্যকারণ বিশ্লেষণ আকর্ষণ-বিকর্ষণ প্রকল্পের চেয়ে আপেক্ষিক পছন্দ-অপছন্দের ভূমিকা অনেক বেশি বাস্তবসম্মত। আপেক্ষিক পছন্দ-অপছন্দের ধারণায় কোনো এক স্থানের আকর্ষক বিষয়গুলোর সাথে অন্য অনেক স্থানের (নিজ বাসস্থানেরও) আকর্ষণীয় বিষয়গুলোর তুলনামূলক বিচার করে থাকে। পরিযায়ী ব্যক্তিরা এর পর তাঁর কাছে যে স্থান সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত বলে মনে হবে সেখানেই তিনি বসবাস করবার জন্য যাবেন। অন্যথায় তিনি বাসস্থান পরিবর্তন করবেন না।

প্রব্রজনের আগ্রহী ব্যক্তির সামনে কয়েকটি পথ খোলা থাকে। একাধিক স্থান তাঁকে একই সঙ্গে প্রব্রজনে হাতছানি দেয়। প্রতিটি স্থানেই স্থিতিশীল হবার পক্ষে কিছু কিছু আকর্ষণীয় দিক থাকবেই। সেইসঙ্গে কিছু কিছু অনাকর্ষণীয় দিকও থাকবে।

2.2.8 প্রবহমানতার ফলাফল (Consequences of Migration)

প্রবাহমানতার ফলে মানুষে মানুষে যে মিলন ঘটে তার বহুবিধ ফলাফল লক্ষ্য করা যায়। নিচে সে সম্পর্কে আলোচনা করা হল :

আয়তন ও সংখ্যাগত ফলাফল (Effects on Size and No. of Population)

ভৌগোলিকেরা প্রব্রজনমানতার ফলাফল নিয় খুব বেশি আগ্রহী।

(1) গ্রাহীতা (reception) কেন্দ্র, তা সে গ্রাম হোক আর শহরই হোক, অবিবাসীদের আগমনজনিত কারণে উভয়েরই জনসংখ্যা বাড়বে। ফলে চাষের জন্য নতুন জমির খোঁজ চলবে। অন্যদিকে, বাস্তুতাগের ফলে ঐ উৎস অঞ্চলে জনসংখ্যা কমে যাবে (Legon et.al., 1992)। চাষের জমি পতিত থেকে যাবে। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ থেকে বিংশ শতাব্দীর গোড়া পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণের জেলাগুলোতে ম্যালেরিয়ার প্রকোপে বহু লোক মারা যেতেন। এর থেকে মুক্তি পেতে ও হুগলি শিল্পাঞ্চলে চলে যান, ফলে গ্রামগুলো জনশূন্য হয়ে পড়েছিল। এজন্য বহু চাষের জমি পতিতথাকত। এই অভাব পূরণের জন্য পশ্চিমাঞ্চল থেকে মুণ্ডা, সাঁওতাল প্রভৃতি উপজাতিরা চাষবাসের জন্য এই অঞ্চলে আসতে আরম্ভ করলেন, যদিও তাঁদের চাষবাসের মান ছিল অনুন্নত (Mukherjee, 1983) । এতো গেল অন্তর্দেশীয় পরিযানের ফলে সৃষ্ট জনসমস্যার একটা দিক।

(2) এবার আন্তর্জাতিক পটভূমিতে প্রবহমানতার ফলাফল নিয় একটু আলোচনা করা যাক যুক্তরাষ্ট্র ও আয়ারল্যাণ্ডের কথা ধরা যাক। 1819 সালে যুক্তরাষ্ট্রে 58 লক্ষ লোক বসবাস করতেন। বিংশ শতাব্দীর শুরুতে এই সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল 76 মিলিয়ন, 1975 সালে তা হল 26 মিলিয়ন আর 2001 সালে 284 মিলিয়ন। যুক্তরাষ্ট্রের এই জনস্ফীতির সঙ্গে সঙ্গে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে জনসংখ্যা হ্রাস পেল। যেমন 1820 থেকে 1947 সালের

মধ্যে সুইজারল্যাণ্ড ও ইতালিতে মোট জনসংখ্যার যথাক্রমে 7 ও 11 শতাংশ লোক কমে গিয়েছিল। কিন্তু সবচেয়ে বেশি প্রভাব পড়েছিল আয়ারল্যাণ্ডে। এখানে 1841-51, 1851-61, 1861-71, 1871-81, 1881-91, 1891-1901, 1901-11, 1911-26, 1926-27 সালের মধ্যে যথাক্রমে-- 19.5, –11.5, –6.5, –4.6, –8.8, –5.1,–1.6, –3.4, –0.5 শতাংশ জনসংখ্যা কমে গিয়েছিল। বাল বাহুল্য, ঐ বিপুলসংখ্যা জনতা যুক্তরাষ্ট্রে স্থায়ীভাবে ঘর বেঁধেছেন। প্রবহমানতার আর একটা ফল সমাজবিজ্ঞানীদের দৃষ্টি এড়ায়নি। তা হল গত 100 বৎসর যাবৎ শহরের অস্বাভাবিক জনস্ফীতি, আর তার বিপরীত চিত্রে রয়েছে গ্রামীণ জনশূন্যতা।

(3) স্বভাবতই গ্রাম ও শহরের জনবন্টনে এক বিরাট ফারাক সৃষ্টি হয়েছে।

পরিব্রাজনের স্থানিক প্রভাব

পরিব্রাজনের ফলে কোন নির্দিষ্ট ভৌগোলিক অঞ্চলের মধ্যে একাধিক ক্ষুদ্রতর ভৌগোলিক এলাকার সৃষ্টি হয়। প্রায়ার (Pryor : Laws of Migration ? The experinece of Malaysia and other Countries, 1969)-এর মতে পরিব্রাজনের জন্য মোট চার ধরনের ভৌগোলিক ক্ষেত্র (Geographical Space) সৃষ্টি হয়। যেমন--

(i) **অপ্রত্যক্ষ সংযোগ এলাকা (Indirect Contact Space) :** পরিব্রাজনের সামাজিক প্রভাব এই এলাকায় সবচেয়ে কম অনুভূত হয়। অনেক সময় পরিব্রাজনের ফলে নতুন আসা লোকজনের সাথে ঐ এলাকার পুরোনো লোকদের কোন প্রত্যক্ষ সংযোগ তৈরি হয় না। এই কারণে পরিব্রাজনের সামাজিক প্রভাবও সরাসরি বোঝা যায় না অর্থাৎ অপ্রত্যক্ষ সংযোগে এই এলাকার বৈশিষ্ট্য।

(ii) আকাঙ্ক্ষিত অঞ্চল (Aspiration Space) : যে অঞ্চলে যাওয়ার জন্য মানুষের মধ্যে সব সময় ইচ্ছা বা চেষ্টা রয়েছে। যেমন, তৃতীয় বিশ্বের লোকজনের কাছে ইংল্যাণ্ড বা আমেরিকার মতো দেশ।

(iii) **কর্মব্যস্ত অঞ্চল (Activity Space) :** যে অঞ্চলের মধ্যে দিয়ে সবসময় মানুষ এক এলাকা থেকে অন্য এলাকায় যাতায়াত করচেন। নেপাল থেকে ভারতে আসার জন্য শিলিগুড়ি এলাকা বা বাংলাদেশ থেকে ভারতে আসার জন্য বনগাঁ, মুর্শিদাবাদ, কোচবিহার সীমান্ত।

(iv) **অনুসন্ধান অঞ্চল (Search Space) :** যেখানে শিক্ষা বা কর্মসংস্থান বা বসবাসের উদ্দেশ্যে উপযুক্ত স্থান খোঁজার চেষ্টা চলে। যেমন, পঞ্চাশের দশকের দণ্ডকারণ্য অঞ্চল।

সাংস্কৃতিক প্রভাব (Cultural Impact)

পরিব্রাজনের প্রভাবে সাংস্কৃতিক ব্যাপন (Cultural Diffusion)-এর হেরফে ঘটে (চিত্র 2.23)। আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে কোনপিছিয়ে পড়া এলাকা পরিব্রাজনের প্রভাবে দ্রুত উন্নতি করতে পারে। আমেরিকায় আফ্রো-এশীয় এবং ইউরোপীয় মানুষজনের প্রভাবে মার্কিন সংস্কৃতির বিকাশ ঘটেছে। অন্যদিকে, পরিব্রাজনের প্রভাবে কোন এলাকার সামাজিক পরিস্থিতির পরিবর্তনও হতে পারে। যেমন, মধ্যযুগে ভারতে মুসলমান রাজত্বে মেয়েদের মধ্যে পর্দাপ্রথা চালু হয়। তার আগে ভারতীয় মহিলারা পর্দানসীন ছিল না। আবার, ইংরাজরা ভারতে আসার পর জোর করে নীল চাষ শুরু করে। ধানের জমিতে নীল চাষ করার ফলে ধানের উৎপাদন ব্যাহত হয়। ফলে বাংলার অর্থনীতি বিশেষভাবে ভেঙে পড়ে।

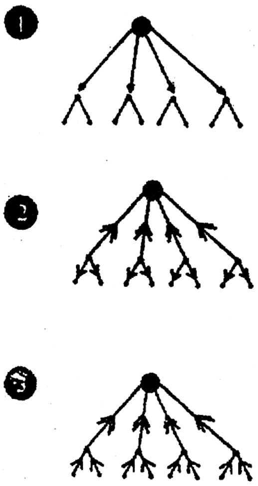

সমাজের উচ্চতম স্তর থেকে মধ্যম স্তরে ছড়িয়ে পড়া সাংস্কৃতিক প্রভাব (যেমন—ডেভিড হেয়ার-এর প্রচেষ্টায় কলকাতা শিক্ষাবিস্তার।)

সমাজের মধ্যম স্তর থেকে উচ্চ ও নিম্ন স্তরে ছড়িয়ে পড়া সাস্কৃতিক প্রভাব (যেমন—পরিব্রাজনের কারণে চলে আসা ডাক্তার, শিক্ষকদের নতুন এলাকার জনগণের মধ্যে সেবামূলক কাজের বিস্তার)।

সমাজের নিম্ন স্তর থেকে মধ্যম ও উচ্চতম স্তরে ছড়িয়ে পড়া সাস্কৃতিক প্রভাব। (যেমন—দার্জিলিং-আসামের চা-বাগান বা আমেরিকায় তুলাক্ষেতে কাজ করা পরিব্রাজকের শ্রমিকের শ্রমের বিনিময়ে স্থানীয়, আঞ্চলিক ও দেশীয় অর্থনীতির উন্নতি—চট্টোপাধ্যায়, 2001 অবলম্বনে।)

চিত্র 2.23 : প্রব্রাজনের প্রভাবে সাংস্কৃতিক ব্যাপন (Cultural Diffusion)-এর প্রকৃতি।

সামাজিক ফলাফল (Social Consequences)

আমরা আগেই জেনেছি যে পুরুষরা নারীদের তুলনায় বেশি পরিব্রাজনশীল, আবার এটাও লক্ষ্য করা গেছে যে পুরুষরা যখন কার্যোপলক্ষ্যে শহরে গিয়ে বসবাস শুরু করেন, তখন তাঁদের পরিবারদের বাড়িতেই রেখে আসতে বাধ্য হন, কারণ কর্মস্থানে বাসা পাওয়া, ছেলেমেয়েদের শিক্ষা, পৈতৃক বাড়ির রক্ষণাবেক্ষণ, বয়স্ক বাবা-মাকে কর্মস্থানে নিয়ে যাওয়া ও সর্বোপরি আর্থিক অসুবিধের দিকটা রয়েছে। তাই দেখা যায় যে 1910 সালে যুক্তরাষ্ট্রে সবচেয়ে বেশিসংখ্যক ব্যক্তি অবিবাসন (immigration) করেছিলেন। এই সময় সেখানে প্রতি 100 জন নারীপিছু পুরুষের সংখ্যা ছিল 129 জন। ঐ দেশে কিছু কিছু প্রবাসীদের ক্ষেত্রে এই লিঙ্গ অনুপাত (sex compostion) চোখে পড়ার মতন। যেমন 1940 সালে ভারতীয়দের ক্ষেত্রে প্রতি 100 জন নারীতে পুরুষের সংখ্যা ছিল 393 জন। 1950 সালে চিনাদের ক্ষেত্রে এই অনুপাত ছিল 190 জন ও ফিলিপিনদের ক্ষেত্রে 297 জন। 1950 সাল পর্যন্ত অবস্থাটা এই রকম চলছিল, অর্থাৎ নারীর চেয়ে পুরুষের সংখ্যা সব সময়েই বেশি ছিল, কিন্তু এর পর থেকে পরিস্থিতি পালটে গেছে। 1960 সালে যুক্তরাষ্ট্রে এক সমীক্ষায় দেকা গেছে প্রতি 100 জন নারীতে পুরুষের সংখ্যা ছিল 98 জন। কারণ হিসেবে বলা হচ্ছে অভিবাসনের ঘটনা কমে গেছে। দ্বিতীয়ত, ইদানীংকালে পুরুষরা তাদের পরিবারকে নিয়ে এদেশে বসবাসের উদ্দেশ্যে আসছেন। এছাড়া 1941 ও 1950 সালের যুদ্ধের মধ্যবর্তী সময়ে যেসব তরুণ-তরুণীর যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশ করেছিলেন, তাদের মধ্যে নারী-পুরুষের অনুপাত ছিল 100 : 68।

প্রবাহমানতার ফলে শহর ও গ্রামাঞ্চলে নারী-পুরুষ অনুপাদের হেরফের সব দেশেই লক্ষণীয়। অবশ্য কারিগরি ও আর্থিক অগ্রগতির ওপর এটা নির্ভর করে। অনুন্নত দেশ আফ্রিকার কথাই ধরা যাক। সেখানকার পুরুষরা স্ত্রীকে বাড়িতে রেখে প্রায় চিরদিনের মতই গ্রাম ত্যাগ করেন। গ্রামে পুরুষের অভাবে চাষবাস ভাল হয় না। আর শহরে স্ত্রীলোকের অভাব পুরুষদের মধ্যে অনেক কু-অভ্যাসের জন্ম নেয়। বিবাহবিচ্ছেদ বাড়ে, সেই সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়ে বেশ্যাবৃত্তিও। ভারতের কেরালাতে অনেকটা একই ধরনের সমস্যা দেখা দিয়েছে। এখানকার অনেক মুসলিম পুরুষ

মধ্যপ্রাচ্যে চাকরির সন্ধানে চলে গেছেন। তাই অনেক গ্রামেই বেশিসংখ্যক মহিলার উপস্থিতি চোখে পনার মত। পুরুষেরা বাড়িতে না থাকায় এক ধরনের সামাজিক সমস্যা দেখা দিয়েছে। এবার সামাজিক সমস্যার একটু ভিন্ন দিক দেখা যায়। আফ্রিকার নিগ্রো-অধ্যুষিত শহর ব্রাজ্জাভিলে (Brazzavilla) প্রাপ্তবয়স্ক জনসংখ্যার একটা বড় অংশ হলেন পুরুষ মানুষ, শিশুদের সংখ্যা তুলনামূলকভাবে কম। আর বৃদ্ধ ব্যক্তিদের সংখ্যা নেই বললেই চলে। এখানকার নারীদের এক-তৃতীয়াংশের বেশি প্রজনন ক্ষমতাহীন। শহরেও স্ত্রীলোকদের বাচ্চা হয় খুব কম। এমত অবস্থায় বংশরক্ষা করা কষ্টসাধ্য ব্যাপার। খনি ও অরণ্য বসতিতে পরিস্থিতি আরো ভয়াবহ। সেখানে নারীদের তুলনায় পুরুষদের সংখ্যা 2 থেকে 3 গুন। সাধারণভাবে বলা চলে শহরের বয়স যত নবীন হবে নারী-পুরুষের সমাহারে (sex composition) তত পার্থক্য হবে। কারণ নতুন শহরে প্রথমাবস্থায় মানুষের বসবাসের সুযোগসুবিধেগুলো কম থাকে। ফলে অনেকেই পরিবারকে বাড়িতে রেখে আসেন। এই প্রসঙ্গে বিজু গার্নিয়ার (Beaujeu Garnier) লিখেছেন যে শহরের গুরুত্ব যত বেশি হবে, জীবনযাত্রার মানও তত পরিবর্তন হবে, নারীর সংখ্যাও তত কম হবে। উদাহরণ হিসেবে তিনি লিখেছেন 1931 সালে ভারতবর্ষের 50,000-1,00,000 অধিবাসী অধ্যুষিত শহরে 100 জন নারীপিছু পুরুষের সংখ্যা ছিল 120 জন, আর পাঁচ লাখ অধিবাসী অধ্যুষিত শহরগুলোতে 161 জন (নারী), কিন্তু 1951 সালে কলকাতায় প্রতি 100 জন নারীপিছু পুরুষের সংখ্যা ছিল 175 জন, হাওড়ায় 163 জন, আমেদাবাদে 130 জন। এছাড়া, সমস্ত বড় বাণিজ্যিক ও শিল্প শহরে একই ধরনের বৈষম্য লক্ষ্য করা গিয়েছিল। উন্নত দেশগুলোর পরিস্থিতি একটু অন্য রকমের। এখানে নারী ও পুরুষ একসঙ্গে গ্রাম ছেড়ে শহরে চলে আসেন। গ্রামে যাঁর পড়ে থাকেন তাঁরা খুব বয়স্ক। আবার, আয়ারল্যান্ড বা ফ্রান্সের কিছু কিছু অংশে দেখা যায় যে যুবতীরা গ্রামে থাকতে চান না। তাঁরা চাকরি খুঁজতে শহরে আসেন। প্রবহমানতার বহু সমীক্ষা ঘেঁটে এটা লক্ষ্য করা গেছে যে ভাগ্যান্বেষণে যাঁরা জন্মস্থানে ছেড়ে আসেন, তাঁদের গড় বয়স 30-এর নিচে।

জৈবিক ফলাফল (Biological Consequences)

প্রবহমানতার জৈবিক ফলাফল আরও গভীর। নবাগদরা এক অপরিচিত পরিবেশের মধ্যে এসে পড়েন, যা তাঁর নিজের দেশের তুলনায় একটু অন্যরকম। প্রবাহমানতার কিছু ভাল দিকও দেশত্যাগীদের মধ্যে দেখা যায়। তাঁদের পুরোনো গোষ্ঠীজীবন ভেঙে যায় এবং বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে মিলন ঘটে। আর তার প্রতিক্রিয়া আগামী বংশধরদের মধ্যে পড়ে।

নতুন পরিবেশে ধাতস্থ হওয়া সমসময় সুখের হয় না। শহরে আগন্তুক গ্রামবাসীরা আলো, বাতাস, স্থানাভাব, ধুলো ও ধোঁয়ার অস্বস্তিকর পরিবেশে ভোগেন।

সংযোগজনিত সমস্যা (Communication Problem)

এই সমস্যা জাতিগত, ধর্মগত ও ভাষাগত পার্থক্যের মধ্যে দিয়ে প্রকাশ ঘটে। প্রথমেই ধরা যাক, জাতিগত সমস্যার কথা। অনুন্নত দেশগুলো গত দু'শো বছর যাবৎ বিদেশি শাসনাধীনে ছিল, ফলে এই সব দেশে কম-বেশি জাতিগত সমস্যা দেখা যায়। বর্তমান দিনে দক্ষিণ আফ্রিকা এ বিষয়ে বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে। সেখানকার প্রাক্তন শ্বেতাঙ্গ সরকার স্থানীয় কৃষ্ণকায় জনগণের সঙ্গে মিলেমিশে বসবাস করার বিরোধী বলে বর্ণবৈষম্য নীতি জিইয়ে রেখেছিলেন। আবার যুরাষ্ট্রের দক্ষিণের রাজ্যগুলোতে শ্বেতকায়-অশ্বেতকায় সমস্যা সমাধান হওয়া মুশকিল।

ভাষার ব্যবধানও সমস্যা সৃষ্টি করে। বহুদিন ধরে একসঙ্গে বসবাস করলেও বিভিন্ন ভাষাভাষী মানুষরা তাঁদের নিজস্ব ভাষা বজায় রাখার চেষ্টা করেন। যেমন, কানাডায় বসবাসকারী ইংরেজ ও ফরাসিরা, দক্ষিণ আফ্রিকায়

বসবাসকারী ইংরেজ ও বুয়ররা। অধিকাংশ প্রবাসীর ক্ষেত্রে তাঁরা জীবদ্দশাতে ভাষায় পরিবর্তন ঘটে না, বিশেষ করে মহিলাদের ক্ষেত্রে, কারণ তাঁরা অধিকাংশ সময়ে বাড়িতে থাকেন। কিন্তু পুরুষরা বাড়ির বাইরে কাজ করতে গিয়ে অন্য ভাষা শিখতে বাধ্য হন। পক্ষান্তরে, বিদেশী শাসকরা তাদের উপনিবেশগুলোতে ইুরোপীয় ভাষা চালু করে স্থানীয় অধিবাসীদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করেছেন। যেমন ইংরেজরা এদেশে ইংরেজি ভাযা চালু করেছিলেন। এছাড়া প্রবাসীদের বিভিন্ন ধর্মের প্রতি বিশ্বাস জন্মায়।

দীর্ঘদিন এক জায়গায় বাস করার ফলে পরস্পরের মধ্যে একটা ভ্রাতৃত্বভাব গড়ে উঠে। এছাড়া বিভিন্ন জাতির মিলন তাদের পরস্পরের মধ্যে সংস্কৃতির উন্নতি ঘটায়। প্রবহমানতার অর্থনৈতিক ফলাফল প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে অনুভব করা যায়। প্রবাসীরা তাঁদের পুরোনো দেশকে তাড়াতাড়ি ভুলতে পারেন না। সেখানকার ফেলে আসা আত্মীয়-স্বজনদের প্রতি তাঁদের মমত্ববোধ থেকে যায়। তাই সময় পেলে তাঁরা সেখানে যান। প্রয়োজবোধে তাঁদের টাকা পাঠায়।

এটা পরিষ্কার যে প্রবহমানতা এক ব্যয়সাপেক্ষ ব্যাপার। বিগত শতাব্দীতে যখন প্রবহমানতা ছিল এক স্বতঃস্ফূর্ত ব্যাপার, তখন মানুষের মৃত্যু ও কষ্টভোগের মাধ্যমে এই নেশার মূল্য দিতে হত। বর্তমান দুনিয়াতে প্রাণ দিতে হয় না বটে, কিন্তু প্রবহমানতা খুব ব্যয়সাধ্য ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। যাতায়াতের খরচ ছাড়াও নতুন জায়গায় জমি কেনা ও বাড়ি তৈরি করা অনেক ব্যয়সাপেক্ষ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

এই দিকগুলো ছাড়াও অন্যান্য কতকগুলো দিক আছে। যেমন যে অঞ্চল থেকে লোক গ্রাম ত্যাগ করেছেন সে অঞ্চলে প্রবহমানতার ফলাফল বিশেষ লক্ষণীয়। কারণ, এইসব অঞ্চল তার সম্ভাবনাপূর্ণ ব্যক্তিদের অভাববোধ করেন (Leong, *et. al.*, 1982), বিশেষ করে তরুণ-তরুণীতে। এই অভাববোধ আরও বেশি করে ফুটে ওঠে যখন দেখা যায় কোন দেস তার তরুণদের উন্নতির জন্য যা কিছু করা দরকার সবই করেছে, কিন্তু বিদেশে ভাল সুযোগ পেয়ে সেখানেই পাকাপাকিভাবে আস্তানা গড়েছেন। ফলে এতদিন ধরে তাদের উচ্চশিক্ষার জন্য যে খরচ হয়েছে তার সুফল থেকে দেশ বঞ্চিত হল। সত্যি কথা বলতে কি, মস্তিষ্ক চালান (Brain drain) উন্নয়নশীল দেশগুলোর পক্ষে একটা মস্ত সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

পরিব্রাজনের ফলে অদূর ভবিষ্যতে আর্থিক সমস্যাও দেখা দিতে পারে। উন্নয়নশীল দেশ ভারতের কথায় আসা যাক। দেশবিভাগজনিত সমস্যার বহিঃপ্রকাশ রূপে দেখা দিয়েছে আর্থিক সমস্যা। পূর্ববঙ্গ (বর্তমান বাংলাদেশ) থেকে অগত শরণার্থীদের সুষ্ঠু অর্থনৈতিক পুনর্বাসন সম্ভব হয়নি। এর ওপর প্রতিদিনহ-ই বাংলাদেশ থেকে শুধু হিন্দুই নয়, মুসলিমরাও পশ্চিমবঙ্গের সীমান্তের জেলাগুলোতে এসে ডেরা বাঁধছেন। এছাড়া অসম থেকে আগত শরণার্থীরা আছেন। এত বিপুলসংখ্যক জনতার চাপ ছোট রাজ্য পশ্চিমবঙ্গের পক্ষে সহ্য করা আগামী দিনে কঠিন হয়ে পড়বে। কারণ চাষের জমি সীমাবদ্ধ আর চাকরির সংস্থানও সীমিত। আবার বেকার যুবকরা যদি কোন উপায় না পেয়ে ব্যবসায় নামেন, তাহলে ব্যবসার এত বাজার সৃষ্টি হবে কী করে? উন্নত দেশে আজ না হলেও আগামী 50 বছরে প্রযাণের প্রভাব পড়তে বাধ্য। এক সময় অভিবাসনের (immigration) দিক দিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের স্থান ছিল শীর্ষে। কিন্তু সম্প্রতি সে দেশে অর্থনৈতিক মন্দা দেখা দিয়েছে, আর তার ঢেউ গোটা দুনিয়াতে ছড়িয়ে পড়েছে।

সবশেষে এটুকু বলা চলে যে স্বতঃস্ফূর্ত পরিযাণ সেই সব দেশের পক্ষে খুব সন্তোষজনক যাদের (1) অর্থনীতি খুব চাঙ্গা এবং (2) নবাগতরা যখন উন্নত দেশ থেকে উন্নয়শীল দেশে বসা করতে আসেন।

23 জনসংখ্যা গঠন [Population Composition]

প্রস্তাবনা

জনসংখ্যা গঠনের বিভিন্ন উপাদানের মধ্যে লিঙ্গভিত্তিক গঠন (Sex composition), বয়স গ্রন্থনা (Age composition) ও অর্থনৈতিক গঠন জনসংখ্যা ভূগোল এক বিরাট জায়গা জুড়ে আছে। বিভিন্ন ধরনের পরিকল্পনা ছাড়া জন্ম, মৃত্যু, পরিযাণ (migration), বিবাহিত/অবিবাহিত ও অর্থনৈতিক বৈশিষ্ট্য ইত্যাদি বিষয় জানার জন্য আলাদা আলাদাভাবে নারী ও পুরুষের পরিসংখ্যান দরকার। লিঙ্গের ভারসাম্য জাতির সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনে যথেষ্ট প্রভাব ফেলে। নারী ও পুরুষ উভয় লিঙ্গই সমাজ ও অর্থনীতিতে কিছুটা বিপরীত ও কিছুটা পরস্পরের পরিপূরক হিসেবে কাজ করে। তাই লিঙ্গভিত্তিক গঠন আলোচনা জনসংখ্যা ভৌগোলিকের Population Geographer) কাছে বেশি গুরুত্ব পায়।

উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করলে আমরা লিম্নলিখিত বিষয়গুলোর সাথে পরিচিত হব : কোন জাতির কর্মসংস্থান ও ব্যয়ের বহন সম্বন্ধে ধারণা করতে গেলে সেই জাতির লিঙ্গ অনুপাত (sex ratio) সম্পর্কে জানতে হবে। Trewartha যথার্থই মন্তব্য করেছেন যে উভয় লিঙ্গের অনুপাত কোন এলাকার ভৌগোলিক বিশ্লেষণের মূল কথা। অনুরূপভাবে দেখা যায় যে সমাজবিজ্ঞানীদেরও বয়স গ্রন্থনা বিশ্লেষণে এক বিশেষ আগ্রহ আছে। কারণ কোন জাতির সামাজিক সম্পর্ক সেই জাতির বয়স কাঠানো দিয়ে বেশ কিছুটা প্রভাবিত হয়। শুধু তাই নয়, অনেক ধরনের পরিকল্পনা, বিশেষ করে কোন জাতিগত প্রতিষ্ঠান ও সেবামূলক কার্যকলাপ, কর্মী সরবরাহ ইত্যাদি বিষয়গুলো কোন জনগোষ্ঠীর বয়স গ্রন্থনা দিয়ে নির্ণীত হয়। সম্ভাব্য স্কুল-ছাত্রছাত্রী, সম্ভাব্য ভোটদাদা, সম্ভাব্য কর্মক্ষম ব্যক্তি, আগামা জনগোষ্ঠীর সম্পর্কে অনুমান (estimate) ছাড়াও, শিক্ষক ডাক্তার, কারিগরীব্যক্তি ও সৈনিকের প্রয়োজন সম্পর্কে ভবিষ্যৎ চাহিত নির্ধারণ করতে বয়স কাঠামো সম্পর্কে জ্ঞান থাকা খুব দরকার। জন্ম, মৃত্যু ও নির্ভরশীল জনতার অনুপাত নির্ণয়করতেও বয়স কাঠামো বিশ্লেষণের প্রয়োজন আছে। আর এই পটভূমিতেই কোন জনগোষ্ঠীর লিঙ্গ ও বয়স গঠন (age structure) সম্পর্কিত বিশ্লেষণ জনসংখ্যা ভৌগোলিকের কাছে এক বিশেষ বার্তা নিয়ে আসে।

তথ্যের গুণমান (Quality of Data)

অধিকাংশ দেশে যেখানে বেশ কিছুকান যাবৎ লোকগণনা চলে আসেছ, সেখানে জনগণনা প্রতিষ্ঠান (census organisation)। লিঙ্গভিত্তিক গঠন গাঠামো সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করে আসছে। যে যাই হোক, কতকগুলো মৌলিক সমস্যা থেকে যায়। লিঙ্গভিত্তিক গঠনের চেয়ে বয়স গ্রন্থনা তথ্যে বেশি ভুল থাকে। কারণ নারী-পুরুষের পার্থক্য চোখে পনার মত এক স্বাভাবিক ব্যাপার। যা হোক, লিঙ্গ সংক্রান্ত তথ্যের প্রথান সমস্যা হল নারী সম্পর্কিত পরিসংখ্যানকে (data) কম করে দেখানো (Enderestimation) এ প্রসঙ্গে Shryock লিখেছেন যে কিছু কিছু দেশ আছে যেখানে কন্যা সন্তান বেশি মারা যায় বলে তা নথিভূক্ত (record) করা হয় না। আবার কোন কোন দেশ এমন

অন্ধবিশ্বাস চালু আছে, যে জনগণনার সময়ে বালকদের বালিক, হিসেবে দেকালে অশুভ শক্তির হাত থেকে বাঁচানো যাবে। বয়সের পরিসংখ্যান নিয়েও অনেক সমস্যা আছে, তাই গবেষণা ও বিশ্লেষণধর্মী কাজে এই সব তথ্য ব্যববারে খুব সাবধান হওয়া দরকার। বয়স সম্বন্ধে তথ্য হয় জন্ম-তারিখ কিংবা যথার্থ বয়স (actual age) জিজ্ঞাসা করে সংগ্রহ করা হয়। জন্ম-তারিখ (dita of birth) সম্বন্ধে প্রশ্ন আরও সঠিক তথ্য যোগায়, কিন্তু এ সম্পর্কে অভিভাবকরা ভুল তথ্য দিলে সমস্যা থেকে যায়। সাধারণত (i) নিরক্ষতা, (ii) জন্ম-তারিখ না জানা বা (iii) সেই সম্বন্ধে উদাসীন থাকা, (iv) বয়সের কথা বলতে গিয়ে শেষের সখ্যার সঙ্গে 0, 5 ইত্যাদি যোগ করা, (v) জোড়াসংখ্যার (pair no.) বয়স পছন্দ, (vi) বিভিন্ন ধরনের বর্ষ ভিতি (calendar year) চালু থাকা, (vii) 37, 7, 13 ইত্যাদি কিছু অশুভ সংখ্যার প্রতি বিরূপ মনোভাব, (viii) কিছু অর্থনৈতিক ও সমাজিক সুযোগ নিতে জনগণনাকারীদের (census enumerator) উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে সটিক তথ্য না দেওয়ার জন্য পরিসংখ্যানে বয়স সংক্রান্ত ভুল থেকে যায়। এদেশের অদিকাংশ লোক অশিক্ষিত, তাই তাদের সন্তানদের নির্দিষ্ট জন্মতারিখ সম্বন্ধে সঠিক তথ্য আশা করা যায় না। ভারতে গ্রামবাসীদের, বিশেষ করে বয়স্কদের, বয়সের কথা জিজ্ঞাসা করলেই তারা কোন যুদ্ধ, বন্যা, খরা দুর্ভিক্ষ ইত্যাদি ঘটনার কথা টেনে তাদের বয়স অনুমান করার চেষ্টা করেন। আবার এও দেকা যায় যে কিচু সমাজিক অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সুবিধে নিতে মানুষ কম-বেশি করে বয়স দেখান। যেমন অনেক বাব-মা ভালো জামাই পাবার জন্য বা ক্ষেত্রবিশেষ ভালো বিয়ে দেবার জন্য মেয়েদের বয়স-কম/বেশি করে বলেন। আবার ছেলেরা হয় চাকরি পাবার জন্য বা ভোটের অধিকার পাবার জন্য বয়স কম বা বেশি দেখান। (Chandna, 2002)।

এছাড়া, লোকগণনার সময় ঠিক বয়স জিজ্ঞাসা করলে কেউ কেউ গত জন্ম-তারিখের বয়স উল্লেখ করেন। আবার কেউ বা আগামী জন্ম-তারিখে বয়স কত হবে তা বলেন। জনগণনাকারীরা এ বিষয়ে সতর্ক না হলে উভয় ক্ষেত্রেই বয়সের শ্রেণিবিভাগ (age group) ভুল থাকার সম্ভাবনা থাকে। যে সব দেশের লোকজন শিক্ষিত বা যেসব দেশে বহুদিন ধরে লোকগণনা হয়ে আসছে, সেখানে পরিসংখ্যানে ভুল কম থাকে। এছাড়া একটা ভুল তথ্য যা ইচ্ছাকৃতভাবে লোকগণনা দেওয়া হয়, তা হল মহিলাদের বয়স। সব দেশেই মহিলাদের বয়স কম করে বলার একটা প্রবণতা আছে। উপরে যে দু'ধরনের ভুল তথ্য পরিবেশন সম্বন্ধে বলা হল তার ফলে (a) কোন বয়সপুঞ্জে (age group) জনসংখ্যা বেশি হয়ে যায়, কোনটাতে কম হয়ে যায়। (b) পাশাপাশি দুই বয়সপুঞ্জের মধ্যে পার্থক্যটা খুব চোখে পড়ে, বিশেষ করে কয়েকটি বয়সপুঞ্জের মধ্যে।

2.3.1 নারী-পুরুষ অনুপাত বা লিঙ্গ অনুপাত (Sex Ratio)

কোন দেশের জনসংখ্যায় নারী ও পুরুষের বণ্টনকে লিঙ্গ অনুপাত বলে। ("The Distribution of a population between males and females", Rubenstein *et. al.*)। সাধারণ প্রতি হাজারে (ক্ষেত্রবিশেষে একশোয়) পুরুষে নারীর সংখ্যাকে লিঙ্গ অনুপাত বলে।

মানুষের স্ত্রী-পুরুষ ভেদ খুব সহজে করা যায়। সব দেশেই মোট জনসংখ্যাকে স্ত্রী ও পুরুষ—এই দুটি শ্রেণিতে ভাগ করে দেখানো হয়। স্ত্রী এবং পুরুষের শারীরিক ও মানসিক গঠন এবং সামাজিক কার্যপ্রণালী ভিন্ন ভিন্ন হয়। আবার জনসংখ্যার বর্তমান বয়স-বিশেষিত গঠন ও স্ত্রী-পুরুষের অনুপাতের ওপর ভবিষ্যৎ জনসংখ্যার আয়তন নির্ভরশীল, কারণ এই দুটি বৈশিষ্ট্যই জন্ম, মৃত্যু, বিয়ের মতন গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা নিয়ন্ত্রণ করে (গুহ, 1987)। আমরা জানি যে স্ত্রী-পুরুষ অনুপাদের ভারসাম্য নষ্ট হলে সমাজে তার প্রতিফলন ঘটে। যে সমাজে পুরুষেরা অলস, যেখানে নারীরাই ঘরের ও বাইরের অধিকাংশ কাজ সামলান। যেমন খাসি সমাজে। সমাজে নারীর সংখ্যা কম থাকলে, এক নারী

একাধিক পুরুষকে বিয়ে করতে বাধ্য হন। উপজাতি টোডা সমাজে কিংবা হিমালচনপ্রদেশে কিন্নৌর অঞ্চলে এই প্রথা আজও চালু আছে। সমাজে নারীর সংখ্যা পুরুষদের তুলনায় খুব বেশি হলে, অনেক নারী সাজা জীবন অবিবাহিত থেকে যেতে বাধ্য হন। বড় বড় শহরে নারীর সংখ্যা কম থাকায় পুরুষদের মধ্যে নানা প্রকার কু-অভ্যাস দেখা দেয়।

কোন দেশের জনসংখ্যার স্ত্রী-পুরুষেহ্ অনুপাত কয়েকটি বিষয়ের ওপর নির্ভরশীল। যথা—[জন্মকালে কন্যাশিশুর সংখ্যা, স্ত্রী-পুরুষদের মরণশীলনতার হার, দূরাঞ্চলে বা নিকটাঞ্চলে পরিযাণের প্রবণতা প্রভৃতি (গুহ, 1987)।

2.3.1.1 লিঙ্গ অনুপাতের পরিমাপ (measurement of Sex Ratio)

জনসংখ্যায় নারী-পুরুষের অনুপাত জনসংখ্যাতত্ত্বের একটি মৌলিক পরিমাপ। দুর্ভাগ্যবশত, এই অনুপাত পরিমাপের কোন বিশেষ স্বীকৃত সংজ্ঞা নেই (মজুমদার, 1991) বিভিন্ন দেশে পরিসংখ্যান ভেদে স্ত্রী-পুরুষ অনুপাদের ভিন্ন ভিন্ন পরিমাপ চালু আছে। এরকম কয়েকটি পরিমাপ নিচে তুলে ধরা হল।

(i) লিঙ্গ অনুপাত $= \dfrac{\text{পুরুষের সংখ্যা}}{\text{পুরুষের সংখ্যা} + \text{স্ত্রী লোকের সংখ্যা}} \times K$

(ii) ” $= \dfrac{\text{স্ত্রীলোকের সংখ্যা}}{\text{পুরুষের সংখ্যা}} \times K$

(iii) ” $= \dfrac{\text{স্ত্রীলোকের সংখ্যা}}{\text{পুরুষের সংখ্যা} + \text{স্ত্রীলোকের সংখ্যা}} \times K$

(iv) ” $= \dfrac{\text{পুরুষের সংখ্যা}}{\text{স্ত্রীলোকের সংখ্যা}} \times K$

K-এর মান সাধারণত 100 বা 1,000 ধরা হয়। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে গবেষণার সুবিধের জন্যে i, ii, iii সূত্রগুলোকে ব্যবহা করা হয়। ভারতবর্ষের আদমসুমারী প্রতিবেদনও এই ক'টি সূত্রকেই ব্যবহার করে। জীবন সারণিতে ব্যবহার করা হয় 2 নং সূত্র। বিভিন্ন ধরনের জনসংখ্যা বৃদ্ধির পরিমাণে (GRR ও NRR) 3 নং সূত্রকে ব্যবহার করা হয়।

সুতরাং কোন প্রতিবেদনে শুধু স্ত্রী-পুরুষের অনুপাত বললেই হবে না। এই অনুপাদ নির্ধারণে কোন্ সংখ্যা ব্যবহার করা হয়েছে তা উল্লেখ করা বিশেষ প্রয়োজন। এক এক দেশে এক এক পদ্ধতিতে এই অনুপাত ঠিক করা হয়। রাশিয়ায় পুরুষ ও মহিলা জনসংখ্যার শতকরা হিসেবে এই অনুপাত প্রকাশ করা হয়।

যেমন— বা

এক্ষেত্রে Pm হল পুরুষের সংখ্যা, Pf হল মহিলার সংখ্যা ও Pt হল মোট জনসংখ্যা।

যুক্তরাষ্ট্রেও প্রতি একশ মহিলাতে পুরুষের সংখ্যা হিসেবে নারী-পুরুষ অনুপাত প্রকাশ করা হয়।

সূত্রটি হল : $\frac{Pm}{Pf} \times 100$

নিউজিল্যান্ডে প্রতি শতক পুরুষে নারীর সংখ্যা দিয়ে নারী-পুরুষ অনুপাত ঠিক করা হয় : $\frac{Pf}{Pm} \times 100$

আমাদের দেশে প্রতি হাজার পুরুষে নারীর সংখ্যা দিয়ে এই অনুপাত প্রকাশ করা হয়।

পদ্ধতিটি হল : $\frac{Pf}{Pm} \times 100$

জনমিতিবিদ্যায় তিন ধরনের নারী-পুরুষের অনুপাত আছে। যেমন—

(i) জন্মকালীন ছেলে-মেয়েদের অনুপাত।

(ii) মৃত অবস্থায় ভূমিষ্ঠদের মধ্যে স্ত্রী-পুরুষের অনুপাত।

(iii) গর্ভধারণকালে স্ত্রী-পুরুষের অনুপাত।

প্রথম অনুপতাকে অনেক সময় স্ত্রী-পুরুষের প্রাথমিক অনুপাত ধরা হয়। দ্বিতীয় ধরনের অনুপাতেক অপ্রধান বা অগৌণ অনুপাত হবে ও শেষোক্ত অনুপাতকে অতি প্রধান বা অতি অগৌণ অনুপাত বলে।

জনসংখ্যা ভূগোল তিন ধরনের নারী-পুরুষ অনুপাত আছে। যেমন—

প্রাথমিক (Primary), গৌণ (Secondary) এবং তৃতীয় পর্যায় নারী-পুরুষ অনুপাত (Tertiary sex ratio)। প্রাথমিক নারী-পুরুষ অনুপাত হল গর্ভাবস্থায় উভয় লিঙ্গের অনুপতা, গৌণ-পুরুষ ানুপাত হল জন্মের সময় উভয়লিঙ্গের অনুপাত ও তৃতীয় পর্যায় অনুপাত হল লোকগণনার সময়কার দুইলিঙ্গের অনুপতা। এদের মদ্যে প্রথমটির ব্যবহার কম। কারণ তা অনুমান-সাপেক্ষ ব্যাপার।

2.3.1.2 লিঙ্গ অনুপাতের গুরুত্ব (Importance of Sex Ratio)

সংখ্যাতত্ত্ববিদরা অনেক আগেই উপলব্ধি করেছেন যে প্রতি হাজারে ক'টি সন্তান জন্ম নিল (Live birth per thousand population), যাকে বৈজ্ঞানিক পরিভাষায় অশোধিত জন্মহার (Crude birth rate) বলা হয়, তা থেকে জনসংখ্যার সার্বিক প্রজনন ক্ষমতা বা বংশবৃদ্ধির সম্ভাব্যতা (Potential for reproduction), সম্পর্কে জানা যয় জনসংখ্যার সময়ভিত্তিক বিন্যাস বা ভবিষ্যৎ জন্মহারের পরিবর্তন সমপের্ক অশোধিত জন্মহার কোনরকম পূর্বাভা, দিতে পারে না। যেহেতু কেবলমাত্র মেয়েরাই গর্বধারণে সক্ষম, সে কারণে জনসংখ্যাতত্ত্ববিদদের কাছে কত শিশু জন্মগ্রহণ করলে তার থেকে আগামী দিনে যারা মা হবে তার কত জন জন্মালো, তা অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

বয়সভিত্তিক জনসংখ্যাবিন্যাসে আপাত কোন পরিবর্তন লক্ষ্য করানা গেলেও ভবিষ্যতে জনসংখ্যা বৃদ্ধি বা হ্রাস পেতে পারে যদি জন্মকালীন স্ত্রী-পুরুষের ানুপাতে কোন পরিবর্তন হয়। জন্মসময়ে স্ত্রী-পুরুষের অনুপাতে যদি কোন পরিবর্তন দেখা দেয় তাহলে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারেও পরিবর্তন ঘটবে। এই সম্ভাবনার কথা মনে রেখেই জনসংখ্যাতত্ত্ববিদরা স্থূল জন্মহার (Crude reproduction rate—CRR) এই দুটি প্রজনন হার (Net reproduction rate—NRR) নির্ণয়ের পদ্ধতি বার করেছেন। উভয় পদ্ধতিতের পরিমাপেই জন্মসময়ে স্ত্রী-পুরুষের অনুপাতকে কাজে লাগানো হয়।

পৃথিবীর সব দেশের জন্মমুহূর্তে কন্যা সন্তানের পুত্র সন্তানের সংখ্যা বেশি। কিন্তু মেয়েদের তুলনায় ছেলেদের মৃত্যুহার বেশি হওয়ার জ্য মোট জনসংখ্যায় নারীদের অনুপাত সামান্য বেশি। পুরুষদের মৃত্যুহার বেশি

হওয়ার কারণ হল বহির্জগতের সঙ্গে মেলামেশা। এ কারণে অসুখ-বিসুখ, দুর্ঘটনা ইত্যাদি তাদের জীবনেই বেশি ঘটে থাকে। নারীর জীবনে দুর্ঘটনা বা বিপত্তির মাত্রা তুলনামূলকভাবে কম। তবে সন্তান জন্ম দেবার সময় তাদের জীবনাশংকা বৃদ্ধি পায়। ভারতবর্ষে প্রতি 1 লক্ষ শিশুর জন্ম দিতে গিয়ে 575 জন মায়ের মৃত্যু ঘটে। সন্তান ধারণের সময়সীমা (15-49) পার হলে নারীদের মৃত্যুর হার কমে আছে। ভারতে প্রতি বয়র এই কারণে 15-30 বছরের মেয়েদের অপুষ্টির ফলে স্বাস্থ্যহানি ঘটে।

(i) আমাদের দেশে মেয়েরা (কন্যা-সন্তান) জন্মমুহূর্ত থেকে উপেক্ষিত।

(ii) অধিক সংখ্যায় সন্তান-প্রসব ও অপুষ্টির ফলে স্বাস্থ্যহানি।

(iii) শিশু-বিবাহ।

(iv) সন্তান-প্রসবে অবৈজ্ঞানিক প্রথার বহুল প্রচলন।

(v) স্ত্রীরোগের চিকিৎসায় লজ্জা ও অনাগ্রহ।

(vi) স্বাস্থ্য সম্পর্কে অহবেলা ও অতিরিক্ত পরিশ্রম।

(vii) অনভিজ্ঞ ধাত্রীর হাণ্ডেত প্রসব।

(viii) পুষ্টিকর খাদ্যের অভাব।

(ix) ভোজন ও বিশ্রমে অনিয়ম।

(x) বাড়িতে অসুখ-বিসুখ হলে সব দায়িত্বই মেয়েদের, সেই কারণে মেয়েদের মধ্যে রোগ সংক্রমণও সহজেই হয়।

(xi) লোকগণনায় ঘাটতি।

এ সব কারণেই ভারতীয় নারীদের মধ্যে মৃত্যুহার অধিক। এছাড়া জনসংখ্যাতত্ত্ববিদরা আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণেই উল্লেখ করেছেন। তা হল লোকগণনার সময়ে অনেক ক্ষেত্রেই মেয়েদের সংখ্যা কম দেখানো হয়। গত কয়েক দশক যাবৎ, বিশেষত উত্তরকালে, জনস্বাস্থ্য সচেতনতা ভারতীয়দের মধ্যে যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছে। আধুনিক চিকিৎসা জনসাধারণের নিকট সহজলক্ষ্য। বহু রোগ যা আগে মহামারী আকারে প্রায়ই দেখা দিত তা প্রায় নির্মূল হয়েছে। হাসপাতাল ও স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়মিত উপস্থিতির হার শিশু ও মেয়েদের মধ্যেই বেশি। মা ও শিশুদের জন্য বিশেষ স্বাস্থ্য প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। স্বাস্থ্যকর্মীরা বাড়ি বাড়ি ও গ্রামে গ্রামে গিয়ে নানা বিষয়ে উপদেশ দিচ্ছে। প্রয়োজনমত চিকিৎসাও করছে। তবুও আধুনিক চিকিৎসা ও জনস্বাস্থ্য রক্ষায় গৃহীত ব্যবস্থাদি থেকে ছেলেরাই বেশি উপকৃত হচ্ছে। জনস্বাস্থ্যের উন্নতির এই তারতম্যের কারণেই সমগ্র জনসংখ্যায় স্ত্রীলোকের অনুপাত বাড়বে। প্রায় সব বয়সেই পুরুষদের তুলনায় মেয়েদের সংখ্যা কম। বয়সভিত্তিক মৃত্যুর হারও 34 বছর পর্যন্ত মেয়েদের মধ্যেই বেশি।

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে স্ত্রী-পুরুষের অনুপাতের তুলনা থেকে বিভিন্ন দেশের সামাজিক, অর্থনৈতিক অগ্রগতির পরিচয় পাওয়া যায়। জার্মানি ও রাশিয়ায় পুরুদের সংখ্যাল্পতার জন্য দায়ী দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। জার্মানির ক্ষেত্রে পুরুষদের বহিঃ প্রব্রজন (Out migration) এই সমস্যাকে আরো প্রকট করেছে। ইউরোপের বেশির ভাগ দেশে স্ত্রী-পুরুষের অনুপাত 95-এর কম। এই উন্নয়নশীল দেশগুলোতে অনেক অনুপাত 100-এর বেশি।

নারী-পুরুষ সমাহারের পার্থক্য (Difference Between Female-male Ratio)

প্রায় সব দেশেই প্রতি 100 জন মহিলাতে পুরুষের সংখ্যা দিয়ে নারী-পুরুষ সমাহার নির্ণয় করা হয়। Trewarth-র মতে জন্মের সময় কোন জনসংখ্যায় নারী-পুরুষ অনুপাত থাকে প্রায় 105 , কারণ মেয়েদের চেয়ে ছেলেদের

জন্মহার বেশি। যেহেতু বাচ্চা ছেলেদের মৃত্যুর হার বেশি, তাই 4 বছরের মাতায় নারী-পুরুষ অনুপাতে তারতম্য এসে যায়। 4 বছরের পর থেকে জনসংখ্যায় পুরুষ অনুপাত কমতে থাকে। আর 95 বছর বয়সে পুরুষের সংখ্যা মহিলাদের অর্ধেক হয়ে দাঁড়ায়। নারী-পুরুষ অনুপাত 90-র কম বা 110-র বেশি হলে তাকে অসম অনুপাত বলে। জনমিতি ও অন্যান্য কারেণ নারী পুরুষ অনুপাতে হেরফের ঘটে। কোন দেশে পরিব্রাজন যদি কম হয়, তবে জনমিতি বৈশিষ্ট্য জন্ম ও মৃত্যু হারের ওপর নির্ভর করে। যে সব দেশ জন্ম-মৃত্যু দুই-ই বেশি, সেই সব দেশে নারী-পুরুষ অনুপাতে একটা সাম্য থাকতে পারে। জন্ম-মৃত্যু উভয় হার কম হলে জনগোষ্ঠীকে "প্রৌঢ়" (mature) আখ্যা দেওয়া হয়। পরিযান, যুদ্ধ, সমাজবিশেষে নারী ও পুরুষদের প্রতি অসম ব্যবহার নারী-পুরুষ অনুপাতে তারতম্য ঘটায়। এ প্রসঙ্গে United Nations-এর Human Development Report-এ উল্লেখ করা হয়েছে—"In no society do women enjoy the same opportunities as men." (পৃঃ 2)। এই Report-এ আরও বলা হয়েছে, "Every country has made progress in developing women's capabilities, but women and men still live in unequal worlds." তবুও বলতে হয় অনুন্নত দেশে এই সমস্যা তীব্র। অনুন্নত দেশে মহিলাদের হীন মর্যাদা ও সন্তানধারণজনিত ঝুঁকি তাদেরকে বেশি সংখ্যায় মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিয়েছে। এ কারণে ঐ সব দেশে নারী-পুরুষ অনুপাতে হেরফের বেশি ঘটে। পরিযান (migration) প্রায়শই নারী পুরুষ অনুপাতে অসম্য ঘটায়। লম্ব দূরত্ব, বিশেষ করে আন্তর্জাতিক অভিবাসনে (international migration) পুরুষেরা জড়িত থাকেন। অন্তর্অভিবাসনের (immigration) ফলে লিঙ্গ অনুপাত বাড়ে, কিন্তু বহির্অভিবাসনের (emigration) ফলে কমে। বহু বছর ধরে আলাস্কা ছিল প্রচুর সংখ্যায় পুরুষদের অন্তর্অভিবাসন স্থাল। সেখানে প্রতি 100 জন স্ত্রীলোকে পুরুষের সংখ্যা ছিল 150-র বেশি। দেকা গেছে মহিলারা সাধারণত কম দূরত্বে পরিযাণের পক্ষপাতী। অতিবাহিতি পুরুষদের বেশি আকর্ষণ করে।

2.3.1.3 পৃথিবীব্যাপী লিঙ্গ অনুপাতের বণ্টন (World Distribution of Sex Ratio)

আগেকার আলোচনার সূত্র ধরে এবার পৃথিবীর নারী-পুরুষ অনুপাত নিয়ে আলোচনা করা যাক। প্রথমেই বলে নেওয়া ভালো যে গোটা পৃথিবীর গড় নারী-পুরুষ ানুপাত সামান্য অসামান্য রয়েছে সারণি। তা হল 79 ও 104 র মাঝামাঝি। প্রথমে ইউরোপের কথায় আসা যাক।

সারণি : বিভিন্ন মহাদেশে নারী-পুরুষের অনুপাত, 2000

মহাদেশ	পুরুষ-নারী অনুপাত (পুরুষ প্রতি/100 নারী-পিছু)
আফ্রিকা	99
উঃ আমেরিকা	97
লাতিন আমেরিকা	98
এশিয়া	104
ইউরোপ	93
ওশেনিয়া	100
পৃথিবী	101

***Source** : Un Demographic Year Book, published in 2001.*

ইউরোপ

United Nations Demographic Year Book, 1983 থেকে দেখা যাচ্ছে যে ইউরোপের পাঁচটি ছোট দেশ ফ্যারো আইল্যান্ড (917), অ্যানডোরা (861), জিব্রাল্টার (987) ও আয়ারল্যান্ড (989) ছাড়া এই মহাদেশের প্রতি দেশেই পুরুষদের চেয়ে মহিলাদের হার বেশি।

সারণি : ইউরোপ ঃ নারী-পুরুষ অনুপাত (প্রতি হাজার পুরুষে নারীর অনুপাত সংখ্যা)

অ্যানডোরা	861	জিব্রাল্টার	987	নরওয়ো	1020
অষ্ট্রিয়া	1111	গ্রিস	1035	পোল্যান্ড	1052
বেলজিয়াম	1047	হাঙ্গেরী	1066	পর্তুগাল	1110
বুলগেরিয়া	1008	আইসল্যান্ড	985	রোমানিয়া	1027
চ্যানেল আইল্যান্ড	1047	আয়ারল্যান্ড	989	আন মেরিনো	1005
চেকোশ্লোভিয়া	1054	আই অফ্ ম্যান	1093	স্পেন	1038
ডেনমার্ক	1029	ইতালি	1048	সুইডেন	1020
ফ্যারো আইল্যান্ড	1041	লিসটেনস্টিন	1025	সুইজারল্যান্ড	1054
ফিনল্যান্ড	1091	ল্যাক্সেমবার্গ	1042	ইংল্যান্ড	1055
ফ্রান্স	8	মাল্টা	1062	ওয়েলস্ নর্দান আয়ারল্যান্ড	1042
জার্মানী	8	মনাকো	1148	স্কটল্যান্ড	1078
	8	নেদারল্যান্ড	1017	যুগোশ্লোভিয়া	1030

উত্তর আমেরিকা

উত্তরে আমেরিকার ছ'টি দেশ কোস্টারিকা (994), কিউবা (980) হন্ডুরাস (995), মেক্সিকো (980), পানামা (960) এবং গ্রীণল্যান্ডে (841) পুরুষদের চেয়ে নারীর সংখ্যা কম। এদের মধ্যে আবার গ্রীনল্যান্ডে নারীর সংখ্যা সবচয়ে কম।

সারণি : উত্তর আমেরিকা : নারী-পুরুষ অনুপাত (প্রতি হাজার পুরুষে নারীর অনুপাত সংখ্যা)

বাহামাস	1013	পানামা	960	গুয়েতেমালা	972
পুর্টোরিকো	1053	বারমুডা	1050	হাইতি	1056
সেন্ট ক্রিস্টোফার		কানাডা	1020	হন্ডুরাস	995
ও নেভিস	1080	কেম্যান আইল্যান্ড	1056	জামাইকা	1016
সেন্ট লুসিয়া	1.117	কোস্টারিকা	994	মার্টিনিক	1062
সেন্টপিয়ার ও মিকুইলন	1025	কিউবা	980	মেক্সিকো	980
ত্রিনিদাদ ও টোবাগো	1004	ডোমিনিয়ান রিপাব্লিক	1004	মন্টসেরাত	1068
যুক্তরাষ্ট্র	1058	গ্রীনল্যান্ড	841	নিকারাগুয়া	1042
ভার্জিন আইনল্যান্ড	1090				

দক্ষিণ আমেরিকা

দক্ষিণ আমেরিকায় কেবলমাত্র ভেনেজুয়েলা (999) ও পেরুতে (963) পুরুষেহ চেয়ে নারীর সংখ্যা কম। পরের পৃষ্ঠায় সারণিতে দক্ষিণ আমেরিকার লিঙ্গ অনুপাত দেওয়া হল।

সারণি : দক্ষিণ আমেরিকা : নারী-পুরুষ অনুপাত (প্রতি হাজার পুরুষে নারীর অনুপাত সংখ্যা)

অর্জেন্টিনা	1032	ফরাসী গিনি	1002	পেরু	963
বলিভিয়া	1027	গুয়ানা	1015	উরুগুয়ে	1026
ব্রাজিল	1001	প্যারাগুয়ে	1005	ভেনেজুয়েলা	999
		চিলি	1019	ইকুয়ডোর	1002

ওশেনিয়া

ওশেনিয়া টোকালাউ-এ নারীর সংখ্যা সবচেয়ে বেশি (1,108)। অন্যান্য দেশগুলো হল ওয়ালিশ ও ফুটনা আইল্যান্ড (1,047), নরফোক আইল্যান্ড (1,038), কিরিবাটি (1,027) ও নিউজিল্যান্ড (1,011)। নিচের সারণিতে ওশেয়িনার দেশগুলোর স্ত্রী-পুরুষ অনুপাত দেখানো হল :

সারণি : ওশেনিয়া : লিঙ্গ অনুপাত (প্রতি হাজার পুরুষে নারীর অনুপাত সংখ্যা)

আমেরিকান সামোয়া	971	নিউ ক্যালিডোনিয়া	923	সামোয়া	933
অস্ট্রেলিয়া	1004	নিউজিল্যান্ড	1,011	সোলোমান আইল্যান্ড	915
ক্রাস্টম্যান আইল্যান্ড	496	নাইন	984	টোকলাউ	1,108
বাকোস (কিলিং আইল্যান্ড	862	নরফোক আইল্যান্ড	1,038	টোবা	957
কুক আইল্যান্ড	936	প্যাসিফিক আইল্যান্ড	951	ওয়ালিশ ও ফুটুনা	
ফিজি	981	পাপুয়া নিউ গনি	953	আইল্যান্ড	1,047
গুয়াম	916	পিটাকাইরান	833		
কিরিবাটি	1,027				

এশিয়া

এশিয়ার মধ্যে জাপান (1,032), ইয়েমেন (1,012), মায়ানমার (1012), ইন্দোনেশিয়া (1,012) ও ইজরায়েল (1,003) ছাড়া অন্যান্য সব দেশগুলোতে পুরুষের অনুপাতে নারীর সংখ্যা কম। এখানকার সবচেয়ে কম সংখ্যক নারীর দেশ হল কুয়াতার (572)। এর আগের স্থান হল বাহারিন (713) ও কুয়েত-এর (748)।

সারণি : এশিয়া : লিঙ্গ অনুপাত (প্রতি হাজার পুরুষে নারীর অনুপাত সংখ্যা)

আফগানিস্তান	944	ইন্দোনেশিয়া	1,012	নেপাল	952
বাহারিন	713	ইরান	937	পাকিস্তান	906
বাংলাদেশ	941	ইরাক	941	ফিলিপাইনস্	993
ব্রনী	873	ইজরায়েল	1,003	কুয়াতার	572
মায়ানমার	1,012	জাপান	1,032	সিঙ্গাপুর	962
চীন	948	জর্ডন	913	শ্রীলঙ্কা	962
সাইপ্রাস	994	কোরিয়া গণতন্ত্র	982	সিরিয়া আরব গণতন্ত্র	958
গণতন্ত্র ইয়েমেন	1,012	কুয়েত	848	থাইল্যান্ড	989
হংকং	923	মালয়েশিয়া	991	তুরস্ক	939
ভারত	923	মালদ্বীপ	899		

আফ্রিকা

আফ্রিকার অবস্থা এশিয়ার চেয়ে একটু ভাল। এখানকার আইভরি কোস্ট (931), চাদ (942), মিশর (961), দক্ষিণ আফ্রিকা (966), ইথিওপিয়া (982), গাম্বিয়া (975), টিউনিশিয়া (991) আপার ভোল্টা (994), মারিটানিয়া (995), সুদান (995), সিচিলিস্ (997), মরক্কো (998) ছাড়া অন্যান্য দেশগুলিতে পুরুষের চেয়ে নারীর সংখ্যা বেশি, তাই United Nations Development Programme-র Human Development Report (1995, Page 97)এ মন্দব্য করা হয়েছে, "In most countries in sub-Saharan Africa, gender inequality is less severe than in Latin America."

সারণি : আফ্রিকা : লিঙ্গ-অনুপাত (প্রতি হাজার পুরুষে নারীর অনুপাত সংখ্যা)

আলজিরিয়া	1,007	লাইবেরিয়া	1,004	সেনেগাল	1,021
বেনিন	1,086	মাদাগাস্কার	998	সিচিলিস্	997
বাটসওয়ানা	1,064	মালাবি	1957	সিয়েরা লিওন	1,012
বুরুন্ডী	1,064	মালি	1,048	দক্ষিণ আফ্রিকা	966
ক্যামেরুন	1,004	মারিটানিয়া	995	সুদান	995
সেন্ট্রাল আফ্রিকা		মরিশাস	1,041	সোয়াজিল্যান্ড	1,132
রিপাবলিক	1,085	বেডোরিগুন	985	টিউনিশিয়া	991
চাদ	942	মরক্কো	998	ইউনাইটেড রিপাবলিক	
ইথিওপিয়া	982	গাম্বিয়া	975	অফ্ টানজানিয়া	1,039
মোজাম্বিক	1,059	টাঙ্গানাইকা	1040	গিয়ানা বিসাউ	1.074
নাইজার	1,001	জাঞ্জিবার	1,012	আইভরি কোস্ট	931
রিইউনিয়ন	1,039	আপার ভোল্টা	994	কেনিয়া	1,010
রাউন্ডা	1,044	জয়ের	1,034	মিশর	961
সেন্ট হেলেনা	1,047	জাম্বিয়া	1,031	লেসোথো	1,072
ট্রিস্রান ডি কুইনা	1,084	জিম্বাবোয়ে	1,031		

আগের আলোচনায় এটা পরিষ্কার হয়েছে যে অন্যান্য মহাদেশের তুলনায় এশিয়া মহাদেশ পুরুষের সংখ্যা বেশি। আয়তন বা লোকসংখ্যার অনুপাত এশিয়ায় নারীর সংখ্যা কম রয়েছে। এর সম্ভাব্য ব্যাখ্যা হল এই যে এশিয়ায় পুরুষদের চেয়ে নারীদের মৃত্যুহার বেশি। কিছুটা ধর্ম, কিছুটা সংস্কৃতির জন্যে এই দেশের নারীরা কঠোর জীবন যাপন করেন। ফলে, তাঁরা বেশি সংখ্যায় মারা যান। এশিয়ার অনেক দেশে সব বয়সের নারীজাতির প্রতি তাচ্ছিল্য ও সমাজে তাদের কম মর্যাদার দরুন এই মহাদেশে নারীর সংখ্যা কম। একসময়ে ভারতে 'সতীদাহ' প্রথা নারীসংখ্যা কম হওয়ার জন্য আংশিকভাবে দায়ী ছিল। একই কথা খাটে আফ্রিকার উত্তরের দেশগুলোর ক্ষেত্রে। এখানেও দক্ষিণ-পশ্চিম এশিয়ার দেশগুলোর মত নারীর সংখ্যা কম। মালয়েশিয়া, শ্রীলঙ্কা ও থাইল্যান্ডে-এ পুরুষাধিক্যের কারণ হল সেখানকার উন্নতমানের বাণিজ্যিক কৃষি যা তরুণদের আকৃষ্ট করে।

এশিয়ার ঠিক বিপরীতে রয়েছে ইউরোপ মহাদেশের এক বিরাট অংশ (ইউরোপীয় রাশিয়াসহ) যেখানে পুরুষদের সংখ্যা কম, বিশেষ করে রাশিয়া (82.7%) মধ্য ও পূর্ব ইউরোপে (জার্মানি, 90.4%)। এই সব দেশে দ্বিতীয় বিশ্বযুধে বহু পুরুষ মারা গিয়েছিলেন। ইউরোপের অন্যান্য দেশে যুধজনিত জীবনহানি কম হয়েছিল। তাই সেই সব দেশের নারী-পুরুষ অনুপাত রাশিয়া বা জার্মানির মত অত কম নয়।

ইউনাইটেড নেশনস্ ডেমোগ্রাফিক ইয়ারবুক (1983)-র পরিসংখ্যানের ভিত্তিতে আমরা বলতে পারি যে পৃথিবীতে প্রতি হাজার পুরুষে নারীর সংখ্যা হল 993 জন। কারণ হিসেবে বলা হয় যে পৃথিবীতে শিশুকন্যার চেয়ে পুত্রসন্তানের জন্মহার বেশি। এই পরিসংখ্যান থেকে আমরা আরও দেখতে পাচ্ছি যে ইউরোপ, আফ্রিকা, উত্তর আমেরিকা ও ও ল্যাতিন আমেরিকায় নারীর সংখ্যা বেশি। ওশেনিয়া ও এশিয়ার নারীর সংখ্যা কম। উপরের আলোচনা থেকে এটা পরিষ্কার হচ্ছে যে উন্নত ও অনুন্নত মহাদেশগুলোর মধ্য নারী পুরুষ অনুপাতের পার্থক্য খুব একটা নজর কাড়ার মতো নয়। উত্তর আমেরিকান মতন খুব উন্নত মহাদেশ ও আফ্রিকার মতন খুব পিছিয়ে থাকা মহাদেশে পুরুষের চেয়ে নারীর সংখ্যা বেশি। মজার ব্যাপার হল যে দুই মহাদেশের পুরুষ-মৃত্যুর হার বেশি, যদিও এই দুই মহাদেশে মৃত্যুর কারণ ভিন্ন ভিন্ন। আফ্রিকায় পুরুষদের কঠোর জীবনযাত্রা ও উপজাতিতে সংঘর্ষ এবং উত্তর আমেরিকায় অত্যাধিক পথ দুর্ঘটনা পুরুষ-মৃত্যুর জন্য দায়ী। এছাড়া, পুত্র ও কন্যা উভয় সন্তানদের সমানভাবে যত্ন নেওয়া হলেও পুত্রসন্তানের মৃত্যুহার কন্যাসন্তানের মৃত্যুহারের চেয়ে তুলনামূলকভাবে বেশি। ল্যাতিন আমেরিকা (পেরু) এবং ওশেনিয়ার কয়েকটি দেশ (বাকোস, পিটকাইরান) নারীর সংখ্যা কম। কারণ হিসেবে বলা হয়ে থাকে যে ওইসব দেশে অন্য প্রদেস থেকে লোক (বিশেষ করে পুরুষেরা) এসে বসবাস করেছেন।

2.3.1.4 ভারতের নারী-পুরুষ অনুপাত (Sex Ratio of India)

2001 সালের লোকগণনানুযায়ী ভারতে প্রতি হাজার পুরুষে, নারীর সংখ্যা ছিল 929 (চিত্র 2.24)। পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মত ভারতেও 0.4 বছর বয়সপুঞ্জে মেয়েদের চেয়ে ছেলেদের অনুপাত বেশি। ভারতে প্রতি বছর 1,000 জন পুত্রসন্তান-পিছু কমবেশি 937 জন কন্যাসন্তান জন্মায়। অনেক দেশে বাচ্চা ছেলেদের ছেলেবেলায় (4 চার বছরের কাছাকাছি সময়ে) বেশি মৃত্যুর হার নারী-পুরুষ অনুপাতে একটা সমতা আনে। ভারতের ক্ষেত্রে কিন্তু তা হয় না। এখানে খুব ছোটবেলায় বাচ্চা মেয়েদের মৃত্যুর হার বেশি হয়। একটি সমীক্ষা জানাচ্ছে, 2000-2001 সালে অন্ধ্রপ্রদেশের শুধু একটি জেলাতেই এইভাবে হত্যা করা হয়েছে 2,198 জন কন্যাশিশুকে। এখনও বিহারের পূর্বদিকের কয়েকটি জেলার কন্যাসন্তান জন্মালে তাকে আঁতুড়ঘরেই মেরে ফেলা হয়।* ভাবতেও অবাক লাগে এক বিংশ শতাব্দীতে পৌঁছেও আমাদের দেশে এই কুৎসিত প্রথা এখনও চলছে।

লিঙ্গ অনুপাত, 1991 : 1991 সালে গ্রামীণ এলাকায় প্রতি হাজার কন্যাসন্তানের মধ্যে যেখানে মৃত্যুর হার ছিল 29.8 সেখানে পুত্রসন্তানের মৃত্যুর হার হল 28.4। শহর এলাকায় এই হার (0-4 বয়সের পুত্রসন্তানের ক্ষেত্রে) 15.2 এবং কন্যাসন্তানের ক্ষেত্রে 16.8। অবহেলা ও অনাদরে আমাদের দেশে বাচ্চা মেয়েরা শিশুপুত্রের তুলনায় বেশি হারে মারা যায়। এ দেশে মেয়েদের প্রতি এই উপেক্ষা, অনাদর বা বৈষম্য তাদের শে, জীবন পর্যন্ত চলে বললে ভুল বলা হয়। এছাড়া, কন্যাশিশুর মৃত্যু যেমন গ্রামেগঞ্জে বা নিম্নবিত্তদের ঝঞ্ঝাট মুক্তির উপায়, তেমনি 'সেক্স সিলেকটিভ

* তুলনীয় আজ থেকে প্রায় একশ বছর আগে শরৎচন্দ্রের 'দত্তা'-র সেই লাইনগুলো। ''শক্তিশেল বুকে পড়িবার সময় লক্ষ্মণের মুখের ভাব নিশ্চয় খুব খারাপ হইয়া গিয়াছিল, কিন্তু গুরুচরণের চেহারাটা বোধকরি তার চেয়েও মন্দ দেখালি—যখন প্রতূষেই অন্তঃপুর হইতে সংবাদ পৌঁছাইল, গৃহিণী এইমাত্র নির্বিঘ্নে পঞ্চম কন্যার জন্মদান করিয়াছেন।''

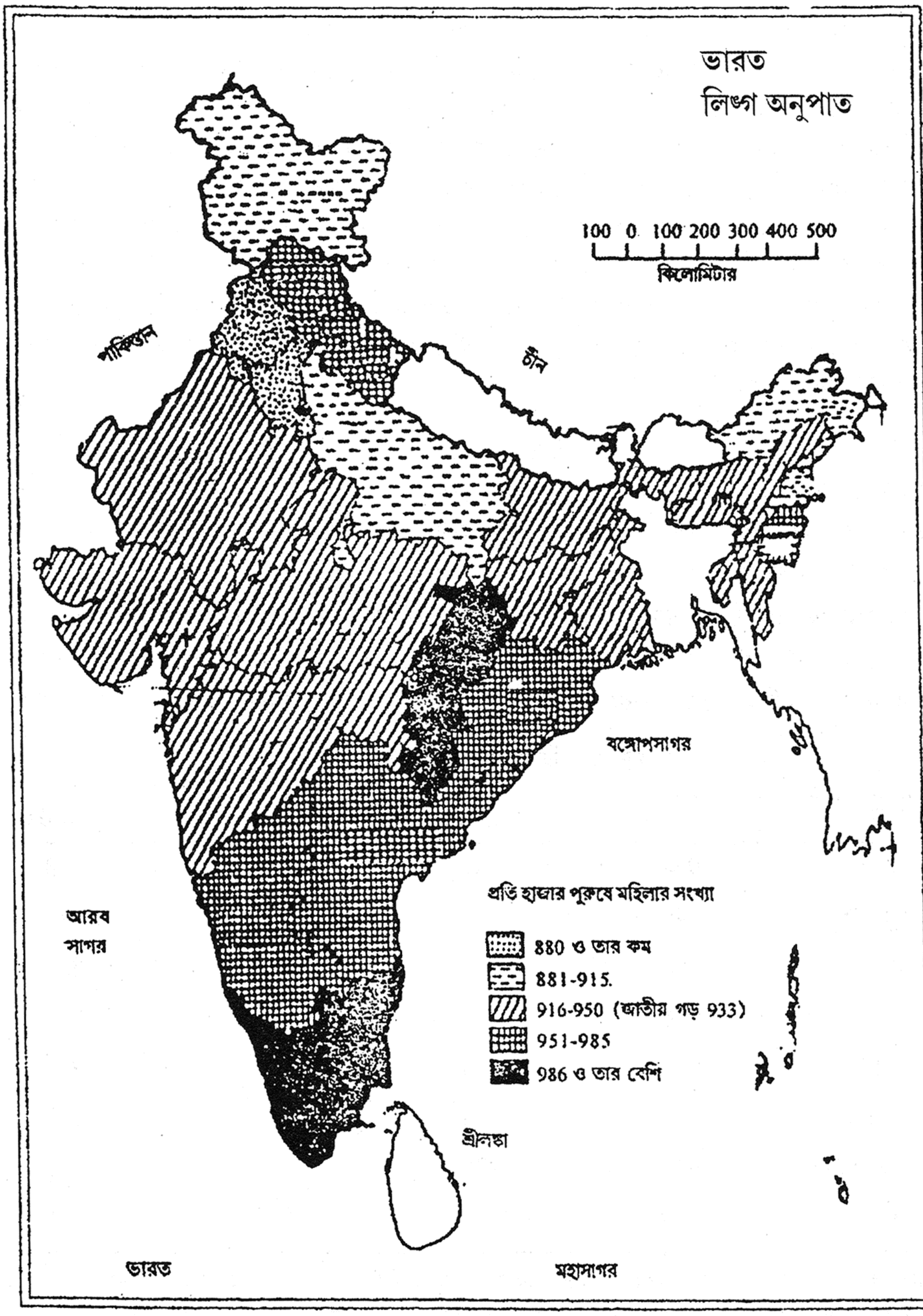

চিত্র 2.24 : রাজ্যভিত্তিক লিঙ্গ অনুপাত (সামগ্রিক), 2001

অ্যাবরশন' বা 'মেয়ে ভ্রূণ হত্যা' রীতিমতো উন্নত বাস্তববুদ্ধির পরিচায়ক। আজ শুধু অভাবে স্বভাব নষ্ট নয়, অর্থও স্বভাবের অনর্থের কারণ। মানবিক মূল্যবোধ টাকার নিক্তিতে বিকিয়ে যেতে বসেছে। সাধারণভাবে ভারতে মহিলাদের সামাজিক মর্যাদা এখনও খুব একটা উঁচুতে নয়। তার প্রমাণ তাঁদের মধ্যে শিক্ষার নিম্নমান, তাঁদের জন্য স্বায়ত্তশাসনের অভাব। বাল্যবিবাহ, অনেক সন্তানসন্ততির জন্মদান, প্রসূতি মৃত্যুর সংখ্যা বৃদ্ধি, সাক্ষরতার নিম্নমান ইত্যাদি এদেশের মহিলাদের নিম্ন সামাজিক অবস্থাকে বোঝায়। 1992-93 সালের এক হিসেব অনুযায়ী দেখা যাচ্ছে যে আমাদের দেশে ছ'বছরের মেয়েরা যারা প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করেছে তাদের হার হল 28.1, অথচ পুরুষদের মধ্যে এই হার হল 48.6 শতাংশ। বেশ কয়েকটি সমীক্ষায় দেখা গেছে যে পুরুষরা অসুস্থ হলে চিকিৎসকের পরামর্শ যত দ্রুত নেওয়া হয়, মহিলাদের ক্ষেত্রে তা করা হয় না। বালক-বালিকাদের ক্ষেত্রেও এ কথাটি সমভাবে প্রযোজ্য। WHO-র সমীক্ষাতে দেখা গেছে যে ভারতে গর্ভবতী মহিলাদের 70 শতাংশ রক্তাল্পতা রোগে ভোগে, এর ফলে মৃত সন্তান জন্মায়। প্রসূতিদের মধ্যে 40 শতাংশের এই কারণে মৃত্যু ঘটে।

অতীতে ভারতে "সতীদাহ" ও "শিশুকন্যা হত্যা" প্রথার জন্য এদেশে মহিলাদের সংখ্যা কম ছিল। এছাড়া ফি-বছর মহামারীও এদেশে মহিলাদের সংখ্যাকে বাড়তে দেয়নি। একে তো বহু সন্তানের জন্মদানের ফলে শারীরিক ধকল, তার ওপরে দুর্ভিক্ষের ঘনঘটা—দু'য়ে মিলে নারীমৃত্যুর হার বাড়িয়ে দিত। এই কারণে এদেশে নারী-পুরুষ অনুপাতে একটা অসাম্য ছিল, যার ছাপ আজও রয়ে গেছে*।

শহর ও গ্রাম, বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়, বিভিন্ন সামাজিক গোষ্ঠী ও বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে বৈষম্য ভারতের নারী-পুরুষ অনুপাতের একটা বৈশিষ্ট্য। ভারতের গ্রাম ও পৌর জনসংখ্যার নারী-পুরুষ অনুপাতের যে চিত্র আমরা পাই, তা পশ্চিমী দেশগুলোর ঠিক উল্টো। ভারতের গ্রামাঞ্চলে প্রতি হাজার পুরুষে নারীর সংখ্যা 951 ও শহরাঞ্চলে মাত্র

সারণি : লিঙ্গ অণুপাত (1971-2001)

রাজ্য	1971	1981	1991	2001
বিহার	964	981	953	938
গুজরাত	946	947	928	878
হরিয়ানা	898	902	879	820
মধ্যপ্রদেশ	976	978	941	929
মহারাষ্ট্র	978	956	946	917
পাঞ্জাব	894	908	875	793
উত্তরপ্রদেশ	923	935	927	916
দিল্লি	909	926	915	865

* অধ্যাপক অমর্ত্য সেন (1397 বঙ্গাব্দ) তাঁর জীবনযাত্রা ও অর্থনীতিতে বিভিন্ন সমীক্ষা থেকে এই সিদ্ধান্তে এসেছেন যে, "অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে আলাদাভাবে ভারতীয় নারী ও পুরুষের অবস্থার উন্নতি হলেও তুলনামূলকভাবে ভারতীয় নারীরা পিছনে পড়ে আছেই বলে মনে হয়।... দেখা গিয়েছে, সাধারণভাবে আয়ের সঙ্গে স্বাস্থ্যের উন্নতি নারীদের বিরুদ্ধে লিঙ্গভিত্তিক অসাম্য প্রত্যেক আয়স্তরেই রয়েছে।" (পৃঃ 178-79) ভারতের কয়েকটি রাজ্যের জনগণনা থেকে দেখা যাচ্ছে যে প্রতিটি লোকগণনাতেই প্রতি হাজার পুরুষে নারীর সংখ্যা ক্রমশ কমে গেছে।

880 (1991 সাল)। সুতরাং, দেখা যাচ্ছে যে এদেশে শহরবাসীদের মধ্যে নারীর অভাব রয়েছে। এর কারণ হল মহিলাদের চেয়ে পুরুষেরা বেশি সংখ্যায় শহরে চলে আসেন। গ্রামাঞ্চলে কাজের অভাব ও সীমিত জমির ওপর ক্রমবর্ধমান চাপ, আবার অন্যদিকে শহরের আকর্ষণ ক্ষমতার জন্য গ্রাম থেকে পুরুষেরা শহরে চলে আসেন। কিন্তু শহরে জীবনযাত্রার জন্য বেশি খরচ ও সমস্যার দরুন পুরুষেরা তাদের পরিবারকে গ্রামে রেখে আসতে বাধ্য হন। গ্রামের যৌথ পরিবার প্রথাও পুরুষদেরকে পরিযাণে সাহায্য করে। যৌথ পরিবারের সঙ্গে বাস করার দরুন পুরুষেরা নিশ্চিন্ত মনে শহরে পাড়ি জমাতে পারেন। এদিকে পরিবার ছাড়া শহরে আসার জন্য একদিকে যেমন গ্রামাঞ্চলে নারীর সংখ্যা বেড়ে যায়, অন্যদিকে তেমনি শহরে সেই অনুপাতে নারীর সংখ্যা কমে যায়। অর্থাৎ গ্রাম ও শহরের নারী-পুরুষ অনুপাতে একটা ফারাক হয়ে যায়। অনুরূপভাবে, ভারতে বিভিন্ন ধর্মীয় গোষ্ঠীর মধ্যে নারী-পুরুষ অনুপাতে পার্থক্য রয়েছে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় যে খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে নারী-পুরুষের অনুপাতে সবচেয়ে বেশি, শিখদের মধ্যে সব থেকে কম, প্রতি হাজারে যথাক্রমে 986 ও 860 জন নারী (1971-র লোক গণনা)। ঐ লোকগণনা থেকে আরও দেখা যাচ্ছে মুসলিমদের মধ্যে নারী-পুরুষ অনুপাত হল 922, হিন্দুদের মধ্যে 930, অর্থাৎ জাতীয় গড়ের (930) সমান। শিখদের মধ্যে কম সংখ্যক কন্যাসন্তানের জন্ম, খ্রিস্টানদের মধ্যে তুলনামূলকভাবে কম হারে মহিলাদের মৃত্যু ও মুসলিমদের মধ্যে তুলনামূলকভাবে বেশি হারে স্ত্রীলোকের মৃত্যু উক্ত ধর্মীয় গোষ্ঠীদের মধ্যে নারী-পুরুষ অনুপাতের পার্থক্যের জন্য দায়ী।

এবার তপশিলি উপজাতিদের কথায় আসা যাক। মজার ব্যাপার হল যে সাধারণ জনগোষ্ঠীর চেয়ে উপজাতিদের মধ্যে নারী-পুরুষ অনুপাত বেশি। প্রতি হাজার পুরুষে নারীর সংখ্যা হল 982 জন। তবে কিছু উপজাতিদের মধ্যে পুরুষ-মৃত্যুর হার বেশি। কারণ তাঁরা কঠোর পরিশ্রম করেন। দরকার হলে বিপদের ঝুঁকি নিয়েও কাজ করেন। অন্যদিকে, উপজাতিদের মধ্যে ব্যাপকহারে খ্রিস্টধর্মের প্রসারের ফলে নারী-মৃত্যুর হার কমে এসেছে। পক্ষান্তরে, তপশিলি উপজাতিদের মধ্যে নারী-পুরুষ অনুপাত হল প্রতি হাজার পুরুষে 932 জন (নারী)। এদের মধ্যে তুলনামূলকভাবে বেশি নারী-মৃত্যু ঘটায় স্ত্রীলোকের সংখ্যা কম।

এবার প্রদেশভিত্তিক নারী-পুরুষ অনুপাতের কথায় আসা যাক। এখানেও দেখা যাচ্ছে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে নারী-পুরুষ অনুপাতের মধ্যে বিরাট ফারাক রয়েছে। ভারতের মধ্যে কেরালা-ই একমাত্র রাজ্য যেখানে পুরুষদের তুলনায় মহিলার সংখ্যা বেশি, প্রতি হাজার পুরুষে 1032 জন মহিলা (1981 লোকগণনা)। এর বিপরীতে রয়েছে সিকিম, যেখানে প্রতি হাজার পুরুষে নারীর সংখ্যা 835 জন। এর পরের স্থান হল অরুণাচল (862), নাগাল্যান্ড (863), হরিয়ানা (870), পাঞ্জাব (879), উত্তরপ্রদেশ (885), জম্মু ও কাশ্মীর (892), অসম (901), পশ্চিমবঙ্গ (911), রাজস্থান ও মিজোরাম (919), মহারাষ্ট্র (37), মধ্যপ্রদেশ (41), ত্রিপুরা ও বিহার (46), মেঘালয় (954), গুজরাত (959), কর্ণাটক (963), মণিপুর (971), হিমাচলপ্রদেশ (973), অন্ধ্রপ্রদেশ (975), তামিলনাড়ু (977), ওড়িসা ও গোয়া (981)।

1991-র লোকগণনায় কেরালার লিঙ্গ অনুপাত হল 1,040। এর পরের স্থান ছিল হিমাচলপ্রদেশের (966)। ভারতের পরিপ্রেক্ষিতে 950 বা তার বেশি অনুপাতকে মহিলাদের পক্ষে অনুকূল বলে ধরা হয়। এই হিসেবে কেরালা ও হিমাচলপ্রদেশ ছাড়া দেশের যে সব রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে এই অনুপাত মেয়েদের পক্ষে অনুকূল সেগুলো হল অন্ধ্রপ্রদেশ (972), গোয়া (969), কর্ণাটক (960), মণিপুর (961), ওড়িশা (972), তামিলনাড়ু (972), পণ্ডিচেরী (982) প্রভৃতি। এই জনগণনায় আরও দেখা যাচ্ছে যে রাজ্যগুলোর মধ্যে অরুণাচলে (861) এবং কেন্দ্রশাসিত

অঞ্চলগুলোর মধ্যে ভারতের অন্যতম আধুনিক শহর চন্ডীগড়ে (793) সবচেয়ে কম নারী-পুরুষ অনুপাত লক্ষ্য করা যায়। আরও উল্লেখ্য যে 1981-র তুলনায় উপরোক্ত রাজ্যগুলোতে নারী-পুরুষ অনুপাত কমেছে। সেই তুলনায় হরিয়ানা, হিমাচলপ্রদেশ, কেরালা, মিজোরাম, নাগাল্যান্ড, পাঞ্জাব, সিকিম ও পশ্চিমবঙ্গে এই অনুপাত বেড়েছে।

উপরের আলোচনা থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ভারতের মধ্যে কেরালা ও গোয়ায় নারী-পুরুষ অনুপাত সবচেয়ে বেশি। এখানকার জনসংখ্যার একটা বড় অংশ হল খ্রিস্টান। উভয় রাজ্যেই জন্ম ও মৃত্যু বেশ কম। এব্যাপারে তাদেরকে উন্নত দেশগুলোর সঙ্গে তুলনা করে চলে। এখানে মহিলা মৃত্যুর হার কম। এ প্রসঙ্গে আরও উল্লেখ করতে হয় যে কেরালা থেকে পুরুষেরা ভারতের বিভিন্ন জায়গায়—এমনকি মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোতে—পরিযাণ করেন। সেই কারণে এই রাজ্যে পুরুষদের সংখ্যা কম। সেই তুলনায় সিকিম ও কেন্দ্রশাসিত আন্দামান ও নিকোবরে অন্য রাজ্য থেকে পরিযাণের সংখ্যা কম। অবশ্য সামরিক দিক দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ বলে দুই জায়গায় সামরিক বাহিনীর কর্মীদের সংখ্যা বাড়তির দিকে।

জেলাভিত্তিক 1981 লিঙ্গ অনুপাত : এবার ভারতের জেলাভিত্তিক (1981 সাল) গ্রাম ও শহরের নারী-পুরুষ অনুপাত নিয়ে একটু আলোচনায় আসা যাক। গ্রামীণ নারী-পুরুষ অনুপাতের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে (i) উত্তর ভারতের চেয়ে দক্ষিণ ভারত এ ব্যাপার এগিয়ে আছে। মহারাষ্ট্রের রত্নগিরি জেলায় গ্রামীণ নারী-পুরুষ অনুপাত বেশি (1,261)। সামগ্রিকভাবে কেরালায় নারী-পুরুষ অনুপাত বেশি। কিন্তু জেলাভিত্তিক গ্রামীণ-নারী পুরুষ অনুপাতের ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে এই রাজ্যের কয়েকটি জেলাতে মহিলার সংখ্যা হাজারের নিচে আছে। আবার উত্তরপ্রদেশের কয়েকটি পাহাড়ী জেলা যেমন চামেলী (1,090), পিথোরগড় (1,034), আলমোড়া (1,037)-এ টেহরী গাড়োয়াল (1,119) ও গাড়োয়াল (1,147)-এ নারীদের সংখ্যা বেশি। এই সব অঞ্চলে নারীদের সামাজিক মর্যাদাও বেশি। আবার এখানকার আজমগড় (1,033), জৈনপুর (1,018), এবং বিহারের সরণ, সিবান (1,079), গোপালগঞ্জ (1,011), নাওদা (1,008) ও বৈশালীর (1,001) মত কৃষিপ্রধান জেলায় পুরুষের চেয়ে মহিলার সংখ্যা বেশি। (ii) মধ্যপ্রদেশের উপজাতি প্রধান এলাকায় যেমন বাস্তার (1,008), রায়পুর (1,024), দুর্গ (1,028), রাজনন্দগাঁও (1,031), রায়গড় (1,015), বালাঘাট (1,015), মাণ্ডালা (1,009), বিলাসপুরে (1,005) পুরুষদের চেয়ে মহিলাদের সংখ্যা বেশি। (iii) পাঞ্জাব, হরিয়ানা, উত্তরপ্রদেশ (পশ্চিম), রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ নিয়ে গঠিত উত্তর-পশ্চিম ভারতের বিরাট এলাকায় নারীর সংখ্যা কম (চিত্র 6.1)। মেয়েদের চেয়ে ছেলেদের বেশি হারে জন্ম ও চাকরির জন্য পুরুষদের পরিযাণ এর জন্য দায়ী। (iv) আবার উত্তর-পূর্ব ভারতের অরুণাচল, নাগাল্যান্ড রাজ্যে নারীর সংখ্যা কম। উত্তর-পূর্ব ভারতের রাজ্যগুলোতে অন্য রাজ্য থেকে প্রচুর সংখ্যক পুরুষেরা কর্মের খাতিরে এসেছেন, বিশেষ করে সামরিক বাহিনীর লোকেরা। ফলে নারী-পুরুষ অনুপাতে একটা ফারাক চোখে পড়ে।

এবার জেলাভিত্তিক শহরের নারী-পুরুষ অনুপাত (1981 সাল) নিয়ে আলোচনায় আসা যাক। (i) ত্রিপুরা ছাড়া উত্তর-পূর্ব ভারতের রাজ্যগুলোর পৌর নারী-পুরুষ অনুপাত কম। এখানকার সিকিমের নর্থ ডিস্ট্রিক্ট জেলায় নারী-পুরুষ অনুপাত সবচেয়ে কম। প্রতি হাজার পুরুষে নারীর সংখ্যা 523 জন। এর আগের স্থান অরুণাচলের ওয়েস্ট সিয়াং জেলা (543 জন), নাগাল্যান্ডের মন জেলা (577 জন)-র। উত্তরপ্রদেশের দুটি পাহাড়ি জেলা উত্তর কাশী (571) ও টেহরী গাড়োয়াল (555), হিমালচলপ্রদেশের কুলু (713), লাহুল ও স্পিটি (766), সোলান (782), জম্মু ও কাশ্মীরের লাদাখ (732), কারগিল (758) ইত্যাদি পাহাড়ি জেলাগুলোতে নারীর সংখ্যা কম। আবার রাজস্থানের রুক্ষ মরুভূমিতে অবস্থিত জয়শলমীর জেলা শহরেও নারীর সংখ্যা কম (745)। সম্ভবত মরুভূমির কষ্টকর জীবনযাত্রা এর জন্যে দায়ী। (ii) ভারতে প্রায় প্রতি জেলা শহরেই নারীর সংখ্যা কম। এমন কি, পূর্বোক্ত উত্তরপ্রদেশ, বিহার

ও মধ্যপ্রদেশের জেলা শহরগুলোতেও নারীর সংখ্যা কম। এদের মধ্যে টেহরী গাড়োয়ালের কথা আগেই বলা হয়েছে। গ্রাম্য নারী-পুরুষ অনুপাতের মতন পৌর নারী-পুরুষ অনুপাতের ক্ষেত্রেও দেখা যাচ্ছে যে উত্তর ভারতের চেয়ে দক্ষিণ ভারতের জেলা শহরগুলো এ ব্যাপারে এগিয়ে আছে, অর্থাৎ এখানকার জেলা শহরগুলোতে পুরুষের চেয়ে নারীর সংখ্যা বেশি। (iii) অবশ্য কেরালার জেলা শহর ছাড়া দক্ষিণ ভারতের মাত্র তিনটি জেলায় নারীর সংখ্যা 1,000-র বেশি। তামিলনাড়ুর তিরুনেলভেলী (1,016), অন্ধ্রপ্রদেশের গুন্টুর (1,015) ও কর্ণাটকের দক্ষিণ কান্নাড় (1,013)। (iv) উত্তর ভারতের মধ্যে একমাত্র ফারাক্কাবাদেই (উত্তরপ্রদেশ) মহিলার সংখ্যা বেশি (1,178)। (v) আবার, কোলকাতা (712), হাওড়া (787), বৃহত্তর মুম্বাইয়ের (772) মতন মহানগরী কিংবা হরিয়ানার শিল্পভিত্তিক ফরিদাবাদ (762) বা বিহারের শিল্প ও খনিজ সম্পদের সম্বন্ধ শহর ধানবাদ (742) ও হাজারীবাগ (762), উত্তরপ্রদেশের মির্জাপুরে (793) নারীর সংখ্যা কম। শহরে স্থা ,ভাব, তদুপরি জীবনযাত্রার উঁচুমান ও দেশের বাড়ি ও সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণের জন্য শহরে আগন্তুক পুরুষ-কর্মীরা তাদের পরিবারবর্গকে গ্রামে রেখে আসেন। রুটি-রোজগারের তাগিদে আসা এইসব লোকের অনেকেরই মাথার ওপর ছাদ থাকে না। ফুটপাতে, স্টেশনে বা নোংরা বস্তিতে এঁরা কোনরকমে দিন কাটান। এদের মধ্যে একটু অবস্থাপন্নরা কাছাকাছি হলে সপ্তাহে একবার, দূরে হলে মাসে একবার বা বছরে দু/এক মাসের ছুটি নিয়ে গ্রামে গিয়ে এদের পরিবারকে দেখে আসেন।

কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলোর মধ্যে সবচেয়ে কম নারীর সংখ্যা হল আন্দামান (720 জন)। এর পরের স্থান চণ্ডীগড়ের (775)। নারীর সংখ্যা সবচেয়ে বেশি হল দিউ-এ (1204)। এর পরের স্থান হল মাহে (1,144), কারাইকাল (1,040) ও দমনের (1,024)।

পৌর নারী-পুরুষ অনুপাত আলোচনায় কয়েকটি বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ে—(1) কয়েকটি জেলা শহর ছাড়া বাকিগুলোতে নারীর সংখ্যা পুরুষদের চেয়ে বেশি নয়। (2) জেলাভিত্তিক আলোচনায় আরও দেখা যায় যে প্রায় প্রতি জেলা শহরে নারীর সংখ্যা গ্রামীণ নারীসংখ্যার চেয়ে বেশ কম। (3) কেন্দ্রশাসিত অধিকাংশ অঞ্চলেই নারীর সংখ্যা পুরুষদের চেয়ে বেশি।

জেলাভিত্তিক লিঙ্গ অনুপাত (1991)

চিত্র 2.25 থেকে (সামগ্রিক) জেলাভিত্তিক গ্রামীণ জেলাভিত্তিক লিঙ্গ অনুপাত সম্বন্ধে একটা ধারণা করতে পারি। এই চিত্র থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ঐ সময়ে (1991), কেরালা রাজ্যের বাইরে কিছু জেলা যেখানে পুরুষদের তুলনায় নারীর সংখ্যা বেশি ছিল। এই রকম জেলা তামিলনাড়ু, কর্ণাটক, মহারাষ্ট্র, অন্ধ্রপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, ওড়িশা, উত্তরপ্রদেশ, বিহার, হিমাচলপ্রদেশে ইত্যাদি রাজ্যগুলোতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। এর বিপরীতে সারা দেশে ঐ সময় 45টি জেলা ছিল যেখানে মহিলাদের সংখ্যা খুব কম ছিল—প্রতি হাজার পুরুষে 850 জন মহিলা। এই সব জেলাগুলো উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, অরুণাচল প্রদেশ, সিকিম ইত্যাদি জেলাগুলোতে সীমাবদ্ধ ছিল। মোটের ওপর দেশের লিঙ্গ অনুপাতের আঞ্চলিক চিত্রটি ছিল এইরূপ :

1. গড়পড়তা হিসেবে ভারতের লিঙ্গ অনুপাত কম ছিল (939 জন), বর্তমানে অবশ্য (933)। কিন্তু মহিলার অভাব দক্ষিণ ভারতের চেয়ে উত্তর ভারতে বেশি তীব্র ছিল। দুটি চিত্র থেকেই এই বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে যায়।
2. হিমাচলপ্রদেশ, উত্তরপ্রদেশ (বর্তমান উত্তরাঞ্চল), অরুণাচল প্রদেশ ও মেঘালয়ের পাহাড়ি অঞ্চল বাদে গোটা উত্তর ভারতে মহিলাদের খুব কম সংখ্যা নজর কাড়ার মতন। উক্ত অনুপাত হল 850 এবং 900 জন।

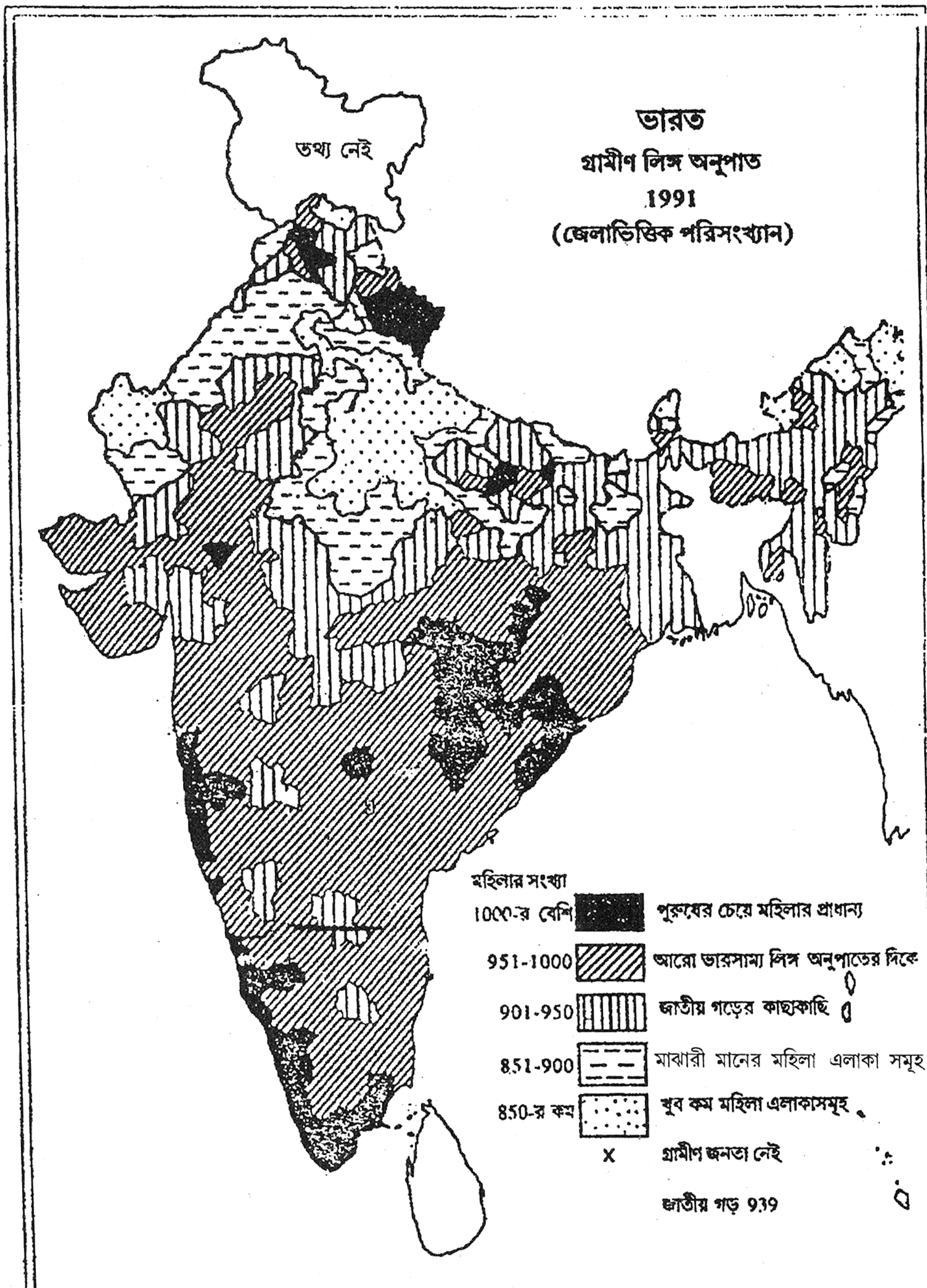

চিত্র 2.25 : গ্রামীণ লিঙ্গ অনুপাত (জেলাভিত্তিক), 1991

(মহিলা প্রতি-পুরুষ প্রতি 1,000 হাজারে) কোন কোন স্থানে এটি 850-র কম ছিল। গাঙ্গেয় সমভূমিতে পুরুষদের পরিযাণ লিঙ্গ অনুপাতের ধরনকে প্রভাবিত করেছে।

3. এই তুলনায় কেরালা, তামিলনাড়ু, কর্ণাটক, অন্ধ্রপ্রদেশ এবং মহারাষ্ট্র ও গুজরাতের অধিকাংশ স্থানের লিঙ্গ অনুপাতের একটা সাম্য অবস্থা ছিল এবং স্থানে স্থানে পুরুষদের তুলনায় মহিলাদের আধিক্য লক্ষণীয় (চিত্র 2.25)। কেরালা, তামিলনাড়ুর অংশবিশেষ এবং মহারাষ্ট্র ও অন্ধ্রপ্রদেশের উপকূলবর্তী কিছু কিছু এলাকায় লিঙ্গ অনুপাত ছিল 1000-র বেশি। দাক্ষিণাত্যের অন্যান্য অংশে লিঙ্গ অনুপাত 250 থেকে 1,000-র মধ্যে ছিল।
4. 1991-র জনগণনায় দেখা যাচ্ছে উত্তরপ্রদেশের উত্তরাখণ্ড (বর্তমান উত্তরাঞ্চল রাজ্য) এবং হিমাচলপ্রদেশের অংশবিশেষে মহিলাদের সংখ্যা পুরুষদের থেকে বেশি। এর কারণ হল পুরুষরা কাজের সন্ধানে শহরে যান। আর এখানে মহিলাদের সামাজিক মর্যাদা বেশি।
5. মধ্য ভারতের খ্রিস্ট্রীয় আদিবাসী এলাকায়ও মহিলাদের সংখ্যা বেশি। এখানে পুরুষদের ঝুঁকিপূর্ণ কাজ করতে হয়। ফলে তাদের মধ্যে মৃত্যুহার বেশি।
6. মোটের ওপর সারা দেশে 10 শতাংশ জেলা ছিল যেখানে পুরুষদের চেয়ে মহিলাদের সংখ্যা বেশি। এ রকম জেলা, কেরালা, তামিলনাড়ু, কর্ণাটক, মহারাষ্ট্র, অন্ধ্রপ্রদেশ, হিমাচলপ্রদেশও উত্তরপ্রদেশের উত্তরাখণ্ড অঞ্চলে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল।
7. কোন কোন ক্ষেত্রে দেখা যায় যে গ্রামীণ লিঙ্গ অনুপাতে একটা সাম্য আছে। এখানে লিঙ্গ অনুপাত হল 950 থেকে 1000-র মধ্যে। এর বিপরীতে শহর এলাকায় লিঙ্গ অনুপাতে বৈষম্য রয়েছে।
8. 1981-র তুলনায় 1991 এ নারীর প্রত্যাশিত আয়ুষ্কাল বেড়েছিল।

2001 সালের গণনায় লিঙ্গ-অনুপাত

2001 সালের জনগণনায় দেখা গেছে যে কেরালা এবারও তাদের সে স্থান অক্ষুণ্ণ রেখেছে। অর্থাৎ লিঙ্গ অনুপাতের তালিকায় কেরালা প্রথম স্থানটি ধরে রেখেছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্যযোগ্য যে এই অনুপাত বর্তমানে (2001) আরো বেড়েছে। 1991 সালে যেখানে কেরালায় প্রতি হাজার পুরুষে নারীর সংখ্যা ছিল 1,036, 2001 সালে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে 1,058 জন। এটির একটি সামাজিক দিক আছে। ঐ রাজ্যে মহিলাদের সামাজিক মর্যাদা উচ্চে। সম্ভবত ঐ রাজ্যে যদিও পুরুষ ও নারীর মৃত্যুহারের কোন পৃথক পৃথক পরিসংখ্যান নেই, তবুও নিশ্চিতভাবে বলা যায় ঐ রাজ্যে মহিলা মৃত্যুর হার কম ছিল, পুরুষদের থেকেও কম হতে পারে "may be lower than that of the males" (Chandna, 2002)। যা হোক, এটাও ঠিক যে কেরালা থেকে অনেক পুরুষ কর্মোপলক্ষে দেশের বিভিন্ন অংশে, এমন কি মধ্য প্রাচ্যের দেশগুলোতে গেছেন। এটিও লিঙ্গ অনুপাতের ক্ষেত্রে মহিলাদের সংখ্যাধিক্য হবার কারণ। তবে লিঙ্গ অনুপাতে মহিলাদের সংখ্যাধিক্যের একটি কুফল দিকও আছে। তা হল অনেক 'মহিলা'র অনূঢ়া (unmarried) থাকার সম্ভাবনা। লিঙ্গ অনুপাত যদি সমান সমান হত (যেমনটি হয়েছে পণ্ডিচেরীর ক্ষেত্রে, প্রতি হাজার পুরুষে 1,001 জন মহিলা) তবে সমাজে একটা ভারসাম্য বজায় থাকত।

2001 সালের জনগণনায় দেখা গেছে যে সারা দেশে লিঙ্গ অনুপাতের গড় হল 933 (1991 সালে যা ছিল 927)। গড় অনুপাতের চেয়ে যথেষ্ট বেশি (960 ও তার বেশি) লিঙ্গ অনুপাতের রাজ্যগুলো হল—ছত্তিশগড়

(990), তামিলনাড়ু (986), মণিপুর ও অন্ধ্রপ্রদেশ (978), মেঘালয় (975), ওড়িশা (72), হিমাচলপ্রদেশ (970) ও উত্তরাঞ্চল (964)। ছত্তিশগড়ে মহিলা সংখ্যাধিক্যের কারণ হল এখানকার উপজাতি পুরুষদের অধিক মৃত্যু হার। কারণ এখানকার পুরুষরা বিপদসংকুল কাজ করে থাকেন। তামিলনাড়ু, অন্ধ্রপ্রদেশ, কর্ণাটক, গোয়া প্রভৃতি দক্ষিণের রাজ্যগুলোতে মহিলাদের সামাজিক মর্যাদা বেশি। হিমাচলপ্রদেশ, উত্তরাঞ্চল প্রভৃতি পাহাড়ি রাজ্যগুলোতে মহিলা আধিক্যের কারণ হল "male selective outer migration and relatively better status granted to the famales in the hill societies" (Chandna, 2002)। উপরোক্ত দুটো রাজ্যের ন্যায় মণিপুর ও মেঘালয়েও মহিলাদের সামাজিক মর্যাদা বেশি। ঐ দুটি রাজ্যে হল মাতৃতান্ত্রিক। এখানে বিয়ের পর পুরুষেরা শ্বশুরবাড়িতে চলে যান এবং মহিলারা সমস্ত সম্পত্তির মালিকানা প্রাপ্ত হন।

জাতীয় গড়ের (933) কাছাকাছি রাজ্যগুলো হল—পশ্চিমবঙ্গ (939), মিজোরাম (938), ঝাড়খন্ড (941), ত্রিপুরা (950), গোয়া (960) ও কর্ণাটক (964)।

সারণি : লিঙ্গ অনুপাত, ভারত (2001)

ক্রম 2001	রাজ্য/কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল*	লিঙ্গ 2001	অনুপাত 1991	ক্রম 1991
1.	কেরালা	1,058	1,036	1
2	চণ্ডীগড়*	1,001	979	3
3	ছত্তিশগড়	990	985	2
4	তামিলনাড়ু	986	974	5
5	মণিপুর	978	958	11
6	অন্ধ্রপ্রদেশ	978	972	6
7	মেঘালয়	975	955	13
8	ওড়িশা	972	971	7
9	হিমাচলপ্রদেশ	970	976	4
10	উত্তরাঞ্চল	964	936	17
11	কর্ণাটক	964	960	10
12	গোয়া	960	967	9
13	ত্রিপুরা	950	945	15
14	লাক্ষাদ্বীপ*	947	943	16
15	ঝাড়খণ্ড	941	922	21
16	মিজোরাম	938	921	22
17	পশ্চিমবঙ্গ	934	917	23
18	অসম	932	923	20

ক্রম 2001	রাজ্য/কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল*	লিঙ্গ 2001	অনুপাত 1991	ক্রম 1991
19	রাজস্থান	922	910	25
20	মহারাষ্ট্র	922	934	19
21	বিহার	921	907	26
22	গুজরাত	921	934	18
23	মধ্যপ্রদেশ	920	912	24
24	নাগাল্যান্ড	909	886	27
25	অরুণাচল প্রদেশ	901	859	32
26	জম্মু ও কাশ্মীর	900	896	12
27	উত্তরপ্রদেশ	898	876	30
28	সিকিম	875	878	29
29	পাঞ্জাব	874	882	28
30	হরিয়ানা	861	865	31
31	আন্দামান ও নিকোবর*	846	818	34
32	দিল্লি*	821	827	33
33	দাদরা ও নগর হাভেলী*	811	952	14
34	চণ্ডীগড়*	773	790	34
35	দমন ও দিউ*	709	969	8
	ভারত	933	927	--

* প্রতি হাজার পুরুষ-নারীর সংখ্যা।

ভারতের জনসংখ্যা গণনার সময় পাক ও চীন অধিকৃত জম্মু ও কাশ্মীরের অংশগুলিতে ধরা হয়নি। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের কারণে গুজরাত ও হিমাচলপ্রদেশের কয়েকটি জেলায় জনগণনায় কাজ করা সম্ভব হয়নি।

সবচেয়ে খারাপ অবস্থায় ছিল দমন ও দিউ (709)। পূর্বে দমন ও দিউ গোয়ার সঙ্গে যুক্ত ছিল, তখন তার লিঙ্গ অনুপাত ছিল গোয়ার কাছাকাছি (969)। আধুনিক শহর চণ্ডীগড় ও দিল্লীতে নারী-পুরুষের পার্থক্য লক্ষ্য করার মতন। এই দুটি বড় শহরে বাইরে থেকে মানুষেরা (পুরুষ) কাজের সন্ধানে আসেন। জীবনযাত্রার মান উচ্চ হওয়ায় ঐ সব পরিযায়ী ব্যক্তি তাদের পরিবারকে দেশের বাড়িতে রেখে আসতে বাধ্য হন। চণ্ডীগড় ও দিল্লী হল উন্নয়নশীল দেশের পৌরায়নের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত যেখানে পুরুষরা তাদের স্ত্রী-সন্তানদের গ্রামে রেখে শহরে চলে আসেন।

সবশেষে বলতে হয় গোটা দেশেই লিঙ্গ অনুপাত বেড়েছে (ব্যতিক্রম হল হিমাচলপ্রদেশ, গোয়া, মহারাষ্ট্র, গুজরাত, সিকিম, পাঞ্জাব, হরিয়ানা)। শিল্পোন্নত মহারাষ্ট্র এবং কৃষিসমৃদ্ধ পাঞ্জাব ও হরিয়ানা রাজ্যে বহু পুরুষ কাজের সন্ধানে

এসেছেন। সম্ভবত সিকিমে সামরিক ব্যক্তিরা আরো বেশি সংখ্যায় এসেছেন। হিমাচলপ্রদেশে নারীর সংখ্যা চিরকালই কম। তবে 1991-র জনগণনায় জাতীয় গড়ের চেয়ে নারীর আধিক্য ছিল চোখে পড়ার মতন। যে বিচারে দিল্লী ও চণ্ডীগড়ের অবস্থা আগের চেয়ে খারাপ হয়েছে। এই দুটি শহরে আরও বহুসংখ্যক পুরুষ কর্মীর সমাবেশ নারীর সংখ্যা হ্রাস হবার কারণ D. Ghosh তাঁর "Pressure of Population and Economic Eefficiency in India" গ্রন্থে উন্নত দেশগুলোর তুলনায় ভারতে মহিলারা সংখ্যালঘু কেন তার ব্যাখা দিতে গিয়ে বলেছেন— আদমসুমারিতে মহিলাদের গণনায় ঘাটতি এই যুক্তি সম্পূর্ণ সত্যি নয়। 1921 সাল থেকে লোকগণনা সংস্থার কার্যকারিতা যথেষ্ট বৃদ্ধি পেলেও নারীর সংখ্যা ক্রমশই হ্রাস পেয়েছে।

সারণি : ভারতের গত একশ বছরের লিঙ্গ অনুপাত (1901-2001)

জনগণনা বছর	বছর লিঙ্গ-অনুপাত	জনগণনা বছর	বছর লিঙ্গ-অনুপাত
1901	102.9	1961	106.3
1911	103.8	1971	107.5
1921	104.7	1981	107.1
1931	105.3	1991	107.2
1941	105.8	2001	107.2
1951	105.7		

D. Ghosh শিশুকন্যা মৃত্যু এবং হত্যা সম্বন্ধেও আলোকপাত করেছেন। 1921 সালে মুম্বাই-এর Census Commissioner Mr. Sedgwick ভারতীয় মহিলাদের সংখ্যাল্পতা সম্বন্ধে জীব-বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার চেষ্টা করেছেন। আনুপাতিক বৈষম্যের ব্যাখ্যা হিসাবে Hutton (1931) স্ত্রী ও পুরুষের বয়স নির্দিষ্ট মৃত্যুহারের পার্থক্যের ওপর জোর দেন।

আমাদের দেশের মেয়েদের উন্নত দেশের মেয়েদের চেয়ে পরিশ্রম করতে হয় অনেক বেশি। তুলনায় তারা পর্যাপ্ত পরিমাণ ক্যালোরি পায় না (মাত্র 1,718 ক্যালোরি)। প্রশ্ন জাগে রামায়ণে জনক রাজা লাঙল চাষ করতে গিয়ে সীতাকে মাটি থেকে পেয়েছিলেন। কন্যা-সন্তান বলেই কি মাটি চাপা দেওয়া হয়েছিল সীতাকে? সর্বংসহা, চিরদুঃখিনী, চিরবিরহিনী সীতা নিজের সেই ভাগ্যকেই বরণ করে নিয়েছিলেন। পাতাল প্রবেশ করেছিলেন সীতা। কিন্তু আজকের মায়েরা তো বসুন্ধরার মতো নির্বাক নন। তাই প্রশ্ন জাগে নিজেদের অধিকার রক্ষার ক্ষেত্রে যাঁরা সরব হয়েছেন, নিজের কন্যা-সন্তানটির ভাগ্য জয়ে সেই নারীর কেন সবলা হয়ে উঠবেন না?

সুখের কথা, স্বাধীনতা লাভের পর জাতীয় সরকার জনস্বাস্থ্য উন্নয়মূলক কর্মসূচীর ব্যাপক পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন : আধুনিক চিকিৎসার প্রবর্তন, রোগ প্রতিরোধক ব্যবস্থা মাতা ও শিশুর স্বাস্থ্য পরিকল্পনা প্রভৃতি।

2.3.2 বয়স গ্রন্থনা (Age Composition)

বয়স ও লিঙ্গ অনুসারে জনসংখ্যার গঠনকে বলে বয়স ও লিঙ্গ গঠন। বিশ্বব্যাপী জনসংখ্যার বৈশিষ্ট্য, জন্ম, মৃত্যু, পরিযাণের মত কয়েকটি মৌলিক দিক নিয়ে বিবেচিত হয়। যেমন 0-14 বছর, 15-64 বছর এবং 65 ও তার বেশি। ভারতে এই বয়সগোষ্ঠী হল 15 বছরের কম, 15-59 এবং 59-এর বেশি। এদেশে সাধারণত 60 বছর বয়সে মানুষ অবসর নেয়।

জনসংখ্যা পাঠের এক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল বয়স গ্রন্থনা। Clarke যথার্থই মন্তব্য করছেন যে বয়স গঠনের এই তিনটি পরিমাণ যথা—জন্ম, মৃত্যু ও পরিযাণ পরস্পরের ওপর নির্ভরশীল। এর একটির পরিবর্তন অন্য দুটি উপাদানকে প্রভাবিত করে। এই পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থাসমূহ বয়স কাঠামোকে পরিবর্তিত করে। Clarke আরো বলেছেন যে বয়স গ্রন্থন জনবৃদ্ধির হারকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে।

প্রজননের হার (Rate of fertility) বিভিন্ন বয়ঃশ্রেণিতে (Age-Categories) জনসংখ্যার অনুপাত নির্ধারিত করে। এ কারণে উত্তর আমেরিকা, আফ্রিকা ও এশিয়ার (জাপান, হংকং, সিঙ্গাপুর ও দক্ষিণ কোরিয়া বাদে) মত উচ্চ জন্মহারের দেশগুলোতে তরুণ বয়সপুঞ্জের (Age group) অনুপাত বেশি লক্ষ্য করা যায়। এই সব মহাদেশের অধিকাংশ দেশগুলোর জনসংখ্যার প্রায় 2/5 এর গড় বয়স 15-এর কম। 1991 সালের জনগণনা অনুযায়ী ভারতে মোট জনসংখ্যার 36.5% এর গড় বয়স 15-এর নিচে।

এর বিপরীতে যে সব দেশের প্রজনন হার কম এবং মানুষের আয়ুষ্কাল (Life Span) অনেক বেশি, সে সব দেশের মোট জনসংখ্যার এক-চতুর্থাংশ তরুণ বয়সের, আর বয়স্ক শ্রেণির আয়ুষ্কাল তুলনামূলক বেশি। 2000 সালের জনসংখ্যার বয়সভিত্তিক গঠনে দেখা যাচ্ছে যে ইউরোপ ও উত্তর আমেরিকায় মোট জনসংখ্যার যথাক্রমে 18% এবং 22% ছিল 15 বছরের কমবয়স্ক জনতার। ইউরোপের অধিকাংশ দেশ, অ্যাংলো-আমেরিকা, জাপান, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড, যারা জনমিতি পরিবৃত্তকাল (Demographic Transition) সম্পূর্ণ করেছে, তাদের যুবা জনতার (14 বছরের কম) সংখ্যা কম এবং বৃদ্ধদের (65-র বেশি) সংখ্যা বেশি।

প্রজননের ক্রম-নিম্নমুখী গতি বৃদ্ধ বয়সগোষ্ঠীর জনসংখ্যার অনুপাত বাড়াতে সাহায্য করে। যুক্তরাষ্ট্র, উত্তর-পশ্চিম ইউরোপীয় দেশগুলো, রাশিয়া, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড ও জাপানে এটি দেখতে পাওয়া যায়। অনুরূপভাবে যদি তরুণ ও বৃদ্ধদের মৃত্যুহার কম হয় তবে উন্নত দেশগুলোর মত অনুন্নত দেশে পরবর্তী বয়সপুঞ্জের লোকসংখ্যা সেই আনুপাতিক হারে বাড়বে। বিপরীতভাবে অপেক্ষাকৃত বেশি বয়স্ক বয়সপুঞ্জের তুলনায় কম বয়সপুঞ্জের মৃত্যুহার যদি কমে যায় তবে উন্নয়নশীল দেশগুলোর মত অনুন্নত দেশে কম বয়সপুঞ্জের জনসংখ্যার আনুপাতিক হার বেড়ে যায়।

2.3.2.1 পরিযাণ ও বয়স গ্রন্থনা (Migration and Age Composition)

জনসংখ্যার বয়স গ্রন্থনার ওপর পরিযাণের একই রকম প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু বয়সপুঞ্জের ওপর জন্ম ও মৃত্যুর প্রভাব পরিযাণের থেকে বেশ কিছুটা আলাদা। কারণ অভিবাসনকারীদের একটা নিজস্ব বয়স ধাঁচ (Age Pattern) ও স্বাভাবিক বৃদ্ধির হার আছে। যেহেতু অধিকাংশ স্থানান্তরকারীরা (Emigrant) যুবা বয়সের হন এবং যেহেতু এদের স্বাভাবিক বৃদ্ধি বেশি, তাই জনসংখ্যার ওপর এদের স্বল্পকালীন প্রভাব থাকে : তা হল নবজাতকদের সংখ্যাবৃদ্ধি ও সেই অনপাতে বয়স্ক গোষ্ঠীর জনসংখ্যা হ্রাস। যদি পরিযাণের হার বজায় থাকে, তবে বয়স গ্রন্থনায় তরুণদের প্রাধান্য বজায় থাকে। যদি অভিবাসীদের (Emigrant) আগমন বন্ধ হয়ে যায় বা কমে যায় অথবা বেশি বয়সের অধিবাসীরা সেই স্থানে আসেন, তবে বয়স গ্রন্থনায় তরুণদের প্রাধান্য থাকবে না। তাই বলা চলে যে বয়স কাঠামোর ওপর পরিযাণের প্রভাব মূলত বয়সনির্ভর। যেহেতু 15-30 বছরের কর্মক্ষম লোকেরা অপেক্ষাকৃত কম বয়সপুঞ্জের তুলনায় বেশি সচল, তাই পরিযাণের মাধ্যমে দুই স্থানের জনতার বয়স কাঠামোর খুব বেশি রকম পরিবর্তন আসে।

2.3.2.2 বয়স গ্রন্থনায় প্রভাবক ও গুরুত্ব :

জন্ম, মৃত্যু ও প্রব্রজন ছাড়া যুদ্ধ (যাতে পুরুষেরা অংশ নেন), আকস্মিক দুর্ঘটনা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, জনসংখ্যা নীতি (Population Policy) দিয়ে বয়স কাঠামো বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়। বয়স কাঠামোর ওপর যুদ্ধের গুরুত্ব অপরিসীম। কেননা এতে প্রচুর যুবকের মৃত্যু ঘটে। একটা নির্দিষ্ট বয়সের পুরুষদের মৃত্যু প্রজননের ওপর প্রভাব বিস্তার করে, যা পরোক্ষভাবে বয়স কাঠামোর ওপর ছাপ ফেলে। যুদ্ধের ফলে কোন জনসংখ্যার বয়স বিন্যাসে (Distribtion) অনিয়ম দেখা যায়। এই অনিয়ম এক বয়সপুঞ্জ থেকে (Age Group) অন্য বয়সপুঞ্জে স্থানান্তরিত হতে থাকে। একইভাবে, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, আকস্মিক দুর্ঘটনা প্রভৃতি বয়স বিভাজনের ওপর প্রভাব ফেলে যতদিন পর্যন্ত না ঐ প্রভাবিত বয়সপুঞ্জের আয়ুষ্কাল শেষ হয়। কোন দেশের সুদূরপ্রসারী কতকগুলো তাৎপর্যপূর্ণ জনসংখ্যা নীতি আছে যা সেখানকার বয়স গঠনের ওপর প্রভাব ফেলে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ঠিক পরেই জাপানে গর্ভপাতকে বৈধ করায় সে দেশের ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার 0-4 বয়সপুঞ্জের লোকসংখ্যা (অর্থাৎ শিশু) অনুপাত কমতে থাকে, আবার চিনের মত দেশে যেখানে জনসংখ্যা খুব বেশি, সেখানে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে কিছু পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। চিনে সারা দেশ জুড়ে গর্ভনিরোধক বড়ি বিনামূল্যে দেওয়া হয়। এছাড়া, নিম্ন পর্যায় পর্যন্ত পরিবার পরিকল্পনা কার্যকরী করার জন্য সংগঠিত নেটওয়ার্ক (Network) কর্মসূচি রয়েছে। মহিলাদের বন্ধ্যাকরণ ও প্রজনন রেকর্ড প্রকাশ্যে টাঙিয়ে দেওয়া হয়। বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়স্বজনেরা "এক শিশুর" পক্ষে বারংবার দম্পতিদের পরামর্শ দেন। এছাড়া এক শিশুর নীতি বলবৎ করতে প্রথম শিশু জন্মাবার পর দম্পতিকে বিভিন্নভাবে পুরস্কৃত করা হয়। কিন্তু দ্বিতীয় শিশু জন্মালে ঐ শিশুকে দূরের স্কুলে ভর্তি করানো বাধ্যতামূলক হয়েছে।

পক্ষান্তরে পাশ্চাত্যের কয়েকটি দেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধিতে সরকার থেকে উৎসাহ দেওয়া হয়েছে। যেমন—রাশিয়া সরকার 1970 সালে জনসংখ্যা বৃদ্ধির জন্য "The Mother Lenin Award" পুরস্কার প্রবর্তন করে। ঐ পুরস্কারে বলা হয় যে মাতা 12টি সন্তানের জন্ম দেবেন তাকে একটি গাড়ি, প্রচুর টাকা এবং একটি মানপত্র দেওয়া হবে। জার্মানিতে জন্মের হার মৃত্যুর হারের তুলনায় কমে যাওয়ায় জার্মান সরকার বৃহৎ পরিবার গঠনের জন্য উৎসাহ প্রদান করেন। বৃহৎ পরিবার গঠনের জন্য জার্মান সরকার মায়েদের কিছু সুবিধে প্রদানের ব্যবস্থা করেন। যেমন দ্বিতীয় সন্তান জন্মের সময় মা এক বছরের ছুটি পাবেন এবং মাসের মাইনের আশি শতাংশ বেতন পাবেন। বিয়ের সময় এবং প্রতি শিশু জন্মাবার পর কম সুদে বাড়ি করার জন্য ঋণ পাওয়া যায়।

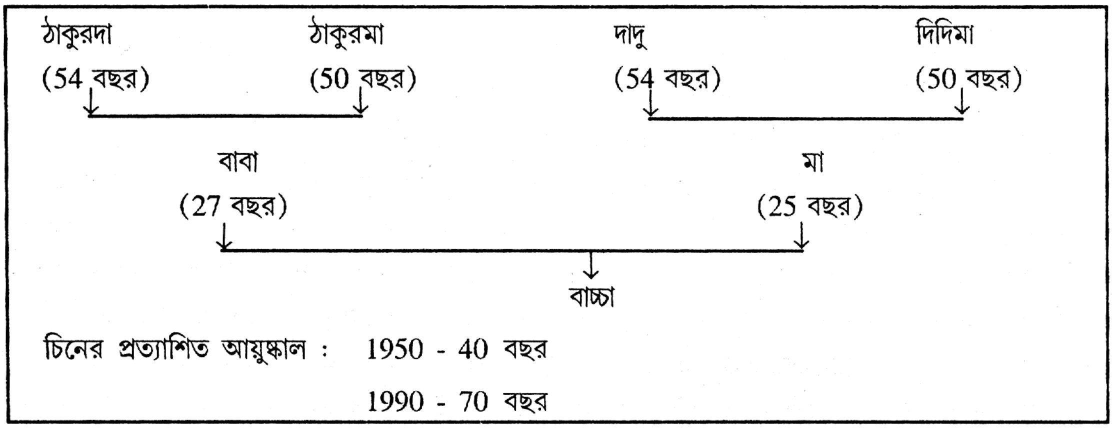

চিত্র 2.26 : চীনের এক-সন্তান পরিবার মডেল

2.3.2.3 বয়স বিশ্লেষণ পদ্ধতি (Methods of Age Analysis)

জনসংখ্যা ভৌগোলিকদের বয়সের সংখ্যাতত্ত্ব (Statistics) বিশ্লেষণে এমন কিছু পদ্ধতি আছে যেগুলো বয়স সম্পর্কিত তথ্যের ভুল কমিয়ে দেয়। এভাবে তাঁরা বয়স সম্পর্কিত সংখ্যাতত্ত্বের ওপর নির্ভরশীলতা বাড়িয়ে দেন। সাধারণত জনসংখ্যা ভৌগোলিকরা বয়স গ্রন্থনা বিশ্লেষণে তিনটি আলাদা আলাদা পদ্ধতি ব্যবহার করেন। এগুলো হল—বয়স পিরামিড (Age Pyramid), বয়সপুঞ্জ (Age Group) ও বয়স সূচক (Age Indices)।

বয়স পিরামিড (Age Pyramid)

বয়স গ্রন্থনা বিশ্লেষণ করার সবচেয়ে চলতি পদ্ধতি হল বয়স পিরামিড যা সচরাচর বয়স-লিঙ্গ পিরামিড নামে পরিচিত। যে লেখচিত্রের সাহায্যে কোনও দেশ বা অঞ্চলের জনসাধারণের বয়স অনুসারে, নারী-পুরুষের জন্ম-মৃত্যুর আয়তন ও গঠন বিন্যাস প্রকাশ করা হয়, তাকে এজ-সেক্স পিরামিড (Age-sex Pyramid) বা জনসংখ্যা পিরামিড (Population Pyramid) বলে। এই পিরামিডকে বয়সভিত্তিক স্ত্রী/পুরুষের অনুপাত সূচক পিরামিড বা বয়োগোষ্ঠীর পিরামিডও বলে।

এই চিত্র দেশের জনসংখ্যার কিছু বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করে। যেমন—(1) দেশের কর্মক্ষম জনসংখ্যার পরিমাণ, (2) অল্পবয়স্ক পরনির্ভর জনসংখ্যার পরিমাণ, (3) পরনির্ভর জনসংখ্যার পরিমাণ, (4) জীবনধারণের মান, (5) দেশবাসীর মাথাপিছু আয়ের পরিমাণগত অবস্থা, (6) শ্রমদানক্ষম জনসংখ্যার পরিমাণ, (7) বয়স্ক পরনির্ভর জনসংখ্যার পরিমাণ, (8) দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা, (9) প্রাপ্তবয়স্ক স্ত্রী-পুরুষের সংখ্যা (যার থেকে ভবিষ্যৎ জনসংখ্যা বৃদ্ধির গতি-প্রকৃতি বোঝা যায়; দেশে প্রাপ্তবয়স্ক যুবক-যুবতীর সংখ্যা বেশি থাকলে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার দ্রুত হয়; আবার খুব বয়স্ক স্ত্রী-পুরুষের সংখ্যা বেশি থাকলে জনসংখ্যা বৃদ্ধির গতি নিম্নমুখী হয়) ইত্যাদি।

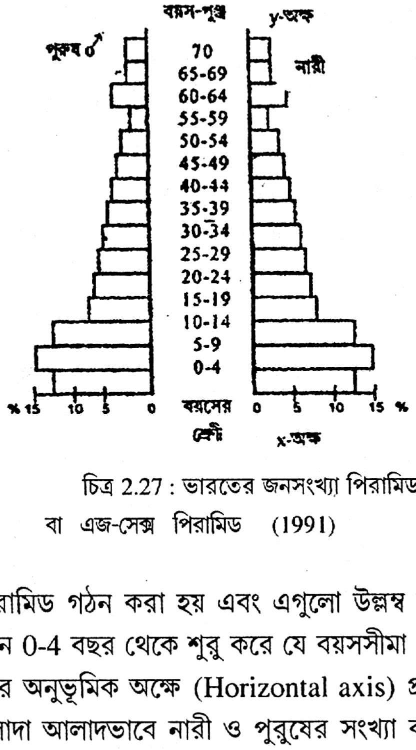

চিত্র 2.27 : ভারতের জনসংখ্যা পিরামিড বা এজ-সেক্স পিরামিড (1991)

কোনও জনসংখ্যার বয়স কাঠামো দেখানোর জন্য বয়স পিরামিড গঠন করা হয় এবং এগুলো উল্লম্ব অক্ষে (vertical axis) একটি নির্দিষ্ট বয়সের (5 বছর) ব্যবধানে (যেমন 0-4 বছর থেকে শুরু করে যে বয়সসীমা পর্যন্ত পর্যালোচনা করতে হবে সে পর্যন্ত) দেখানো হয়। এই পিরামিডের অনুভূমিক অক্ষে (Horizontal axis) প্রতিটি বয়সপুঞ্জের (Age group) স্ত্রী ও পুরুষের মোট সংখ্যা বা আলাদা আলাদভাবে নারী ও পুরুষের সংখ্যা বা দুই লিঙ্গের শতকরা হার দেখানো হয় (চিত্র 2.27)। যদি অনুভূমিক অক্ষে স্ত্রী ও পুরুষ আলাদভাবে দেখানো হয় তবে পিরামিডকে সমান দুটি ভাগে ভাগ করতে হয়, যার ডানপক্ষ স্ত্রী ও বামপক্ষ পুরুষকে নির্দেশ করে। স্বাভাবিক ক্ষেত্রে প্রত্যেক পরবর্তী বছরের লোকসংখ্যা পূর্ববর্তী বয়সপুঞ্জের লোকসংখ্যা থেকে কম হয়। মনে রাখা দরকার যে দেশ ও সময়ের (বিভিন্ন বয়সপুঞ্জের) পার্থক্য অনুসারে পিরামিড-চিত্রের গঠন ও আকৃতির তারতম্য ঘটে। এই গঠন ও আকৃতির পার্থক্য থেকে (1) দেশের বিভিন্ন সময়ের বিভিন্ন বয়সের স্ত্রী-পুরুষের সংখ্যার পরিমাণ সম্বন্ধে পরিচয় পাওয়া যায়। তার থেকে (2) ভবিষ্যৎ জনসংখ্যার গতি-প্রকৃতি ও শ্রমিক সরবরাহ, (3) সম্পদ সৃষ্টির কাজে উৎসাহ, (4) সম্পদ সৃষ্টির পরিমাণ, (5) সম্পদের প্রাচুর্য ও অবক্ষয় ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয় সম্বন্ধে জানা যায়।

যে সব দেশে জন্ম ও মৃত্যুর হার দুই-ই বেশি সেই সব দেশ জনমিতিক পরিবৃত্তকালের প্রথম অবস্থায় থাকবে। এই সব দেশের বয়স গ্রন্থনায় যে পিরামিড হবে, তার ভিত্তি (base) খুব চওড়া হবে, কিন্তু তার ওপরের দিকটা খুব তাড়াতাড়ি সরু হয়ে আসবে। এর ফলে ত্রিভুজের দুই দিক অবতলাকৃতি দেখতে হবে। যে সব দেশ জনমিতিক পরিবৃত্তকালের দ্বিতীয় স্তরে রয়েছে, সেই সব দেশের বয়স গ্রন্থনা পিরামিডের ভিত্তি (base) বড় হয়। পিরামিডের এই বড় ভিত্তি (broad base) আরও কিছু বয়সপুঞ্জ পর্যন্ত চলে। তারপর আয়ুষ্কালের পরিধি কম হওয়ার দরুন পিরামিডের ওপর দিকটা ক্রমশ কম চওড়া হতে থাকে। তুলনামূলকভাবে, সে সব দেশে পরিবর্তনের তৃতীয় স্তরে রয়েছে, যে সব দেশের পিরামিডের ভিত্তি সরু হয়। এই অবস্থা আরো কিছু বয়সপুঞ্জ পর্যন্ত চলে থাকে। আর পিরামিডটি আস্তে আস্তে সরু হয়ে যায়।

চিলি ধরন (Chile Type)

যুদ্ধ, মহামারী, স্থানান্তর গমন ও শিশু জন্মাধিক্য বয়স পিরামিডের আকৃতির ওপর প্রভাব বিস্তার করে। যুদ্ধ সাধারণত কোন জনগোষ্ঠীর বয়স গ্রন্থনার ওপর দীর্ঘমেয়াদি ও স্বল্পমেয়াদি প্রভাব বিস্তার করে। যুদ্ধের দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব জন্মহার কমার মাধ্যমে প্রকাশ পায়। যুদ্ধ অনেক যুবকের প্রাণহানি ঘটায়, আর তার ফলাফল বয়স পিরামিডের আকৃতিতে ধরা পড়ে। অনুরূপভাবে, মহামারী ও দুর্ভিক্ষের ফলে অনেক অস্বাভাবিক মৃত্যু হয় ও তা বয়স পিরামিডের আকৃতিকে বিকৃত করে। দৈবদুর্বিপাকে বিভিন্ন বয়সের মানুষ মৃত্যুর শিকার হয়। স্বভাবতই পিরামিডের আকৃতি কিছুটা বদলায়। এছাড়া পরিযাণ, যা বয়স ও লিঙ্গ নির্ভর, তা পিরামিডের স্বাভাবিক আকৃতিকে বিকৃত করে। পরিযাণের ফলে দুটি স্থানের মধ্যে (গ্রহীতা অঞ্চল ও বাস্তুত্যাগকারী অঞ্চল) জনবন্টনের পার্থক্য ঘটে, যার প্রভাব পিরামিডের ওপর পড়ে।

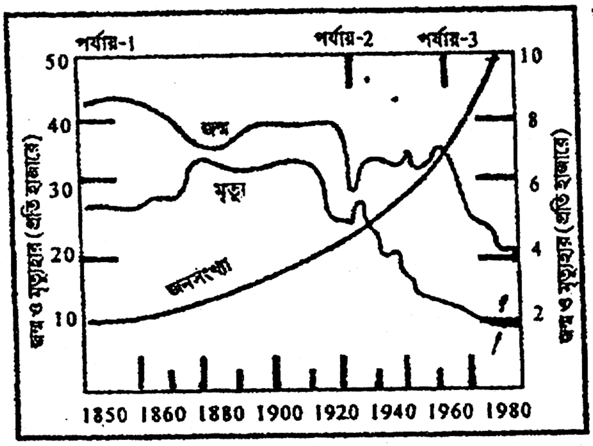

চিত্র 2.28 : (ক)

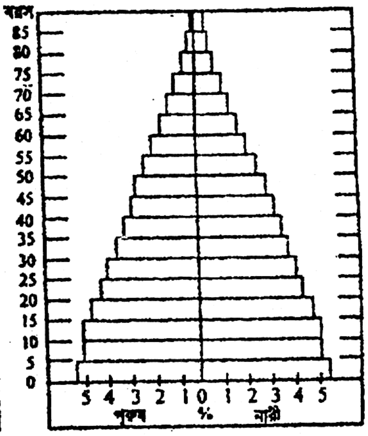

চিত্র 2.28 : (খ)

চিত্র-2.28 (ক) ও (খ) : চিলির জনমিতি পরিবৃত্তকালের মডেল ও জনসংখ্যা পিরামিড। 1930-র দশকে চিলি জনমিতি পরিবৃত্তকালের দ্বিতীয় পর্যায়ে প্রবেশ করেছে। মৃত্যুহার হঠাৎ করে কমে গিয়েছিল। কিন্তু জন্মহার প্রতি হাজারে 30 শতাংশ ছিল। 1960-র দশকে সরকারি জন্মনিয়ন্ত্রণ নীতির দরুন জন্মহার হঠাৎ করে যায়। অবশ্য 1979 সালে ঐ নীতি বদলের ফলে 1980-র দশক থেকে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে।

ডেনমার্কের জনমিতি পরিবৃত্তকালের একটি মডেল ও জনসংখ্যা পিরামিড 2.29 (ক) ও (খ) ডেনমার্ক জনমিতি পরিবৃত্তকালের চতুর্থ পর্যায়ে রয়েছে। 1970-র দশকের শুরু থেকেই এখানে জনসংখ্যা বৃদ্ধি খুব কম ঘটেছে। জন্ম ও মৃত্যুহার প্রায় একই রকম।

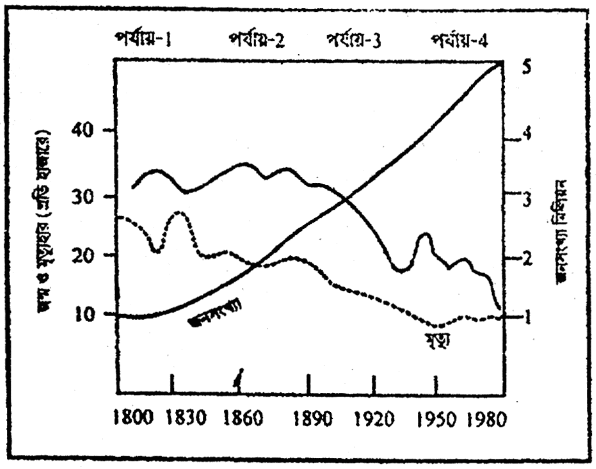

চিত্র 2.29 : (ক) ডেনমার্কের জনমিতি পরিবৃত্তকালের একটি মডেল ও জনসংখ্যা পিরামিড। ডেনমার্ক জনমিতি পরিবৃত্তকালের চতুর্থ পর্যায়ে রয়েছে। 1970-এর দশকের শুরু থেকেই এখানে জনসংখ্যা বৃদ্ধি খুব কম ঘটেছে। জন্ম ও মৃত্যুহার প্রায় একই রকম।

তবে কোন কোন সময় বয়স পিরামিডের অসঙ্গতি শুধুমাত্র একটি কারণের ওপর নির্ভর করে না। বিভিন্ন দেশের নিজস্ব সামাজিক, অর্থনৈতিক ও জনমিতি ইতিহাসের কারণে বয়স পিরামিডের আকৃতি বিভিন্ন হতে পারে। পিরামিডের বিভিন্ন স্তম্ভের (bar) বিকৃতির কোন ঐতিহাসিক ব্যাখ্যা করতে পারে। যেমন বলা চলে, কোন দেশে [যেমন ডেনমার্ক (চিত্র 2.29) এবং সুইডেনের ক্ষেত্রে হয়েছে] বহুদিন ধরে জন্ম ও মৃত্যুহার কম থাকলে, সেই দেশের বয়স পিরামিডের আকৃতি পিপার (barrel) মতন দেখতে হতে পারে। প্রথম (1914-1918) ও দ্বিতীয় (1939-1945) বিশ্বযুদ্ধের ফলে জন্ম ও মৃত্যুর হঠাৎ হ্রাস-বৃদ্ধির দরুন বয়স পিরামিডে অসঙ্গতি দেখা দেয় (যেমন ফ্রান্সের ক্ষেত্রে হয়েছে)। গর্ভপাত বৈধকরণের ফলে জন্মের হার কমতে পারে (যেমন, জাপানের ক্ষেত্রে হয়েছে)। এ ক্ষেত্রে পিরামিডের ভিত্তির (base) আয়তন পরবর্তী স্তম্ভের (bar) তুলনায় ছোট হতে পারে। যে সব দেশে অভিবাসন ঘটেছে বা যে সব দেশ থেকে লোকজন বাইরে চলে গেছেন, সেইসব দেশে বয়স পিরামিডের মাঝের স্তম্ভ বা ওপরের স্তম্ভ যথাক্রমে বেশ লম্বা বা বেঁটে হতে পারে (চিত্র 2.30)।

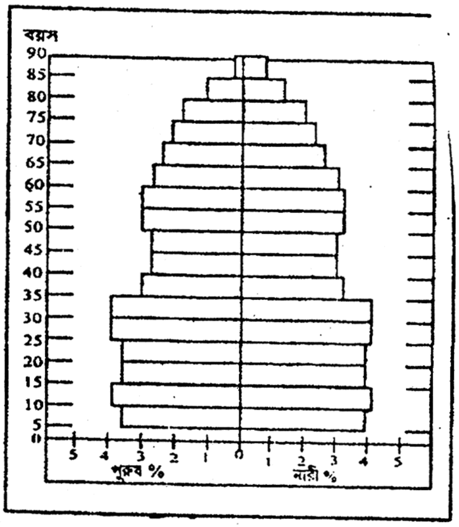

চিত্র 2.30 : ডেনমার্কের জনসংখ্যা পিরামিড

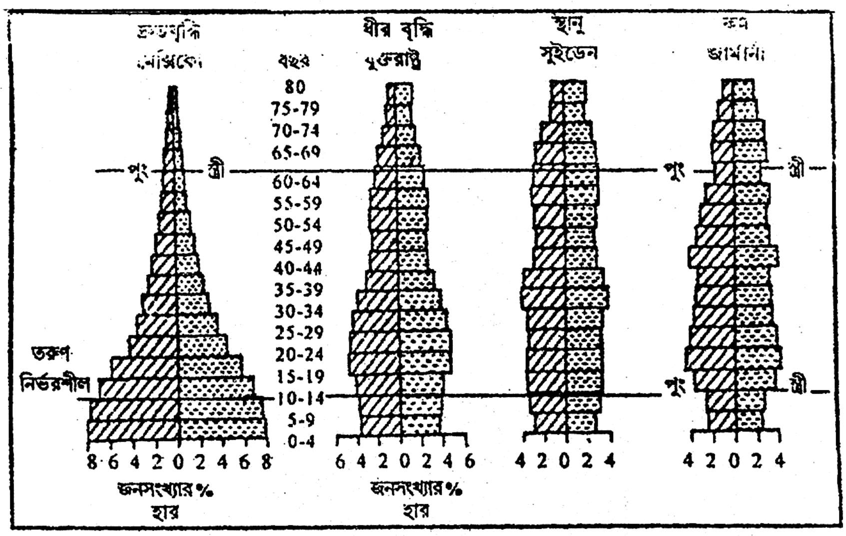

চিত্র 2.31 : চার ধরনের জনসংখ্যার গঠন

2.3.2.4 পৃথিবীর উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশের বয়স পিরামিডের তুলনা

উন্নত দেশের বয়স পিরামিড : পৃথিবীর উন্নত, সমৃদ্ধ দেশগুলোর বয়স পিরামিড বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, এখানে জন্মহার কম হওয়ার জন্য শিশু ও কিশোর জনসংখ্যার চাপ কম এবং উপার্জনশীল মানুষের সংখ্যা বেশি। তাই নির্ভরশীল জনগণের আর্থ-সামাজিক দায়দায়িত্ব বহন করা এখানে কর্মজীবী মানুষের কাছে কোনও সমস্যান নয়। সুতরাং পৃথিবীর শিল্পোন্নত দেশগুলোর বয়স পিরামিডের আকৃতি বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশগুলোর থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। নিয়ন্ত্রিত জন্মহারের জন্য উন্নত দেশগুলোর পিরামিডের ভূমি অপ্রশস্ত হয় (চিত্র 2.32)।

(ক) যুবক ও কর্মজীবী পুরুষদের ক্রমবর্ধমান অভিবাসনের ফলে বিঘ্নি পিরামিড

(খ) যুদ্ধের কারণে যুবক ও সবল পুরুষদের ক্রমবর্ধমান মৃত্যুহার ও বিঘ্নি পিরামিড

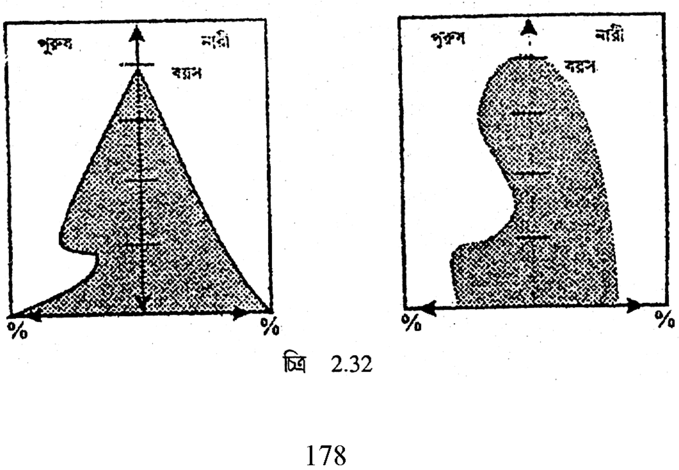

চিত্র 2.32

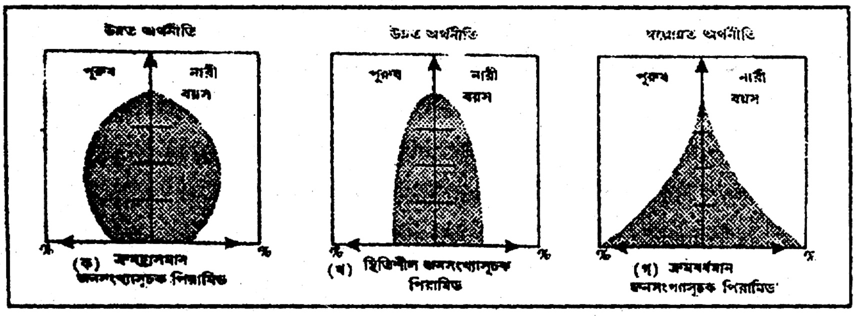

চিত্র 2.33

অর্থাৎ 0-15 বছর পর্যন্ত নাবালকদের অনুপাত এখানে অল্প। 15-24 বছরের মধ্যে কিশোর ও যুবকদের অনুপাত নাবালক জনসংখ্যার তুলনায় বেশি হওয়ার জন্য পিরামিডের এই অংশটি প্রশস্ত হয়। পিরামিডেরহ্ উপরের দিকে পরবর্তী ধাপগুলো সাধারণত জনসংখ্যার ক্রমহ্রাসমান অনুপাতকে নির্দেশ করে। উন্নত দেশগুলোতে বয়স পিরামিড আকৃতি অনুসারে তিন ধরনের হয়, যেমন (i) তৃতীয় শ্রেণির পিরামিডের মত উত্তল ধরনের (চিত্র 2.34)। পশ্চিম ইউরোপের দেশগুলোতে এই ধরনের জনসংখ্যার বিন্যাস দেখা যায়। (ii) ঘণ্টা বা বেল (bell)

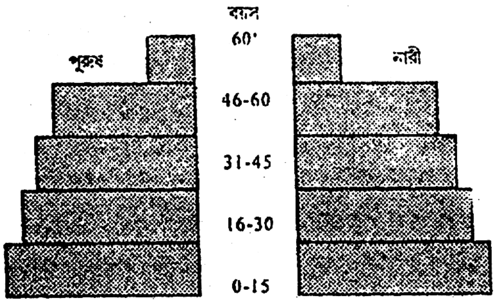

চিত্র 2.34 : উত্তল আকৃতির পিরামিড

আকৃতির। বহুদিন ধরে জন্মহান ও মৃত্যুহার কম থাকার পরে হঠাৎ জন্মহার বাড়তে শুরু করলে পিরামিড ঘণ্টার আকার ধারণ করে। যুক্তরাষ্ট্র এবং কানাডায় জন্মহার হঠাৎ বেড়ে যাওয়ার জন্য উন্নয়নশীল দেশ থেকে আসা লোকজনের বিশেষ ভূমিকা আছে। এই দুই দেশে জনসংখ্যার।

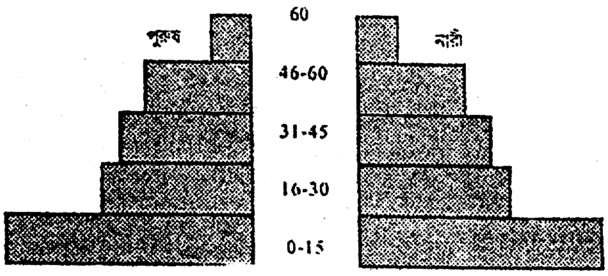

চিত্র 2.35 : ঘণ্টা বা বেল আকৃতির পিরামিড

বিন্যাস চতুর্থ শ্রেণির পিরামিডের মত (চিত্র 2.35)। (iii) নাসপাতির মত আকৃতির (পঞ্চম শ্রেণির) পিরামিড। এখানে জন্মহারা মৃত্যুহারের চেয়ে কম। যেমন, জাপান, সুইডেন প্রভৃতি জনবিন্যাস (চিত্র 2.36)।

উন্নয়নশীল দেশের বয়স পিরামিড

পৃথিবীর উন্নয়নশীল দেশগুলির বয়স পিরামিড বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে জন্মহার বেশি হওয়ার দরুন শিশু

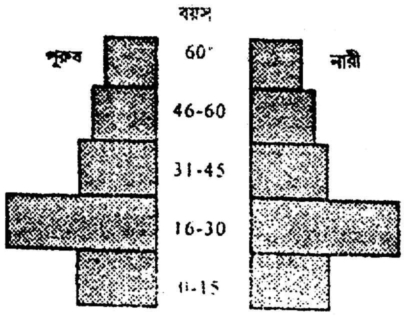

চিত্র 2.36 : নাসপাতির আকৃতির মত পিরামিড

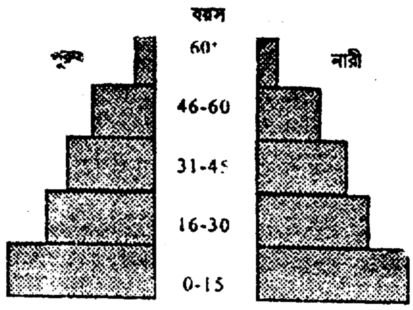

চিত্র 2.37 : তীক্ষ্ণবীর্য সমবাহু পিরামিড

ও কিশোর জনসংখ্যার চাপ এই দেশগুলোতে সবচেয়ে বেশি। প্রকৃতপক্ষে, কোনও দেশের অনুৎপাদক জনসংখ্যার পরিমাণ নির্ভর করে সেই দেশে জীবনধারণের জন্য কোন উপার্জনমুখী কাজে নিযুক্ত নয়, এমন শিশু, কিশোর ও বৃদ্ধি নরনারীর আয়তনের ওপর। যেহেতু সমাজের শিশু, কিশোর ও বৃদ্ধ-বৃদ্ধারা উৎপাদনে অংশ নেন না, তাই এই উপার্জনহীন জনগোষ্ঠীর ভরণ-পোষণ এবং তাদের মৌলিক সামাজিক ও সংস্কৃতিক চাহিদা পুরণের দায়িত্ব নিতে হয় উপার্জনশীল, উৎপাদনে অংশগ্রহণকারী পৌঢ় ও যুবক সম্প্রদায়কে। তাই পৃথিবীর বিকাশশীল দেশগুলোতে শিশু ও কিশোর জনসংখ্যার ক্রমবর্ধমান চাপের জন্য সামগ্রিকভাবে মাথাপিছু আয়, মাথাপিছু উৎপাদন ও দেশের সার্বিক উন্নতির হার ব্যাহত হয়। বয়সভিত্তিক স্ত্রী-পুরুষের অনুপাতসূচক পিরামিডে এই জাতীয় আর্থ-সামাজিক অনগ্রসরতার চিহ্ন বিস্তীর্ণ ও প্রসারিত পিরামিড ভূমি ও ক্রমসঙ্কুচিত শীর্ষের সাহায্যে স্পষ্টভাবে ধরা পড়ে। পৃথিবীর উন্নয়নশীল দেশগুলোর পিরামিড সাধারণত সেই কারণেই তীক্ষ্ণশীর্ষ সমবাহু ত্রিভুজের মত (চিত্র 2.38)।

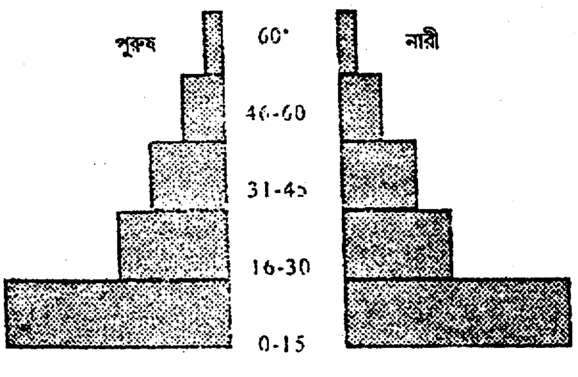

চিত্র 2.38 : ধনুকাকৃতি পিরামিড

পরের পৃষ্ঠায় কয়েকটি উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশের বয়স পিরামিডের চিত্র ও তার সম্ভাব্য ব্যাখ্যা দেওয়া হল :

উন্নত দেশের পিরামিড

যুক্তরাষ্ট্র

ওপরের পিরামিড চিত্রটি (বয়স ও স্ত্রী-পুরুষ অনুসারে) যুক্তরাষ্ট্রের। এই পিরামিড চিত্র (2.39) থেকে নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট দেখা যায়।

(i) জন্মের হার ও শিশু জনসংখ্যার ক্ষেত্রে স্ত্রী জনসংখ্যার চেয়ে পুরুষ জনসংখ্যা বেশি। 25 বছর বয়স পর্যন্ত স্ত্রী জনসংখ্যার চেয়ে পুরুষ জনসংখ্যার পরিমাণ বেশি। তারপর যতই ওপরের দিকে যাওয়া যায়, পুরুষের চেয়ে স্ত্রী জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে।

(ii) শিশুমৃত্যুর হার উন্নত দেশে তুলনামূলকভাবে অনেক কম।

(iii) মোট জনসংখ্যার তুলনায় জন্মের হার সীমিত।

(iv) কার্যক্ষম জনসংখ্যার পরিমাণ বেশি হওয়ায় সম্পদ-সৃষ্টির পরিমাণ বেশি হয়।

(v) পরনির্ভর অল্পবয়স্কদের সংখ্যা কম হওয়ার ফলে মাথাপিছু আয় এদেশে বেশি।

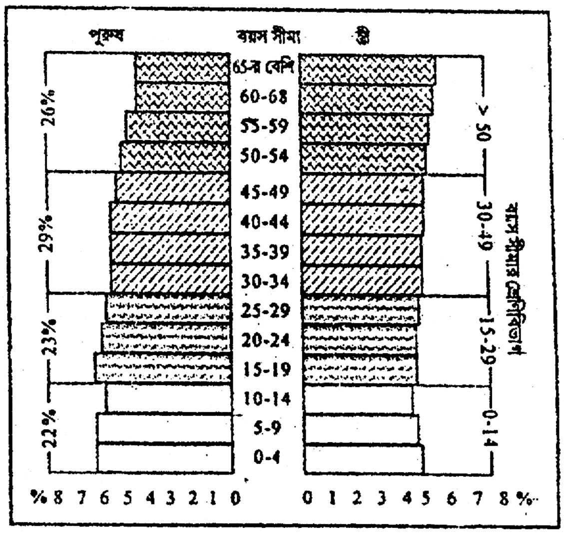

চিত্র 2.39 : বয়স ও স্ত্রী-পুরুষ অনুসারে যুক্তরাষ্ট্রের পিরামিড

উপরোক্ত বৈশিষ্ট্যগুলো উন্নত দেশেই দেখা যায়। যুক্তরাষ্ট্রের মত উন্নত দেশের পিরামিডে ঐসব বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পেয়েছে।

ব্রিটিশ যুক্তরাজ্য (United Kindom)

শিল্পোন্নত দেশ ব্রিটিশ যুক্তরাজ্যের জনসংখ্যা-পিরামিড-চিত্র (চিত্র 2.40) বিশ্লেষণ করলে নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্য ধরা পড়ে :

(i) দেশে জন্মহার কম। অল্পবয়স্কদের সংখ্যা সীমিত। দেশের মোট জনশক্তির মাত্র 25 শতাংশের 14 বছর ও তার নিচে।

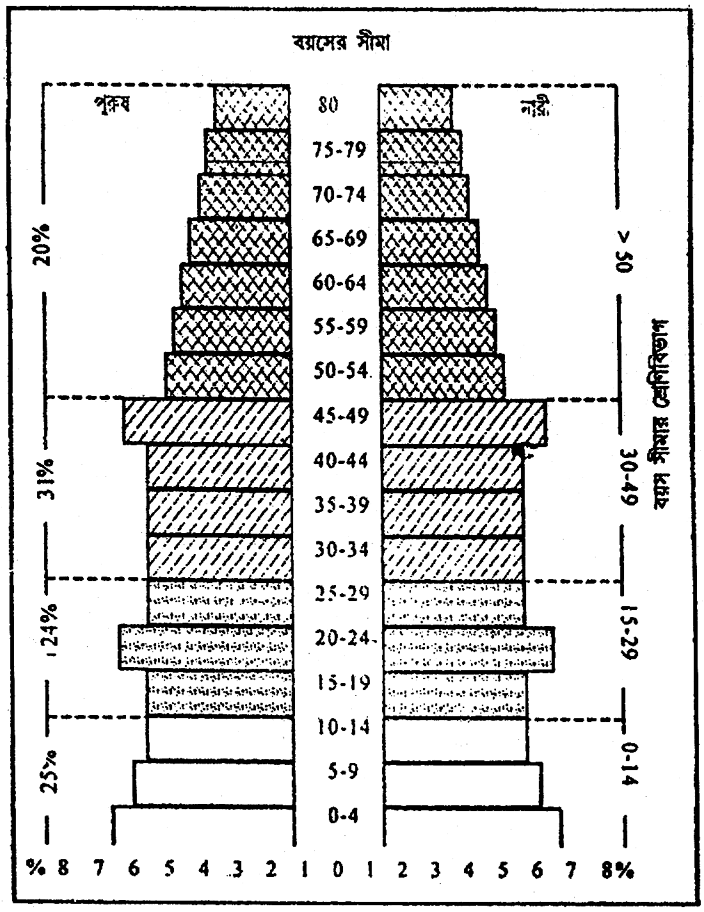

চিত্র 2.40 : জনসংখ্যা পিরামিড : বৃটিশ যুক্তরাজ্য

(ii) পিরামিডের মধ্যভাগ মোটা। এ থেকে বোঝা যায় যে ঐ দেশে যুবক-যুবতী ও পূর্ণবয়স্কদের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি (মোট জনসংখ্যার প্রায় 55 শতাংশ)। ফলে কর্মক্ষম জনসংখ্যার প্রাধান্য থাকায় দেশের অর্থনীতি সমৃদ্ধ।

(iii) পিরামিডের ওপরের অংশও যথেষ্ট মোটা। এর থেকে বোঝা যায় যে ঐ দেশে 50 বছরের বেশি জনসংখ্যা অনেক (মোট জনসংখ্যার 20 শতাংশ)।

জাপান (Japan)

এশিয়া তথা বিশ্বের এই উন্নত দেশটির জনসংখ্যা পিরামিড-চিত্র (চিত্র 2.41) থেকে নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায় :

(i) পিরামিডের মধ্যভাগের চেহারা স্ফীত। এ থেকে বোঝা যায় যে জন্দ্বাপানে পূর্ণবয়স্কদের জনসংখ্যা সর্বাধিক (দেশের মোট জনশক্তির প্রায় 57 শতাংশ)। এদেশে কর্মক্ষম জনসংখ্যা সবচেয়ে বেশি। তাই জাপানের অর্থনৈতিক উন্নতি ক্রমবর্ধমান।

(ii) মধ্যভাগের চেয়ে নিচের দিকের পিরামিডের চেহারা কম মোটা। এর মানে দেশের জনসংখ্যায় শিশু ও অল্পবয়স্কদের প্রাধান্য কম। জাপানে জন্মহার কম হওয়ার দরুন দেশের মোট জনসংখ্যার মাত্র শতকরা 18 ভাগ হল শিশু ও অল্পবয়স্ক।

(ii) পিরামিড-চিত্র 2.36 থেকে দেখা যাচ্ছে জাপানে 50 উর্ধ্বে জনসংখ্যা যথেষ্ট বেশি (মোট জনসংখ্যার প্রায় 25 শতাংশ)। পরনির্ভর জনসংখ্যা কম হওয়ার দরুন মাথাপিছু আয় বেশি।

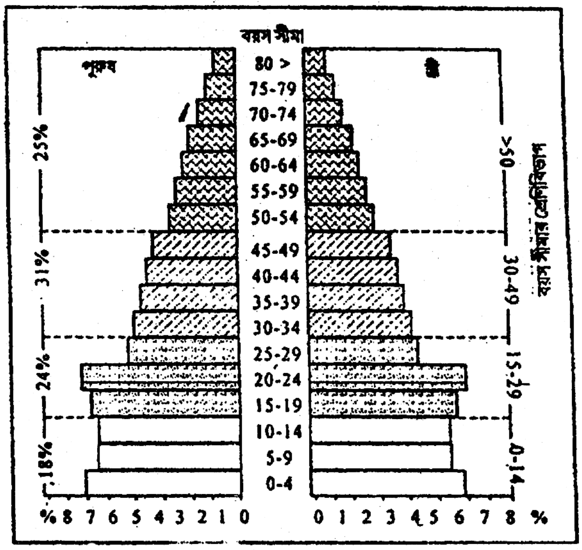

চিত্র 2.41 : জনসংখ্যা পিরামিড : জাপান

উন্নয়নশীল দেশের পিরামিড-চিত্র

ভারত (India)

উন্নয়নশীল দেশ ভারতের জনসংখ্যার পিরামিড-চিত্র (চিত্র 2.42) থেকে নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলো লক্ষ্য করা যায় :

(i) জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার দ্রুত, তাই পিরামিডের নিচের দিকে মোটা এবং কম বয়সের ছেলে-মেয়েদের সংখ্যা বেশি।

(ii) পুরুষদের তুলনায় স্ত্রীদের সংখ্যা কম; শিশু থেকে বয়স্ক পর্যন্ত এই চিত্রটি লক্ষ্য করা যায়।

(iii) ভারতের মত উন্নয়নশীল দেশে শিশুমৃত্যুর হার অত্যন্ত বেশি।

(iv) কর্মক্ষেম জনসংখ্যার পরিমাণ বয়স্ক জনসংখ্যার তুলনায় উল্লেখযোগ্যভাবে বেশি; ফলে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার দ্রুত।

(v) বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের সংখ্যা তুলনামূলকভাবে অনেক কম; এটি সমস্যা ও দারিদ্র্য-পীড়িত সমাজের একটি চিত্র।

(vi) বয়স্ক জনসংখ্যা (45-এর বেশি) কম হওয়া মানে হল পরনির্ভর অল্পবয়স্কদের সংখ্যা বেশি; ফলে

পরিবারের কর্মক্ষম জনসংখ্যা কম হওয়ার দরুন সংসারে মাথাপিছু আয় কম। এই কারণে উন্নতশীল দেশে বেশিরভাগ লোক দারিদ্র সীমার নীচে জীবন যাপন করে (পাল, 2000)।

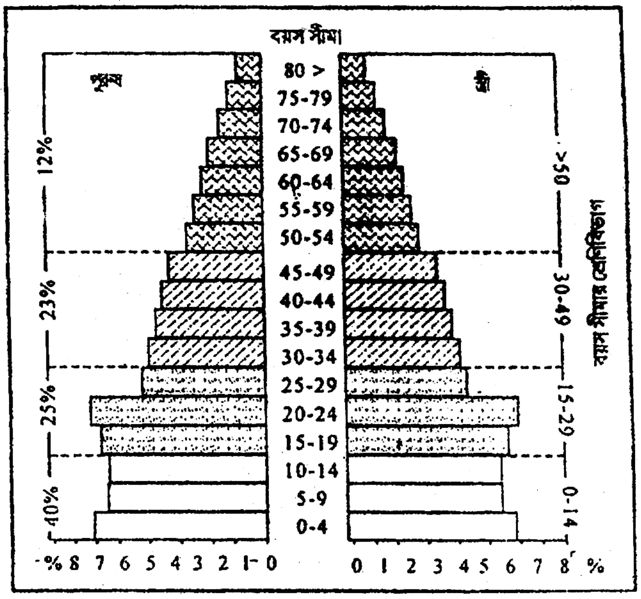

চিত্র 2.42 : স্ত্রী-পুরুষের বয়স অনুসারে ভারতের জনসংখ্যার পিরামিড

মালয়েশিয়া (Malayasia)

উন্নয়শীল দেশ মালয়েশিয়াতেও জনসংখ্যা বৃদ্ধি হচ্ছে দ্রুত হারে। এদেশের পিরামিড-চিত্র (চিত্র 2.38) থেকে নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্য দেখতে পাওয়া যায় :

(i) জন্মহার অত্যন্ত বেশি হওয়ার দরুন মালয়েশিয়ার জনসংখ্যা-পিরামিডটির নিচের অংশ চওড়া অর্থাৎ শিশু ও অল্প বয়স্কদের সংখ্যা বেশি (মোট জনসংখ্যার প্রায় 45 শতাংশ)

(ii) পিরামিডটির আয়তন মধ্যভাগ থেকে ওপরের দিকে ক্রমশ সরু হয়ে গেছে। অর্থাৎ বয়স্ক জনসংখ্যা ক্রমশ হ্রাস পেয়েছে। 15 থেকে 49 বছর বয়সের লোকসংখ্যা মোট জনসংখ্যার শতকরা 45 ভাগ। দেশে কর্মক্ষম মানুষের সংখ্যা কম।

(iii) পিরামিডের ওপরের দিকে সরু হয়ে গেছে অর্থাৎ বয়স্কদের জনসংখ্যা কম (মোট জনসংখ্যার 10 শতাংশ)।

(iv) দেশে শিশু ও অল্পবয়স্কের সংখ্যা বেশি হওয়ার অর্থ পরনির্ভর জনসংখ্যা বেশি। এর ফলে মাথাপিছু আয় কম; ফলে দেশের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বিনিয়োগ কম। মূলধন কম হওয়ার দরুন অর্থনৈতিক অবস্থা ভাল নয়।

বয়স পিরামিড চিত্র থেকে আমরা কোন দেশের অর্থনৈতিক দিক দিয়ে (i) সক্রিয় ও (ii) অ-কর্মী জনগোষ্ঠীর (non-owrking population) বয়সপুঞ্জের একটা সুন্দর রেখাচিত্র পাই, যা কিনা বয়স কাঠামো ও অর্থনৈতিক

সম্পর্কের চিত্রটিই তুলে ধরে। তবে আন্তঃরাষ্ট্র বা আন্তর্জাতিক স্তরে বয়স গ্রন্থনা সমাহারের তুলনা খুব একটা ফলপ্রসূ হয় না। ইদানীং জনসংখ্যা বিশেষজ্ঞরা বয়স পিরামিডের বিভিন্ন ব্যবহার করেছেন। অর্থনৈতিক দিক দিয়ে সক্রিয় ও অর্থনৈতিক দিক দিয় অকার্যকরী কোন জনগোষ্ঠীর একটি নির্দিষ্ট বয়সপুঞ্জের প্রকৃত ভোগ ও উৎপাদনের নমুনা বর্তমানে পিরামিডের মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়। এই ধরনের কোন একটি জনগোষ্ঠীর বয়স কাঠানো ও অর্থনৈতিক সম্পর্কের একটি সুন্দর রেখাচিত্র ফুটে ওঠে। এগুলোকে 'অর্থনৈতিক বয়স পিরামিড' (Economic Age Pyramid) -ও বলা হয়।

আগেকার আলোচনা জনমিতিন বিশ্লেষণে বয়স ও লিঙ্গ পিরামিডের গুরুত্বকে প্রকাশ করে। অবশ্য এতে কতকগুলো মারাত্মক অসুবিধের সম্মুখীন হতে হয়। বয়স ও লিঙ্গ পিরামিডের কোন স্থানিক (spatial) উপাদান নেই। যদি কেউ আন্তঃরাষ্ট্র বা আন্তর্জাতিক স্তরে বয়স গ্রন্থনার সমাহারের আঞ্চলিক বিশ্লেষণে উৎসাহী হন, তবে এক্ষেত্রে বয়স পিরামিড তার উপকারে খুব কমই আসবে।

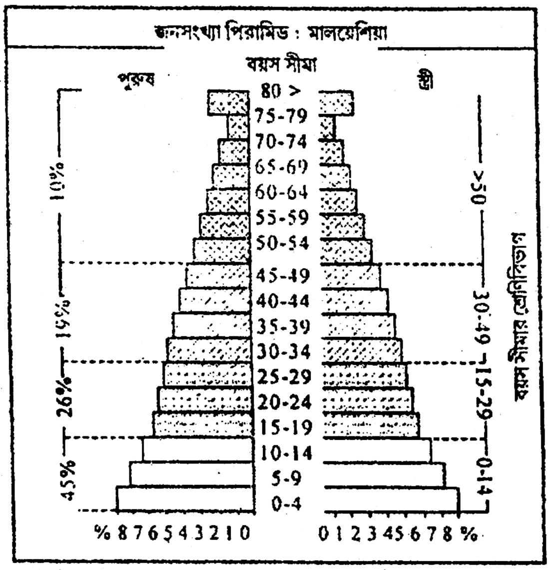

চিত্র 2.43 : জনসংখ্যা পিরামিড : মালয়েশিয়া

2.3.3 শ্রমশক্তি [Labour Force]

❑ শ্রমশক্তি (Labour Force) : কোন দেশের কর্মক্ষম জনসংখ্যার যে অংশ সক্রিয়ভাবে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত রয়েছে বা জাড়িত হতে ইচ্ছুক ঐ অংশকে দেশটির শ্রমশক্তি হিসাবে বিবেচনা করা যায়। শ্রমশক্তির এই ধারণা জাতিসংঘ কর্তৃক প্রদত্ত সংজ্ঞার সাথে সংগতিপূর্ণ বলা যায়। অধ্যাপক আগরওয়ালা (S..N. Agarwala) তাঁর India's Population এ শ্রমশক্তির সংজ্ঞা এভাবে দিয়েছেন ঃ "Labour force is defined to include persons who actually work for wages and salaries, own account workers, employers and unpaid family workers and also those who are unemployed but seeking work. If does not include persons employed in activities which are economically unproductive like rentires, pensioners, beggars and dependents." অর্থাৎ আগরওয়ালার মতে সে সব লোক মজুরি এবং বেতনের জন্য প্রকৃত পক্ষে কাজ করছে, স্বনিয়োজিত, নিয়োগকারী, অবৈতনিক পারিবারিক শ্রমি এবং যারা বেকার অথচ কাজ খুঁজছে খাজনা ভোগী, পেনশনভোগী, ভিক্ষুক এবং অন্যের ওপর নির্ভরশীল তারা শ্রমশক্তির অংশ নয়। জাতি-সংঘের **Multilingual Demographic Dictionary** অনুযায়ী শ্রমশক্তিকে দুই অর্থে নির্দেশ করা যায়—

(i) লাভজনক শ্রম ধারণা অনুযায়ী কর্মে নিয়োজিত জনসংখ্যা বলতে এমন সব ব্যক্তি বোঝায় যারা স্বাভাবিক অবস্থায় লাভজনক কোন পেশায় নিয়োজিত রয়েছে।

(ii) শ্রমশক্তি ধারণা অনুযায়ী, কমতরত জনশক্তি বলতে এমন সব ব্যক্তিবর্গ বোঝায় যার কোন লাভজনক পেশাতে নিয়োজিত রয়েছে অথবা কোন নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে এরূপ কোন কাজ পেতে ইচ্ছুক। ["For a statistical measurement of the working population, the gainful worker concept or the labour force concept my be used. According to this concept, the working population is defined as being composed of those persons who have a gainful occupation which they normally engage in according to the labour force concept, the working population is denifed as a group of persons who are working at a gainful occupation or wanting or seeking such work during a specified period preeceeding to the enquiry."—United Nations :

শ্রমশক্তি এবং এর সীমাবন্ধতা (Working Forceand its Determinates)

ভারতবর্ষের মত দেশগুলিতে কর্মরত এবং কর্মবিহীন জনসংখ্যার মধ্যে একটি প্রভেদ তৈরি হয়েছে। জনসংখ্যাকে অর্থনৈতিক দিক থেকে সক্রিয় এবং অসক্রিয় জনসংখ্যা এই দুইভাগে ভাগ করার পরিবর্তে ভারতীয় আদমসুমারী দপ্তর সমগ্র জনসংখ্যাকে শ্রমে কর্মরত এবং শ্রমবিহীন এই দুই অংশে বিভক্ত করেছে। শ্রম সম্বন্ধীয় ধারণা ভারতবর্ষে প্রথম প্রচলিত হয় 1961 সালে। ভারতের আদমশুমারি অনুযায়ী শারীরিক অথবা মানসিক দিক থেকে অর্থনৈতিক উৎপাদন চার্যে অংশগ্রহণ করা যে কোন ব্যক্তির প্রধান কার্য, যা শ্রমিক হিসাবে বিভাজিত হয়। এই ধরনেরকার্য শুধুমাত্র যথাযথ কার্য হিসেবে নিযুক্ত হয় না, দক্ষ তত্ত্বাবধান এবং নিদর্শন হিসাবেও বিবেচিত হয়। 1961 সালের শ্রবসম্বন্ধীয় ধারণার প্রথম ধাপ হতেই, ভারতবর্ষে শ্রমিকের সংজ্ঞা আদমসুমারিা কালে কালে পরিবর্তিত হয়েছে। 1961 সালে, যে কোন ব্যক্তি যে গড়ে দিনে শুধুমাত্র একঘণ্টার জন্য কাজ করত তার সময়কালানুযায়ী শ্রমিক হিসাবে বিবেচতি হয়। 1971 সালে যদি কোন ব্যক্তি তার সময়কালানুযায়ী সংখ্যাগণনার পূর্ববর্তী এক সপ্তাহে যে কোন একদিন কাজ করে, শ্রমিক

হিসাবে বিবেচিত হয় এবং অর্থনৈতিক উৎপাদন কার্যকে তার কার্যের প্রধান অবলম্বন ধরে। এইভাবে মানুষ প্রাথমিকভাবে গৃহকর্মের কার্যে নিযুক্ত হয়। ছাত্ররা পড়ার কার্যে এবং যারা উৎপাদন কার্যে অংশগ্রহণ ছাড়াই অর্থ উপার্জন করে তাদের শ্রমবিহীন মানুষ বলা হয়।

1961 এবং 1971 সালের আদমশুমারির ফলাফলকে পর্যালোচনা করলে, 1981 সালের আদমশুমারির লেখাচিত্র সম্বন্ধে একটি সম্ভাব্য ধারণা পাওয়া যায়। 1981 সালের আদমসুমারি অনুযায়ী প্রধান শ্রমিক এবং প্রান্তিক শ্রমিকের মধ্যে একটি পার্থক্য করা হয়। কৃষিক্ষেত্রে যারা 6 মাস বা তার বেশি সময় ধরে অর্থনৈতিকভাবে সক্রিয় থাকে তারাই প্রধান শ্রমিক হিসাবে গণ্য হয়। অপরদিকে, প্রধান শ্রমিক বলতে তাদেরকে বোঝায় যারা বছরের বেশির ভাগ সময়ই পারিশ্রমিকের বিনিময়ে কাজ করে। বিপরীতপক্ষে প্রান্তিক শ্রমিক হল তারাই যারা বছরের বেশিরভাগ সময় কাজ না করলেও বছরের কোন কোন সময়ে মজুরির বিনিময়ে কাজ করে। এইরূপে 1981 সালের আদমশুমারি অনুযায়ী, সর্বপ্রথমে সমগ্র জনসংখ্যাকে শ্রমিক ও শ্রমবিহীন জনসংখ্যায় ভাগ করা হয়। শ্রমিক হল তারা যারা গত বছরে বছরের বিভিন্ন সময়ে কাজ করেছে এবং শ্রমবিহীন জনসংখ্যা হল তারা যারা কোন কাজ করে না। শ্রমিকদের দুভাগে ভাগ করা হয় প্রধান শ্রমিক এবং প্রান্তিক শ্রমিক। লিঙ্গের ভিত্তিতে দেখতে গেলে ভারতের শ্রমশক্তিকে শতাংশের হিসেবে দুভাগে ভাগ করা হয় পুরুষ শ্রমশক্তি ও নারী শ্রমশক্তি।

শ্রমশক্তির আয়তন নির্ভর করে জনমিতিক, সামাজিক এবং অর্থনৈতিক নির্ভরতার উপর। সাধারণত এটি হল সমষ্টিগত জনসংখ্যার ধারণা, কিন্তু বয়স গঠন এবং জ্যামিতিক বিন্যাস উভয়ের গুরুত্বপূর্ণ নির্ধারক। জনমিতিকভাবে জন্মহার, বয়সগঠন, বয়সসীমা, পরিব্রাজনের চরিত্র এবং পরিবারের গড় আয়তন এগুলি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এছাড়াও বহুবিধ অন্যান্য সামাজিক ও অর্থনৈতিক কারণসমূহ শ্রমশক্তির প্রবণতাকে প্রভাহিত করে। সামাজিকভাবে, স্বাক্ষরতা এবং শিক্ষার স্তর, সমাজে নারীর স্থান এবং বিয়ের বয়সসীমা এবং সাধারণ স্বাস্থ্যের মান তাৎপর্যপূর্ণ অর্থনৈতিকভাবে অর্থনৈতিক ধরন, কর্মের সুযোগ এবং আয়স্তরও গুরুত্বপূর্ণ।

জনমিতির বিভিন্ন কারণের মধ্যে যে সমস্ত জনমিতিক কারণগুলি একটি অঞ্চলে শ্রমশক্তিকে নির্ধারণ করে এদের মধ্যে জন্মহার, ফলপ্রসূ বয়সের গঠন গুরুত্বপূর্ণ। অনুন্নত দেশের উন্নয়নশীল যুবসম্প্রদায়ের মধ্যে শ্রমশক্তির পরিমাণ কম কারণ তাদের জনসংক্যার বেশিরভাগই শিশুশ্রমিক যারা কার্যত কর্মহীন। তুলনামূলকভাবে, উন্নত দেশগুলির জনসংখ্যা কম কারণ তাদের জনবৃদ্ধির হারও কম, বয়স্ক জনসংখ্যা কম যদিও কর্মক্ষর্ম জনসংখ্যা তুলনামূলকভাবে বেশি।

জীবনের স্থায়িত্ব নির্ভর করে গুরুত্বপূর্ণ শ্রমশক্তির আয়তন নির্ধারকের ওপর। যে সকল দেশে গড় মৃত্যুহার বেশি, সেই সকল দেশে কর্মক্ষম জনসংখ্যা তুলনামূলকভাবে বেশি এবং সেইজন্য কর্মক্ষমত শ্রমশক্তির প্রবণতাও এখানে খুব বেশি অন্যান্য সমাজের তুলনায় যেখানে জীবনের মেয়াদ খুব কম এবং যেখানে বেশির ভাগ শ্রমিকই মৃত্যুবরণ করে তাদের কর্মক্ষম বয়সসীমার। শ্রমিকদের পরিব্রাজন বা মূলত বয়সের ওপর নির্ভর করে, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রেও সমান গুরুত্বপূর্ণ।

পরিবারের গড় আয়তন অর্থনৈতিক কার্যে অংশগ্রহণকে প্রভাবিত করে। Clark (1972), ক্ষুদ্র আয়তনের পরিবার বহু নারী শ্রমিকের জন্ম দেয় এবং সমাজে শ্রমিকের সংখ্যা বৃদ্ধি করে যেটা নারী শ্রমের ক্ষেত্রে কোন সমাজেই কার্যকরী হয় না, যদিও নারী শ্রমের যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে। এটাই দেশের সমাজের সত্য। বিপরীতভাবে, স্বল্পোন্নত দেশের সমাজে যেখানে অর্থনৈতিক সচ্চলতা নেই এবং যার ফলে বড় আয়তনের পরিবার দেখা যায়

সেখানে পরিবারে প্রত্যেকটি সদস্যকে অর্থনৈতিক সংঘর্ষে লিপ্ত হতে হয়। ফলস্বরূপ এই সব দেশে কর্মক্ষেত্রে বাড়তি জনসংখ্যা দেখা যায়।

সাক্ষরতা এবং শিক্ষার স্তর তাৎপর্যপূর্ণভাবে প্রভাবিত করে কর্মক্ষেত্রে অংশগ্রহণের পরিমাণকে শিক্ষা এবং কর্মে অংশগ্রহণকারীর মধ্যে একটি বিপরীত সম্পর্ক হয়েছে। যে সমাজে শিক্ষিতের হার বেশি সেখানে শ্রম প্রদর্শনের স্বল্পতা দেখা যায় কারণ শিক্ষাগত যোগ্যতা অর্জন করতে মানুষের বেশি সময় লাগে ফলে কর্মক্ষেত্রে যোগদানে দেরি হয়। তাই চিরন্তন শিক্ষিত সমাজে কর্মক্ষেত্রে অংশগ্রহণের পরিমাণ কম অন্যান্য সমাজ ব্যবস্থার তুলনায়।

ঘরের চার দেওয়ালের বাইরে সমাজে নারীর স্থান এবং মহিলাদের কর্মক্ষেত্রে অংশগ্রহণের সম্মতি বা অসম্মতি হল অংস একটি সামাজিক কারণ শ্রমশক্তির প্রবণতা নির্ধারণের ক্ষেত্রে নারীর কর্মক্ষেত্রে অংশগ্রহণ সমাজে একটি ছোট ভূমিকা পালন করে যেখানে নারী-পুরুষের সমমর্যাদা প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু সেই সমাজে নারীপুরুষের বিস্তর পার্থক্য রয়েছে, এই কারণও এখানে গুরুত্বপূর্ণ। ফলস্বরূপ, যে সমাজে মহিলাদের কর্মক্ষেত্রে যোগদান এবং স্বাধীনতা বিষয়ে গোঁড়ামি রয়েছে। সেখানে কর্মক্ষম মহিলাদের কর্মক্ষেত্রে অংশগ্রহণের মাত্রা কম, কারণ কর্মক্ষম জনসংখ্যার অর্ধেক অংশ দখল করে রয়েছে মহিলারা।

কার্যে অংশগ্রহণ করার ঘটনা একান্তভাবেই বিবাহের বয়সকে প্রভাবিত করে। যে সকল সমাজে বিবাহকার্য শীঘ্র সম্পাদিত হয়, সেই সকল সমাজে অন্যান্য উপাদান সমান হলেও শ্রমিকের অনুপাত তুলনামূলকভাবে বেশি হয়। এর কারণ হিসাবে বলা যায় যে পারিবারিক দায়িত্ববোধ যা কিনা একটি চাপ সৃষ্টি করে অল্প বয়সেই অর্থনৈতিক দিক থেকে সাহায্যকারী কার্যে নিযুক্ত হওয়ার জন্য। যাই হোক, এটা মহিলাদের চাইতে পুরুষদের ক্ষেত্রেই বেশি প্রযোজ্য হয়। সাধারণ স্বাস্থ্যের মান শ্রমশক্তির বিস্তৃতিকেও কিছু কিছু ক্ষেত্রে প্রভাবিত করে যা কিনা জনসংখ্যার জীবনীশক্তির সূচক। সাধারণভাবে একটি রাষ্ট্রের উন্নত স্বাস্থ্যাবস্থা কর্মে উচ্চ পরিমাণে অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা প্রদর্শিত করে।

শ্রমশক্তির আয়তনের অর্থনৈতিক নির্ধারকদের মধ্যে কেটি অচলের অর্থনৈতির ধরন তাৎপর্যপূর্ণ। শিল্প সমাজে কার্যপ্রকৃতির প্রাপ্যতা এবং কৃষিক্ষেত্রে সহজলভ্যতার মধ্যে বিস্তর পার্থক্য রয়েছে। শিল্পকারখানাগুলির নিজের দক্ষতা এবং শিক্ষায় যে দাবী থাকে তা শ্রমশক্তির কার্যে অংশগ্রহণকে বিলম্বিত করে এবং যার ফলশ্বরূপ এই ধরনের অর্থনীতিতে শ্রমশক্তির আয়তন বিপর্যয়ে ভোগে। তুলনামূলকভাবে কৃষি অর্থনীতিকে কার্যের প্রকৃতি নির্দিষ্টভাবে স্বল্পোন্নত পরিধিযুক্ত হয় এবং এই ধরনের শিক্ষা কার্যক্ষেত্রে কম মূল্যবান হয়। এইক্ষেত্রে ব্যক্তি তার পারিবারিক দাবি অনুযায়ী যত শীঘ্র সম্ভব কার্যে অংশগ্রহণ করতে থাকে।

দ্বিতীয়ত কর্মের সুযোগের সহজলক্ষ্যতা ও কোন অঞ্চলের শ্রমশক্তির আয়তন নির্ধারক হিসাবে প্রভাব বিস্তার করে। যদি কর্মের সুযোগের সহজলক্ষ্যতা পর্যাপ্ত হয় তহলে সমগ্র মনুষ্যশক্তি কাজে অংশগ্রহণ করত এবং যদি তা না হত তাহলে যারা অর্থনৈতিক কার্যে অংশগ্রহণ করতে ইচ্ছুক তারাও কাজ পেত না।

পরিশেষে আয়ের সাধারণ স্তর যার প্রকাশ অর্থনৈতিক বাধ্যবাধকতার মধ্যে দিয়ে, নির্ধারণ করতে পারিশ্রমিকের সংখ্যাকে, অর্থনৈতিক বাধ্যবাধকতার জন্য অর্থনৈতিক সংঘর্ষে অংশগ্রহণ যা অর্থনৈতিক দিক থেকে অসচ্ছল সমাজ ব্যবস্থার দেখা যায়, যেখানে পরিবার নারী-পুরুষ, ছোট-বড় সকলে অর্থনৈতিক সংঘর্ষে লিপ্ত হতে বাধ্য হয়। অপরদিকে উন্নত সমাজে পরিবারে প্রত্যেকে কখনই অর্থনৈতিক কাজকর্মে লিপ্ত হতে বাধ্য হতে হয় না।

নিজের সারণীতে ভারত এবং তার রাজ্য/ কেন্দ্রশাশিত অঞ্চলগুলিতে কর্মে অংশগ্রহণকারী জনতার শতকরা হার দেখানো হয়েছে। এতে দেখা যাচ্ছে ভারতে জাতীয় গড় হল 39.1 (2001 সাল)। আমরা দেখছি ভারতের বেশ কয়েকটি রাজ্য এমনকি পশ্চিমবঙ্গ জাতীয় গড়ের চেয়ে পেছনে রয়েছে।

আবার ধর্মীয় ভিত্তিক কর্মে অংশগ্রহণের চিত্রটা যদি দেখি তবে দেখব জৈন পুরুষরা সবচেয়ে বেশি কর্মে নিয়োজিত। এর পরের স্থান হল যথাক্রমে শিখ, হিন্দু, খ্রিস্টান, বৌধ ইত্যাদি। আবার কর্মে অংশগ্রহণকারীদের অংশ থেকে দেখতে পাচ্ছি খ্রিস্টান মহিলারা সবচেয়ে এগিয়ে আছেন। এর পরের স্থান যথাক্রমে হিন্দু, শিখ ইত্যাদি সম্প্রদায়ের।

উন্নত এবং অনুন্নত দেশের মধ্যে কর্মহারের পার্থক্য (Differences in the activity rates between developed and underveloped countries) : কর্মক্ষম জনসংখ্যা বলতে মোট জনসংখ্যার ঐ অংশ বোঝায় যারা বিভিন্ন অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে। সাধারণ জনসংখ্যার পুরুষ 15-51 অথবা 15-64 বছর বয়সী অংশকে কর্মক্ষম জনসমষ্টি হিসাবে বিবেচনা করা হয়। এই জনসমষ্টি পুরুষ এবং মহিলা এই উভয়শ্রেণীর ক্ষেত্রে প্রযোজন্য বলা হয়। এসব ধারণার আলোক উন্নত এবং অনুন্নত দেশে কর্মহারের মধ্যে নিম্নোক্ত পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়।

- উন্নত দেশে মোট জনসংখ্যায় কর্মঠ জনগোষ্ঠী যথেষ্ট পরিলক্ষিত হয়। কারণ এসব দেশে 15-64 বছর বয়সী সুস্থ এবং কর্মক্ষম লোকসংখ্যা বেশি পরিলক্ষিত হয়। অপরপক্ষে বেশিরভাগ উন্নয়নশীল দেশে কর্মঠ জনগোষ্ঠীর এক উল্লেখযোগ্য অংশ হল শিশু শ্রমিক।
- উন্নত দেশগুলিতে কর্মক্ষম জনগোষ্ঠীর সিংহভাগকে বিভিন্ন অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে সরাসরি লিপ্ত থাকতে দেখা যায়। তবে এসব দেশে প্রৌঢ় এবং বৃধ্ব বয়সী কর্মঠ জনগোষ্ঠীর হার অনুন্নত দেশের তুলনায় কম পরিলক্ষিত হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় অনুন্নত দেশগুলিতে 55-65 বয়সী পুরুষের শ্রমে অংশগ্রহণের হার যথেষ্ট পরিলক্ষিত হয়। দারিদ্রতা, পরিবারের আর্থিক অসচ্ছলতা এবং অন্যের ওপর নির্ভরশীল না হওয়ার তাগিদে অনেকটা বাধ্য হয়ে এই বয়সী লোকেরাও কর্মে লিপ্ত থাকে। উন্নত দেশগুলিকে যুবক বয়সে উপার্জিত আয় যথেষ্ট বলে সঞ্চয় বেশি থাকায় উপরোক্ত বয়সী পুরুষদের মধ্যে বেশির ভাগ অবসার জীবনে যাপনে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে। যেমন থাইল্যান্ডে 60-70 বয়সী লোকের শ্রমে অংশগ্রহণের হার 44.6% হলেও সুইডেনে এই হার 2.5% মাত্র।
- অনুনত দেশে অর্থনৈতিক কারণে জনসংখ্যার শিশু এবং কিশোরেরা বিভিন্ন ধরনের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে জড়িত হতে বাধ্য হয়। কিন্তু উন্নত দেশে বাধ্যতামূলক শিক্ষা এবং শ্রম আইনের কড়াকড়ির দরুণ এই বয়সীশ্রম জনসংখ্যা খুবই কম পরিলক্ষিত হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় থাইল্যান্ডে 15 বছরের কম শিশুদের শ্রমে অংশগ্রহণের হার 43.7% পরিলক্ষিত হয়। অথচ যুক্তরাজ্য ও জাপানে এই শ্রেণীর শ্রমের অংশগ্রহণের হার শূন্য।

$$\text{অশোধিত কর্মহার} = \frac{L}{P} \times 100$$

যেখানে $L =$ মোট শ্রমশক্তি

$P =$ মোট জনসংখ্যা।

অশোধিত কর্মহার আবার পুরুষ এবং মহিলাদের বেলায় বের করা সম্ভব। যেমন মহিলা শ্রমশক্তিকে মোট মহিলা জনসংখ্যা দ্বারা ভাগ করলে মহিলা অশোধিত কর্মহার পাওয়া যায় ঃ

$$\text{অশোধিত মহিলা কর্মহার} = \frac{L_L}{P_L} \times 100$$

যেখানে F_L = মহিলা জনশক্তি

P_L = মোট মহিলা জনসংখ্যা।

অন্যদিকে পুরুষ শ্রমশক্তিকে মোট পুরুষের সংখ্যা দ্বারা ভাগ করলে পুরুষ-অশোধিত কর্মহার নির্ণয় করা যায় :

$$\text{অশোধিত পুরুষ কর্মহার} = \frac{M_L}{P_M} \times 100$$

যেখানে M_L= পুরুষ জনশক্তি

P_M = মোট পুরুষ জনসংখ্যা।

উদাহরণ হিসেবে বলা যায় 1981 সালের আদমশুমারি অনুযায়ী বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যা ছিল 89.9 মিলিয়ন। এর মধ্যে বেসামরিক শ্রমশক্তি ছিল 25.9 মিনিয়ন। সুতরাং 1981 সালে এদেশে স্থূল/অশোধিত শ্রমের অংশগ্রহণের হার/অশোধিত কর্মহার ছিল নিম্নরূপ ঃ-

$$\textbf{স্থূল কর্মহার } (1981) = \frac{25.9}{89.9} \times 100 = 28.8$$

বয়ঃক্রমিক কর্মহার (Age Specific activity rate) :

কোন নির্দিষ্ট বয়ঃগোষ্ঠীর মোট জনসংখ্যার মধ্যে যে সংখ্যক লোক কর্মে নিয়োজিত থাকে তার অনুপাত অথবা শতকরা অংশক বয়ঃক্রমিক কর্মহার বলা যায়। সূত্রের সাহায্যে এটি নিম্নোক্তভাবে প্রকাশ করা যায় :

$$\textbf{বয়ঃক্রমিক কর্মহার} = \frac{\text{নির্দিষ্ট বয়ঃগোষ্ঠীর কর্মে নিযুক্ত শ্রমশক্তি}}{\text{ঐ বয়গোষ্ঠীর মোর জনসংখ্যা} \times 100}$$

বয়ঃক্রমিক কর্মহার পুরুষ এবং মহিলা এই উভয় শ্রেণির বেলায় বের করা সম্ভব। যেমন 20-25 বছর বয়ঃনির্দিষ্ট পুরুষ কর্মহার নিম্নোক্ত ভাবে বের করা সম্ভব।

$$\textbf{বয়ঃক্রমিক পুরুষ কর্মহার} = \frac{\text{20-25 বছর বয়সী কর্মে নিযুক্ত পুরুষের সংখ্যা}}{\text{20-25 বয়ঃগোষ্ঠীর মোট পুরুষ সংখ্যা}} \times 100$$

অনুপভাবে বয়ঃক্রমিক মহিলা কর্মহার নিম্নোক্ত উপায়ে নির্ধারণ করা যায় ঃ

$$\textbf{বয়ঃক্রমিক পুরুষ কর্মহার} = \frac{\text{20-25 বছর বয়সী কর্মে নিযুক্ত মহিলার সংখ্যা}}{\text{20-25 বয়ঃগোষ্ঠীর মোট পুরুষ সংখ্যা}} \times 100$$

উদাহরণ হিসাবে ধরা যাক কোন দেশে 20-25 বয়সী কর্মে নিযুক্ত জনসংখ্যা 2 মিলিয়ন এবং মোট জনসংখ্যা 20 মিনিয়ন। এক্ষেত্রে বয়ঃনির্দিষ্ট কর্মহার হবে নিম্নরূপ ঃ

বয়ঃনির্দিষ্ট কর্মহার $= \frac{2}{20} \times 100 = 10\%$ অর্থাৎ 20-25 বছর বয়সী মোট জনসংখ্যার 10% কর্মে নিয়োজিত হয়েছে।

সারণি :

2001-এ ক্রমসংখ্যা	রাজ্য/কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল	অংশগ্রহণের হার		1991-এ ক্রম
		2001	1991	
	ভারত	39.1	37.5	
1.	মিজোরাম	52.6	48.9	2
2.	দাদরা ও নগর হাভেলী	51.8	53.9	1
3.	হিমালচলপ্রদেশ	49.2	42.8	8
4.	সিকিম	48.6	41.5	13
5.	ছত্তিশগড়	46.5	47.7	3
6.	দমন ও দিউ	46.0	37.6	18
7.	অন্ধ্রপ্রদেশ	45.8	45.1	5
8.	তামিলনাড়ু	44.7	43.3	6
9.	কর্ণাটক	44.5	43.0	12
10.	অরুণাচল	44.0	46.2	4
11.	মণিপুর	43.6	42.9	11
12.	মধ্যপ্রদেশ	42.7	41.1	14
13.	নাগাল্যান্ড	42.6	42.7	9
14.	মহারাষ্ট্র	42.5	43.0	7
15.	রাজস্থান	41.1	38.9	17
16.	গুজরাত	41.9	40.2	15
17.	মেঘালয়	41.8	42.7	10
18.	হরিয়ানা	39.6	31.0	31
19.	উড়িষ্যা	38.8	37.5	19
20.	গোয়া	38.8	35.3	22
21.	আন্দামান এবং নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ	38.3	35.2	23
22.	চন্ডিগড় *	37.8	34.9	24
23.	পাঞ্জাব	37.5	30.9	32
24.	ঝাড়খন্ড	27.5	36.8	20
25.	জম্মু এবং কাশ্মীর	37.0	N.A	–
26.	উত্তরাঞ্চল	36.9	39.9	16

1. জম্মু ও কাশ্মীরের 1991-র তথ্য নেই।
2 মণিপুরের সেনাপতির জেলারও Paomata, Mao, Maram Puru মহকুমার 2001-র তথ্য নেই।
Source : Census of India 2001, Primary Census Abstract, Total Polulation Tables A-5 (2004), p.ix.

27.	পশ্চিমবঙ্গ	36.8	32.2	26
28.	ত্রিপুরা	36.2	31.1	30
29.	আসাম	35.8	36.1	21
30.	পণ্ডিচেরী	35.2	33.1	25
31.	বিহার	37.7	30.6	33
32.	দিল্লি	32.8	31.6	28
33.	উত্তরপ্রদেশ	32.5	31.8	27
34.	কেরালা	32.3	31.4	29
35.	লাক্ষাদ্বীপ	25.3	26.4	34

Multilingual Demographic Dictionary-র মতে অর্থনৈতিক ভাবে কর্মঠ জনগোষ্ঠীর ধারণা (Concept of Economically Active Population) : কোন দেশের প্রত্যেক ব্যক্তিই দ্রব্য ও সেবা ভোগ করে। কিন্তু মোট জনসংখ্যার একটি অংশমাত্র দ্রব্য ও সেবা উৎপাদনে নিয়োজিত হয়। সুতরাং অর্থনৈতিকভাবে কর্মঠ জনগোষ্ঠী বলতে জনসংখ্যার ঐ অংশ বোঝায় যারা অর্থনৈতিক দ্রব্য ও সেবা উৎপাদনে প্রকৃতপক্ষে নিয়োজিত থাকে অথবা নিয়োজিত থাকতে সচেষ্ট হয়। একে অনেক সময় কার্যরত জনশক্তি বলেও অভিহিত করা হয়। জনবিজ্ঞানী E.G Stockwell কর্মঠ জনগোষ্ঠীর সংজ্ঞা এভাবে দিয়েছেন ঃ "The economically active (sometimes also called the working force) is that part of the manpower which actually engages, or attempts to engage in the production of economic goods and service." জাতিসংঘের মতে নৌসামরিক এবং সামরিক কর্মে নিযুক্ত উভয় শ্রেণীর লোক কর্মঠ জনগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত বলা যায়।

কোনো নির্দিষ্ট সময়ে একজন কর্মঠ/কর্মক্ষণ লোক প্রকৃতপক্ষে নিয়োজিত অথবা বেকার থাকতে পারে। নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গ বলতে পারিবারির শ্রমিক এবং যারা অপরাপর অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে লিপ্ত আছে তাদেরকে বোঝায়। এক্ষেত্রে কোন ব্যক্তি কোন কারণে সাময়িকভাবে কাজ থেকে বিরত থাকলেও তাকে নিয়োজিত বলে ধরতে হবে বলে জাতিসংঘের Principles and Recommendations for the 1970 Population Censuses পুস্তিকায় অভিমত করা হয়েছে। অন্যদিকে বেকার বলতে তাদেরকে বোঝানো হয় যারা নির্দিষ্ট সময় সীমায় কাজে জড়িত নয় অথচ মজুরী অথবা মুনাফা অর্জনের জন্য খুঁজছে।

জাতিসংঘের মতে অর্থনৈতিকভাবে কর্মঠ জনগোষ্ঠীকে আবার শ্রমশক্তি এবং লাভজনক শ্রম ধারণের (:anpir force and gainful worker concept) ভিত্তিতে নির্দেশ করা সম্ভব। এই ধারণা অনুযায়ী কর্মঠ জনগোষ্ঠী বলতে ঐসব ব্যক্তিবর্গ বোঝায় যারা কোন কাজ থেকে কিছু আর্থিক উপার্জন অথবা মুনাফা অর্জন করে অথবা তা অর্জনের জন্য চেষ্টা চালায়।

স্থূল/অশোধিত অংশগ্রহণের হার বলতে মোট জনসংখ্যার মধ্যে শতকরা কত অংশ শ্রমশক্তির রয়েছে তা বোঝায়। অর্থাৎ মোট শ্রমশক্তিকে মোট জনসংখ্যা দ্বারা ভাগ করলে শ্রমের অশোধিত/স্থূল অংশগ্রহণের হার পাওয়া যায়। এই হার মোট পুরুষ এবং মহিলা এই তিনি ধরনের শ্রমশক্তির বেলায় নির্ণয় করা সম্ভব এর সূত্র নিম্নরূপ ঃ

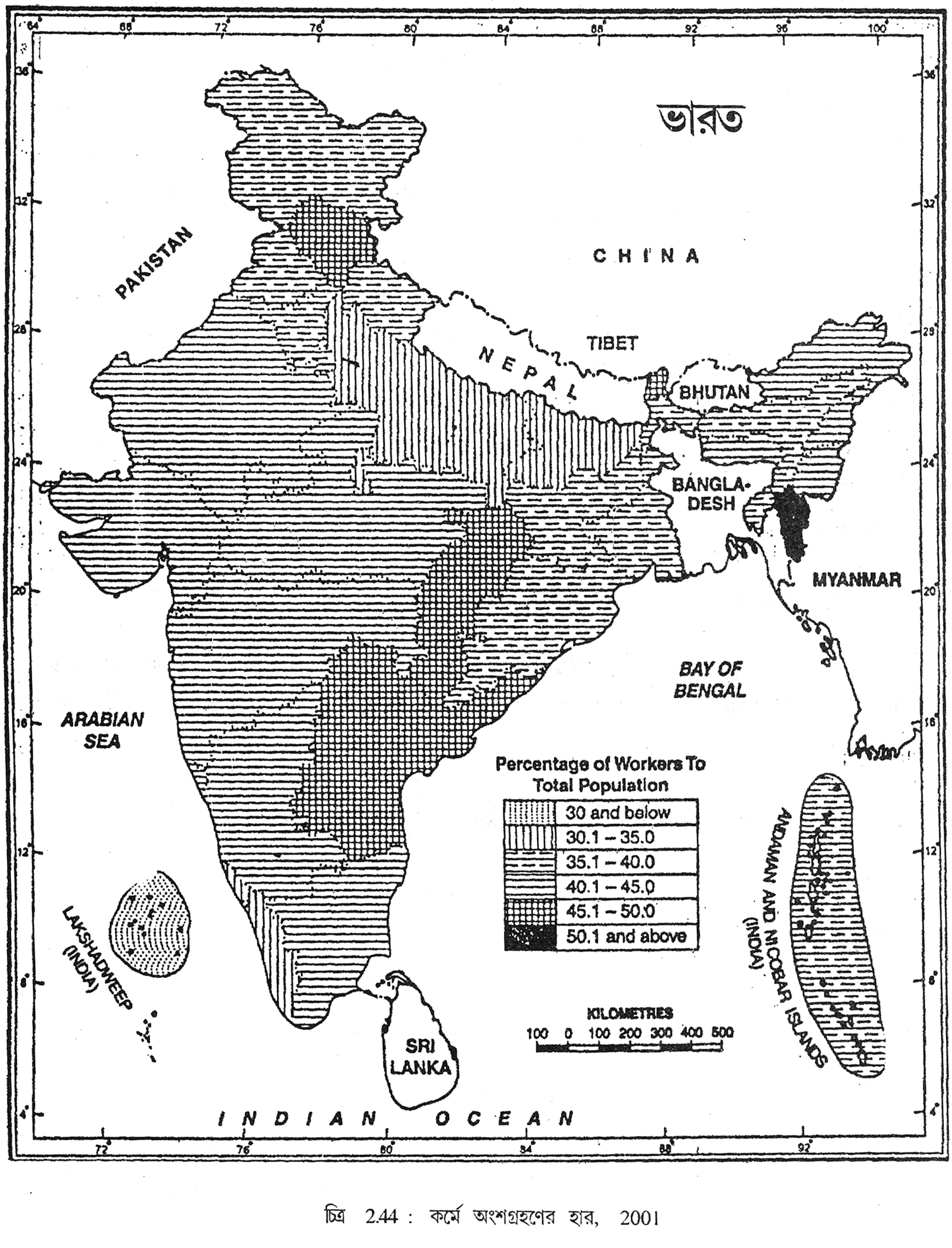

চিত্র 2.44 : কর্মে অংশগ্রহণের হার, 2001

$$\text{স্থূল মোট শ্রমশক্তি অংশগ্রহণের হার} = \frac{\text{মোট শ্রমশক্তি}}{\text{মোট জনসংখ্যা}} \times 100$$

$$\text{স্থূল পুরুষ শ্রমশক্তি অংশগ্রহণের হার} = = \frac{\text{মোট পুরুষ শক্তি}}{\text{মোট পুরুষ জনসংখ্যা}} \times 100$$

$$\text{লূল মহিলা শ্রমশক্তি অংসগ্রহণের হার} = \frac{\text{মোট মহিলা শক্তি}}{\text{মোট মহিলা জনসংখ্যা}} \times 100$$

উদাহরণ ঃ (1) বাংলাদেশের 1981 সালের আদমশুমারী অনুযায়ী মোট জনসংখ্যা ছিল 89.9 মিলিয়ন। এর মধ্যে বেসাময়িক শ্রমশক্তি ছিল 25.9 মিলিয়ন। সুতরাং 1981 সালে এদেশে স্থূল/অশোধিত শ্রমের অংশগ্রহণের হার ছিল নিম্নরূপ ঃ

$$\text{স্থূল শ্রমের অংশগ্রহণের হার (1986)} = \frac{25.9}{89.9} \times 100 = 28.8$$

উদাহরণ ঃ (2) 1984-85 সালের শ্রমশক্তি জরিপ অনুযায়ী বাংলাদেশে 10 বছর এবং তদূর্ধ্ব বয়সী মহিলাদের সংখ্যা ছিল 32.39 মিলিয়ন। এর মধ্যে বেসামরিক মহিলা শ্রমশক্তি ছিল 2.7 মিলিয়ন। এক্ষেত্রে মহিলা শ্রমশক্তির স্থূল অংশগ্রহণের হার হবে নিম্নরূপ ঃ

$$\text{স্থূল মহিলা শ্রমশক্তির অংশগ্রহণের হার (1984-85)} = \frac{2.7}{32.9} \times 100 = 8.3$$

2.3.4 সামাজিক সমস্যা [Social Problems]

❑ সামাজিক সমস্যা ঃ সংজ্ঞা

সামাজিক সমস্যার সংজ্ঞা দিতে গিয়ে ওয়াল্‌শ্‌ এবং ফুরে বলেছেন যে এটি হল সামাজিক আদর্শ থেকে বিচ্যুতি এবং গোষ্ঠীগত প্রচেষ্টার দ্বারা যার প্রতিকার সম্ভব। এই সংজ্ঞা থেকে দুটি জিনিষ লক্ষনীয় ঃ (এক) এটি এমন একটি অবস্থার অস্তিত্ব যা আদর্শর থেকে বিচ্যুত অর্থাৎ যা অনাকাঙ্ক্ষিত বা অস্বাভাবিক, এবং (দুই) যৌথ প্রচেষ্টার দ্বারা এই অবস্থার প্রতিকার সম্ভব। যে অবস্থায় গোষ্ঠীগত সম্পর্কের পরিপ্রেক্ষিতে মানবীয় আচরণ অবাঞ্ছিত বলে প্রতিপন্ন হয় অথবা যে অবস্থায় সাধারণ স্বার্থরক্ষা ও মঙ্গল বিধান করা এবং জনজীবনে শৃঙ্খলা রক্ষা করা কঠিন হয়ে পড়ে, সে অবস্থাকে সামাজিক সমস্যা বলে। দারিদ্র্য, বেকারি, উগ্রস্থন্থা, মাদকাসক্তি ইত্যাদি সমস্যা ব্যক্তিগত স্তরে সীমাবধ্ব না থেকে বৃহত্তর জনজীবনকে প্রভাবিত করে।

ইরান এবং জি. জে. সেল্‌জ্‌নিক-এর মতে সামাজিক সমস্যা হল মানবীয় সম্পর্কের ক্ষেত্রে সমস্যা যা সমাজকে বিপন্ন করে অথবা বহু মানুষের গুরুত্বপূর্ণ আশা-আকাঙ্ক্ষা ধূলিসাৎ হয়। উপরোক্ত লেখকদ্বয় আরও বলেছেন যে, A social problem exists when organized society's ability to order relationships among people seems to be failing] when its institutions are faltering its laws are being flouted, the transmission of its values from generations to the next is breaking down, the framework of expectations is being shaken."

নিসবেট এবং মার্টন সামাজিক সমস্যা সম্পর্কে বলেছেন, "They are social in the sense that they pertain to human relationship and to the normative contexts to which all human relationships exist. They are problems in the sense that they represent interruptions in the expected or desired scheme of things; violation of the right ro the proepr, as a society defines these qualities; dislocation in the social patterns and relationships that a society cherishes."

মার্টন সামাজিক সমস্যাকে দু'ভাগে ভাগ করেছেন—সামাজিক অসংগঠন এবং বিচ্যুতিমূলক আচরণ। সামাজিক অসংগঠন (Social disorganisation) যেখানে সামাজিক সমস্যার সামাজিক স্তরটিকে নির্দেশ করে। বিচ্যুতিমূলক আচরণ (deviant behaviour) সামাজিক সমস্যার ব্যক্তিগত স্তরটিকে নির্দেশ করে।

হটন ও লেসলির মতে সামাজিক সমস্যা হল এমন একটি অবস্থা যা অবাঞ্ছিত ভাবে যথেষ্ট সংখ্যক ব্যক্তির জীবনকে প্রবাবান্বিত করে এবং যে ব্যাপারে সম্মিলিত সামাজিক প্রচেষ্টা দ্বারা কিছুটা সমাধান করা হয়।

পরবর্তী অনুচ্ছেদগুলোতে আমরা আজকের ভারতের কিছু জ্বলন্ত সামাজিক সমস্যা নিয়ে আলোচনা করব।

2.3.4.1 দারিদ্র (Poverty)

দারিদ্র হল এমন বিষয় যা কোনও ব্যক্তির জীবন ধারণের জন্য খাদ্য, বস্ত্র, শিক্ষা, আশ্রয় ও স্বাস্থ্যের মত ন্যূনতম প্রয়োজনীয় উপকরণসমূহকে সংগ্রহের ক্ষেত্রে অক্ষম করে রাখে এবং ব্যক্তির অন্তর্নিহিত সম্ভাবনাগুলিকে পূর্ণতা দানে বাধা দেয়। সমাজতাত্ত্বিক গিলিন ও গিলিন দারিদ্রের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেন, যাদের জীবনযাত্রার মান সমাজ নির্ধারিত জীবনযাত্রার মানের চেয়ে নিম্নস্তরে, তাঁরাই দারিদ্র। সেই কারণে তারা সমাজ জীবনে তাদের মানসিক ও দৈহিক নৈপুণ্য প্রমাণ করতে অক্ষম। এই অবস্থাকেই দারিদ্র বলে।

অধ্যাপক রাম আহুজার মতে, এক জনের যা আছে এবং একজনের যা থাকা উচিত—এই দুইয়ের মধ্যেকার বিরোধের অনুভূতি যে অবস্থা সৃষ্টি করে, তাকেই দারিদ্র বলে। অধ্যাপক গিল বলেছেন, "Because it is poor, the country does not develop, because it does not develop, it remains poor." সামাজতাত্ত্বিক হ্যারিংটন বঞ্চনার প্রেক্ষাপটে বঞ্চনার দারিদ্রকে সংজ্ঞায়িত করেছেন। তাঁর মতে, খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা প্রভৃতির ন্যূনতম মান থেকে বঞ্চনাই হল দারিদ্র। দারিদ্রের সামাজিক ধারণা সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে সমাজতাত্ত্বিক থমাস গ্লাডউইন অসাম্যকেই বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন। তাঁর মতে, দারিদ্র পরিস্থিতি হল এক বিষচক্র।

অর্থনৈতিক দৃষ্টিতে দারিদ্র্য বলতে সেই অবস্থাকে বোঝায়, যাতে কোন দেশের মাথা পিছু আয় এত কম যে সাধারণ মানুষ তাদের মৌলিক চাহিদা পূরণে অক্ষম হয় এবং মানবেতন জীবন যাপনে বাধ্য হয়। দারিদ্র ও দুর্ভিক্ষের কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে অধ্যাপক অমর্ত্য সেন অসম্পূর্ণ ভূমি সংস্কার, ব্যাপক নিরক্ষরতা, স্বাস্থ্য পরিষেবার অপ্রতুলতা, নারীদের ক্ষমতাহীনতা প্রভৃতিকে দারিদ্র্যের সূচক হিসাবে চিহ্নিত করেছেন।

ভয়েসেস অব দ্য পুয়োর (Voices of the Poor) নামে বিশ্ব ব্যাঙ্ক সম্প্রতি 60টি দেশের 60 হাজারেরও বেশি দরিদ্র নরনারীকে নিয়ে সমীক্ষা করেছিল। তাতে দরিদ্র মানুষের নিজেদের বিচারে দারিদ্রের অর্থ কী তা জানতে চাওয়া হয়েছিল। উত্তরদাতাদের মতে তাদের ভেঙে পড়া ঘরবাড়ি, ছেঁড়া পোশাক, খাদ্যভাব-এই সবই দারিদ্র।

বর্তমান সমাজিবিজ্ঞানীদের মতে, মানব দারিদ্র্য ও আয় দারিদ্র্য সমার্থক নয়। প্রথমটির ক্ষেত্রে আয় অন্যতম শর্ত হলেও একমাত্র শর্ত নয়। তাঁদের মতে, মানব দারিদ্র্য হল জীবনযাপনের ন্যূনতম মানের অভাব, স্বাস্থ্য ও শিক্ষার সুযোগের অপ্রতুলতা এবং তত্য ও যোগাযোগ সংক্রান্ত সুযোগের বঞ্চনা।

■ **দারিদ্র্যের পরিমাপ (Measurement of Poverty) :**

এখন প্রশ্ন হল দারিদ্র কিভাবে পরিমাপ করব? দারিদ্র্য পরিমাপের পদ্ধতি হিসাবে কয়েকটি পদ্ধতির কথা বলা হয়ে থাকে। উল্লেখযোগ্য পদ্ধতি হল—

❑ **আয়ের বৈষম্য পরিমাপ ঃ** আয়ের বৈষম্যের পরিপ্রেক্ষিতে দারিদ্রের পরিমাপ করা হয়ে থাকে। আয় খুব কম হলে মানুষের ন্যূনতম চাহিদা পূর্ণ হয় না। এরকম ব্যক্তি দরিদ্র হিসাবে চিহ্নিত হয়। ন্যূনতম প্রয়োজনের বিষয়টি অবশ্য বিতর্কিত। তবে আয়ের বৈষম্যের সঙ্গে দারিদ্র্য, গভীরভাবে সম্পর্কিত এ বিষয়ে দ্বিমতের অবকাশ নেই।

❑ **মাথাপিছু ভোগের পরিমাপ ঃ** মাথাপিছু ভোগের পরিমাপের পরিপ্রেক্ষিতে দারিদ্র্যের সীমা নির্ধারণ করা হয়। দারিদ্রের সঠিক পরিমাপের ক্ষেত্রে উপরোক্ত দৃষ্টিভঙ্গী সামগ্রিক বিচারে সমর্থন করা যায় না। এই দৃষ্টিভঙ্গীর বিধি সীমাবদ্ধতা আছে।

(i) খাদ্যের মাধ্যমে জীবনধারণ ও স্বাস্থ্য সংরক্ষণের জন্য ব্যক্তি-মানুষের ক্যালোরি, প্রোটিন ও ভিটামিন ভোগের পরিমাণ বহুলাংশে নির্ভরশীল খাদ্য দ্রব্যাদি সম্পর্কে তার ব্যক্তিগত ভাল লাগা—মন্দ লাগার ওপর।

(ii) খাদ্য সামগ্রী ছাড়াও মানুষের জীবনযাত্রার ক্ষেত্রে ন্যূনতম প্রয়োজনের মধ্যে আরও অনেক কিছু পড়ে।

(iii) সব মানুষের ক্যালরি ভোগের প্রয়োজন সামন, এমন কথা বলা যায় না আবহাওয়ার পার্থক্যের পরিপ্রেক্ষিতে অঞ্চলভেদে ক্যালোরি ভোগের প্রয়োজনে পার্থক্য থাকতে পারব্দে এবং থাকেও।

(iv) বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রয়োজনের মাত্রার মধ্যে পার্থক্য থাকে।

মাথা গণনার মাধ্যমে পরিমাপ ঃ মাথাগণনার মাধ্যমে দারিদ্রের পরিমাণ পরিমাপের ব্যাপরে একটি পদ্ধতির কথা বলা হয়। অধ্যাপক অমর্ত্য সেনের ভাষায় "The conventional measure of poverty, still widely used, proceeds from here (poverty line) to count the umber of people below the poverty line— the so called 'head count' and defines the index of poverty as the proportion of the total population that happens to be below the poverty line (i.e. the fraction of the population identified as poor)." এই পদ্ধতিটিরও সীমাবদ্ধতা বর্তমান। (1) এই পদ্ধতির মাধ্যমে দরিদ্রদের মধ্যে আয়ের বণ্টন সম্পর্কে আলোচনা করা হয় না। (2) দারিদ্র সীমার নীচে অবস্থিত ব্যক্তিবর্গের আয় সংশ্লিষ্ট সীমারেখার কতখানি নীচে আছে, তাও পরিমাপ করার ব্যবস্থা এই পদ্ধতিতে নেই। (3) এই পদ্ধতিতে দরিদ্রদের আবস্থার মধ্যে পার্থক্য করা হয় না।

ভারতে দারিদ্রের পরিমাপ (Measurement of poverty in India) :

ভারতে দারিদ্র পরিমাপের ক্ষেত্রে বিভিন্ন অর্থনীতিবিদ্ ও পরিকল্পনা কমিশন উদ্যোগ নিয়েছেন। দুটি বিষয়ে মোটামুটি সকল অর্থনীতিবিদই অভিন্ন মত পোষণ করেন। (ক) দারিদ্র্য সীমার নীচে অবস্থিত মানুষের সংখ্যার অনুপাত হ্রাস পায়নি। এই অনুপাত অপরিবর্তিত আছে (খ) ভারতে দরিদ্র মানুষের মোট সংখ্যা বৃধি পেয়েছে। এ বিষয়ে মোটামুটি সব অর্থনীতিবিদই একমত পোষণ করেন।

ভারতে পরিকল্পনা কমিশন 1962 সালে একটি কার্যকরী দল গঠন করে, 1960-61 সালের মূল্যস্তরের ভিত্তিতে এই দল মাসিক মাথাপিছু কুড়ি টাকা ব্যয়কে দারিদ্র সীমারেখা হিসাবে নির্ধারণ করে এবং তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার প্রাক্কালে এটাকেই দারিদ্র সীমারেখা হিসাবে চিহ্নিত করা হয়। ডাঃ কোস্টা ভারতের দারিদ্রকে তিনটি স্তরে ভাগ করেছেন। প্রবল দুঃস্থতা, দুঃস্থতা এবং দারিদ্র। 1963-64 সালের পরিসংখ্যানের পরিপ্রেক্ষিতে তিনি দেখিয়েছেন যে, সমকালীন ভারতের মোট জনসংখ্যার 13.2 শতাংশ ছিল চরম দুঃস্থ, 22.4 শতাংশ মানুষ ছিল দুঃস্থ এবং 34.9 শতাংশ মানুষ ছিল দরিদ্র।

অধ্যাপক অমর্ত্য সেনের মতে, দারিদ্র পরিমাপের ক্ষেত্রে আপেক্ষিক বঞ্চনা একটি গুরুত্বপূর্ণ মাপকাঠি হিসাবে বিবেচিত হতে পান্দের। এই ধারণায় একই পরিবেশ একজন যে সুযোগ-সুবিধা ও সঙ্গতি লাভ করছে আর একজন তা পাচ্ছে না। এক্ষেত্রে একজনের তুলনায় অপরজন নিশ্চয় গরীব। এই দারিদ্রসীমা আপেক্ষিক, রাষ্ট্রভেদে একরকম নয়। আপেক্ষিক দারিদ্রের মূল কারণ আয়ের বৈষম্য। অমর্ত্য সেন প্রস্তাবিত দারিদ্রের নতুন সংজ্ঞাকে ভিত্তি করে ইউ.এন.ডি.পি মানব দারিদ্র সূচকের উদ্ভাবন করেছে। এর ফলে বোঝা যায় দেশের জনসংখ্যার কত অংশ মানব উন্নয়নের ন্যূনতম স্তরের নীচে রয়েছে।

সমাজবিজ্ঞানীদের মতে, আয় দারিদ্র সূচক (Income Poverty Index or I.P.I.) জনগণের আর্থিক অবস্থা সম্পর্কে সম্যক ধারণা দিলেও দারিদ্রের প্রকৃতি ও ব্যাপকতা বিস্তৃতভাবে তুলে ধরে না। সেজন্য অন্যান্য দেশের মত ভারতবর্ষেও দারিদ্রের ব্যাপ্তি ও প্রকৃতির ব্যাখ্যা বিশ্লেষণে আয় দারিদ্র সূচক (Human Poverty Index or H.P.I.) সমাজবিজ্ঞানীদের কাছে বেশি গ্রহমযোগ্য বিবেচিত হচ্ছে।

ভারতবর্ষে দারিদ্রের ব্যাপ্তি ও প্রকৃতি ঃ দারিদ্র ভারতীয় অর্থনীতির গভীরে গেঁথে আছে। এ দেশের অর্থনীতির ব্যবস্থার কাঠামোর সঙ্গে দারিদ্র ওতপ্রোতভাবে সম্পর্কযুক্ত। 1999-2000 সালের দারিদ্র সমীক্ষা প্রকাশ করে যোজনা কমশন জানিয়েছে, ভারতে দারিদ্র সীমার নীচে বসবাসকারী মানুষের সংখ্যা কমেছে। 1993-94 সালের

36 শতাংশ থেকে 1999-2000 সালে হয়েছে 26.1 শতাংশ। সমীক্ষা অনুযায়ী ভারতবর্ষে মোট দরিদ্রের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে 23 কোটি 25 লক্ষ 92 হাজার। 1999-2000 এর দারিদ্র সমীক্ষায় প্রাপ্ত তথ্যের রাজ্যওয়ারি বিশ্লেষণে দেখা যায়, ওড়িশায় দারিদ্রসীমার নীচে মানুষের সংখ্যা 47.15 শতাংশ যা জনসংখ্যার অনুপাতের বিচারে দেশের মধ্যে সবচেয়ে বেশি।

জাতীয় নমুনা সমীক্ষণ সংস্থার (N.S.S.O বা National Sample Survey Organisation) 1999-2000 সালের দারিদ্র সমীক্ষা প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী কেবলমাত্র ওড়িশা ও বিহারেই দারিদ্রের হাহর 40 শতাংশের বেশি। মহারাষ্ট্র, তামিলনাডু, কর্ণাটক এবং অন্ধ্রপ্রদেশে দারিদ্রসীমার নীচে বাস করে যথাক্রমে 25 শতাংশ, 21 শতাংশ, 20.4 শতাংশ এবং 15.77 শতাংশ মানুষ।

কোন কোন সমাজবিজ্ঞানীর মতে, দারিদ্রসীমা অনুধাবনের জন্য ভারত সরকার নির্ধারিত আয়ের সূচক যথার্থ নয়। এইসব সমাজবিজ্ঞানীর মতে, সরকারি পরিসংখ্যানের বিপরীতে ভারতবর্ষে দরিদ্র মানুষের সংখ্যা বাস্তব ক্ষেত্রে অনেক বেশি। সরকারি হিসাবে দারিদ্রসীমার নীচে বসবাসকারী মানুষের সংখ্যা এবং সুস্থভাবে বেঁচে থাকার জন্য ন্যূনতম 2400 ক্যালোরি গ্রহণের শর্ত পূরণ করে এমন মানুষের সংখ্যার মধ্যে বেশ বড় রকমের পার্থক্য দেখা যায়। এই পার্থক্যই প্রমাণ করে বাস্তবে ভারতীয় সমাজে দারিদ্রের সমস্যা অনেক বেশি গভীর।

ন্যাশনাল কাউন্সিল অফ অ্যাপ্লায়েড ইকনমিক রিসার্চ (NCAER)-এর সমীক্ষা অনুযায়ী ভারতের গ্রামীণ এলাকার 58 শতাংশ মানুষ এবং শহর এলাকার 37 শতাংশ মানুষ নিম্ন আয় বিশিষ্ট। বিশ্ব ব্যাঙ্কের মতে, ভারতবর্ষে দরিদ্রতর এবং অপেক্ষাকৃত উন্নত রাজ্যগুলির মধ্যে ব্যবধান ক্রমশ বাড়ছে। বারতবর্ষের কোন কোন অঞ্চলে দারিদ্রের তীব্রতা হ্রাসে কিছুটা অগ্রগতি হয়েছে। তবে একথাও অস্বীকার করার উপায় নেই যে বারতীয় সমাজজীবনে পাশাপাশি রয়ে গেছে নানান বৈষম্য ও বৈপরীত্য। এ প্রসঙ্গে ভারতবর্ষের খাদ্য, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, শ্রম সম্পর্কে নীচে আলোকপাত করা হল—(1) 1951-2000 সালের মধ্যে ভারতে খাদ্য উৎপাদনের পরিমাণ অনেক বেড়েছে। সেই অর্থে দেশে দুর্ভিক্ষ এখন হয় না। তবে ভারতে 30 কোটি মানুষ প্রয়োজনমত খাদ্য পায় না। অধ্যাপক সেনের মতে, 1943 সালের দুর্ভিক্ষ খাদ্যের অভাবের জন্য হয়নি। খাদ্য ছিল, কিন্তু তাতে বহু মানুষের স্বত্বধিকার ছিল না।

(2) ইউনেস্কার (UNESCO) মতে বিশ্বের দারিদ্রের মানচিত্র এবং নিরক্ষরতার মানচিত্রের পরস্পর মিল আছে। বিশ্বের সবচেয়ে কম উন্নত দেশগুলিতে নিরক্ষর মানুষের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি। ভারতবর্ষের 2001 সালের জনগণনা থেকে দেখা যায়, বিহার, উত্তরপ্রদেশের মত রাজ্যগুলিতে দারিদ্র যেমন বেশি, তেমনি নিরক্ষরতাও সেখানে অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় বেশি।

(3) জনস্বাস্থ্যের প্রশ্নে দেখা যাচ্ছে, ভারতীয়দের গড় আয়ু অনেকটা বাড়লেও এদেশে শিশু মৃত্যুর হার এখনও প্রতি হাজারে 70, পাঁচ বছরের কম বয়সী শিশু মৃত্যুর হার প্রতি হাজারে 115 জন। একনও ভারতবর্ষে ফি বছর 22 লক্ষ শিশুমৃত্যু ঘটে যা প্রতিরোধ করা যেতে পারে। ইন্ডিয়ান হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট রিপোর্ট থেকে দেখা যাচ্ছে, দরিদ্রদের মধ্যে যারা দরিদ্রতম তাঁরা চিকিৎসাখাতেই বার্ষিক আয়ের 20 শতাংশ ব্যয় করেন।

অধ্যাপক মহাবুব-উল-হক সাম্প্রতিককালে ভারতবর্ষে দারিদ্র সমস্যার ব্যাপ্তি ও প্রকৃতি বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বলেছেন যে ভারতবর্ষের 46 শতাংশ মানুষ চূড়ান্ত দারিদ্রের মধ্যে বসবাস করেন। পাশাপাশি প্রায় দুই তৃতীয়াংশ মানুষ 'কার্যকারী অর্থে দরিদ্র'; এর অর্থ এই অংশের মানুষ মানবিক কার্যকারিতা বজায় রাখার জন্য প্রয়োজনীয় ন্যূনতম শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সুরক্ষা থেকে বঞ্চিত (চৌধুরী, 2004)।

ভারতবর্ষে দারিদ্রে কারণ ঃ গিলিন ও গিলিন তাঁদের An Introduction to Sociology-তে দারিদ্রে কারণ সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। তাঁরা দারিদ্র্যের পাঁচটি মূল কারণ নির্দেশ করেছেন। সেগুলি হল—

(i) ব্যক্তির অসমার্থ্য ঃ বিভিন্ন বিষয় ব্যক্তির অসামর্থ্য হিসেবে পরিগণিত হয়। এই বিষয়গুলি হল বংশগত কারণে দুর্বল ও অসুস্থ শরীর, হতাশাগ্রস্ত মানসিকতা, কাজকর্মে অনীহা প্রভৃতি; এবং দুর্ঘটনা বা রোগভোগের কারণে অন্ধ, বোবা, কালা বা এক কথায় প্রতিবন্ধী হয়ে পড়া প্রভৃতি।

(ii) প্রতিকূল পরিবেশ পরিমণ্ডল ঃ প্রতিকূল পরিবেশ পরিণণ্ডলের মধ্যে প্রাকৃতিক সম্পদের অভাব অনটনের বিষয়টিও পড়ে। তাছাড়া জলবায়ু ও আবহাওয়ার প্রতিকূলতা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, দুর্বিপাক, পোকামাকড়ের উপদ্রব প্রভৃতিও এই কারণের অন্তর্ভুক্ত।

(iii) আর্থনীতিক উপাদানসমূহ ঃ দারিদ্রের আর্থনীতিক উপাদান হিসাবে যেসব বিষয়ের কথা বলা হয়ে থাকে সেগুলি হল—মূলধনের অভাব, প্রযুক্তিগত জ্ঞানের অভাব, ব্যবসা বাণিজ্যে মন্দা, সম্পদের অসমবণ্টন, প্রযুক্তি গত পরিবর্তনের কারণ, শ্রমিকের কর্মহীনতা প্রভৃতি।

(iv) সামাজিক সংগঠনের সীমাবদ্ধতা ঃ খুব দ্রুত প্রযুক্তিগত পরিবর্তনের কারণে সামাজিক সংগঠনের ক্ষেত্রে কিছু কিছু ত্রুটিবিচ্যুতি দেখা দেয়। সেগুলি হল নতুন পেশাগত রোগব্যাধির ক্ষেত্রে স্বাস্থ্য পরিষেবার সীমাবদ্ধতা, শিক্ষা ব্যবস্থায় সীমাবদ্ধতা, স্বামী-স্ত্রীর উপযুক্ত আবাসন ও চাকরির ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতা, অভিজ্ঞতার অভাবের জন্য যুবক-যুবতীদের কর্মহীনতা, সন্তানের সমাজিকীকরণের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতা ইত্যাদি।

(v) যুদ্ধ ঃ যুদ্ধ সমাজকে হীনবল করে দেয়, কারণ যুদ্ধে সব থেকে সক্ষম ও সক্রিয় ব্যক্তিদের প্রাণ যায়। যুদ্ধের দরুন ব্যক্তিদের মূল্যস্ত অস্বাভাবিক বৃদ্ধি পায়। তার ফলে জীবনযাত্রার মানের ওপর প্রতিকূল প্রভাব প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়।

একটু বিশদভাবে আলোচনা করলে নিম্নলিখিত কারণগুলোকে ভারতবর্ষের দারিদ্র পরিস্থিতির জন্য দায়ী করা যায় ঃ

(১) ব্যক্তিগত কারণসমূহ ঃ আমাদের দেশে গুণগত যোগ্যতা, ব্যক্তিগত সামর্থ্য, উদ্যোগ-আয়োজন প্রভৃতির ওপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়। মনে করা হয় যে, এসবের পরিপ্রেক্ষিতেই ব্যক্তি মানুষের আর্থনীতিক অবস্থান ও মর্যাদা নির্ধারিত হয়। দারিদ্র্যের পিছনে ব্যক্তিগত কারণগুলির মধ্যে কয়েকটি বিশেষ ভাবে উল্লেখের দাবি রাখে।

(ক) নিরক্ষরতা (Illiteracy) ঃ সমাজবিজ্ঞানীদের মতে দারিদ্র ও নিরক্ষরতা পরস্পরের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে সম্পর্কযুক্ত। নিরক্ষরতার কারণে দারিদ্রের সৃষ্টি হয় এবং দারিদ্র বৃদ্ধি পায়। কারণ নিরক্ষর ব্যক্তির রুজি রোজগারে ক্ষমতা নিতান্তই কম। অধ্যাপক রাম আহুজা ('Social Problems in India') লিখেছেন, "...the educational level of the people in the country also contributes to poverty." সাধারণভাবে বাল যায় যে, সাক্ষরতা শ্রমিকদের উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি করে। এজন্য বলা হয়ে থাকে যে, আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের পথে নিরক্ষরতা বাঁধা হয়ে দাঁড়ায়।

(খ) অমিতব্যয়িতা (Extravagance) ঃ অমিতব্যয়িতা দারিদ্রের একটি বড় কারণ। অমিতব্যয়ী মানুষ প্রচুর অর্থ অপব্যয় করতে পারে। ভারতের সমাজ ব্যবস্থায় এমন কছি আচার অনুষ্ঠান আছে, যা অমিতব্যয়ের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। যেমন বিভিন্ন উৎসব অনুষ্ঠান, বিবাহ, শ্রাদ্ধ প্রভৃতি এরকম ক্ষেত্রে ব্যক্তিকে ঋণ করতে হয়। তখন সে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, আবাসন এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় নাগরিক পরিষেবার জন্য অর্থব্যয় করতে পারে না।

(গ) অসুস্থতা (Sickness) ঃ নিরক্ষরতা ও দারিদ্রের মতই অসুস্থতা ও দারিদ্রের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক বিদ্যমান। উৎপাদনের পরিমাণ ও গুণমানের ওপর শ্রমিকদের শরীর স্বাস্থ্যের প্রভাব পড়ে। সুস্বাস্থ্যের অধিকারী শ্রমিক ভাল কাজ করে। হীনবল শ্রমিক তা পারে না। শ্রমজীবী মানুষ এমনিতেই দরিদ্র। রুজিরোজগার কমে গেলে তার দারিদ্র আরও বেড়ে যায়। এ প্রসঙ্গে সমাজবিজ্ঞানী R. Hunter তাঁর 'Poverty' তে মন্তব্য করেছেন, "Poverty and sickness from a vicious partnership each helping the other to add to the miseries of the most unfortunate of mankin."

(ঘ) অলসতা (Idleness) ঃ দারিদ্রের কারণ হিসাবে অলসতার কথাও বলা হয়। বিশেষত ভারতের মত গ্রীষ্মপ্রধান দেশে দারিদ্র ও অনগ্রসরতার কারণ হিসেবে অলসতার ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। কাজ থাকলেও অলস ব্যক্তি কাজ করে না, চাকরি পেলেও করতে চায় না। এ ধরনের মানুষ পরিবারের বোঝা হয়ে দাঁড়ায় ও দারিদ্রের শিকার হয়।

(ঙ) মানসিক অসুস্থতা (Mental disease) ঃ মানসিক অসুস্থতা ও দারিদ্রের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। মানসিকভাবে অসুস্থ মানুষ কাজকর্ম করার স্বাভাবিক সামর্থ্য হারায়। বিপরীতভাবে দারিদ্রও মানসিক অসুস্থতা সৃষ্টি করতে পারে। নিদারুণ দারিদ্র মানুষের জীবনকে বিষময় করে তোলে। এই অবস্থায় মানসিক ভারসাম্য বজায় রাজা অসম্ভব হয়ে পড়ে। সমাজবিজ্ঞানী R. Pashley তঁর 'Pauperism and Poor Laws' তে বলেছেন, "Poverty alone directly produces a very large proportion of the whole number of cases of insanity among the indegent poor."

(চ) নীতিহীনতা (Demoralization) ঃ নীতিভ্রষ্ট মানুষ অনৈতিক কাজকর্মে সামিল হয়। দুর্নীতিমূলক ও অনৈতিক কাজকর্ম মানুষের জীবনকে অসংগঠিত করে তোলে। মানুষ শারীরিক ভাবে হীনবল হয় এবং আর্থিকভাবে দুঃস্থ হয়। মদ্যপ ও জুয়াড়িদের জীবনে দারিদ্রের অভিশাপ নেমে আসে (মহাপাত্র, 2006)।

(ছ) দুর্ঘটনা (Accidents) ঃ ব্যক্তি মানুষের জীবনে দুর্ঘটনা দারিদ্র ডেকে আনতে পান্দের। দুর্ঘটনায় পড়ে মানুষ পঙ্গুগ্রস্ত বা বিকলাঙ্গ হয়ে পড়ে। দুর্ঘটনাগ্রস্ত ব্যক্তিটি যদি পরিবারের একমাত্র রোজগেরে সদস্য হন, তা হলে সেই পরিবারের ভাগ্যে দারিদ্রের অভিপাশ নেমে আসে।

2.3.4.2 লিঙ্গ সংক্রান্ত সমস্যা (Gender Issues)

ঈশ্বর সৃষ্টি করেছিলেন—মানব ও মানবী এই পৃথিবীর জন্য, সেই প্রথম মানব ও মানবী আদম্ ও ইভ্। ঈশ্বর তাদের স্বর্গের উদ্যানে জ্ঞানবৃক্ষ ব্যতীত সমস্ত বৃক্ষের ফল খাওয়ার অনুমতি দেন। শয়তানের প্ররোচনা সত্ত্বেও আদাম সেই জ্ঞানবৃক্ষের ফল ভক্ষণ থেকে নিজেকে নিরস্ত রাখে, কিন্তু ইভ্ শয়তানের প্ররোচনায় শেষ পর্যন্ত জ্ঞানবৃক্ষের ফল ভক্ষণ করে ঈশ্বরের ইচ্ছার বিরুধে যায়। বাইবেলের এই গল্প থেকেই গুরু হয় নারী ও পুরুষের মধ্যে পক্ষপাতিত্বের বাতাবরণ। সম্ভাব্য বাইবেলের এই রচনার সময়কাল থেকেই নারী-পুরুষের বিভাজন শুধুমাত্র জীববৈজ্ঞানিক বিভাজন ছিল না, একটি সামাজিক বিভাজনে রূপান্তরিত হয়ে পড়েছিল। (কমল ইন্দু ঃ প্রশ্ন অধিকোষ : সমাজতত্ত্ব : চতুর্থ খণ্ড)।

জন্মলগ্নেই পুরুষ ও নারী একে অপর থেকে পৃথক। শারীরিক ও মানসিক গঠনে নারী ও পুরুষ ভিন্নধর্মী। নারীর রমণীয় ও কমনীয় দেহ তাঁর কোমলধর্মিতা ও স্নিগ্ধ প্রকৃতিরই বহিঃপ্রকাশ। "শুধু বিধাতার সৃষ্টি নহ তুমি নারী! পুরুষ প্রকৃতিরই গড়েছে তোরে সৌন্দর্য সঞ্চারি আপন অন্তর হতে।" অপরদিকে পুরুষের বলিষ্ঠ ও মজবুত

দেহ তার মানসিক দৃঢ়তা ও সবলতার প্রকাশ। হয়তো এই সূত্রেই জীবনযাত্রায় তাদের কর্মবিভাজন দেখা গিয়েছে। পুরুষরা বহির্মুখী। জীবনযাত্রা নির্বাহের জন্য তাদের বাইরের জগতের সন্ধান করতে হয়। সংসার প্রতিপালনের দায়িত্ব প্রধানত তাদের। জীবিকার জন্য চাষবাস, ব্যবসা-বাণিজ্য, চাকরির সন্ধানে সদাব্যস্ত জীবন। নারী অন্তর্মুখী। তারা সংসার প্রতিপালনের জন্য গৃহেতে আবধ্ব। সন্তানের জন্ম, সংসার প্রতিপালন ও সাংসারিক নানান ক্রিয়াকর্ম, কর্তব্যপালন করে সংসারকে সুন্দর ও সুষ্ঠুভাবে বাঁচিয়ে রাখে। প্রাচীনকাল থেকে এ ব্যবস্থা চলে আসছে। এ প্রসঙ্গে একটা কথা মনে রাখা ভালো যে এই কর্মবিভাজনে নারীর আসন বিন্দুমাত্র সংকুচিত ছিল না। তারা কোনো কালেই হেয়'র পাত্র ছিলেন না। বৈদিক যুগে নারী ছিলেন পুরুষের প্রায় সমগোত্রীয়।

বিশেষ আলোচনা : অত্যাচারিত নারী দেশে দেশে

'অভিশপ্ত সে দেশ পরাধীন, শৌর্য
শক্তিহীন,
শোধ করেনি যে দেশ কল্যাণী সেবিকা
নারীর ঋণ।
নারী অমৃতময়ী, নারী কৃপা—
করুণাময়ের দান,
কল্যাণ, কৃপা পায় না, যে করে নারীর
অসম্মান।
(নজরুল)

সমাজে নারীর ভূমিকা নাকি অনবদ্য, অথচ নিচের আলোচনা থেকে আমরা দেখব যে পৃথিবীর প্রায় প্রতিটি দেশেই, এমনকি সুসভ্য যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেনেও নারীর ওপর মানসিক এবং শারীরিক অত্যাচার চলছে। যেমন প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগেই ব্রিটেনে নিজেদের ভোটাধিকারের দাবিতে হাজার হাজার মহিলা রাস্তায় নেমেছিলেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, সে দেশের বামপন্থী লেবার পার্টি নারীর মর্যাদার কথা বললেও এ ব্যাপারে সুস্পষ্ট ধারণা বা কোনো সদর্থক পদক্ষেপ নেয়নি।

1946 সারে 'ইক্যুয়াল পে কমিশন' (Equal Pay Commission)-র সামনে অর্থনীতিবিদ হ্যারড দাবি করেন যে, পুরুষদের তুলনায় কর্মরতা নারীদের বেতন, মজুরি এবং অন্যান্য সুবিধা-সুযোগ কম হওয়াই দরকার, কারণ তা না হলে নাকি মহিলারা বিয়ে এবং সন্তানধারণ করতেই চাইবেন না। ব্রিটেনের লেবার পার্টি তথা দেশের প্রথম মহিলা প্রধানমন্ত্রী মার্গারেট থ্যাচারও কিন্তু অজস্র নারীবিরোধী কমসূচি নিতে দ্বিধা করেন নি। তাঁর আমলেই মধ্যবিত্ত ও শ্রমজীবী পরিবারের নারীরা পারিবারিক সূত্রের অর্থ ও সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত হয়েছিলেন। ট্রেড ইউনিয়ন ও শ্রমিক আন্দোলন দমনের জন্য থ্যাচারের সরকার নারি শ্রমিকদের ওপর অকথ্য অত্যাচার চালিয়েছিল। শুধু মেয়েদের জন্যই চাকরিক্ষেত্রে পদোন্নতি বন্ধ করা উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে সীমাবধ্ব করা, নতুন আইন করে পুরুষদের তুলনায় কম মজুরি ও পেনশন চালু করা, বাড়ির মালিকানা পুরুষ কর্তার হাতে নিয়ে নারীদের আইনগত গৃহহীন করা প্রভৃতি দুষ্কর্ম প্রসঙ্গত উল্লেখ্য।

যুক্তরাষ্ট্রের চিত্রটাও একই। আশির দশকের সূচনায় মার্কিন অর্থনীতির বিবর্ণ অংশেই ছিল নারীদের অবস্থান। সরকার নির্ধারিত দারিদ্র্য সীমার নিচে বসবাসকারীদের 67% ছিল নারী-সমারে প্রতিনিধি। সেদেশে 50% মহিলা

65 বছর বয়সের আগেই বিধবা হন আর এইসব বিধবাদের দুই-তৃতীয়াংশেরই অবস্থান দারিদ্র্য সীমার নিচে। মার্কিন মেয়েদের একটা বড় অংশই পথবাসিনী গৃহহীনা। সন্তানসম্ভবা মেয়েদের 30 শতাংশের কোনোও চিকিৎসাই হয় না। বহু গৃহহীনা নারী তাদের শারীরিক স্বাস্থ্য ও মানসিক বারসাম্য হারিয়ে ফেলেছেন। সেদেশে নারী-পরিচালিত পরিবারগুলোর অধিকাংশই দারিদ্র্য সীমার নিচে বাস করেন এবং তাঁদের দুই-তৃতীয়াংশই রাষ্ট্রীয় দাক্ষিণ্যের ওপর নির্ভরশীল—এমন অবস্থায় মেয়েদের স্বাধীনতা ও মর্যাদা কতটুকু রক্ষিত হয় তা সহজেই বোঝা যায়। জর্জ গিল্ডার, জেরি ফাওয়েল, রিচার্ড ভিগারী প্রমুখ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নব্য দক্ষিণপন্থীরা স্বনির্ভর মহিলাদের বিরুধে প্রচার চালান। এঁদের যুক্তিটাই অদ্ভুত! নারীরা চাকরি করছে বলেই নাকি দেশে এত বেকার পুরুষ! তাছাড়া মায়েদের অখণ্ড মনোযোগ ও যত্নের অভাবেই পরবর্তী প্রজন্ম নাকি কুপথে যাচ্ছে, অপরাধের হার বেড়ে চলেছে আর সামাজিক কাঠামো ভেঙে পড়ছে। উদ্বেগের বিষয় হল, মার্কিন সরকার তাঁদের পরামর্শ কিছুটা কার্যকর করার ফলেই সেদেশের প্রায় অধিকাংশ পেশার মহিলাদের ওপর নেমে এসেছিল ছাঁটাই-এর অভিশাপ। মেয়েদের মধ্যে আবার সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত হয় আর্থিক ভাবে দুর্বল, সংখ্যালঘু কৃষ্ণাঙ্গ নারীসমাজ। অন্যান্য দেশেও দেখা গেছে, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে একজনকে ছাঁটাই করলে স্ত্রীকেই সাধারণত ছাঁটাই করা হয়। পোল্যান্ডে 1990-এর শেষ পর্যন্ত যাঁরা ছাঁটাই হয়েছেন, তাঁদের 80 শতাংশ নারী। জার্মানিতে বেকারদের অর্ধেকই নারী।

সর্বত্রই প্রায় এক চিত্র। ভিয়েতনামে রাষ্ট্রীয় খরচ কমাবার জন্য মেয়েদের শিক্ষা সঙ্কুচিত করার প্রবণতা বেড়ে চলেছে। পোপ জন পল পর্যন্ত নারীজাতিকে 'রান্নাঘর, গির্জা আর ছেলেমেয়েদের' নিয়ে জীবন কাটাবার নির্দেশ দিয়েছেন। নিগ্রো আফ্রিকা, বিশেষত দক্ষিণ আফ্রিকার মেয়েরা এখনও বর্ণবিদ্বেষের সমস্যামুক্ত হননি। শ্বেতাঙ্গদের খামার, খনি বা গৃহকর্মে নিযুক্ত কৃষ্ণাঙ্গ মেয়েরা আজ্য বহুক্ষেত্রেই বেগার খাটা নিম্নতর মজুরির দাসী। মালিকেরা সামান্যতম কারণেও তাদের ওপর এমন অত্যাচার চালায় যে প্রায়ই তাঁরা মৃত্যুবরণেও বাধ্য হন। আফ্রিকায় কৃষিজীবী নারীদের বিপুল কর্মক্ষমতাই তাঁদের বঞ্চনার মূল কারণ। মেয়েদের সাহায্য ছাড়া কৃষিকার্য অসম্ভব। তাই অনেক কৃষকই বহুবিবাহে উৎসাহী।

পশ্চিম এশিয়ার মতো আরব, আফ্রিকার বহু জায়গায় আবার মৌলবাদের সাথে দেখা যাচ্ছে তীব্র নারীবিদ্বেষ। মিশর ও আলজিরিয়া এদের অন্যতম। অলিম্পিক অনুষ্ঠানে মার্চ পাস্টের সময়ে খেলোয়াড়দের সারির সামনে কোনোও মহিলার উপস্থিতির ওপর কয়েকটি দেশ নিষেধাজ্ঞা জারি করার মতো কুৎসিত প্রবণতা দেখিয়েছে। পরাসি সাম্রাজ্যবাদের বিরুধে সুদীর্ঘ গৌরবময় সংগ্রামের মধ্য দিয়ে আলজিরিয়া স্বাধীনতা লাভ করে। মেয়েরা ছিল সেই সংগ্রামের পূর্ণ শরিক। অথচ আজ সেদেশে মহিলাদের স্বাতন্ত্র ও স্বাধীনতাকে অপরাধ বলেই ধরা হয়। বহু নিরপরাধ নারীকে মৌলবাদীরা হত্যা করেছে এবং অন্যান্য মহিলাদেরও তারা অবাধে ক্রমাগত ভীতিপ্রদর্শন করে চলেছে।

দক্ষিণ কোরিয়া, তাইওয়ান, সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়া, থাইল্যান্ড, ইন্দোনেশিয়ার মতো দেশের বৈশিষ্ট্য সেখানকার নামমাত্র মজুরি, দক্ষ অথচ বাধ্য শ্রম, আর পরিবেশ ও শ্রমিক-নিরপত্তা আইনের শিথিলতা। সেখানকার কারখানা ও বাণিজ্য সংস্থার কর্মীদের বেশির ভাগই 18 থেকে 26 বছর বয়েসী মহিলা। এরপর আর তাঁদেরকে রাখা হয় না। প্রকৃত ঘটনা হল, নারী শ্রমিকদের জীবনের শ্রেষ্ঠ বছরগুলোয় তাঁদেরকে নিংড়ে ব্যবহার করে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া হয়। বহু শিল্পেই মহিলার মাতৃত্বকালীন ছুটি পর্যন্ত পান না। চাকরি বাঁচাবার জন্য প্রায় সন্তান-প্রসবের দিন পর্যন্ত তঁরা অমানুষিক পরিশ্রম করতে বাধ্য হন। ফলে বহুক্ষেত্রেই মা, সদ্যোজাত শিশু গুরুতর অসুস্থ হন, এমনকি মৃত্যুও হয়। তবে পূর্ব এশিয়ার বহু দেশেই সবচেয়ে বিপজ্জনক প্রবণতা হল, পর্যটনের কাজে নারীদেহের

ব্যবসা। থাইল্যান্ড এ ব্যাপারে কুখ্যাত। মার্কিন পত্রিকা 'টাইম' ব্যাঙ্ককেকে 'দেহব্যবসার রাজধানী' বলেছে। মূলত গ্রামাঞ্চল থেকে নিঃস্ব অবস্থায় আসা অসহায় নিষ্পাপ মেয়েরা (এমনকি নাবালিকরাও) এই ব্যবসায় পেটের দায়ে নামতে বাধ্য হচ্ছে—এড্‌স্ জনিত মৃত্যুই যাদের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি। এশিয়ার প্রতিবেশী দেশ পাকিস্তানের কয়েকটি কথা এখানে বলা দরকার। বছর খানেক আগে সংবাদসংস্থা 'এ. এফ. পি.'-র খবরে জানা গেছে বিগত 10 বছরে পারিবারিক সম্মান বাঁচানোর অজুহাতে ইসলামাবাদ ও রাওয়ালপিন্ডিতে 5,000 মহিলাকে পুড়িয়ে মারা হয়েছে। এঁদের 97% বিবাহিতা এবং প্রায় এক-তৃতীয়াংশ ছিলেন অন্তঃসত্ত্বা। প্রায় দুই-তৃতীয়াংশের বয়স 18-র কম। জানা গেছে, মহিলাদের ওপর যে কোনো অত্যাচারই পাকিস্তানে পারিবারিক সম্মান হিসেবে ব্যাখ্যা করা হয়। সামান্য অজুহাত যেমন, নিজের মতপ্রকাশ, পণ নিয়ে ঝামেলা বা রান্নায় লবণ কম-বেশি হবার জন্যও মেয়েদের গায়ে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয়।

যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ প্রভৃতি অস্বাভাবিক পরিস্থিতিতেও সবচেয়ে বেশি বিপদে পড়েন মহিলারাই। আগেকার দিনে যুদ্ধে নিহতদের 70 শতাংশই ছিলেন সেনাকর্মী। এখন হতাহতের তালিকায় 90 শতাংশ হলেন সাধারণ মানুষ, যাদের অধিকাংশই নারী ও শিশু। সবচেয়ে বিপজ্জনক ব্যাপার হল, নার-নিগ্রহকেও আজকাল যুদ্ধাস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে। একবিংশ শতাব্দীর মানুষের কাছে এ-এক নিদারুণ পরিহাস। 1992 সালে বলকান অঞ্চলে যুদ্ধ শুরু হবার পর শোনা যায় কুড়ি হাজারেরও বেশি নিরপরাধ মহিলার ওপর পাশবিক নির্যাতন চালানো হয়। এর পর মাত্র এক বছর সময়ের মধ্যে রোয়ান্ডায় চূড়ান্ত অত্যাচারিত হন 15,700 নারী। রাষ্ট্রসংঘের সমীক্ষাতেই ধরা পড়েছে এক অস্বস্তিকর ও বেদনাদায়ক তথ্য—যারা রক্ষক, তারাই ভক্ষক, কারণ রাষ্ট্রসংঘের শান্তিরক্ষা বাহিনী কোথাও পৌঁছবার সাথে সাথেই সে অঞ্চলে নাবালিকাদের দেহ-ব্যবসায়ে নামানোর হার দ্রুত বেড়ে গেছে।

এরপর যুগ পরিবর্তনে নারীর অনেক ক্ষমতা সীমিত হয়ে পড়ে। নারীদের মৌলিক অধিকার খর্ব করা হয়। পুরুষশাসিত সমাজে লাঞ্ছনা, গঞ্জনা, অত্যাচার ও নিপীড়নে নারীর জীবনে এক অসাম্য অধ্যায়ের সূচনা হয়। পুরুষশাসিত সমাজে নারী পুরুষের হাতে ক্রীড়নকে পরিণত হয়ে পড়ে। পরিবারের চার দেওয়ালের বাইরে তাদের কোনো জীবন ছিলনা। সামাজিক কুসংস্কার, অশিক্ষা ও নিপীড়নের এক অন্ধকার অধ্যায় নারীর জীবনে নেমে আসে।

I am the woman who holds up the sky
The rainbow runs through my eyes
The sun makes a path through my womb
My thoughts are in the shape of clouds
But my words are yet to come.

(J.N. Bhat, "Gender Equality : Turmoil or Triumph", AIR Journal, Vol. 16, 1998)

নারী জাগরণের সূচনায় বেথুন, বিদ্যাসাগর, রামমোহন রায়ের মত মুক্ত পুরুষের অবদান অস্বীকার করা যায় না। এছাড়া আরও অনেক ব্যক্তিত্ব এ ব্যাপারে নারীদের সচেতন করে সমাজের উন্নতির পথ প্রদর্শন করেছেন।

বেশিরভাগ পুরুষ কিন্তু তাদের পূর্ণ অধিকার ও আধিপত্য নিয়ে সমাজে শ্রেষ্ঠ হয়ে বিরাজ করতে লাগল। নারীর স্থান পুরুষের নিচে, তাদের কোনো স্বাধীন সত্তা নেই—এই মনোভাবের অধিকারী হয়ে তারা দাপটের সঙ্গে সংসারে বিরাজ করতে লাগল। উনবিংশ শতাব্দীর নবজাগরণের ফলে শিল্প, বাণিজ্য, শিক্ষা, সমাজ সর্বক্ষেত্রেই এক বৈপ্লবিক চিন্তাধারার সূচনা হয়। স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে এই অভ্যুত্থানের সামিল হন। কিছু নারীদরদী মহাপুরুষের প্রচেষ্টায় নারীদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি পেতে থাকে। সমাজে তারাও একজন, তাদেরকে সংসার

সমাজে প্রয়োজন আছে এ ভাবনা শুরু হয়। দেশ শুধু পুরুষের নয়। নারীদেরও সেখানে স্থান আছে। সমস্ত অধিকার, সুযোগ-সুবিধা পুরুষদের কুক্ষিগত থাকবে এটা সুস্থ মানসিকতার লক্ষণ নয়। একথা নারীরা বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রমাণ রেখেছে। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে বহু নারী নির্বিবাদে হাসিমুখে প্রাণ দিয়েছে, যুদ্ধ করেছে, নেতৃত্ব দিয়েছে দেশবাসীকে।

কিন্তু এত কিছু করেও নারী-পুরুষের মধ্যে যে পার্থক্য করা হত তা সম্পূর্ণ দূর করা যায়নি। এখনও আমাদের সমাজ পুরুষ দ্বারা শাসিত। এখানে পুরুষরাই সবকিছু নির্ধারণ করে। মেয়েদের মতো ছেলেদের অধিকার অর্জন করতে বা আদায় করতে লড়াই করতে হয় নি। জন্ম থেকেই তারা এক বিশেষ সুবিধা ভোগ করে আসছে। একটি অন্যায় করলে পুত্রসন্তান পার পেয়ে যায়, তারা পুত্রসন্তান বলে। বাড়িতে খাদ্য পরিবেশনের সময় পুত্রদের প্রতিবেশি পক্ষপাতিত্ব দেখানো হয়। এই পার্থক্য বা ভেদাভেদ শিক্ষাদীক্ষায় সর্বত্রই লক্ষণীয়। ছেলেরা লেখাপড়া শিখে ভালো চাকরি করে বাবার পিছনে দাঁড়াবে আর মেয়েদের অন্য বাড়িতে পাঠাতে হবে অনেক খরচ করে। সুতরাং কাঁড়ি টাকা মেয়েদের শিক্ষায় ঢেলে কি লাভ, এই মধ্যযুগীয় মনোভাব এখনও আকছার দেখা যায়। এখনও সংবাদপত্রে বেরোয় নারী কন্যাসন্তানের জন্মের জন্য নিপীড়িত হচ্ছে। কন্যারা বাবা-মার গলগ্রহ এই সামাজিক প্রথার শিকার হয়ে কন্যাসন্তানরা আত্মঘাতী হচ্ছে, আজকাল বৈজ্ঞানিক যন্ত্রের সাহায্যে মাতৃজঠরে ভ্রূণের লিঙ্গ নির্ধারণ করা যাচ্ছে এবং কন্যা সন্তানদের ভ্রূণ নষ্ট করা হচ্ছে এই একবিংশ শতাব্দীতে এসেও। (কমল ইন্দু : প্রশ্ন অধিকোষ : সমাজতত্ত্ব)

সারণি : দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলিতে নিরক্ষরতা

দেশ	নিরক্ষতার শতকরা হার	
	মহিলা	পুরুষ
বাংলাদেশ	74	70
ভূটান	51	42
ভারত	62	35
মালদ্বীপ	4	4
নেপাল	81	76
পাকিস্তান	47	46
শ্রীলঙ্কা	76	46
দক্ষিণ এশিয়া	62.8	35.9
After Human Development in South Asia, The Gender Question, Oxford, Karachi.		

নারী উন্নয়ন সূচক (GDI)

যে সূচকের সাহায্যে সমাজে নারী ও পুরুষের মধ্যে উন্নয়নের অসাম্য বা পার্থক্য (inequalities) নিরূপণ করা যায়, তাকে নারী উন্নয়ন সূচক বা জেনডার রিলেটেড ডেভেলপমেন্ট ইনডেক্স (Gender Related Development Index, GDI) বলে। আলোচ্য সূচকটি পরিমাপের জন্য HDI-এর অন্তর্গত তিনটি "প্রাথমিক মাত্রা" (Three basic dimensions)-এর উপর ভিত্তি করে নারী-পুরুষের অসমতার মান নির্ণয় করা হয়।

মানবিক উন্নয়ন সূচক (HDI) হিসেব করার সময়ে যেমন "গোলপোস্ট" মান-এর উপর নির্ভর করা হয়, GDI-এর ক্ষেত্রেও সুনির্দিষ্ট "গোলপোস্ট" (goalpost) মান আছে। যেমন—

সারণি : GDI পরিমাপের জন্য গৃহীত "গোলপোস্ট" মানসমূহ—

সূচক (Indicator)	সর্বোচ্চ মান (Maximum Value)	সর্বনিম্ন মান (Minimum Value)
মহিলাদের প্রত্যাশিত আয়ু (বছরের হিসেব)	৮৭.৫	২৭.৫
পুরুষদের প্রত্যাশিত আয়ু (বছরের হিসেব)	৮২.৫	২২.৫
প্রাপ্তবয়স্কদের মধ্যে সাক্ষরতার হার (%)	১০০	০
নারী-পুরুষ নির্বিশেষে শিক্ষার্থীর অনুপাত (%)	১০০	০
নির্ণীত উপার্জিত আয় (US $)	৪০,০০০	১০০

[উৎস : Human Development Report 2006]

এখানে উল্লেখ করা যায় যে, সর্বনিম্ন GDI হল - (শূন্য) এবং সর্বোচ্চ ১ (এক)

সারণি : GDI অনুসারে পৃথিবীর কয়েকটি দেশের অবস্থা

সমাজের নারীদের অবস্থা	GDI ক্রম (Rank)	GDI-এর মান (Value)	দেশ
সবচেয়ে ভালো ↑	১	০.৯৬২	নরওয়ে
	৮	০.৯৪৬	আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র
	১৬	০.৯৩৮	ব্রিটিশ যুক্তরাজ্য
	৯৬	০.৫৯১	ভারত
	১০৫	০.৫১৩	পাকিস্তান
সবচেয়ে খারাপ	১৩৬	০.২৯২	নাইজার

উৎস : অর্থনৈতিক ভূগোল ও সম্পদ শাস্ত্রের পরিচয় : অনীশ চট্টোপাধ্যায়।

মেয়েরা সুযোগ-সুবিধা যতই পাক, তাদের উন্নতির পথ থেকে বাধা যতই দূর হোক সমাজটা পুরুষশাসিত রয়ে গেছে। এখানে পুরুষদের প্রাধান্য রয়েই গেছে। পুরুষদের মতামত, সুবিধা-অসুবিধাকে এখনও প্রাধান্য দেওয়া হয়। এক জায়গায় থেকেও চাকুরে স্ত্রী হলে স্বামীর ইচ্ছায় স্ত্রীকে প্রায়ই চাকরি ছাড়তে হয়, সে যত ভালো চাকরি করুক না কেন। স্বামীরা অফিস থেকে বাড়ি ফিরতে দেরি হলে কোনো প্রশ্ন ওঠে না। কিন্তু স্ত্রী বা মেয়েরা দেরি করলে নানান জবাবদিহি করতে হয় এবং বাড়িতে নানা অশান্তি হয়।

I too have given Agnipariksha
Not one but many
Everyday, a new one
Howeer, this Agnipariksha

Is not to prove myself of this or that Ram
But to make myself
Worthy of freedom
Everyday your envious, dirty looks
Reduced me to ashes
And everyday, like a phoenix I arose again
Out of my own ashes...
Who is Ram to reject me?
I have rejected that entry society
Which has converted
Homes into prisons

(Madhu Kishwar, 1999 : *Off the Beaten Track : Rethinking Gender Justice for Indian Women,* Oxford, New Delhi)

শিশুরা ধীরে ধীরে মায়ের আঁচল থেকে বেরিয়ে আসে এবং এক আদর্শ পুরুষকে খোঁজে। প্রাথমিক স্তরে বাবা তাদের কাছে আদর্শ পুরুষ হবে এটাই স্বাভাবিক।

কিন্তু দুঃখের বিষয় এ ব্যাপারে পুরুষরা যথেষ্ট অবহিত নন। সন্তান পালনে মা-বাবার দুজনারই ভূমিকা আছে। তবেই তারা সঠিক পথে জীবনকে চালনা করতে পারে। কিন্তু এই কাজটাও মায়েদের উপর চাপিয়ে দিয়ে তারা সমালোচকের দৃষ্টিতে সন্তানদের সমালোচনা করে তাদের দায়িত্ব পালন করেন।

সংক্ষেপে লিঙ্গ বৈষম্যের কারণগুলো হল নিম্নরূপ ঃ

কর্মক্ষেত্রে বৈষম্য ঃ নারী পরিবারে সন্তানধারণ, প্রতিপালন, গৃহস্থালির সব কাজকর্ম করেও পরিবারের অন্নসংস্থানের জন্য অর্থ উপার্জনমুখী কাজ করে থাকেন। গ্রামে কৃষিক্ষেত্রে, বনে কাঠ সংগ্রহ, পাথরখাদানে, হস্তশিল্পে, কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পে এবং অফিস-কাছারি সর্বত্রই পুরুষদের পাশাপাশি নারী কর্মীদের দেখা যায়। কিন্তু অসংগঠিত ক্ষেত্রে একই কাজের জন্য পুরুষ শ্রমিক অপেক্ষা নারী ও শিশু শ্রমিককে অনেক কম মজুরি দেওয়া হয়। বাইরে পরিশ্রম করে আসার পরও গৃহস্থালির কাজ থেকে নারীর নিস্তার নেই। এমনকি প্রসূতি নারীও অনেক সময় ঘরে বাইরে কাজ থেকে বিশেষ অব্যাহতি পায় না। কর্মস্থলেও অনেক সময় নারীদের প্রতিকূল পরিবেশে কাজ করতে হয়। ভারী কাজ, দীর্ঘদিন পরিশ্রম করা, অতিরিক্ত কাজের জন্য কোনো মজুরি না পাওয়া, কোথাও কোথাও যৌন লাঞ্ছনা নারীদের সহ্য করতে হয়।

নারীদের ক্ষমতার পরিমাপ (GEM)

যে সূচকের সাহায্যে সমাজের সকল স্তরে নারীদের হাতে কতটুকু ক্ষমতা আছে, তা চিহ্নিত করা যায়, তাকে নারীদের ক্ষমতার পরিমাপ বা জেনডার এমপাওয়ারমেন্ট মেজার (Gender Empowerment Measure, GEM) বলে। বস্তুতপক্ষে, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক জীবনে নারীর সক্রিয় ভূমিকা পরিমাপের জন্য GEM ব্যবহার করা হয়। GEM পরিমাপের জন্য তিনটি বিশেষ ক্ষেত্র নির্বাচন করা হয়েছে। যেমন—

রাজনীতিতে মহিলাদের অংশগ্রহণ ও সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা ঃ পার্লামেন্টের মোট আসনের মধ্যে পুরুষ ও মহিলাদের আসনের অনুপাতের ভিত্তিতে GEM হিসেব করা হয়।

অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে মহিলাদের অংশগ্রহণ ও সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা ঃ বিধায়ক, উচ্চ পদস্থ অফিসার, ম্যানেজার প্রভৃতি উঁচু পদে কত শতাংশ মহিলা আছেন, সেই তথ্যের উপর ভিত্তি করে GEM হিসেব করা হয়।

অর্থনৈতিক সম্পদের উপর আধিপত্য ঃ মোট আয়ের কত শতাংশ নারীদের অর্জিত, সেই সংখ্যার উপর ভিত্তি করে GEM হিসেব করা হয়। GEM এর সর্বনিম্ন মান (০) শূন্য ও সর্বোচ্চ মান (১) এক।

সারণি ঃ GEM অনুসারে পৃথিবীর কয়েকটি দেশের অবস্থা

সমাজের নারীদের অবস্থা	GEM ক্রম (Rank)	GEM-এর মান (Value)	দেশ
সবচেয়ে ভালো	১	০.৯৬২	নরওয়ে
↑	২	০.৮৮৩	সুইডেন
	৪	০.৮৬১	ডেনমার্ক
	১২	০.৮০৮	আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র
	১৬	০.৭৫৫	যুক্তরাজ্য
	-	-	ভারত
	৬৬	০.৩৭৭	পাকিস্তান
	৬৭	০.৩৭৪	বাংলাদেশ
পুরুষের চেয়ে পিছিয়ে	৭৫	০.১২৮	ইয়েমেন

উৎস ঃ Human Development Report 2000

শিল্প অসাম্য ঃ উন্নয়নশীল দেশগুলিতে নারী শিক্ষার হার পুরুষের তুলনায় অনেক কম দেখা যায়। 2001 সালে ভারতে সাক্ষরতার হার ছিল 65%। এই সময় পুরুষদের মধ্যে সাক্ষরতার হার ছিল প্রায় 76% এবং নারীদের মধ্যে সাক্ষরতার হার ছিল 54% (Census of India, 2001)।

জনসংখ্যায় অসাম্য ঃ উন্নয়নশীল দেশগুলিতে দেখা যায় পুরুষের তুলনায় নারীর সংখ্যা কম। ভারতে 2001 সালের জনগণনা অনুসারে প্রতি হাজার পুরুষে 903 জন নারী। উন্নত দেশগুলিতে কিন্তু নারী-পুরুষের সংখ্যায় এরকম তফাত নেই। যে দেশগুলোতে নারী-শিশু অবহেলিত, প্রসূতির ভগ্নস্বাস্থ্য পুষ্টি ও সুচিকিৎসায় অভাব রয়েছে, সন্তান জন্মদানের পর মায়ের বিশেষ যত্ন নাই, সেই সব দেশে নারীর মৃত্যুহার বেশি হওয়ায় পুরুষের তুলনায় নারীর সংখ্যা কম। উন্নয়নশীল বহু দেশেই নারীরা বৈষম্যের শিকার হওয়ায় নারীর সংখ্যা কম হয়। উপরোক্ত কারণ ছাড়াও বেআইনিভাবে লিঙ্গ নির্ধারণ দ্বারা স্ত্রী-ভ্রূণ হত্যা জন্মদানের পর নারী-শিশুর গোপন হত্যা যৌতুক সংক্রান্ত কারণে হত্যা ইত্যাদিও নারী সংখ্যা কম হওয়ার কারণ।

বিবাহের বয়স ঃ গ্রামাঞ্চলে অভিভাবকরা কন্যার বিয়ের বয়সের সরকারি নিয়ম (১৮ বছর)-এর ধার ধারেন না। বয়ঃসন্ধি পার হলেই অভিভাবকেরা মেয়েদের বিয়ে দেবার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েন। কিছু কিছু অঞ্চলে এখনও বাল্যবিবাহ দেওয়ার রীতি রয়েছে। অল্প বয়সে বিয়ে দিলে মেয়েদের শরীর ও মনের ওপর চাপ পড়ে। এ থেকে মেয়েরা শারীরিক ও মানসিক রোগগ্রস্ত হতে পারে। অল্পবয়সে মাতৃত্বও জটিল সমস্যার সৃষ্টি করতে পারে।

উন্নয়নশীল বহু দেশেই অল্পবয়সে বিবাহ হবার জন্য নারী শৈশবের কতকাংশ এবং কৈশোর জীবনের আনন্দ হতে বঞ্চিত হয়। গ্রামাঞ্চলে ও শহরে নিম্নবর্ণের লোকদের মধ্যে অল্পবয়সে বিয়ে দেবার ব্যাপারে মেয়েদের মতামতকে প্রায়শই গুরুত্ব দেওয়া হয় না। ফলে বিবাহের পর মেয়েদের আর্থিক, সামাজিক ও মানসিক অবস্থার উন্নতির বদলে অনেক সময়ই অবনতি হয়।

উপসংহার

মেয়েরা নানাক্ষেত্রে দক্ষতা দেখবার যথেষ্ট সুযোগ পাচ্ছে। তবুও নারী-পুরুষদের মধ্যে একটা সীমারেখা টানতে হয় এই পার্থক্য বা বিভেদ মেনে নিলে মেয়েদের অধিকার বিন্দুমাত্র খর্ব হয় না। প্রত্যেকটি ব্যাপারে নারী ও পুরুষ একাকার হলে প্রকৃতির ভারসাম্য নষ্ট হয়। তা সমাজকে কলুষিত করে। রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ মেয়ে ও ছেলেদের সমানাধিকার স্বীকার করে নিয়ে বলেছেন—নারী-পুরুষদের equality বা সমানাধিকার থাকবে কিন্তু uniformity নয়। অর্থাৎ সমানাধিকার মানে নারী-পুরুষ একাকার হয়ে যাওয়া নয়। এটা ভাববার কথা। প্রকৃতিকে অস্বীকার করে কোনো সুস্থ সমাজব্যবস্থা গড়ে তোলা যায় না। প্রতিটি মানুষই একে অপর থেকে পৃথক সে ছেলেই হোক অথবা মেয়েই হোক। আর নারী-পুরুষের পার্থক্যটা শাশ্বতকালের এই ঘটনাকে সহজভাবে মেনে নিয়ে যে যার ক্ষমতা অনুযায়ী সঠিক পথে এগোতে পারলে সমস্যা প্রকট হয় না।

আজকাল মেয়েরা এই সমানাধিকার নিয়ে এত সোচ্চার এবং প্রতিযোগিতামূলক মনোভাব এত তীব্র হয়ে উঠেছে যে মেয়েরা যেন খানিকটা দিশেহারা। ফলে তাদের আচরণ পরস্পর বিরোধী হয়ে উঠছে। নারীরা সমানাধিকার নিয়ে সোচ্চার হলেও কোনো কোনে ব্যাপারে নিজেদের ইচ্ছা চরিতার্থ করতে প্রতিষ্ঠা ও prominence পাবার জন্য পুরুষের অধীনতা স্বীকারে বা তাদের দ্বারস্থ হতে কোনো সংকোচ বা দ্বিধা নেই। **(কমন ইন্দু : প্রশ্ন অধিকোষ : সমাজতত্ত্ব : চতুর্থ খণ্ড)**

অনুরূপভাবে সমানাধিকার বা স্বাধীনতার দোহাই দিয়ে পুরুষজাতিকে নস্যাৎ করাবর কোনো মানসিকতা সমর্থনযোগ্য নয়। পুরুষজাতি তাদের দৈহিক ও মানসিক ক্ষমতার জোরে চলতে চায়—ক্ষেত্রবিশেষে তাদের বাড়তি ক্ষমতাকে স্বীকার করে নিলে জগতে কারোর ক্ষতি হবার কারণ আছে বলে মনে হয় না। স্ত্রী ও পুরুষ পরস্পরের পক্ষে অপরিহার্য। এক অপরের পরিপূরক।

সাক্ষরতা ও শিক্ষা (Literacy and Education) সংক্রান্ত :

"The United Nations has defined literacy as the ability of a person to read and write, understanding a short simple statement on his everyday life." (Bhande and Kanitkar, 1985) ভারতীয় জনগণনা দপ্তরের মতে যদি কোন ব্যক্তি যে কোন ভাষায় লিখতে ও পড়তে পারেন, তবে তাকে সাক্ষর বলা যাবে। এই পরিপ্রেক্ষিতে মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রক ও পরিকল্পনা কমিশন ঠিক করেছেন যে 7 বছর ও তার বেশি বয়সীদের সাক্ষর হিসেবে গণ্য করতে হবে। এখন প্রশ্ন হল শিক্ষা কি, শিক্ষার উদ্দেশ্য কি, বা পৃথিবীকে বয়স্ক শিক্ষিতের হার কিরূপ?

শিক্ষা হল মানব সমাজের একটি মৌলিক কার্যপ্রক্রিয়া। শিক্ষা বলতে অ্যারিস্টটল বলেছেন যে, এর উদ্দেশ্য হল শিক্ষার্থীকে বড় করে তোলা বা সাফল্যের সঙ্গে মানসিকতা গড়ে তোলা "According to Aristotle, to educate ment to develop man's faculties, especially his mind so that he may be able to enjoy the contemplation of supreme truth, beauty and goodness." (Vidya Bhusan & Sachdeva)। গ্রীক

দার্শনিক প্লেটো (Plato)-র মতানুসারে শিক্ষার আসল উদ্দেশ্য হল জ্ঞানার্জন। দার্শনিক রাসেল (Bertrand Russel)-এর মতে, শিক্ষার, উদ্দেশ্য হল মানুষের সৎ চরিত্র গঠন করা। স্পেনসার (Herbert Spencer)-এর মতানুসারে, শিক্ষার লক্ষ্য হল পরিপূর্ণ জীবনের সামগ্রিক স্বার্থে প্রয়োজনীয় সবকিছু করার জন্য যথাসম্ভব শিক্ষার্থীকে গড়ে তোলা। ভারতীয় দার্শনিক অধ্যাপক সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন তাঁর University Education Commission-এর প্রতিবেদনে মন্তব্য করেছেন, "The purpose of all education, it is admitted by thinkers of Est and West, is to provide a coherent picture of the universe and integrated way of life."

শিক্ষা মানুষকে স্বাধীন চিন্তা করার ক্ষমতা দেয়। ভাল-মন্দ, সত্য-মিথ্যা বোঝার ক্ষমতা শিক্ষার মাধমে মানুষের মধ্যে জন্মায়। শিক্ষার উদ্দেশ্য সমাজের ঐক্য বা সংহতিকে সুদৃঢ় করা। মানব সম্পদের বিকাশের জন্য শি৭ার অবদান অপরিসীম।

সম্ভবত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হল, শিক্ষা আয়ের সঙ্গে গভীরভাবে সম্পর্কিত। প্রকৃতপক্ষে শিক্ষা না থাকলে আমোদপ্রমোদ, গণতান্ত্রিক অধিকার, উপার্জন ইত্যাদি সবকিছুরই দরজা বন্ধ। তাই তাদের জীবনকুশলতার পরিমাণ সিমাবন্ধ হয়ে যায়।

শিক্ষার দুটি দিক আছে—(1) সাধারণ শিক্ষা যা মানুষকে সাধারণভাবে জীবনে চলবার পথে সাহায্য করে। (2) অর্থনৈতিক জীবনে প্রতিষ্ঠা লাভ করার জন্যও শিক্ষা প্রয়োজন হয়। উন্নয়নশীল দেশে শিক্ষাখাতে প্রচুর ব্যয় করা হচ্ছে। কিন্তু যথেচ্ছভাবে ব্যয় করলেই শিক্ষার প্রসার লাভ হবে এ কথা বাল যায় না।

শিক্ষার স্তরবিন্যাস আছে : (a) প্রাথমিক শিক্ষা স্তরে মানুষ কিছু ভাষা-জ্ঞান, সংখ্যা-গণনা ইত্যাদি আয়ত্ত করে। শৈশবেই এই শিক্ষা শেষ হয়। সেজন্য কোনও দেশের প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থায় বিনিয়োগ করার সময় সেখানে 6 থেকে 11 বা ওইরকম বয়ঃগোষ্ঠীর বালক-বালিকার সংখ্যা কত তা অবশ্য জানতে হয়।

(b) প্রাথমিক স্তরের পর আসে মাধ্যমিক স্তর। এই স্তরে মোটামুটি ানেক জ্ঞাতব্য বিষয় সম্বন্ধেই মানুষকে জানতে হয়।

মাধ্যমিক স্তর পেরোলে মানুষ জীবনপথে চলবার কিছুটা পাথেয় সংগ্রহ করে নিতে পারে। সমাজের অধিকাংশ মানুষ যদি এই স্তর পার হয় তাহলেই সেই সমাজ শিক্ষিত-সমাজরূপে পরিগণিত হতে পারে।

(c) মাধ্যমিক স্তরের পরে আসে উচ্চ শিক্ষার স্তর। এখানেই বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে দক্ষতার প্রশ্ন ওঠে।

উচ্চশিক্ষার গুরুত্ব মানবজীবনে অপরিসীম। দরিদ্র দেশে সাধারণ শিক্ষাস্তর পার হাবর সুযোগ অধিকাংশ লোক পান না। তাই অনেকেই এসব দেশে উচ্চশিক্ষার খাতে বেশি ব্যয় করার পক্ষপাতী নন।

শিক্ষার মান ও যোগ্যতার কথা বাদ দিয়ে সাক্ষরতাকে যদি শিক্ষার মাপকাটি হিসেবে ধরা হয়, তবে দেখা যায় যে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে সাক্ষরতা-জ্ঞানসম্পন্ন জনতার হার শতকরা 30 জন মাত্র। এশিয়া ও আফ্রিকার দেশসমূহে শিক্ষার এই নিম্নমান সম্পদ সৃষ্টির পথে অন্তরায়। সংখ্যার দিক থেকে সেখানে মানব সম্পদ অনেক; কিন্তু গুণগত মানের বিচারে তা খুব নগণ্য। সুতরাং মানবসম্পদের উন্নয়নের জন্য সবার আগে যা দরকার তা হল শিক্ষার বিস্তার (গুহ, 1987)।

পৃথিবীর এক-তৃতীয়াংশ মানুষই নিরক্ষর। অবশ্য সাক্ষরতা সম্বন্ধে পর্যাপ্ত ও নির্ভরশীল পরিসংখ্যানে নেই। এমন কি, সম্মিলিত জাতিপুঞ্জও পৃথিবীতে সাক্ষরতা বণ্টন নিয়ে কোন মানচিত্র প্রকাশ করে নি (Hussain,

2002)। যাহ্ হোক, প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে বলা চলা যে আফ্রিকায় সবচেয়ে কমসংখ্যক মানুষ শিক্ষিত। উন্নয়নশীল দেশগুলোতে নারীশিক্ষার হার খুব কম। আফ্রিকার চেয়ে এশিয়ার সাক্ষরতার হার সামান্য বেশি, যদিও ত্র 30 শতাংশের কম। দক্ষিণ আমেরিকায় অবশ্য সাক্ষরতার হার তুলনামূলকভাবে বেশি। আবার শহর ও গ্রামের শিক্ষিতের হারেও তফাত আছে।

পৃথিবীতে নিরক্ষরের সংখ্যা সম্ভবত ভারতেই সবচেয়ে বেশি (28.1 কোটি)। গোটা বিশ্বের 30 শতাংশ বয়স্ক নিরক্ষরের দেশ এই ভারতভূমি। আবার পৃথিবীর 22 শতাংশ নিরক্ষর শিশুও ভারতীয়। বর্তমান বাৎসরিক জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার আগামী দিনে এই অবস্থাকে আরও সঙ্গীন করে তুলবে। আরও লক্ষ্যণীয় যে, ভারতবর্ষের 60 শতাংশ নারী-ই নিরক্ষর। প্রাথমিক স্তরে শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে চিন আজ ভারতকে ছড়িয়ে গেছে। UNESCO-র একটি সাম্প্রতিক রিপোর্টে প্রকাশ পেয়েছে যে, ভারত 87টি উন্নয়নশীল দেশের মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে 50-তম স্থানে রয়েছে।

নাইজার, নেপাল, সেনেগাল, পাকিস্তান, বাংলাদেশ প্রভৃতি দেশে শিক্ষার অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। নাইজারে মাত্র 13.6 শতাংশ, নেপালে 27.5 শতাংশ, সেনেসালে 33.2 শতাংশ, পাকিস্তানে 37.8 শতাংশ এবং বাংলাদেশে 38.1 শতাংশ মানুষ শিক্ষিত। আবার নারী-পুরুষের শিক্ষার হারের পার্থক্য লক্ষণীয়।

শিক্ষার এই নিম্নমানের জন্য উন্নয়নশীল দেশের লোকেরা স্বাস্থ্য ও পুষ্টি সম্বন্ধে সচেতন নন। এবার প্রাথমিক শিক্ষার কথায় আসা যাক। সারণি থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, উন্নয়নশীল দেশগুলোর মধ্যেই স্কুলে ভর্তি হওয়ার অনুপাত, বা শিক্ষক/শিক্ষার্থীর অনুপাত কিংবা মোট সাক্ষরতার হারেই প্রভেদ রয়েছে।

সারণি : উন্নয়নশীল দেশগুলোতে বুনিয়াদী শিক্ষার অবস্থা

দেশ	স্কুলে ভর্তি হওয়ার অনুপাত %	চতুর্থ শ্রেণি পর্যন্ত পড়াশোনা চালাতে পারে %	শিক্ষক/শিক্ষার্থী অনুপাত	মোট সাক্ষরতার হার %
মেক্সিকো	98.0	81	31	87.3
ব্রাজিল	88.0	47	23	81.1
ইন্দোনেশিয়া	96.7	89	23	77.0
চীন	100.0	86	22	73.0
নাইজেরিয়া	59.3	67	41	50.7
মিশর	91.0	99	23	48.4
ভারত	66.3	61	46	48.2
পাকিস্তান	29.3	59	41	37.8
বাংলাদেশ	62.9	52	63	38.1

সূত্র ঃ মনোরমা ইয়ারবুক, 1996

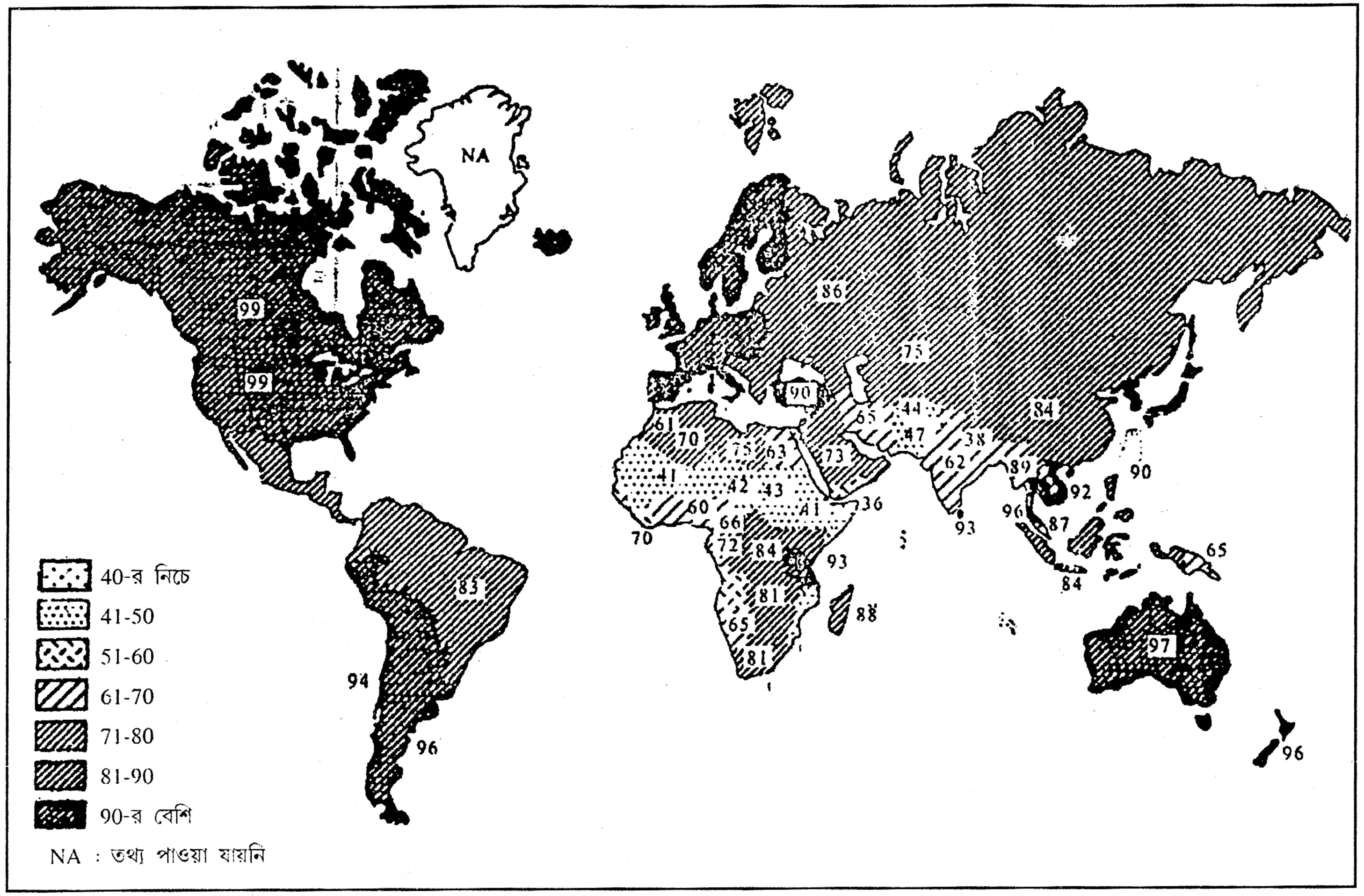

চিত্র 2.45 : পৃথিবী : প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ শিক্ষিতের হার, 1995

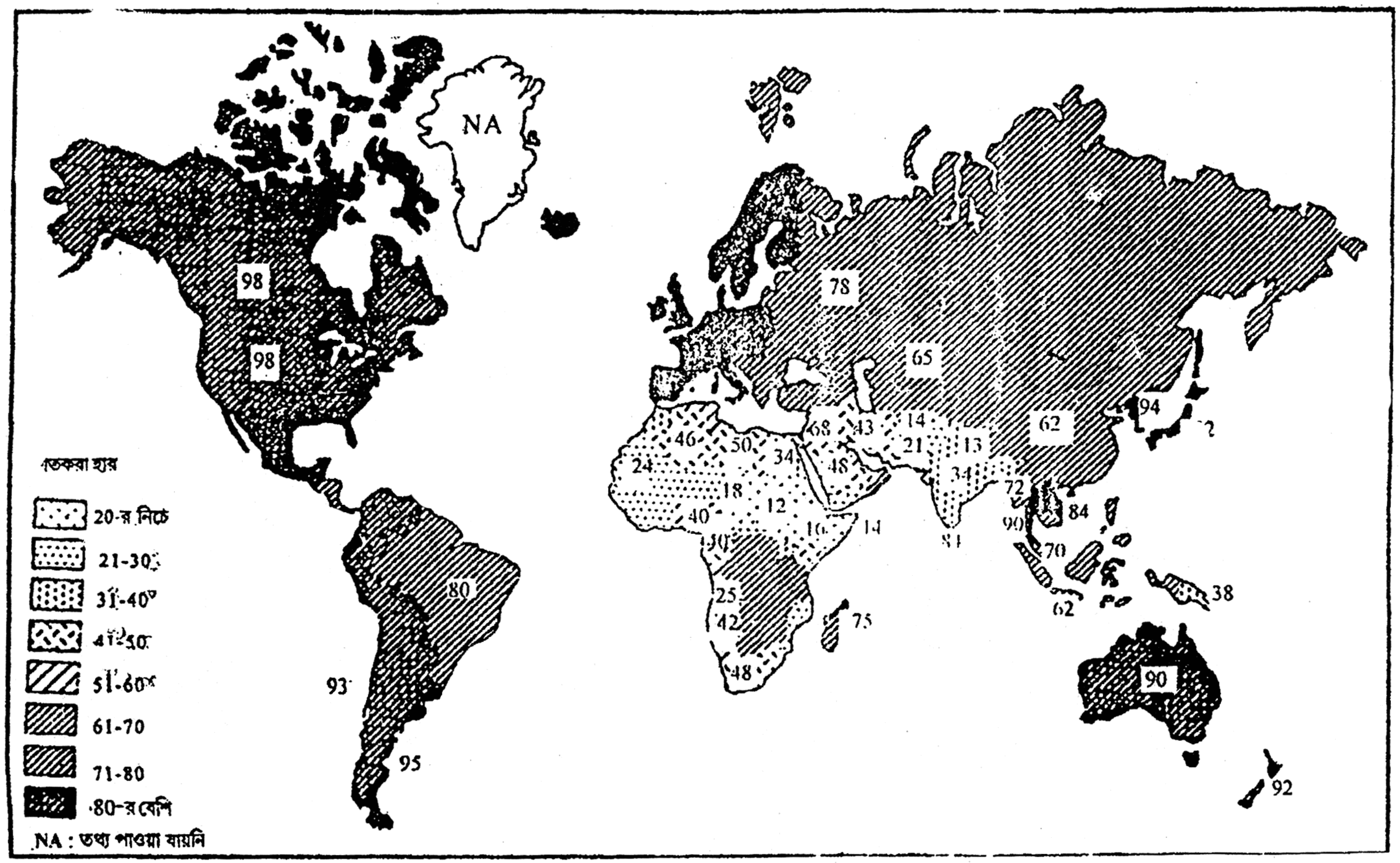

চিত্র 2.46 : পৃথিবী : প্রাপ্তবয়স্ক নারী শিক্ষার হার, 1995

ভারতের সাক্ষরতার হার কম, কারণ প্রাচীন ঐতিহ্য। বর্ণবৈষম্য প্রথানুযায়ী সমাজের উচ্চবর্ণের লোকদেরই শুধুমাত্র শিক্ষার অধিকার ছিল, ফলস্বরূপ বৃত্তির প্রয়োজনে শিক্ষাগ্রহণ করা হত। যা হোক, আজও আমাদের দেশে শিক্ষার হার কম হওয়ার কারণ হল বর্ণভিত্তিক সমাজ, প্রধানত কৃষিভিত্তিক অর্থনীতি যেখানে কলাকৌশলের প্রয়োগ কম, নারীদের পরিযাণ (migration), শিক্ষা ও চাকরির বিরুধে কুসংস্কার, দারিদ্র্য, শিক্ষার প্রচুর খরচ, স্কুলের সীমিত সুযোগ, ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা ও তাদের অশিক্ষা।

শুধুমাত্র অঞ্চলভিত্তিক সাক্ষরতার হারে পার্থক্য নয়, নারী ও পুরুষ, গ্রাম ও শহর এবং বর্ণভিত্তিক উপরিভাগের মধ্যে পার্থক্যও ভারতের সাক্ষরতার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এই ধরনের পার্থক্যের হেতু হল উক্ত অঞ্চল বা জনতার আর্থ-সামাজিক পটভূমিকা। 1991 সালের লোকগণনায় শিক্ষাহারে নিম্নোক্ত আঞ্চলিক পার্থক্য চোখে পড়ে (সারণি 2.13)। ভারতের রাজ্যসমূহের মধ্যে কেরালায় শিক্ষার হার সবচেয়ে বেশি। এর পরের স্থান হল মিজোরাম, গোয়া, তামিলনাড়ু, হিমাচলপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, নাগাল্যান্ড, মণিপুর, গুজরাট ও ত্রিপুরার। এ থেকে বলা যেতে পারে যে ভারতের পঁচিশটি রাজ্যের মধ্যে দশটির 60 শতাংশের বেশি লোক সাক্ষর। এই সব রাজ্যগুলোর কয়েকটিতে বেশ কিছু খ্রিস্টধর্মাবলম্বী ব্যক্তি রয়েছেন, যেমন মিজোরাম (83.8 শতাংশ), নাগাল্যান্ড (80.0), মণিপুর (29.7), গোয়া (29.1), কেরালা (20.7)। এইসব রাজ্যগুলোর বেশির ভাগই জাতীয় গড়ের চেয়ে শিক্ষাখাতে অনেক বেশি ব্যয় করে। কেরালায় উচ্চ শিক্ষা হারের মূলে রয়েছে সেখানকার প্রশাসনের দীর্ঘকালীন প্রচেষ্টা, এক বৃহৎ-সংখ্যক জনতার অ-কৃষিকার্যে নিয়োগ ও খ্রিস্টান মিশনারীদের প্রভাব। খ্রিস্টধর্মাবলম্বী কম এমন কিছু রাজ্যে উচ্চশিক্ষার হার বেশি, কারণ হল সেখানকার শিল্প পরিকাঠামো, কারিগরি ও প্রশাসনিক দক্ষতা।

পাঞ্জাব রাজ্যে মাথাপিছু আয় অনেক বেশি, অথচ সেখানকার শিক্ষার হার 57.1 শতাংশ। এর কারণ হল এই রাজ্য কৃষির উন্নতির জন্য খাল, টিউওয়েল, রাস্তা, বিদ্যুৎ ইত্যাদির ওপর গুরুত্ব দিচ্ছে। দ্বিতীয়ত, এই রাজ্য থেকে অনেক শিক্ষিক ব্যক্তি দেশের অন্যান্য রাজ্য, এমনকি বিদেশে পাড়ি দিচ্ছেন। পক্ষান্তরে, উত্তরপ্রদেশ ও বিহার থেকে অনেক অশিক্ষিত ব্যক্তি এই রাজ্যে পাঞ্জাবে প্রবেশ করছেন।

কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলসমূহে শিক্ষার হার মোটামুটি সন্তোষজনক। দাদরা ও নগর হাভেশিতে শিক্ষার হার সবচেয়ে কম (39.4 শতাংশ)। এটি গ্রামীণ এলাকা, অন্যান্য অঞ্চলগুলো পৌর এলাকা, স্বভাবতই ওই সব স্থানে শিক্ষার হার বেশি। আর একটি লক্ষণীয় ব্যাপার হল যে এই লোকগণনায় চণ্ডীগড়ের তুলনায় লাক্ষাদ্বীপে শিক্ষার হার বেশি হয়েছে। যেহেতু লাক্ষাদ্বীপ সামরিক দিক দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ, তাই এখানে সামরিক বাহিনীর লোকজন এসেছেন। এঁরা শিক্ষিত। দ্বিতীয়ত, কেন্দ্রশাসিত এই অঞ্চলটি ছোট, তাই এখানে কিছু লোকের আগমন শিক্ষার হার (%) বড় রকম রদবদল ঘটিয়েছে। পক্ষান্তরে, চণ্ডীগড়ে অদক্ষ শ্রমিকদের পুনর্বাসনের জন্য কয়েকটি শিবির তৈরি করা হয়েছে। এজন্য এই লোকগণনায় চণ্ডীগড় শিক্ষার দিক দিয়ে পিছিয়ে রয়েছে।

ভারতবর্ষে শিক্ষার হার (i) উত্তর ভারত অপেক্ষা দক্ষিণ ভারতে, (ii) দেশের অভ্যন্তর ভাগ অপেক্ষা উপকূল এলাকা, (iii) পূর্বতন সনদ রাজ্য অপেক্ষা ব্রিটিশ শাসিত এলাকা, (iv) হিন্দী ভাষাভাষী এলাকা অপেক্ষা অ-হিন্দী ভাষাভাষী এলাকা, (v) অ-খ্রিস্টধর্মাবলম্বী উপজাতি এলাকা অপেক্ষা খ্রিস্টধর্মাবলম্বী উপজাতি এলাকা, (vi) স্বয়ংসম্পূর্ণ কৃষি অর্থনীতি এলাকা অপেক্ষা বাণিজ্যক কৃষি অর্থনীতি এলাকা, (vii) মাথাপিছু কম আয় অপেক্ষা বেশি আয় এলাকা এবং (viii) মুসলিম এলাকা অপেক্ষা অ-মুসলিম এলাকায় বেশি।

ভারতের সাক্ষরতার একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল যে পুরুষদের তুলনায় নারীরা শিক্ষার দিক দিয়ে অনেক পিছিয়ে আছেন। 1991 এর জনগণনায় পুরুষ-শিক্ষার হার যেখানে ছিল 63.86 শতাংশ, নারীশিক্ষার হার সেখানে 33.42 শতাংশ। আমাদের দেশের মহিলারা ঘরের চার দেওয়ালের মধ্যে আবধ্ধ থেকে সংসারের কর্তব্য পালন করেন।

পরিবারের অর্থনৈতিক সংগ্রামে তাঁদের ভূমিকা কম। এছাড়া রয়েছে দারিদ্র্য, সমাজে নারীর নিম্ন স্থান, কম বয়সে বিয়ে হওয়া ও তাদের পরিযাণ নিয়ে কুসংস্কার। আর্থ-সামাজিক সচেতনতা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ও বিবাহিত জীবনে শিক্ষার প্রয়োজন দেখা দেওয়ায় নারী-পুরুষের মধ্যে শিক্ষশ্রা হারের পার্থক্য ধীরে ধীরে কমে আসছে।

এবার ভারতের গ্রাম ও শহরের শিক্ষাহারের তুলনা করলে দেখা যাবে যে গ্রামাঞ্চলে শিক্ষার হার শহরের শিক্ষাহারের তুলনায় প্রায় অর্ধেক। এর কারণ হল উভয় এলাকার অর্থনীতি, সামাজিক জীবন ও অভিবাসনের ধরনের পার্থক্য। যেহেতু পৌর অর্থনীতির ভিত্তি হল অ-কৃষিকাজ, তাই স্বভাবতই শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা বাদ দেওয়া যায় না। শহরের সমাজব্যবস্থা এমনই যে প্রত্যেক নাগরিকই তার শিশুদের শিক্ষা দান করতে বাধ্য হন। আর শহরে যাঁরা রুজি রোজগারের সন্ধানে আসেন, তাঁদের অধিকাংশই শিক্ষিত, অর্ধ-শিক্ষিত পুরুষ ও নারী।

পৌর শিক্ষার হারের দিক দিয়ে মিজোরাম কেরালাকে ছাড়িয়ে গেছে আরও লক্ষণীয় যে অন্ধ্রপ্রদেশ, বিহার, রাজস্থান ও উত্তরপ্রদেশের শহরাঞ্চলে শিক্ষার হার 70 শতাংশের কম। অন্যান্য রাজ্যগুলোতে 70 শতাংশের বেশি। অরুণাচল প্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, মণিপুর, ওড়িশা, পাঞ্জাব রাজ্য জাতীয় গড়ের (73.0) তুলনায় পিছিয়ে আছে। কেন্দ্রশাসিত সব কটি অঞ্চলে পৌর শিক্ষিতের হার জাতীয় গড়ের তুলনায় বেশি। গ্রামীণ শিক্ষাহারের ক্ষেত্রে কেরালা সবার আগে রয়েছে। এর পরের স্থান হল মিজোরামের। আরও লক্ষণীয় যে অরুণাচল প্রদেশ, অন্ধ্রপ্রদেশ, বিহার, মধ্যপ্রদেশ, মেঘালয়, রাজস্থান, উত্তরপ্রদেশ ভারতের জাতীয় গড়ের (44.7 শতাংশ) তুলনায় পিছিয়ে আছে। অনুরূপভাবে বিভিন্ন সামাজিক গোষ্ঠীর মধ্যে শিক্ষার হারে পার্থক্য রয়েছে।

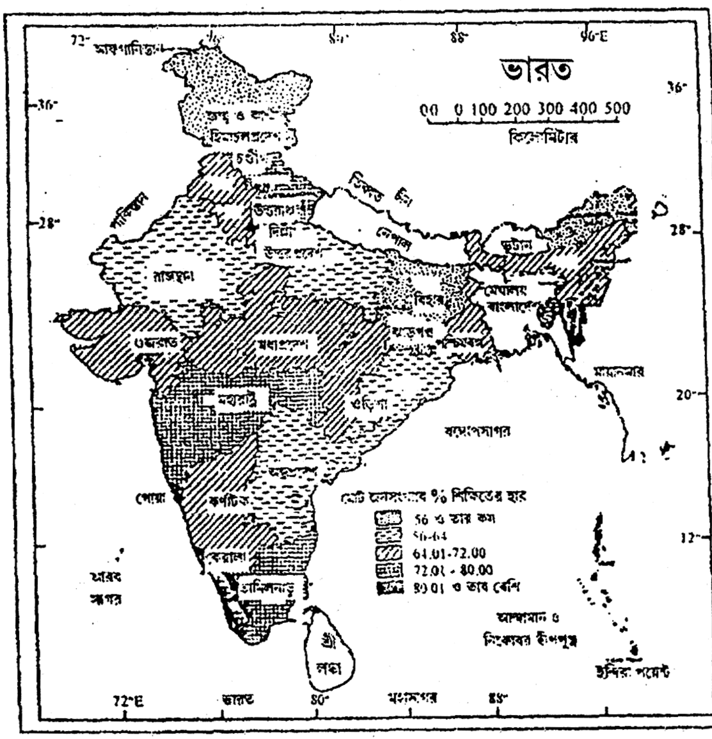

চিত্র 2.47 : ভারতের সাক্ষরতার হার (2001)

সারণি :

স্কুল-পড়ুয়া ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা (বয়স 6:17 বছর)

শতাংশ	দেশ
90% বা তার বেশি	কানাডা, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, আর্জেন্টিনা, রাশিয়া, ব্রিটেন, ফ্রান্স, নরওয়ে।
80-89%	চিন, ইতালি, অস্ট্রিয়া, মেক্সিকো।
70-79%	তুরস্ক, ইরাক, টিউনিশিয়া।
60-60^	ভারত, মায়ানমার, নেপাল, সৌদি আরব।
60%-এর কম	পাকিস্তান, বাংলাদেশ, থাইল্যান্ড, ইথিয়োপিয়া, জাইরে।

***Source** : Atlas of Environment*

প্রাপ্তবয়স্কের মধ্যে শিক্ষিতের হার

শতাংশ	দেশ
75% বা তার বেশি	কানাডা, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, আর্জেন্টিনা, রাশিয়া, ব্রিটেন, ফ্রান্স, নরওয়ে।
80-94%	পর্তুগাল, তুরস্কা, মেক্সিকো, ব্রাজিল।
60-79%	চিন, সৌদি আরব, লিবিয়া।
40-59%	ভারত, মিশর, আলজিরিয়া।
40%-এর	কম পাকিস্তান, আফগানিস্তান, বাংলাদেশ, নেপাল।

***Source** : Atlas of Environment*

প্রাপ্তবয়স্কের মধ্যে শিক্ষিতের হারে উন্নত এবং উন্নয়নশীল দেশগুলোর মধ্যে পার্থক্য

দেশ	প্রাপ্তবয়স্ক শিক্ষেতের হার		
	পুরুষ (%)	নারী (%)	মোট (%)
উন্নত দেশ			
জার্মানি	99.0	99.0	99.0
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র	99.0	99.0	99.0
ব্রিটিশ যুক্তরাজ্য	·99.0	99.0	99.0
ফ্রান্স	99.0	99.0	99.0
জাপান	99.0	99.0	99.0
উন্নয়নশীলদেশ			
ভারত	65.5	37.7	52.0
বাংলাদেশ	49.4	26.1	38.1
পাকিস্তান	50.0	24.4	37.8

***Source** : Human Development Report : 1998*

বয়স্ক শিক্ষার হার (Adult Literacy Rate) উন্নয়নশীল দেশগুলোতে বেড়ে হয়েছে বর্তমানে গড়ে 70 শতাংশ; কিন্তু দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াতে 90 শতাংশ এবং দক্ষিণ এশিয়ার 5.1 শতাংশের মধ্যে বিপুল পার্থক্য রয়ে গেছে।

নারীশিক্ষার হার (Famale literacy) প্রচুর উন্নতি করেছে মধ্য আফ্রিকা ও আরবের দেশগুলো (44 শতাংশ)। দক্ষিণ এশিয়ার প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষার হার বাড়লেও নারীশিক্ষার দিকে এখানকার দেশগুলো এখনও পিছিয়ে আছে (55 শতাংশ)। অপরদিকে, শিল্পোন্নত দেশগুলোতে শিক্ষার হার প্রায় 100 শতাংশ, তবে নতুন কয়েকটি সমীক্ষায় দেখা গেছে এসব দেশের বয়স্কদের মধ্যে অনেকেই শিক্ষিত হলেও প্রকৃতপক্ষে তাদের দক্ষতার হার খুবই কম। কারিগরি শিক্ষায় অদূর ভবিষ্যতে পূর্ব এশিয়ার দেশগুলো অন্যদের ছাড়িয়ে যেতে পারে—সেখানকার অর্ধেক ছাত্র-ছাত্রী বিজ্ঞান পড়ার দিকে ঝোঁকে।

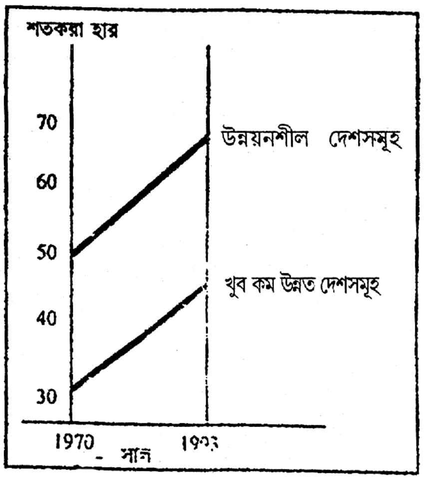

চিত্র 2.48 : প্রাপ্তবয়স্ক সাক্ষরতার হারে উন্নতি (Husain অনুকরণে)

ভারত সাক্ষরতা (Literacy in India)

যে কোন উন্নয়নের ক্ষেত্রে শিক্ষা হল হাতিয়ার। তাই ভারতের প্রতিটি উন্নয়ন পরিকল্পনায় শিক্ষাক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়। ভারতীয় জনগণনা দপ্তরের মতে যদি কোন ব্যক্তি যে কোন ভাষায় লিখতে ও পড়তে পারেন তবে তাকে সাক্ষর (literate) বলা যাবে। এই পরিপ্রেক্ষিতে মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রক ও পরিকল্পনা কমিশন ঠিক করেছে যে 7 বছর ও তার বেশি বয়সীদের সাক্ষর হিসেবে গণ্য করতে হবে। সাক্ষরতরা হার নির্ণয় করতে আগেকার লোকগণনার সমস্ত বয়সের জনতার সংখ্যা চিন্তা করা হত।

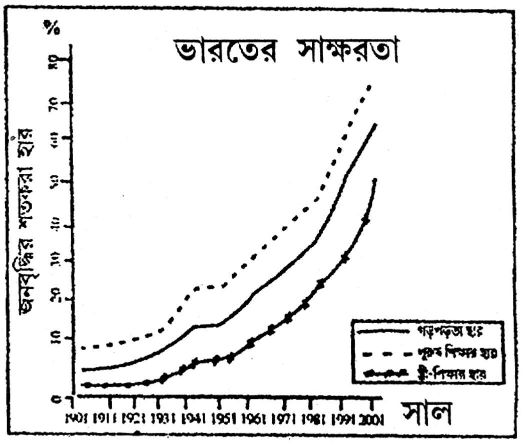

চিত্র 2.49 : ভারতে সাক্ষরতার অগ্রগতি (1901-2001)

2001 সালের জনগণনায় দেখা যাচ্ছে যে স্বাধীনতা উত্তরকালে সাক্ষরতায় হার যথেষ্ট বেড়েছে। স্বাধীনতার সময় (1951), প্রতি 5 জনের মধ্যে একজন (18.3 শতাংশ) লিখতে ও পড়তে পারতেন। স্ত্রীলোকদের অবস্থা ছিল আরও ভয়াবহ। প্রতি এগারো জনের মধ্যে একজন (8.8 শতাংশ) মাত্র সাক্ষর ছিলেন (চিত্র 2.42)।

2001 সালের জনগণনায় দেখা যাচ্ছে যে কয়েকটি রাজ্য সাক্ষরতার দিক দিয়ে তাদের পূর্বেকার ক্রম (Ran ধরে রেখেছে। যেমন কেরালা, মিজোরাম, লাক্ষাদ্বীপ, পন্ডিচেরী, আন্দামান ও নিকোবর, দমন ও দিউ, মহারা হিমাচলপ্রদেশ ইত্যাদি। কয়েকটি রাজ্য সাক্ষরতার দিক দিয়ে এগিয়ে গেছে, যেমন ত্রিপুরা, হরিয়ানা, আবার মেঘাল মণিপুর ইত্যাদি রাজ্য পিছিয়ে পড়েছে।

সারণি : ভারত—সাক্ষরতার হার (7 বছর ও তার বেশি) 2001 (%)

রাজ্য/কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল	মোট	পুরুষ	স্ত্রীলোক
ভারত (রাজ্য	65.38	75.85	54.16
কেরালা	90.92	94.20	87.86
মিজোরাম	88.49	90.69	86.13
গোয়া	82.32	88.88	75.51
মহারাষ্ট্র	77.27	86.27	67.51
হিমাচলপ্রদেশ	77.13	86.02	68.08
ত্রিপুরা	73.66	81.47	65.41
তামিলনাড়ু	73.47	82.33	64.55
উত্তরাঞ্চল	72.28	84.01	60.26
গুজরাত	69.97	80.50	58.60
পাঞ্জাব	69.95	75.63	63.55
সিকিম	69.68	76.73	61.46
পশ্চিমবঙ্গ	69.22	77.58	60.22
মণিপুর	68.87	77.87	59.70
হরিয়ানা	68.69	79.25	56.31
নাগাল্যান্ড	67.11	71.77	61.92
কর্ণাটক	67.04	76.29	57.45
ছত্তিশগড়	65.18	77.86	52.40
অসম	64.28	71.93	56.03
মধ্যপ্রদেশ	64.11	76.80	50.28
ওড়িশা	63.61	75.95	50.97
মেঘালয়	63.31	66.14	60.41
অন্ধ্রপ্রদেশ	61.11	70.85	51.17
রাজস্থান	61.03	76.46	44.34
উত্তরপ্রদেশ	57.36	70.23	42.98
অরুণাচল প্রদেশ	54.74	64.07	44.24
জম্মু ও কাশ্মীর	54.46	65.75	41.82
ঝাড়খন্ড	54.13	67.94	39.38
বিহার	47.53	60.32	33.57
দিল্লী	81.82	87.37	75.00
কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল			
লাক্ষাদ্বীপ	87.52	93.15	81.56
চন্ডীগড়	81.76	85.65	76.65
পন্ডিচেরী	81.49	88.89	74.13
আন্দামান	81.18	86.07	75.29
দমন ও দিউ	81.09	88.40	70.37
দাদরা ও নগর হাভেলি	60.03	73.32	42.99

Source : *Census of India, 2001 : Provisional Population Totals, 2001, Table G-1*

সারণি : সাক্ষরতার হার 1991 এবং 2001

ক্রম (Rank) 2001 সাল	রাজ্য/কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল	2001 সাল	লিঙ্গ অনুপাত 1991 সাল	ক্রম (Rank) 1991 সাল
1	কেরালা	90.92	89.81	1
2	মিজোরাম	88.49	82.27	2
3	লাক্ষাদ্বীপ	87.52	81.78	3
4	গোয়া	82.32	75.51	5
5	দিল্লী*	81.82	75.29	6
6	চন্ডীগড়*	81.76	74.81	4
7	পন্ডীচেরী*	81.49	74.74	7
8	আন্দামান ও নিকোবর	81.18	73.02	8
9	দমন ও দিউ	81.09	71.20	9
10	মহারাষ্ট্র	77.27	64.87	10
11	হিমাচলপ্রদেশ	77.13	63.86	11
12	ত্রিপুরা	73.66	60.44	15
13	তামিলনাড়ু	73.47	62.66	12
14	উত্তরাঞ্চল	72.28	57.75	18
15	গুজরাত	69.97	61.29	14
16	পাঞ্জাব	69.95	58.51	17
17	সিকিম	69.68	56.94	20
18	পশ্চিমবঙ্গ	69.22	57.70	19
19	মণিপুর	68.87	59.89	16
20	হরিয়ানা	68.59	55.85	22
21	নাগাল্যান্ড	67.11	61.65	13
22	কর্ণাটক	67.04	56.04	21
23	ছত্তিশগড়	65.18	42.91	28
24	অসম	64.28	52.89	23
25	মধ্যপ্রদেশ	64.11	44.20	26
26	ওড়িশা	63.61	44.09	25
27	মেঘালয়	63.31	49.10	24
28	অন্ধ্রপ্রদেশ	61.11	44.09	27
29	রাজস্থান	61.03	38.55	33
30	দাদরা ও নগর হাভেলি	60.03	40.71	32
31	উত্তরপ্রদেশ	57.36	41.60	29
32	অরুণাচলপ্রদেশ	54.74	41.60	29
33	জম্মু ও কাশ্মীর	54.46	–	–
34	ঝাড়খন্ড	54.13	41.39	31
35	বিহার	47.53	38.48	34
	ভারত	65.49	52.20	–

বিঃ দ্র : ভারতের জনসংখ্যা গণনার সময় পাক ও চীন অধিকৃত জম্মু-কাশ্মীরের অংশগুলিকে ধরা হয়নি। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের কারণে গুজরাত ও হিমাচলপ্রদেশের কয়েকটি জেলায় জনগণনার কাজ করা সম্ভব হয়নি।

2001 সালের সাক্ষরতার পরিসংখ্যানে দেখা যায় যে, বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে এ বিষয়ে পার্থক্য আছে। প্রধান রাজ্যগুলোতে কেরালা, মহারাষ্ট্র, হিমাচলপ্রদেশ, তামিলনাডু, উত্তরাঞ্চল, গুজরাত, পাঞ্জাব, হরিয়ানা, কর্ণাটক বা পশ্চিমবঙ্গে সাক্ষরতার হার ভালো। কিন্তু ছত্তিশগড়, অসম, মধ্যপ্রদেশ, ওড়িশা, অন্ধ্রপ্রদেশ ও রাজস্থানে কম। আর সবচেয়ে কম সাক্ষরতার রাজ্যগুলো হল উত্তরপ্রদেশ, জম্মু ও কাশ্মীর, ঝাড়খন্ড এবং বিহার। বিহার একমাত্র রাজ্য যেখানে সাক্ষরতার হার 50 শতাংশেরও কম।

এ দেশের সাক্ষরতার একটা বড় সমস্যা হল নারী সাক্ষরতার সমস্যা। নারীদের মধ্যে সাক্ষরতার হার বাড়াতে না পারলে সাধারণভাবে সাক্ষরতা বাড়ানো যাবে না। প্রধান রাজ্যগুলোর মধ্যে ছত্তিশগড়, অন্ধ্রপ্রদেশ, ওড়িশা, মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান, উত্তরপ্রদেশ, জম্মু ও কাশ্মীর, ঝাড়খন্ড ও বিহারে নারী সাক্ষরতার হার ভীষণ কম। ঝাড়খন্ড ও বিহারে নারী সাক্ষরতার হার 40 শতাংশের কম। জেলাওয়াড়ি সব তথ্য এখনও পাওয়া যায়নি। তবে পাওয়া গেলে হয়ত দেখা যাবে এমন জেলাও আছে যেখানে নারী সাক্ষরতার হার 10 শতাংশেরও কম।

মূল কথা হল যদি সাক্ষরতা এবং সেই অর্থে মানবোন্নয়ন এবং কর্মসংস্থানের সমস্যার সমাধান করা যায় তবে জনসংখ্যা বৃদ্ধি নিয়ে মাথা খুব বেশি না ঘামালেও চলবে (মনোরমা ইয়ারবুক, 2002)।

2.3.5 গ্রন্থপঞ্জী

গুহ, সবিতা, 1987 : জনসংখ্যার ব্যবহারিক প্রয়োগ (ভারতের পটভূমিকা), পঃ বঃ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলকাতা।

দে, মনোরঞ্জন, 2004 : জনবিজ্ঞান ও জনসংখ্যা বিশ্লেষণ, ঢাকেশ্বরী লাইব্রেরি, ঢাকা।

মজুমদার, প্রভাতরঞ্জন, 1991 : জনসংখ্যাতত্ত্বের গোড়ার কথা, ১ম খণ্ড, পঃ বঃ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলকাতা।

সেন, জ্যোতির্ময়, 2004 : জনসংখ্যা ভূগোল, বুক্স্ অ্যান্ড অ্যালায়েড, কলকাতা

Chandna, R. C. 2002 : A Geography of Population, Concepts, Determinants and Patterns, Kalyani, New Delhi.

2.3.6 প্রশ্নাবলী

দীর্ঘ প্রশ্নাবলী

1. লিঙ্গ অনুপাতে বলতে কি বোঝায়? ভারতবর্ষে লিঙ্গ অনুপাতের বণ্টনের ধাঁচ সম্বন্ধে আলোচনা করুন।
2. কোন অঞ্চলের জনসংখ্যা কাঠামোয় লিঙ্গ অনুপাতের গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব আছে—ব্যাখ্যা করুন।
3. বয়স গ্রন্থনা বলতে কি বোঝায়? বয়স কাঠামোর নির্ণায়কগুলি ব্যাখ্যা করুন।
4. বয়স গ্রন্থন বা গ্রন্থনা বিশ্লেষণের বিভিন্ন পদ্ধতি ব্যাখ্যা করুন।
5. বয়স পিরামিড বলতে কি বোঝায়? বয়স পিরামিডের আকৃতিকে কি কি উপাদান প্রভাবিত করে?
6. 1901 সাল থেকে ভারতে জনসংখ্যা বৃদ্ধির উপর একটি টীকা লিখুন।
7. জনবণ্টনকে প্রভাবান্বিত করার বিভিন্ন উপাদানগুলি লিখুন। ভারতে জনবন্টনের প্রভাব বিস্তারকারী কারণগুলি আলোচনা করুন।

8. জনঘনত্বকে কি কি উপাদান প্রভাবিত করে? ভারতের বিভিন্ন অংশে বেশি ঘনত্বের কারণ উল্লেখ করুন।

9. এশিয়াতে অসম জনবন্টনের কারণ উল্লেখ করুন।

10. পরিযাণের সংজ্ঞা কি? বিভিন্ন ধরনের পরিযাণ সম্পর্কে আলোচনা করুন।

11. পরিযাণের সামাজিক ও অর্থনৈতিক নির্ণয়কগুলি নিয়ে আলোচনা করুন।

12. রাভেনস্টাইন এবং লী-র পরিযাণের নিয়ম ব্যাখ্যা করুন।

13. দারিদ্র্যের পরিমাপ কিভাবে করা যায়? ভারতবর্ষে দারিদ্র্যের কারণ কি কি?

14. লিঙ্গ সমস্যা কি? সমস্যার প্রকৃতি আলোচনা করুন।

মাঝারি মানের প্রশ্ন

1. পৃথিবীব্যাপী জনসংখ্যা বৃদ্ধির গতিপ্রকৃতি সম্বন্ধে নাতিদীর্ঘ আলোচনা করুন।

2. জনসংখ্যা আলোচনায় বয়স পিরামিডের গুরুত্ব নির্ণয় করুন। উপযুক্ত উদাহরণ সহযোগে আলোচনা করুন।

3. ভারতবর্ষে ঋতুগত পরিযাণের ধাঁচটি ব্যাখ্যা করুন।

4. ঋতুগত পরিযাণের কারণ ও ফলাফল ব্যাখ্যা করুন।

5. অন্তর্দেশীয় বা আন্তঃরাজ্য পরিযাণ বলতে কি বোঝেন?

6. বাধ্যতামূলক পরিযাণের কারণ ও ফলাফল ব্যাখ্যা করুন।

7. ভারতবর্ষের পেশাগত ধাঁচটি আলোচনা করুন।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

1. চার ধরনের অন্তর্দেশীয় বা আন্তঃরাজ্য পরিযাণ কি কি?

2. বয়স-লিঙ্গ পিরামিড কি?

3. 2001 সালের জনগণনায় ভারতে জনবৃদ্ধির হার কিরূপ ছিল। 1991 সালে-ই (জনগণনায়) বা কত ছিল?

4. দুটি দেশের নাম করুন যেখানে বার্ষিক জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার তিন (3) শতাংশ বা তার বেশি।

5. জনসংখ্যার আয়তন (size) বলতে কি বোঝায়?

6. স্বাভাবিক বৃদ্ধির হার কি?

7. পরিযাণে 'পুশ' (প্রয়াস) এবং 'পুল' (আকর্ষণ) কারণগুলি কি কি?

8. নিশ্চল জনবৃদ্ধি কি?

9. অন্তঃ ও বহির্পরিযাণ অভিবাসন বলতে কি বোঝায়?

10. বাধ্যতামূলক পরিযাণ কি?

11. অবৈধ পরিযাণ কি?

একক—3 ❑ ভারতের পরিচিতি

গঠন

প্রস্তাবনা

উদ্দেশ্য

3.1. ভারতের প্রাকৃতিক ভূগোল— ভূমিরূপ, নদনদী, জলবায়ু, স্বাভাবিক উদ্ভিদ ও মৃত্তিকা (সংরক্ষণ সহ)

3.2. ভারতের অর্থনৈতিক ও সামাজিক ভূগোল— শক্তি সম্পদ ও খনিজ সম্পদ; জলসেচ ও কৃষিকাজ; প্রধান শিল্পকেন্দ্রসমূহ; জনসংখ্যার বৃদ্ধি ও বণ্টন

3.3. অঞ্চল ও তার শ্রেণিবিভাগ এবং আঞ্চলিকীকরণ

3.4. গ্রন্থপঞ্জী

3.5. প্রশ্নাবলী

প্রস্তাবনা

বিশাল দেশ এই ভারতবর্ষ। স্বভাবতই এর প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য থাকাই খুব স্বাভাবিক। গগনচুম্বী হিমালয় থেকে শুরু করে নদী জপামাত-ধৃত প্রান্তর এবং প্রশান্ত বেলাভূমি সবই রয়েছে এদেশে। হিমালয়ের বরফ গলা জল যেমন এখানকার কৃষিক্ষেত্রকে শস্যশ্যামলা করেছে তেমনি দাক্ষিণাত্যের নদীগুলি দেশকে জুগিয়ে চলেছে শক্তি (বিদ্যুৎ)। উপদ্বীপীয় অবস্থান যেমন সমুদ্রোপুকূলের জলবায়ুকে করেছে আরামদায়ক, আবার মহাদেশীয় অবস্থান কোকোনো স্থানকে করে তুলেছে শুষ্ক, এমনকি মরুভূমি যেখানে কাঁটাজাতীয় বৃক্ষের সমাবেশ দেখা যায়। আবার সমুদ্রউপকূলের নোনা জলে সুন্দরী জাতীয় মানগ্রোভ দেখা যায়। উচ্চতা বাড়ার সাথে হিমালয় অঞ্চলের উদ্ভিদের চেহারাই পাল্টিয়ে যায়।

উদ্দেশ্য

এক এককটি পাঠ করলে জানা যাবে—

- ভারতের ভূ-প্রকৃতি কিরূপ? কোথায় কোথায় পর্বত, মালভূমি, সমভূমি অবস্থান করছে? পর্বতগুলি উচ্চতা কি একই প্রকার না পৃথক পৃথক। এদেশের উপকূলভাগটি কেমন?
- এদেশের নদনদীগুলি প্রকৃতি কিরূপ? তাদের কি কি কাজে লাগান যায়? নদীগুলির কি কোন ইতিহাস আছে?
- জলবায়ু অনুসারে এদেশকে কয়ভাগে ভাগ করা যায়? এদেশের ঋজু কয়টি? ঋতুগুলির কিছু বৈচিত্র্য আছে কি? এদেশের ভাগ্যনিয়ন্ত্রা হিসেবে মৌসুমী বায়ুর ভূমিকা কি?
- জলবায়ু কি এখানকার স্বাভাবিক উদ্ভিদের বিকাশে কিছু প্রভাব ফেলেছে?
- দেশের বিভিন্ন অংশে কি কি ধরনের মৃত্তিকা দেখা যায়? দেশের অর্থনীতিতে বিভিন্ন মৃত্তিকার ভূমিকা কি?

3.1. ভারতের প্রাকৃতিক ভূগোল

❑ ভারতের পরিচিতি

ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিক দিক থেকে আমাদের মাতৃভূমি ভারত একটি মহান দেশ। এর আয়তন এতই বিশাল যে একে অনেক সময় 'উপমহাদেশ' আখ্যা দেওয়া হয়। এটি এশিয়া মহাদেশের অংশ। কিন্তু অনেক সময় ভারতকেই একটি মহাদেশ বলে মনে হয়। এটি বরফাবৃত হিমালয় থেকে ভারত মহাসাগরের উপকূল পর্যন্ত বিস্তৃত। ভারত মহাসাগর গঙ্গার ব-দ্বীপ থেকে গুজরাটের কচ্ছ ও সিন্ধু উপত্যকার পূর্বাংশ পর্যন্ত হাজার হাজার কিলোমিটার জুড়ে বিস্তৃত। উত্তরের বিশাল সমভূমি, পশ্চিমে থরের মরুভূমি, পূর্বের ইন্দো-মায়ানমার পার্বত্যভূমি, বন্ধুর মালভূমি, প্রাচীন পার্বত্যভূমি, দক্ষিণের নারকেল উৎপাদনকারী উপকূলীয় সমভূমি এবং উত্তরের উঁচু বরফাবৃত পর্বতমালা এই ভূমির অন্তর্ভুক্ত। ক্রান্তীয় অঞ্চলে অবস্থিত বলে এখানে সূর্যতাপ বেশী। মৌসুমী বৃষ্টিপাত এই অঞ্চলের আর্দ্রতা বাড়িয়ে তুলেছে। প্রচণ্ড সূর্যতাপ ও প্রচুর মৌসুমী বৃষ্টিপাত লক্ষ লক্ষ ভারতীয়কে যথেষ্ট প্রভাবিত করে। এই আমাদের ভারতবর্ষ, আমাদের ভাগ্য অধিষ্ঠাত্রী।

'ভারত' কথাটি এসেছে গ্রীক শব্দ উন্দোই (Indoi) থেকে—ইন্দোস নদীর কাছাকাছি ভূমিভাগ। রোমানরা এই নদীর নাম উচ্চারণ করত ইন্দাস বলে এবং এর পরের দেশ হল ভারত। পারসিকরা এই নদীর নাম করণ করেছিল হিন্দু (সিন্ধুকে হিন্দু বলতো) এবং এর পূর্বদিকের দেশ হল হিন্দুস্তান।

প্রাচীন রাজা ভারতের নামে এই দেশের নামকরণ হয়েছে ভারত বলে। ঋকবেদে ভারত নামে আর্য জাতির এক শক্তিশালী রাজার প্রথম উল্লেখ পাই। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে (Aitareya Brahmana) ভারতের রাজ্যাভিষেক, অশ্বমেধ যজ্ঞ ইত্যাদির উল্লেখ পাই। ভগবত পুরানে তাঁকে অধিরথ এবং সম্রাট (রাজার রাজা) বলা হয়েছে। তিনি আর্যকরণ প্রক্রিয়া তরান্বিত করেছিলেন। প্রাচীন উপাখ্যান অনুযায়ী ভারত ছিলেন দুষ্মন্তের ছেলে। এই ভারতের নামে ভারত নামকরণ হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে পুরাণে প্রথম আমরা ভারত নামটির সাথে পরিচিত হই। বিষ্ণু পুরাণের মতে মহাসাগরের (ভারত মহাসাগরের) উত্তর দিকের ভূখণ্ড এবং হিমালয়ের দক্ষিণদিকের ভূখণ্ড ভারত নামে পরিচিত। এখানকার এই এলাকাটি ভারতের বংশধর 'ভারতীয়'দের বসবাসস্থল।

বৌদ্ধযুগে এই দেশটি জম্বুদ্বীপ (Jambudwipa) নামে পরিচিত ছিল। বৈদিক যুগে মধ্যদেশ (পাঞ্জাব ও পশ্চিম উত্তর প্রদেশ) বলতে বোঝাত আর্য রাজ্য, আর প্রাচ্য (পূর্ব দেশ) বলতে অনার্য রাজত্ব মগধ ও বিদেহকে বোঝাত। পরবর্তীকালে মধ্যদেশ ও প্রাচ্য শব্দ দুটির বদলে ব্রহ্মোত্তর ও আর্যাবর্ত কথা দুটি ব্যবহার করা হত। **আর্যাবর্ত** (আর্যদের দেশ) বলতে হিমালয় ও বিন্ধ্য পর্বতের মধ্যের অংশকে বোঝাত। আর এর দক্ষিণের অংশ (কৃষ্ণা নদী পর্যন্ত) **দক্ষিণাপথ**। আর্যাবর্ত বলতে কাশ্মীর থেকে কেপ ক্যামেরুন পর্যন্ত গোটা দেশকে বোঝানো হত যা ভারত বা ইণ্ডিয়ার আর এক নাম।

❑ সময়ের ঘণ্টা

সময়ের বিবর্তন দিকে তাকালে একটি পরিবর্তনের রূপরেখা পরিলক্ষিত হয়। জঙ্গলে বসবাসকারী প্রস্তর যুগের খাদ্যসংগ্রহকরা প্রকৃতির উপর নির্ভরশীল ছিল। তারা ভীত ও কুণ্ঠিত জীবনযাপন করত। প্রাচীন নব-প্রস্তর (নিওলিথিক) সম্প্রদায় পৃথিবী-মাকে পূজা করে তাদের পাথরের লাঙল দিয়ে মাটি চাষ করত। তারা প্রচুর উদ্ভিদ ও বৈচিত্র্যময় প্রাণী সম্পদের অধিকারী হয়েছিল এবং এইভাবেই জীবনধারণ করত। শক্তিশালী আর্যরা প্রকৃতির শক্তির প্রতি প্রশংসামূলক গীত রচনা করত। কিন্তু একই সময়ে নদীকে নিয়ন্ত্রন করে ও আকারহীন মাটিকে আকৃতি দিয়ে প্রকৃতির শক্তিকে নিয়ন্ত্রন করতেও শিখেছিল। প্রত্যেক বছর পলিক্ষেপনকারী নদীর উর্বর তীরে বড় ও ছোটো

গ্রামগুলিতে এই প্রাচীন কৃষক সম্প্রদায় বাস করত এবং প্রশান্ত চিত্তে গঙ্গা, যমুনা ও কাবেরীর তটে ক্রমশঃ বিস্তৃত শহরগুলিতে সাম্রাজ্যের উত্থান পতন লক্ষ্য করত। এই বিশাল জনসাগরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠী নিয়ে গঠিত দ্বীপের মতো শহর রয়েছে। অন্ধকার ও অপরিচ্ছন্ন কর্মশালায় শ্রমিক ও হস্তশিল্পীরা মৃত পাথরে জীবনদান করে, চকচকে সোনা থেকে গয়না তৈরী করে এবং বর্ণময় সুতি ও রেশমী সুতো দিয়ে কাপড় বোনে।

অন্যদিকে আবার সেই বিবর্তনের আরেকটি নতুন রূপ দেখা যায়। চিমনি থেকে ধোঁয়া বেরোচ্ছে। আকরিক থেকে পাওয়া গলিত তামাটে ধাতু স্টীলে রূপান্তরিত হচ্ছে। প্রচণ্ড জলপ্রবাহের শক্তিকে বশ মানানো হচ্ছে।

সময়ের অলিগলি দিয়ে যাত্রার এই প্রতিটি স্তরে আমরা ধীরে ধীরে প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রণ করতে শিখেছি। প্রথম দিকে আমরা প্রায় প্রকৃতির দাস ছিলাম। আস্তে আস্তে কিন্তু ক্রমগত আমরা প্রকৃতিকে বুঝতে ও এর সঙ্গে সহযোগিতা করতে শিখেছি। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির প্রভূত জ্ঞানের সাহায্যে প্রকৃতির সাথে আমাদের যোগাযোগ বৃদ্ধি পেয়েছে। শুধুমাত্র আমাদের বোধগম্য প্রকৃতির সঙ্গেই আমরা যোগাযোগ করতে পেরেছি। আমরা এর বিরোধিতা বা উপেক্ষা করতে পারিনা, কারণ আমরা এর সন্তান। আমরা প্রকৃতির কোলেই পালিত হই এবং আমাদের অস্তিত্ব এর উপর নির্ভরশীল। আমাদের উন্নতির দিশা প্রকৃতি-প্রদত্ত সুযোগ সুবিধার দ্বারা যথেষ্ট প্রভাবিত হয়। উন্নতির কাঠামোই প্রকৃতি তৈরী করে। শ্রেষ্ঠ ফল লাভে প্রকৃতিই আমাদের নির্দেশক। এক নতুন দিগন্তের সূচনার স্বার্থে আমাদের এই নিয়মকে মান্য করা উচিত।

যুক্তিসঙ্গত উপায়ে আমাদের প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহার করতে জানতে হবে। লোভবশত একে তাড়াতাড়ি অপচয় করলে চলবে না। আবার বহুল পরিমানে এই প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহার করে পতিত জমি সৃষ্টি করাও উচিৎ নয়। প্রকৃতির নিয়মানুযায়ী ও যুক্তি সঙ্গত ভাবে এই প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহার করা উচিত। আগামী প্রজন্মের জন্য এই প্রাকৃতিক সম্পদ রক্ষা করতে হবে। আমাদের এটা বুঝতে হবে যে আমরা এর ব্যবহার কর্তা মাত্র, অধিকর্তা নয়।

❑ স্থানীয় সম্পর্ক

ভূ-গোলকে আমরা দেখতে পাই, ভারতীয় উপমহাদেশ মূল এশিয়া ভূখণ্ডের দক্ষিণের বর্ধিত অংশ মাত্র।

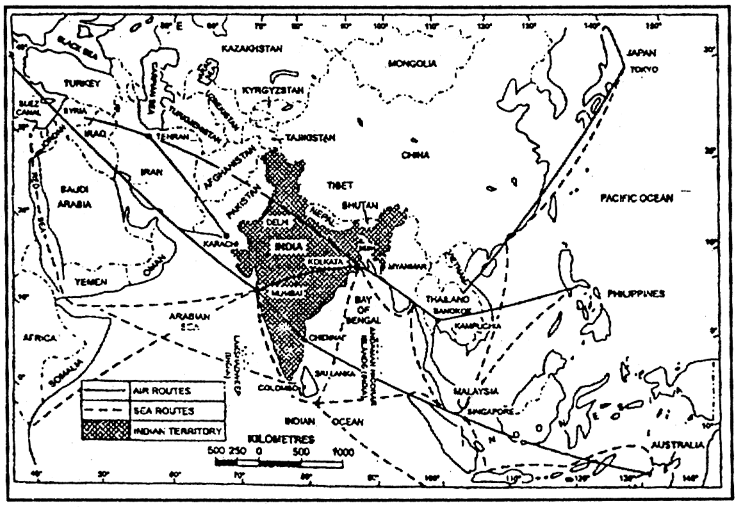

চিত্র 3.1 ঃ ভারতের মহাসাগরের প্রবেশমুখে ভারতর অবস্থান। প্রাচ্য জগতের আন্তর্জাতিক ব্যবসাবাণিজ্যের পথে এর অবস্থান লক্ষণীয়।

ভারতীয় উপদ্বীপ ভরত মহাসাগরে এমন ভাবেই বিস্তৃত বাংলাদেশের সীমানায় পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, মেঘালয়, ত্রিপুরা এবং মিজোরাম এই রাজ্যগুলি অবস্থিত।

আমাদের পশ্চিম সীমানায় অবস্থিত পাকিস্থানের সাথে রাজস্থানের কালিবঙ্গান, পাঞ্জাবের হরপ্পা ও সিন্ধুর মহেঞ্জোদোড়ো অঞ্চলের ইতিহাস অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। এছাড়া, ভারতের উত্তরে রয়েছে কঠোর পরিশ্রমী পাঠানদের বাসস্থান। এর দক্ষিণে রয়েছে পঞ্চ নদীর দেশ যেখানে অমৃতসর ও জলন্ধরের গ্রামের মতো সোনালী গমের ক্ষেতে হীর ও ভাঙ্‌রার সুর শোনা যায়। আরও দক্ষিণে পশ্চিম রাজস্থানের মরুভূমি (Thar)-অবস্থিত। এর পাশেই রয়েছে সিন্দ অঞ্চল যা সিন্ধু ব-দ্বীপ পর্যন্ত বিস্তৃত।

আমরা ঐতিহ্যগতভাবে শান্তিপ্রিয় মানুষ। ভারতীয় সেনাবাহিনী খুব কমই অন্যদেশের মাটিতে পা দিয়েছে। কাম্বোডিয়ার ভারতীয় মন্দির, চীনের মঠে বৌধ্য পাণ্ডুলিপি ও মধ্য এশিয়ার প্রাচীন শহর থেকে উদ্ধারীকৃত বস্তু থেকে প্রাচীন ভারতীয় বানিজ্যিক দ্রব্য সম্বন্ধে ঐতিহাসিকরা ধারণা করেন। কিন্তু কোথাও তাঁরা ভারতীয় জয়যাত্রার স্মারক খুঁজে পাননি। ভারতীয় ইতিহাস হল সেইসব জনগণের ইতিহাস যারা তাদের প্রতিবেশীদের সঙ্গে শান্তিতে বসবাস করার চেষ্টা করেছে। কিন্তু আমরা স্বাধীনতা ভালোবাসি যা আমরা এক শক্তিশালী ঔপনিবেশিক শক্তির হাত থেকে কষ্ট করে অর্জন করেছি। আমরা এই স্বাধীনতাকে স্বয়ংসম্পূর্ণভাবে রক্ষা করতে ভালোবাসি।

3.1.1 প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য (Physical Features)

বিশাল দেশ এই ভারতের প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য থাকা খুবই স্বাভাবিক (চিত্র 3.2)। ভূ-প্রাকৃতিক গঠন অনুসারে ভারতকে ৪টি প্রাকৃতিক অঞ্চলে ভাগ করা হয়। যথা— 1) হিমালয় পর্বতশ্রেণী 2) মেঘালয় মালভূমি ও উত্তর-

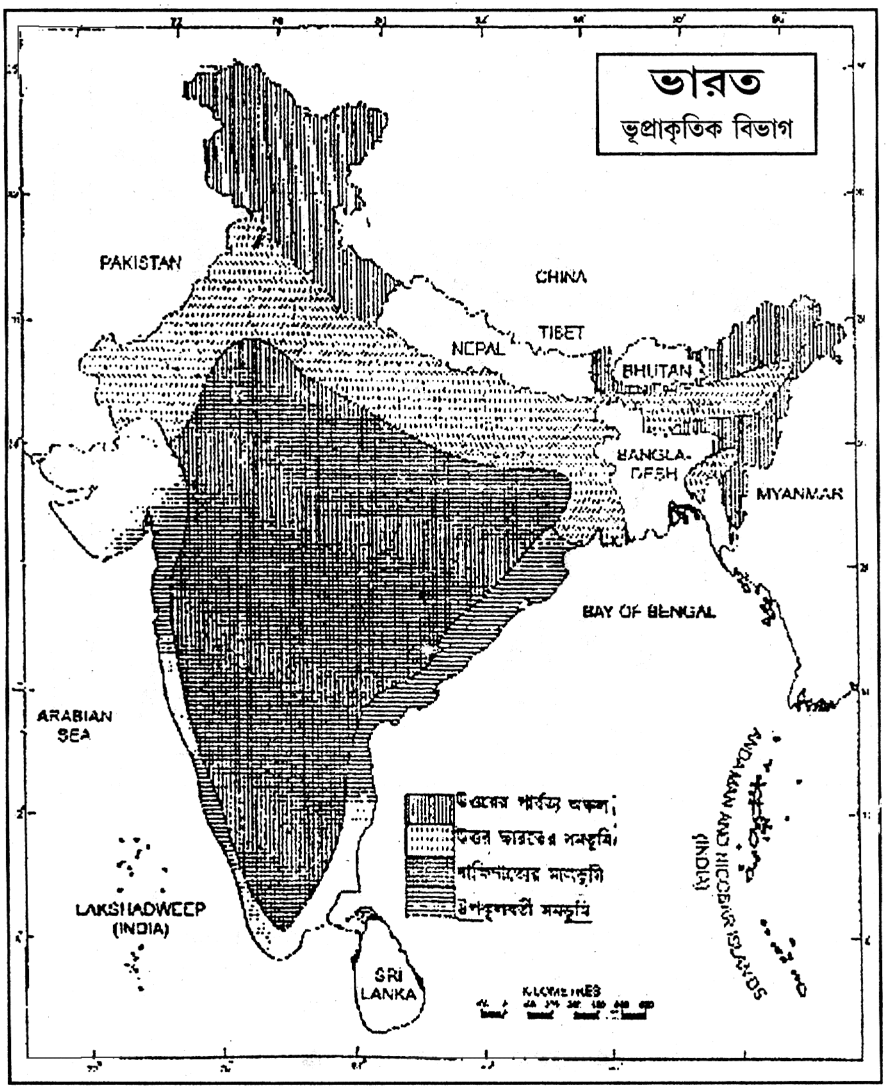

চিত্র 3.2 ঃ ভূ-প্রাকৃতিক বিভাগ

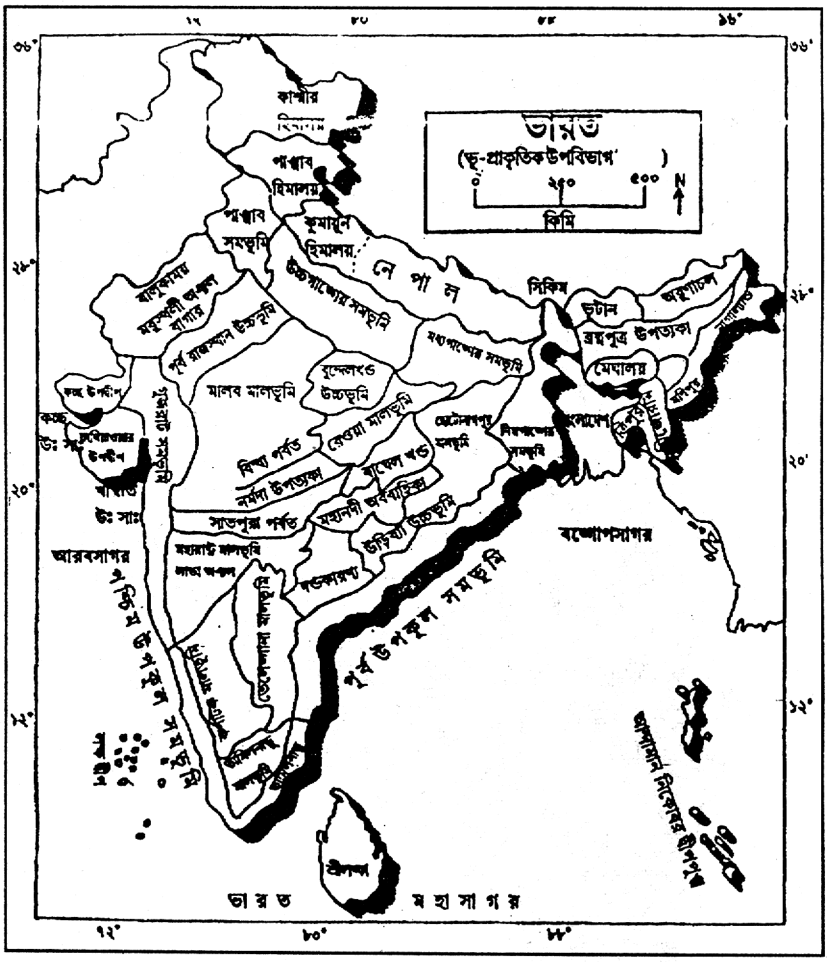

চিত্র 3.3 ঃ ভারতের ভূপ্রাকৃতিক উপবিভাগ

পূর্ব পর্বতশ্রেণী (পূর্বাচল) (3) শতদ্রু গঙ্গা সমভূমি ও ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা, (4) থর মরুভূমি (5) মধ্যভারত উচ্চভূমি ও পূর্বের মালভূমি (6) দাক্ষিণাত্য মালভূমি (7) উপকূল সমভূমি (8) দ্বীপ অঞ্চল।

উপরোক্ত ভূ-প্রাকৃতিক বিভাগগুলির বন্ধুরতা নজর-কাড়ার মতন

● হিমালয় পর্বতশ্রেণী ●

অবস্থান ও আয়তন ঃ আমাদের দেশের উত্তর সীমান্ত জুড়ে হিমালয় পর্বত শ্রেণী বিশাল প্রাচীরের মতন দাঁড়িয়ে আছে। পৃথিবীর সবোচ্চ ও বৃহত্তম পর্বত শ্রেণী হল এই হিমালয় **(হিমের আলয় = হিমালয়,** চির তুষারাবৃত শৃঙ্গ)। পামীর পর্বতগ্রন্থি থেকে যে সব পর্বতশ্রেণী বিভিন্ন দিকে প্রসারিত হয়েছে তাদের মধ্যে হিমালয় অন্যতম। হিমালয় উত্তরপূর্বে নামচা বারওয়া (7.757 মি. চীনে অবস্থিত) থেকে উত্তর পশ্চিমে নাঙ্গাপর্বত

(8,126 মি., ভারতে অবস্থিত) পর্যন্ত প্রসারিত। 2700 কিলোমিটার দীর্ঘ এই পর্বতের অর্ধাংশ চাঁদের মত পশ্চিম থেকে পূর্বে বিস্তৃত। 240 কিলোমিটার থেকে 320 কি. মি. পর্যন্ত এটি চওড়া।

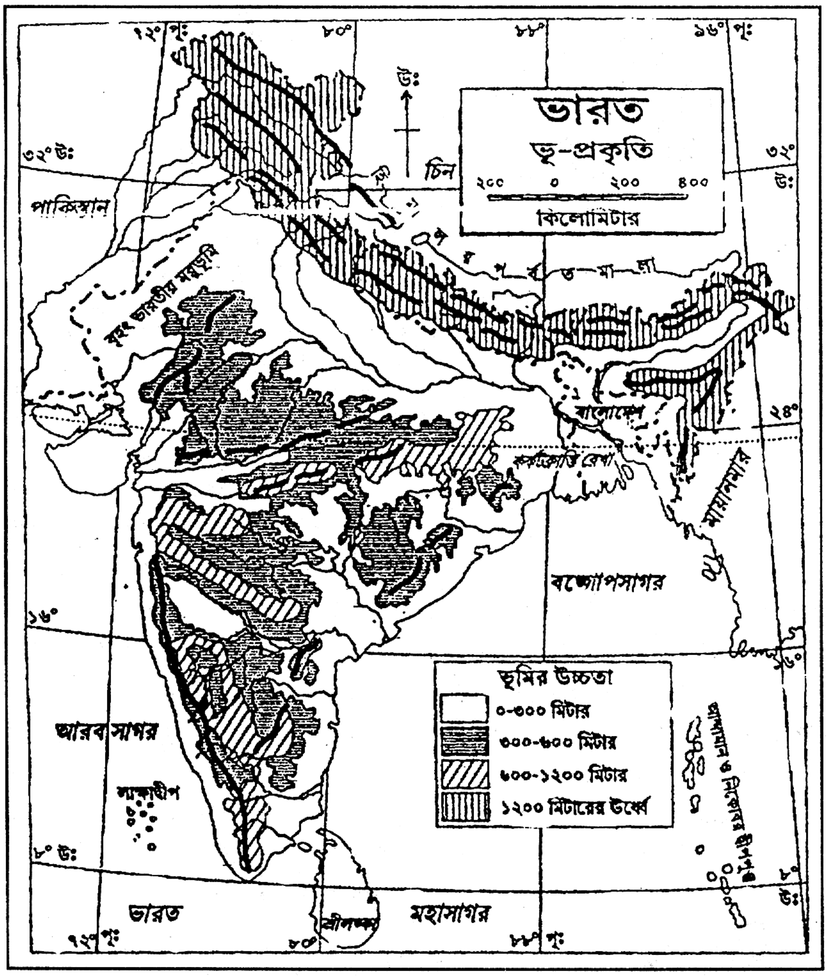

চিত্র 3.4 ঃ ভারতের ভূ-প্রকৃতি

হিমালয় একটি আন্তর্জাতিক পর্বতশ্রেণী। কারণ এর $\frac{2}{3}$ ভাগ ভারতের মধ্যে, বাকি $\frac{1}{3}$ অংশ পাকিস্তান, নেপাল, ভুটান ও চীনে অবস্থিত। হিমালয়ের উঁচু শিখর দেশের প্রায় $\frac{1}{7}$ অংশ স্থান চিরতুষারাবৃত। এদের বরফগলা জলেই উত্তর ভারতের নদীগুলি পুষ্ট।

ভূ-প্রকৃতি ঃ হিমালয় পৃথিবীর নবীনতম ভঙ্গিল পর্বত। টেথিস সাগরের মহীখাত থেকে এটি উৎপন্ন হয়েছে। এর গঠন কাজ এখনও চলছে। ফলে হিমালয় এলাকায় প্রায়ই ভূমিকম্প হয়। এটা বলার অপেক্ষা রাখে না যে হিমালয়ের মতন এক বিশাল পর্বত টেথিস নামক বিস্তীর্ণ মহীখাত থেকে সৃষ্টি হয়েছে। বহু বছর ধরে টেথিস মহীখাত থেকে ভাঁজে ভাঁজে হিমালয় গড়ে উঠেছে।

তাই এটি একদিকে যেমন এক অবিচ্ছিন্ন পর্বতশ্রেণী সৃষ্টি করেছে, অপর দিকে তেমনি পশ্চিম থেকে পূর্বে বিস্তৃত কতকগুলি উচ্চতা-বিশিষ্ট সমান্তরাল পর্বতশ্রেণীও গঠন করেছে। এই পর্বতশ্রেণীগুলি সমান্তরাল ও লম্বাটে

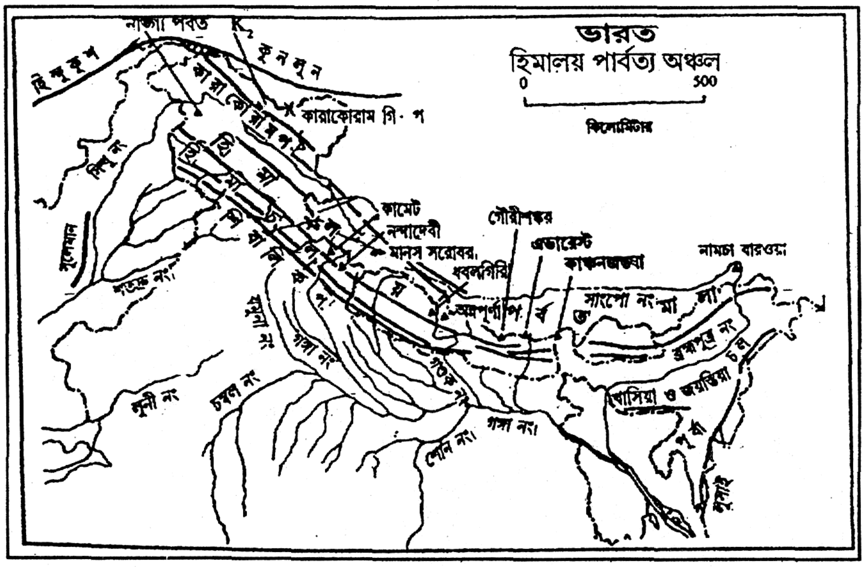

চিত্র 3.4 ঃ হিমালয় পার্বত্য অঞ্চল

এবং উপত্যকা (দুন) ও মালভূমি দিয়ে বিচ্ছিন্ন। উপত্যকাগুলির মধ্যে দুন, কুলু, বিতস্তা, তাওয়াই, রংপো প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। লাডাক মালভূমির উচ্চতা প্রায় 4 কিলোমিটার। হিমালয়ে সমভূমির একান্ত অভাব। পর্বতের ঢালগুলি নদী উপত্যকায় গিয়ে মিলিত হয়েছে। নদীগুলি খরস্রোতা এবং নদীগুলি তাদের গতিপথে অনেক জলপ্রপাত ও গিরিখাত সৃষ্টি করেছে। পর্বতগাত্র খুব খাড়া। স্থানে ঘন বনভূমি দিয়ে ঢাকা। পর্বতের শিখরদেশ বছরের সব সময় তুষারে ঢাকা থাকে।

উচ্চতা ও ভূ-প্রকৃতি অনুসারে উত্তর থেকে দক্ষিণে হিমালয়কে চারটি অংশে বিভক্ত করা হয়।

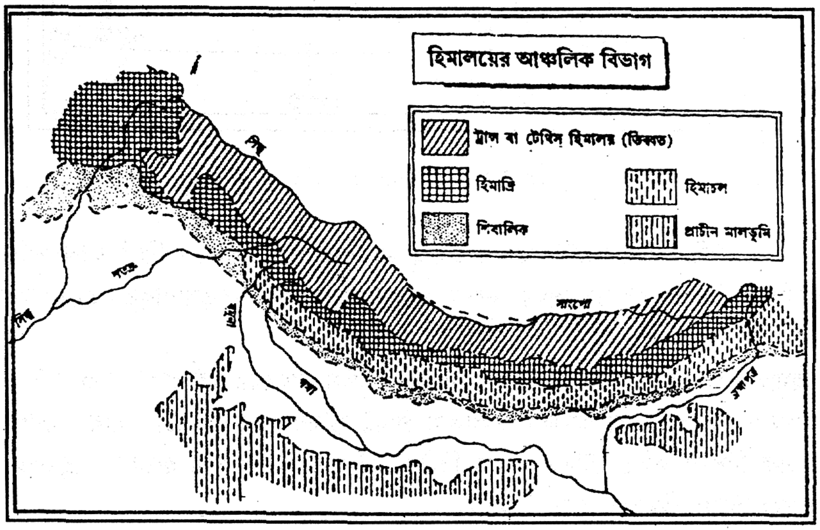

চিত্র 3.5 ঃ হিমালয়ের আঞ্চলিক বিভাগ

(1) **ট্রান্স হিমালয় ঃ** উত্তরে সিন্ধু-সাংপো উপত্যকা এবং দক্ষিণে উচ্চ হিমালয় অবস্থিত। জাস্কর (Zaskar) পর্বতশ্রেণী ট্রান্স হিমালয়ের প্রধান অংশ হল শিল্প (7,026 মি.) ও রিয়ো ফারগুল (6791) উহার দুটি প্রধান শৃঙ্গ। ট্রান্স্ হিমালয় পূর্বে তিব্বত মালভূমিতে মিলিত হয়েছে। ট্রান্স হিমালয়ের বিসার প্রায় 40 কিলোমিটার।

(2) **হিমাদ্রি বা উচ্চ হিমালয় ঃ** হিমালয়ের এটি উচ্চতম (6000 মিটার) অংশ। এখানে 6000 মিটার (6 কিমি) -র বেশী উঁচু বহু পর্বতশৃঙ্গ রয়েছে যাদের শিখরদেশ সারা বছর চিরতুষারাবৃত থাকে। সুউচ্চ শৃঙ্গগুলির মধ্যে নাঙ্গা পর্বত (8116 মি.), নন্দাদেবী (7817 মি.), কাঞ্চনজঙ্ঘা (8598 মি.) ও কাংটো (7089 মি.) প্রধান। এই অঞ্চলে গ্রানাইট পাথরের প্রাধান্য দেখা যায়। এই পার্বত্য অঞ্চলের দক্ষিণ ঢাল খুব খাড়া ও অনতিক্রম্য। বুর্জি লা, জোজিলা, বরলাচা প্রভৃতি গিরিপথগুলি উল্লেখযোগ্য। হিমালয়ের এই অংশ উত্তর পশ্চিমে নাঙ্গা পর্বতের (North-west syntaxis) কাছে এবং উত্তরপূর্বে নামচা বারওয়ার কাছে চুলের কাঁটার ন্যায় বাঁক নিয়েছে। হিমালয়ের এই অংশের কোন কোন এলাকা চীন, নেপাল ও ভুটানের অন্তর্গত। এই অংশের উচ্চতম শৃঙ্গ মাউন্ট এভারেষ্ট (8848 মি.) নেপাল ও চীন সীমান্তে অবস্থিত।

(3) **হিমাচল বা অবহিমালয় ঃ** হিমালয়ের হিমাচল অংশের উত্তরে হিমালয়ের সর্বোচ্চ প্রর্বতশ্রেণী উচ্চ হিমালয় এবং দক্ষিণে শিবালিক পর্বতশ্রেণী অবস্থিত। এই অংশের বিস্তার 60 থেকে 80 কিলোমিটার। এখানকার উঁচু পর্বত শৃঙ্গগুলির গড় উচ্চতা 2000 থেকে 3,300 মিটার। এই অংশের হিমালয়কে হিমাচল বলে। স্থানে স্থানে উচ্চতা 8000 মিটার বা তারও বেশী হয়। এই অংশের প্রধান পর্বতশ্রেণীগুলির মধ্যে পিরপঞ্জল, ধাওলাধর, নাগটিব্বা ও মুসৌরী বিশেষ উল্লেখযোগ্য। হিমালয়ের এই অংশে নদীগুলি গভীর খাতের সৃষ্টি করেছে। এই অংশে অনেক গিরিপথ আছে, যেমন—পিরপঞ্জল পর্বতশ্রেণীতে পিরপঞ্জল গিরিপথ, বুন্দিলপীর গিরিপথ, বানিহাল গিরিপথ বিদ্যমান। হিমাচল হিমালয়ের দক্ষিণ ভাগ থেকে শিবালিক হিমালয়ের উত্তরভাগ পর্যন্ত বিস্তীর্ণ অঞ্চলে অনেক সমান্তরাল ও প্রশস্ত উপত্যকা দেখা যায়, এদের **দুন** (Dun) বলে, যথা দেরাদুন। কুমায়ুন হিমালয়ের এই অংশে কতগুলি হ্রদ বা **তাল** বিদ্যমান, যথা নৈনিতাল।

(4) **শিবালিক ঃ** হিমালয়ের দক্ষিণপ্রান্তে ছোট পাহাড় লাইন বেঁধে পশ্চিম থেকে পূর্বে বিস্তৃত। এই পাহাড় শৃঙ্খলের নাম **শিবালিক**। এই অংশের ভূ-প্রকৃতিতে পাহাড়পর্বত বিদ্যমান। এর উচ্চতা 150 থেকে 600 মিটার এবং চওড়া 10 থেকে 15 কিলোমিটার। **শিবালিক** শব্দটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হল **শিবের আলয়**। হরিদ্বারের কাছে এইরকম এক পাহাড় ভেদ করে গঙ্গা সমভূমিতে নেমেছে।

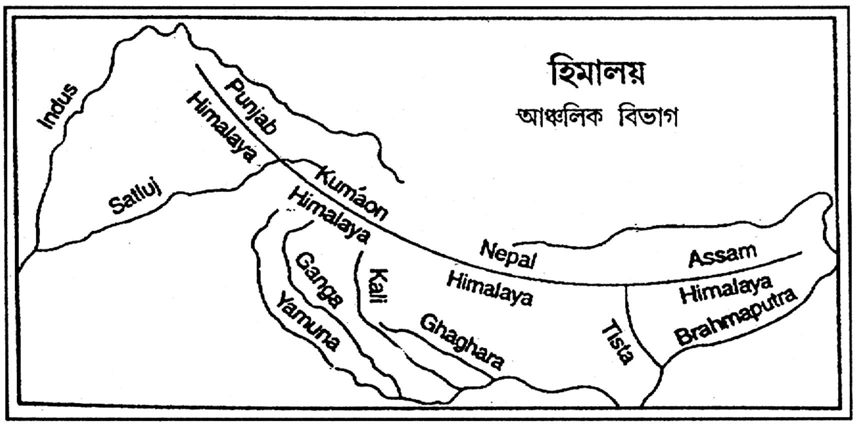

চিত্র 3.6 ঃ হিমালয়

হিমালয়ের আঞ্চলিক বিভাগ ঃ উচ্চতা ও ভূ-প্রকৃতি অনুসারে উত্তর থেকে দক্ষিণে হিমালয়কে যেরূপ 4টি অংশে বিভক্ত করা হয়, তেমনি পশ্চিম থেকে পূর্বে প্রধান 3টি অংশে বিভক্ত করা হয়। যথা—

(1) পশ্চিম হিমালয় ঃ জম্মু ও কাশ্মীর, হিমাচল প্রদেশ ও উত্তরপ্রদেশের উত্তরাখণ্ড নিয়ে পশ্চিম হিমালয়। পশ্চিম হিমালয়কে পশ্চিম থেকে পূর্বে তিনটি অংশে ভাগ করা যায়, যথা ঃ (ক) **কাশ্মীর হিমালয়** (খ) **হিমাচল হিমালয়** (গ) **কুমায়ুন হিমালয়** বা উত্তরাখণ্ড হিমালয়। **পর্ব হিমালয়কে পশ্চিম থেকে পূর্বে তিনটি অংশে ভাগ** করা যায় যথা ঃ (i) **সিকিম-দার্জিলিং হিমালয়** (ii) **ভুটান হিমালয়** (ভারতে অন্তর্ভুক্ত নয়) (iii) **অরুণাচল হিমালয়।**

কাশ্মীর হিমালয় ঃ কাশ্মীর হিমালয় জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্য জুড়ে অবস্থিত। ভূ-প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী কাশ্মীর হিমালয়কে দুটি উপ-অঞ্চলে বিভক্ত করা হয় ঃ (ক) কাশ্মীর হিমালয় এবং (খ) দক্ষিণ কাশ্মীর হিমালয়।

(ক) উত্তর কাশ্মীর হিমালয় ঃ উত্তর কাশ্মীর হিমালয় ও মধ্যবর্তী অংশে উচ্চ হিমালয় প্রসারিত। জম্মু ও কাশ্মীরের নাঙ্গা পর্বত থেকে দক্ষিণ পূর্বে প্রসারিত হয়ে প্রায় 850 কিমি দীর্ঘ বৃহৎ হিমালয় বিদ্যমান। উত্তর কাশ্মীর হিমালয় ট্রান্ট বা টেথিস হিমালয় নামে পরিচিত। দক্ষিণ পূর্ব দিকে প্রসারিত পর্বত শ্রেণীগুলির মধ্যে বৃহৎ হিমালয় পর্বতশ্রেণী, জাস্কর পর্বতশ্রেণী, লাডাক পর্বতশ্রেণী ও বৃহৎ কারাকোরাম পর্বতশ্রেণী দাঁড়িয়ে আছে। পৃথিবীর বৃহত্তম হিমবাহগুলি কারাকোরাম পর্বতশীর্ষে অবস্থিত। পৃথিবীর দ্বিতীয় উচ্চতম পর্বতশৃঙ্গ গডউইন অস্টিন বা K_2 (8.611 মিটার) এখানে অবস্থিত। অন্যান্য অতি উঁচু শৃঙ্গগুলি হল গ্যাসেরব্রুম, ব্রডপীক (8,056 মি), দিস্তেঘিলসর (7,885 মি), রাকাপোসি (7,788 মি), ত্রিভর (7,788 মি.) প্রভৃতি। কারাকোরামের দক্ষিণ ঢালে অনেক বড় বড় হিমবাহ আছে। হিস্পার হিমবাহ ও বাটুরা হিমবাহ সিন্ধু নদের জল যোগায়। বাটুরার জল হুঞ্জা নদী হয়ে সিন্ধু নদে পড়েছে। আবার, বিয়াকো হিমবাহ ও বাল্টেরো হিমবাহ সিন্ধুর উপনদী শিগার নদীকে জল জোগায়। ভারতের **দীর্ঘতম হিমবাহ সিয়াচেনের** দৈর্ঘ্য প্রায় 72 কিলোমিটার। নুব্রা নদী এই হিমবাহ গলা জলে পুষ্ট। কারাকোরামের শিখরদেশের বরফের গভীরতা প্রায় 121 থেকে 300 মিটার। বৃহৎ কারাকোরামের উল্লেখযোগ্য গিরিখাতগুলি হল হুঞ্জা নদী খাত (যা আফগানিস্তান ও চীনে যাতায়াতের পথ হিসাবে ব্যবহৃত হয়) হিস্পার, গুমুস্তাঘ, সিয়ালা, বিলাট লা, মার্পোলা, সাসের লা ও কারাকোরাম।

সিন্ধুনদ ও শিয়ক নদীর মধ্যখানে লাডাক পর্বতশ্রেণী অবস্থিত। এর দৈর্ঘ্য 350 কিমি ও বিস্তার 50 কিমি। ভারতের উচ্চতম মালভূমি লাডাক মালভূমি (উচ্চতা প্রায় 4000 মিটার) লাডাক পর্বতশ্রেণীর উত্তরপূর্বে অবস্থিত।

উত্তর কাশ্মীর হিমালয়ের দক্ষিণ ভাগে জাস্বরসহ বৃহৎ হিমালয় পর্বতশ্রেণী অবস্থিত। এর পশ্চিমভাগে যেখানে সিন্ধু নদ বাঁক নিয়ে পাকিস্তানে প্রবেশ করেছে সেখানে নাঙ্গা পর্বত (8,126 মি.) অবস্থিত। এখানে 13-টি শৃঙ্গ আছে যাদের উচ্চতা 6000 মিটারেরও বেশি। এখানকার উল্লেখযোগ্য গিরিপথগুলি হল উমসি লা, চিলুং লা ও বুজি লা।

পশ্চিম হিমালয়ের গঠন ঃ হিমালয়ের উত্থানকালে গিরিজনি আলোড়নের ফলে ভাঁজ, চ্যুতি ইত্যাদির মত জটিল ভূতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য বিকাশ লাভ করে। হিমালয় গঠনের বিভিন্ন পর্যায়ে পার্শ্বিক চাপজনিত কারণে এই জটিলতা পরবর্তীকালে আরো বৃদ্ধি পায়।

বলা হয়ে থাকে যে বহির্হিমালয়ের গঠন অপেক্ষাকৃত সরল। এটি জুরা গঠনপ্রকৃতির, সাধারণ ঊর্ধ্বভঙ্গ ও অধোভঙ্গ শ্রেণীর সমন্বয়ে গঠিত।

"The structure of the outer or Sub-Himalayan ranges is generally of great simplicity/ they are made up of a series of broad anticlines and synclines of the normal type" (Wadia).

বহির্হিমালয়ের দেখা যায় খাড়া ভৃগুতট ও নতিঢাল। এগুলি অনুদৈর্ঘ্য (longitudinal) দুন ও অন্যান্য গাঠনিক উপত্যকা দ্বারা বিচ্ছিন্ন। এদের মধ্যে **প্রধান সীমানা বিলোম চ্যুতি** বা **ক্রল থ্রাস্ট** এই পর্বতশ্রেণীর গঠনগত বৈশিষ্ট্য যা অসম থেকে পাঞ্জাব পর্যন্ত হিমালয়ের পাদদেশ বরাবর বিস্তৃত। "These outer ranges, dissected into a series of escarpments and dip-slopes, are separated by narrow, longitudinal tectonic valleys or depressions, called **duns**. The reversed strike-faults.....are a characteristic feature.... the most prominent of these is the main boundary fault" (Wadia)

শিবালিক পর্বতশ্রেণী ও মধ্য হিমালয়ের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট হল এদের অর্থোক্লাইনাল গঠন। এর ভৃগুতটে সমভূমিমুখী এবং তিব্বতের দিকে ঢালু হয়ে গেছে। Wadia-র ভাষায় "Many of the ranges of the outer Himalyayas and several of the middle Himalyayas as well are of the orthoclinal type of structure; they have a steep scarp on the side facing the plains and gentle inclination facing Tibet."

পশ্চিম হিমালয় এক বা একাধিক পর্যায়ে উত্থানের ফলে গঠিত হয়েছে। ভূ-তাত্ত্বিক গঠন অনুযায়ী পশ্চিম হিমালয়কে নিম্নোক্ত গঠনাঞ্চলে (structural zone) ভাগ করা যায়;

1. **ফোরল্যান্ড ঃ** এই সমপ্রায়ভূমি প্রধানত কেলাসিত মুরী (Murree) শিলা দ্বারা গঠিত (its peneplaned surface being buried under a thick cover of Murree sediments).

2. **অটোক্‌থনাস অঞ্চল** (A belt of autochthonous) : এটি প্রধানত কার্বনিফেরাস থেকে এয়োসিন যুগের শিলা দ্বারা গঠিত (Carboniferous-Eocene belt) এবং রিকাম্বেন্ট ভাঁজের বৈশিষ্ট্যযুক্ত। অটোক্‌থনাস অঞ্চল ফোরল্যান্ড (সম্মুখভূমির) ওপর এসে পড়েছে, যার নীচে আছে মুরি শ্রেণী (মুরী থ্রাস্ট)। এই অঞ্চলের দক্ষিণাভিমুখে অতি ভাঁজ ও থ্রাস্টিং (a series of overfolds and thrusting) এবং উত্তর পূর্বমুখী নতি ঢালের প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয়।

3. **নাপ অঞ্চল ঃ** অনেক ক্ষেত্রে বিলোম চ্যুতি (reversed fault) রিকাম্বেন্ট অঞ্চলকে কর্তন করেছে এবং থ্রাস্ট প্লেনকে (thrust plane) ও অতিক্রম করেছে। এই কারণে ভাঁজের কিছু অংশ দক্ষিণে সরে গেছে। যেমন— কাশ্মীরের নাপ অঞ্চল যা "has been ridged up and trust forward in a nearly horizontal sheet-fold" (Wadia).

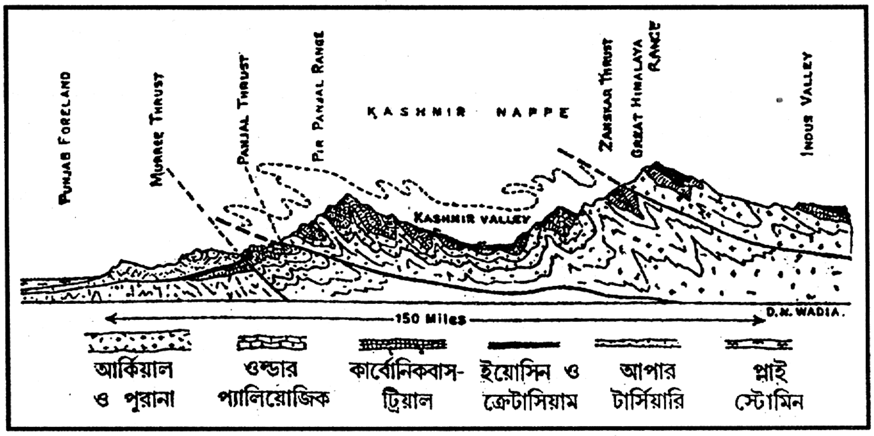

চিত্র 3.7 ঃ কাশ্মীর হিমালয়ের ভূ-তাত্ত্বিক গঠন

কাশ্মীর নাপ প্রধানত পূর্ব ক্যাম্বিয়ান (সুলেমান শ্রেণী) যুগের শিলা দ্বারা গঠিত। এর ওপর রয়েছে ডোগ্রা শ্লেট (Dogra slate) যা বৃহৎ মহীখাতের তলদেশ গঠন করেছে। পাঞ্জাল থ্রাস্ট (Panjal thrust) অনুভূমিকভাবে সম্মুখে অগ্রসর হয়েছে।

সিমলা নাপ অঞ্চল শোলোন-এর উত্তরে শুরু হয়েছে। এখানকার ক্রল থ্রাস্ট দুইটি বৃহৎ থ্রাস্ট-জুটগ (Gutogh) ও গিরি (Giri) দ্বারা বিচ্ছিন্ন এবং এরা পশ্চিম হিমালয়ের পাঞ্জাল থ্রাষ্টের সামিল। সিমলা হিমালয়ের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল এখানে ক্লিপ ও উইণ্ডো (window)-র উপস্থিতি; সিমলা ক্লিপ ও শালি উইণ্ডো। ভাঁজযুক্ত শিলাস্তরে অত্যাধিক চাপের ফলে রিকাম্বেন্ট ভাঁজের কিছুটা অংশ দূরে ছিটকে পড়ে এবং পরবর্তীকালে ভূ-পৃষ্ঠে ক্ষয়ের ফলে উইণ্ডো-র সৃষ্টি হয়।

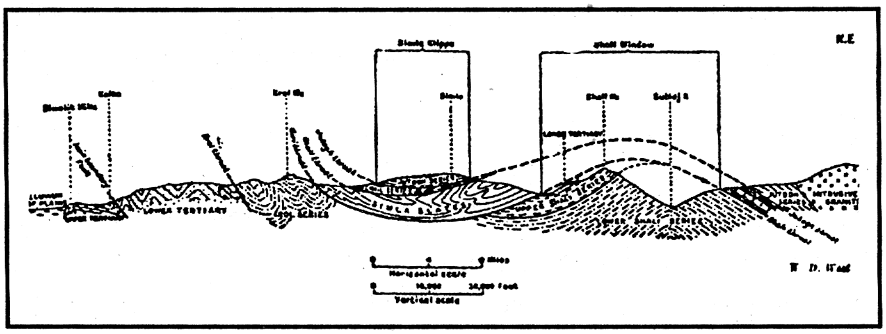

চিত্র 3.8 ঃ সিমলা হিমালয়ের ভূ-তাত্ত্বিক প্রস্থছেদ

গাড়োয়াল (Garwal) হিমালয়ের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল এই যে গারওয়াল নাপ ক্রল (Kral) নাপের ওপর অধ্যারোপিত হয়েছে এবং এখানেও প্রধান সীমানা চ্যুতি ছাড়াও অপর একটি চ্যুতি লক্ষ্য করা যায়।

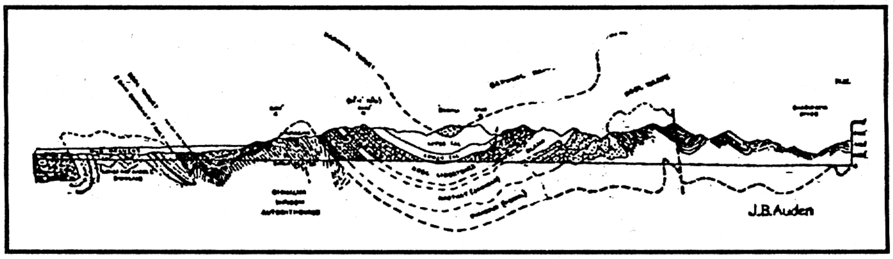

চিত্র 3.9 ঃ গাড়োয়াল হিমালয়ের নাপের গঠনের এক প্রস্থছেদ

দক্ষিণ কাশ্মীর হিমালয় ঃ দক্ষিণ কাশ্মীর হিমালয়ের গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল হল শ্রীনগর উপত্যকা বা কাশ্মীর উপত্যকা। শ্রীনগর শহরকে কেন্দ্র করে বিতস্তা উপত্যকার অংশ কাশ্মীর উপত্যকা নামে পরিচিত। এই উপত্যকার দক্ষিণে পিরপঞ্জল পর্বত শ্রেণী এবং উত্তরে বৃহৎ হিমালয় পর্বতশ্রেণী। এই উপত্যকা প্রায় সমতল। ইহা 135 কিমি. লম্বা ও 80 কিমি. চওড়া। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে এই উপত্যকা 1600 মিটার উঁচু। এখানে ডাল হ্রদের তীরে জম্মু ও কাশ্মীরের রাজধানী শ্রীনগর অবস্থিত। এখানকার প্রাকৃতিক দৃশ্য মনোরম। বৃহৎ হিমালয়ের জেজিলা গিরিপথে শ্রীনগরের সঙ্গে লেহ্-র সড়কপথে যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে। জেজিলার দক্ষিণভাগে বিখ্যাত অমরনাথ গুহা অবস্থিত। পূর্বে জম্মু অঞ্চলের সঙ্গে শ্রীনগরের যোগাযোগের মাধ্যম হিসাবে পিরপঞ্জল পর্বতশ্রেণীর

বানিহাল গিরিপথ ব্যবহার হতো। শীতকালে অত্যাধিক তুষারপাদে দরুন এই গিরিপথ বন্ধ হয়ে যেত বলে বর্তমানে এখানে সারাবছর যাতায়াতের উপযোগী 2.4 কিমি. লম্বা জওহর সুড়ঙ্গ তৈরী করা হয়েছে যা দেশের অন্যান্য অংশের সঙ্গে কাশ্মীর উপত্যকার যোগাযোগ রক্ষা করে। পিরপাঞ্জলের দক্ষিণে বেলেপাথরে গঠিত বন্ধুর ছোট ছোট পাহাড় রয়েছে। পশ্চিমে বিতস্তা নদী উপত্যকা ও পূর্বে ইরাবতী নদী উপত্যকার মধ্যবর্তী জম্মু পাহাড় টার্সিয়ারী (Tertiary) যুগের শিলায় গঠিত। পিরপঞ্জলের পূর্বভাগ ধাওলাধর (Dhawladhar) পর্বতশ্রেণী নামে পরিচিত।

হিমাচল হিমালয় ঃ জম্মু ও কাশ্মীর থেকে দক্ষিণপূর্বে বিস্তারিত হিমাচল প্রদেশের অন্তর্গত হিমালয়ের অংশটি **হিমাচল হিমালয়** নামে খ্যাত। এই অংশের উত্তর ঢাল খুব বন্ধুর ও রুক্ষ, দক্ষিণ ঢাল অরণ্যময়। উত্তরভাগে বৃহৎ হিমালয়ে রোটাং গিরিপথ ও বড় লাচা লা গিরিপথ রয়েছে। বৃহৎ হিমালয়ের দক্ষিণ ঢালে বড় লাচা লা-র কাছে চন্দ্র নদী ও ভাগা নদী সৃষ্টি হয়েছে। এদের মিলিত প্রবাহই হল **চন্দ্রভাগা** নদী যা পিরপঞ্জালের উত্তর ঢাল দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে। পিরপঞ্জালের দক্ষিণভাগে ধাওলাধর পর্বতশ্রেণী রয়েছে। হিমালয়ের এই অংশ থেকে দুটি প্রধান নদী, যথা ঃ বিপাশা (রোটাং গিরিপথের কাছে) ও ইরাবতী নদী (বিপাশার পশ্চিমে) উৎপন্ন হয়েছে। এই অঞ্চলের প্রধান নদী শতদ্রু শপকি লা গিরিপথের কাছে এক গভীর গিরিখাত খনন করে ভারতে প্রবেশ করে।

ভূ-প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী হিমাচল হিমালয়কে তিনটি উপ-প্রাকৃতিক ভাগে ভাগ করা যায় ঃ যথা— (1) উত্তর অংশে **বৃহৎ হিমালয়** (জাস্কর পর্বতশ্রেণীসহ), (2) **মধ্যভাগের অবহিমালয়** ও (3) দক্ষিণভাগের **শিবালিক হিমালয়।**

পূর্বোক্ত জাস্কর পর্বতশ্রেণী স্পিটি ও কিন্নৌর উপত্যকাকে উত্তর-পূর্বের তিব্বত মালভূমি থেকে আলাদা করেছে। ধাওলাধার ও পিরপঞ্জালের উত্তরে অবস্থিত বৃহৎ হিমালয় (5000 – 6000 মি.) পর্বতের মধ্য দিয়ে কাংলা, বড়লাচা লা প্রভৃতি গিরিপথ বিস্তৃত রয়েছে।

ধাওলাধর পর্বত ও পিরপঞ্জল পর্বতের ঢালে কয়েকটি নদী উপত্যকা যথা, কাংড়া, চম্বা, কুলু, লাহুল প্রভৃতি উপত্যকা রয়েছে। শতদ্রু, বিপাশা ও ইরাবতী নদীগুলি ধাওলাধর পর্বতকে বিভিন্ন স্থানে অতিক্রম করেছে (criss-cross)। ধাওলাধর পর্বতশ্রেণীর জ্বালামুখী পাহাড় থেকে অনবরত আগুনের শিখা বেরোয়। এর চারপাশে বহু উষ্ণ প্রস্রবন রয়েছে। এখানকার অন্যান্য উল্লেখযোগ্য পর্বতশ্রেণীগুলি হল নাগটিব্বা ও মুসৌরি। এখানকার দক্ষিণভাগের হিমালয় **শিবালিক** পাহাড় নামে পরিচিত, যার গড় উচ্চতা হল 600 মিটার। এর দক্ষিণভাগ খাড়াই, কিন্তু উত্তরভাগ ক্রমশঃ ঢালু হয়ে উপত্যকায় মিশেছে।

কুমায়ুন হিমালয় ঃ ভারতের নতুন রাজ্য উত্তরাঞ্চলের মধ্যে দিয়ে প্রসারিত হিমালয়ের অংশটি কুমায়ুন হিমালয় (উত্তরাখন্ড হিমালয়) নামে পরিচিত। হিমালয়ের এই অংশে উত্তর থেকে দক্ষিণে যথাক্রমে **উচ্চ হিমালয়** (হিমাদ্রি), **হিমাচল হিমালয় ও শিবালিক** এই তিনটি পর্বতশ্রেণী রয়েছে। এরা উত্তর পশ্চিম থেকে দক্ষিণপূর্বে বিস্তার লাভ করেছে।

প্রথমটি উত্তরের শেষপ্রান্ত জুড়ে রয়েছে। এর গড় উচ্চতা 4800 থেকে 5000 মিটার। এটি চওড়ায় প্রায় 50 কিলোমিটার। দ্বিতীয়টি অর্থাৎ হিমাদ্রি পশ্চিমভাগে যমুনার উপনদী টোনস্ থেকে পূর্বভাগে কালীনদী পর্যন্ত প্রায় 320 কিমি দৈর্ঘ্যের জায়গা জুড়ে অনেকগুলি তুষারমণ্ডিত শৃঙ্গ রয়েছে। যথা-নন্দাদেবী (7,817 মি.), কামেট (7,756 মি.) বন্দরপুঞ্জ (6,315 মি.), গঙ্গোত্রী (6,614 মি.), কেদারনাথ (6,940 মি.) চৌখাম্বা (৭৮১৭ মি.) , দুনগিরি (7066 মি.), ত্রিশূল (7,120 মি.), নন্দাকোট (6,861 মি.) প্রভৃতি। হিমালয়ের এই অঞ্চল থেকে অনেক নদী উৎপন্ন হয়েছে যাদের মধ্যে গঙ্গা, যমুনা ও কালী প্রধান।

দ্বিতীয়টি অর্থাৎ হিমাচল হিমালয় উচ্চ বা বৃহৎ হিমালয় অঞ্চলের দক্ষিণভাগে অবস্থিত। নাগটিব্বা ও মুসৌরী

পর্বত এখানে রয়েছে। এটি গড়ে 1500-2700 মিটার উঁচু ও প্রায় 75 কিমি চওড়া। পূর্বভাগে কতগুলি হ্রদ (তাল) দেখা যায় ঃ যথা— নৈনিতাল, ভীমতাল, নাউকুচিয়াতাল, সাততাল, পুনাতাল, সামলাতাল ইত্যাদি।

হিমাচল হিমালয়ের দক্ষিণ ভাগের ঢাল ক্রমশঃ নিচু হয়ে নিম্ন উপত্যকায় মিশেছে যা দুন নামে পরিচিত। এদের মধ্যে দেরাদুন সবচেয়ে বড় (36 কিমি লম্বা ও 25 কিমি চওড়া)। অন্যান্য উপত্যকাগুলির মধ্যে কোটরি, চৌখাম্বা, পট্টি, কোটা উল্লেখযোগ্য।

দুনের দক্ষিণ ভাগে রয়েছে **শিবালিক পাহাড়**। এই অঞ্চলের শিবালিক পাহাড়ের উচ্চতা 750 থেকে 1200 মিটার, এদের দক্ষিণ ঢাল খাড়াই, কিন্তু উত্তর ঢাল ক্রমশঃ নিচু হয়ে দুনে (নিম্ন উপত্যকা) মিশেছে।

পূর্ব হিমালয় ঃ নেপালের পূর্ব সীমানা থেকে ভুটানের পশ্চিম সীমানা এবং ভুটানের পূর্ব সীমানা থেকে অরুণাচল প্রদেশের তিরাপ জেলার পশ্চিম সীমানা পর্যন্ত বিস্তীর্ণ হিমালয় পর্বতশ্রেণী পূর্ব হিমালয় নামে খ্যাত। মাঝের ভুটান হিমালয়কে (ভুটানের অন্তর্গত) বাদ দিলে পূর্ব হিমালয়কে প্রধান দুটি ভাগ করা যায়—

1. **সিকিম-দার্জিলিং-হিমালয় ঃ** পশ্চিমে সিঙ্গালিলা পর্বতশ্রেণী থেকে পূর্বে ডংকিয়া পর্বতশ্রেণীর মধ্যবর্তী অংশ হল সিকিম-দার্জিলিং-হিমালয়। এর উত্তর ভাগে রয়েছে বৃহৎ হিমালয় পর্বতশ্রেণী। দক্ষিণ ঢালে তিস্তা ও তার উপনদী রঙ্গিত প্রবাহিত। সিকিম ও নেপাল সীমান্তে পৃথিবীর তৃতীয় উচ্চতম শৃঙ্গ কাঞ্চনজঙ্ঘা (8598 মিটার) অবস্থিত। ডংকিয়া পর্বত শ্রেণীর মধ্যে নাথুলা ও জিলেপ লা নামে দুটি গিরিপথ রয়েছে। কালিম্পং, কার্সিয়াং, দার্জিলিং সদর মহকুমা এবং জলপাইগুড়ি জেলার উত্তরভাগের সামান্য একটি অংশ নিয়ে দার্জিলিং সদর মহকুমা এবং জলপাইগুড়ি জেলার উত্তরভাগের সামান্য একটি অংশ নিয়ে দার্জিলিং হিমালয় গঠিত। দার্জিলিং হিমালয়ের পশ্চিমভাগে সিঙ্গালিলা ও পূর্বভাগে চোলা পর্বতশ্রেণী রয়েছে। সিঙ্গালিলার প্রধান শৃঙ্গগুলির মধ্যে সান্ডাকুফ (3630 মি.), ফালুট (3595 মি.), সবরগাম (3,543 মি) এবং টংলু (3,063 মি.) উল্লেখযোগ্য।

অরুণাচল হিমালয় ঃ অরুণাচল প্রদেশের হিমালয়ের তিনটি ভাগই **হিমাদ্রি, হিমাচল** ও **শিবালিক** রয়েছে। ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার উত্তরে অবস্থিত শিবালিক পাহাড়ের গড় উচ্চতা 800 মিটার। এই অংশের হিমাদ্রির গড় উচ্চতা 6,000 মিটারের বেশি, অরুণাচল হিমালয় বহু পার্বত্য নদী দিয়ে বিচ্ছিন্ন। ডিহং, ডিবং কামলা ও সুবর্ণসিরি নদীগুলি উল্লেখযোগ্য।

(২) উপদ্বীপ অঞ্চল

উপদ্বীপ অঞ্চলটি উত্তর ভারতের বিশাল সমভূমিঅঞ্চলের দক্ষিণে অবস্থিত। এটির উত্তর সীমানা কচ্ছ থেকে পূর্বে রাজমহল পাহাড় পর্যন্ত বিস্তৃত। এবং দক্ষিণসীমা কন্যাকুমারিকা অন্তরীপ পর্যন্ত বিস্তৃত। এই ত্রিভুজাকার অঞ্চলটি **উপদ্বীপ অঞ্চল** নামে পরিচিত। এই অঞ্চলটি দু'ভাগে বিভক্ত ঃ উত্তরের অংশটি (i) **মধ্য ভারতের উচ্চভূমি** ও দক্ষিণের অংশটি (ii) **উপদ্বীপীয় মালভূমি** নামে পরিচিত। উপদ্বীপ অঞ্চলের মাঝ-বরাবর বিন্ধ্য ও সাতপুরা পর্বতের মধ্যে অবস্থিত নর্মদা উপত্যকা ও আরো উত্তর-পূর্বে শোন উপত্যকা বরাবর যে রেখা টানা যায় তা অঞ্চলকে দুভাগে ভাগ করেছে। তা হল পূর্বোক্ত মধ্য ভারতের উচ্চভূমি ও উপদ্বীপীয় মালভূমি।

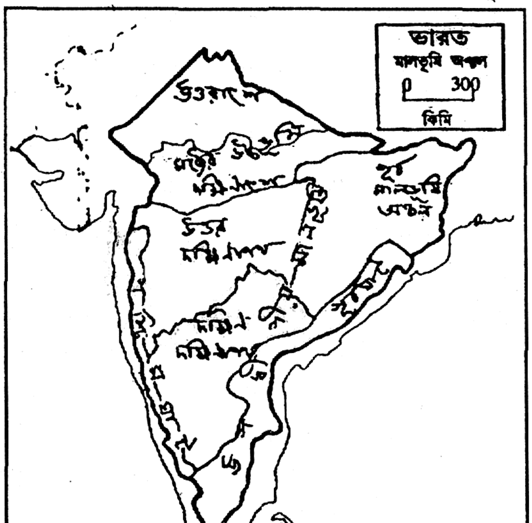

চিত্র 3.10 ঃ ভারতের মালভূমি অঞ্চল

(i) **মধ্যভারত উচ্চভূমি** ও পূর্বভারত উচ্চভূমি (পূর্বের মালভূমি) ঃ—

মধ্যভারত উচ্চভূমি ও পূর্বের মালভূমি প্রধানতঃ পাহাড়ী অঞ্চল যা দাক্ষিণাত্য মালভূমিকে গঙ্গা সমভূমি থেকে

আলাদা করেছে। এই উচ্চভূমির উত্তরে রয়েছে গঙ্গা সমভূমি, দক্ষিণে সাতপুরা পর্বতশ্রেণী, পশ্চিমে আরাবল্লী পর্বতশ্রেণী ও গুজরাট সমভূমি এবং পূর্বভাগে পশ্চিমবঙ্গের রাঢ় অঞ্চল ও ওড়িশা উপকূল সমভূমি।

আমরা আগেই জেনেছি যে এই অঞ্চলের প্রধান ভাগ দুটি (ক) মধ্যভারত উচ্চভূমি, (খ) পূর্বভারত উচ্চভূমি বা পূর্বের মালভূমি। প্রথমটি অর্থাৎ মধ্য ভারত উচ্চভূমি দুটি প্রাকৃতিক উপ-বিভাগে বিভক্ত, যেমন (ক) **উত্তর মধ্য ভারত উচ্চভূমি** এবং (খ) **দক্ষিণ মধ্য ভারত উচ্চভূমি**।

উত্তর মধ্য ভারত উচ্চভূমিকে ভূ-প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী পশ্চিম থেকে পূর্বে চারটি প্রাকৃতিক ভাগে ভাগ করা হয়। যথা—

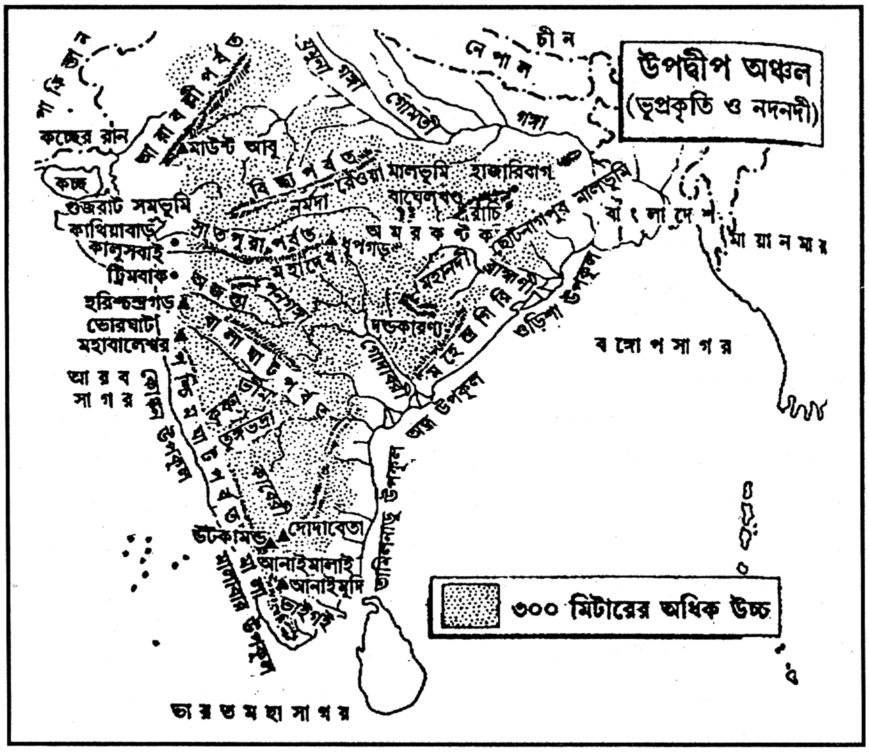

চিত্র 3.11 ঃ ভারতের উপদ্বীপিয় অঞ্চল

(ক) (i) **আরাবল্লী পর্বতশ্রেণী ঃ** এটি পৃথিবীর প্রাচীনতম (প্যালিওজোয়িক যুগের) ভঙ্গিল পর্বত। স্থানে স্থানে এই পর্বতশ্রেণী ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে সমভূমিতে রূপান্তরিত হয়েছে। ক্ষয়কার্যের ফলে জায়গায় জায়গায় এটি বিচ্ছিন্ন পাহাড়ের রূপ নিয়েছে।* এই পর্বতশ্রেণীর শৈলশিরাটি (প্রায় 692 কিমি লম্বা) গুজরাটের পালনপুর থেকে দিল্লী পর্যন্ত বিস্তৃত। উত্তরপূর্বভাগে আলোয়ার, শিকার, ক্ষেত্রী অঞ্চলে 700 থেকে 1000 মিটার উঁচু উঁচু ক্ষয়জাত পাহাড় দেখা যায়। তবে মেরওয়ার পার্বত্য অঞ্চলে আরাবল্লীর ধারাবাহিকতা বিদ্যমান। মধ্য আরাবল্লী অঞ্চলে অনেক

*ভূ-তাত্ত্বিক ইতিহাস সাক্ষী দেয় যে পৃথিবীর অন্যতম প্রাচীন এই পর্বতটি অতিতে হিমালয়কে অতিক্রম করে (তখন অবশ্য হিমালয়ের জন্ম হয়নি) উত্তরে তিব্বত পর্যন্ত (তখন ভূভাগ সবে তৈরী হচ্ছে, তাই রাষ্ট্রের সীমানার কথা আসেই না) বিস্তৃত ছিল। ভূতাত্ত্বিক ইতিহাস আরো বলে যে এই পর্বতটি কয়েকটি ক্ষয়চক্রের শিকার। অর্থাৎ বহু ক্ষয়চক্রীয় (Multi-cyclic) ভূমিভাগের উদাহরণ এটি। সর্বশেষ ক্ষয়চক্রের পর্যায়ে এই পর্বতের মধ্যভাগ উত্থিত হয়েছিল।

লোনা জলের হ্রদের সৃষ্টি হয়েছে। যথা— সম্বর, নওয়া, কুচামান, দেগানা, দিদাওয়ানা প্রভৃতি। এই সব হ্রদের জল থেকে লবণ তৈরী হয়। উপরোক্ত হ্রদগুলির মধ্যে সম্বর হ্রদটি বৃহত্তম। বর্ষাকালে এই হ্রদের আয়তন বাড়ে। প্রায় 25 কিমি দীর্ঘ এবং 8 থেকে 16 কিমি চওড়া এই হ্রদটি প্রকৃতপক্ষে একটি প্লায়াহ্রদ। সম্বর হ্রদ অঞ্চলকে **শেখাবতী নিম্ন পাহাড়ী** অঞ্চল বলে যার গড় উচ্চতা 800 মিটার। আজমীর অঞ্চলের মেরওয়ার পাহাড়ের গড় উচ্চতা 550 মিটার, নিকটবর্তী উদয়পুরের উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে ভোরাট মালভূমি। এখানকার জার্গা (Jarga) পর্বতের উচ্চতা সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে 1431 মিটার।

আবু অঞ্চল ঃ দক্ষিণ পশ্চিমভাগে আরাবল্লী পর্বত সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে আবু অঞ্চলে মাউন্ট আবু এক পার্বত্য মালভূমির আকৃতি নিয়েছে। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে 1200 মিটার উঁচু মাউন্ট আবু 19 কিমি লম্বা ও 6 কিমি চওড়া। আশেপাশে কয়েকটি উৎক্ষিপ্ত পাহাড়চূড়া বর্তমান। মাউন্ট আবুর সঙ্গে ওড়িয়া (Oria) মালভূমিযুক্ত। এই অঞ্চলের আরাবল্লীর সর্বোচ্চ শৃঙ্গ গুরুশিখর (172 মি. উঁচু) অবস্থিত। উত্তরে হিমালয় ও দক্ষিণে নীলগিরির মাঝে অবস্থিত গুরু শিখর ভারতের উচ্চতম শৃঙ্গ। নিকটবর্তী উঁচু শৃঙ্গগুলির মধ্যে **অচলগড়** (1380 মি.) উল্লেখযোগ্য। উচ্চতার জন্য আবু পাহাড়ী অঞ্চলে শৈলোৎক্ষেপ বৃষ্টিপাত হয় এবং এখান থেকে বৃষ্টির জলে পুষ্ট কয়েকটি নদীর সৃষ্টি হয়েছে।

(2) **পূর্ব রাজস্থান উচ্চভূমি ঃ** আরাবল্লীর পূর্বভাগে অবস্থিত যা উত্তর ও পূর্ব ভাগে গঙ্গা সমভূমির যমুনাপার সমভূমির সাথে মিলিত হয়েছে।

(3) **মধ্য ভারত পাথর ঃ** মূলতঃ পাথুরে মালভূমি যার পৃষ্ঠদেশ ঢেউ খেলানো সমপ্রায়ভূমি (Peneplain)।

(4) **বুন্দেলখন্ড উচ্চভূমি ঃ** উত্তরে যমুনাপার, দক্ষিণে বিন্ধ্যমালভূমি, উত্তর পশ্চিমে চম্বল উপত্যকা, দক্ষিণ পূর্বে পান্না-অজয়গড় পাহাড় বেষ্টিত বুন্দেলখণ্ড উচ্চভূমি অঞ্চলের ভূ-প্রকৃতি ততটা বন্ধুর নয়। এটি একটি ঢেউ খেলানো ভূমিভাগ। এর দক্ষিণভাগ ব্যবিচ্ছন্ন মালভূমির ন্যায় কিন্তু উত্তরভাগ অনেকটা সমভূমির মত। এই অঞ্চলের উপর দিয়ে প্রবাহিত বেতোয়া, ধমন, কেন প্রভৃতি নদী স্থানে স্থানে জলপ্রপাত সৃষ্টি করেছে। গ্রানাইট শিলায় গঠিত বহু প্রাচীন এই অঞ্চল যবুনা, চম্বল, বেতোয়া ও কেন নদীও তাদের উপনদীদ্বারা মিলিতভাবে 80^0 পূর্ব দ্রাঘিমারেখা বরাবর প্রায় 150 কিমি. স্থান জুড়ে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়েছে।

(খ) দক্ষিণ মধ্যভারত উচ্চভূমি ঃ

দক্ষিণ মধ্য ভারত উচ্চভূমিকে ভূ-প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী (পশ্চিম থেকে পূর্বে) নিম্নলিখিত চারটি ভাগে ভাগ করা হয়।

(i) **মালব মালভূমি ঃ** লাভা-আবৃত বলে এখানকার পাহাড়গুলি চ্যাপ্টা আকৃতির। তবে সামগ্রিকভাবে মালব মালভূমির পৃষ্ঠদেশ তরঙ্গায়িত। মালব মালভূমি বলতে গেলে জলবিভাজিকার (water divide) কাজ করেছে। মাহী, তাপ্তি ও নর্মদা নদীগুলি পশ্চিমে আরবসাগরের দিকে প্রবাহিত হয়েছে। অপরপক্ষে, চম্বল ও বেতোয়া নদী দুটি যমুনার উপনদী হিসাবে বঙ্গোপসাগরে পড়েছে।

(ii) **বিন্ধ্য পর্বত ঃ** এটি বক্রকারে প্রসারিত। উত্তরপার্শ্বে নর্মদা উপত্যকা কঠিন, পূর্বভাগে এটি ভান্রের পাহাড়ের সঙ্গে মিলিত হয়েছে। আরো পূর্বভাগে কাইমুর পাহাড় বিদ্যমান। পশ্চিমভাগে বিন্ধ অত্যন্ত সংকীর্ণ এবং কয়েকটি ছোট ছোট পাহাড়ে বিভক্ত। ললিতপুর অঞ্চলে বিন্ধ্যকে ভেদ করে এক বিশাল গিরিখাত দিয়ে বেতোয়া নদী প্রবাহিত হয়েছে। সাধারণভাবে বিন্ধ্যের দৈর্ঘ্য 105 কিমি. এবং গড় উচ্চতা 600 মিটার। এই মালভূমির ওপরটা প্রায় সমতল এবং ঢালগুলি ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে ধাপে ধাপে সিঁড়ির মত নেমে এসেছে।

(iii) **বিন্ধ্যের খাড়া ঢাল ঃ** উত্তর-পূর্বাংশে শোন নদীর গ্রস্ত উপত্যকায় ও দক্ষিণে নর্মদা নদীর গ্রস্ত উপত্যকায়

খাড়াভাবে নেমে গেছে। উত্তর পূবাংশে এটি শোন গ্রস্ত উপত্যকায় নেমে গেছে। এই অঞ্চলটি বিন্ধ্য যুগের বেলেপাথরে গঠিত। শোন গ্রস্ত উপত্যকা থেকে খাড়াভাবে উঠে আসা কাইমুর পাহাড়ী অঞ্চলে বেলেপাথর ও চুনাপাথরের প্রাধান্য দেখা যায়। Spate-র ভাষায় "The Vindhya (Deccan Lava) and Kaimür (Vindhyan sandstone) Hills form a great scarp overlooking the Narmada valley and that of the subsequent Son".

(iv) **নর্মদা উপত্যকা ঃ** বিন্ধ্যপর্বত ও সাতপুরা পর্বতের মধ্যবর্তী অঞ্চল জুড়ে প্রবাহিত নর্মদা নদী হল গ্রস্ত উপত্যকা, আর বিন্ধ্য ও সাতপুরা উভয়ই স্তূপ পর্বত। জব্বলপুরের কাছে নর্মদা নদী মার্বেল পাহাড় ভেদ করে প্রবাহিত হয়েছে। 3 কিমি. দীর্ঘ মার্বেল পাহাড়ী খাত বেয়ে নামার সময় নর্মদা এক সুন্দর জলপ্রপাত (ভেরাঘাট, 15 মি. উঁচু) সৃষ্টি করেছে।

পূর্বভারত উচ্চভূমি বা পূর্বের মালভূমি ঃ আঞ্চলিক ভূপ্রকৃতিগত পার্থক্য অনুযায়ী পূর্বভারত উচ্চভূমিকে নিম্নলিখিত প্রাকৃতিক উপ-বিভাগে ভাগ করা যায়।

(i) **বাঘেলখণ্ড মালভূমি** গ্রানাইট শিলা ও বিন্ধ্য যুগের পাললিক শিলায় গঠিত। এই মালভূমির ওপর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে রিহান্দ নদী উত্তরে শোন নদীতে মিশেছে। এই অঞ্চলে আরাবল্লী পর্বতের মত প্রাচীন ভঙ্গিলপর্বতের ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়।

(ii) **ছোটনাগপুর মালভূমি ঃ** ছোটনাগপুর মালভূমি আর্কিয়ান যুগের গ্রানাইট, নিস্ প্রভৃতি প্রাচীন আগ্নেয় শিলায় গঠিত।* এই মালভূমির গড় উচ্চতা প্রায় 700 মিটার। দামোদর নদ ছোটনাগপুর মালভূমিকে দু'ভাগে ভাগ করেছে। দামোদর উপত্যকার উত্তরভাগ হাজারীবাগ মালভূমি নামে খ্যাত। হাজারীবাগের পূর্বে রয়েছে পরেশনাথ পাহাড় (1,366 মি)। হাজারীবাগ মালভূমির উত্তরে রয়েছে কোর্ডামা মালভূমি, এটি ভারতের অন্যতম অভ্র উৎপাদক অঞ্চল। কোর্ডামা মালভূমির উত্তরপূর্ব দিকে রাজমহল পাহাড়। দামোদর নদীর দক্ষিণভাগ রাঁচী মালভূমি নামে পরিচিত। এই মালভূমির পশ্চিমভাগ অপেক্ষাকৃত উঁচু ও বন্ধুর। এর উচ্চতা প্রায় 1000 মিটার। এর উপরিভাগ ল্যাটারাইট মৃত্তিকায় আচ্ছাদিত। এই অঞ্চল 'পাট' নামে পরিচিত। রাঁচী অঞ্চলে কয়েকটি জলপ্রপাত আছে। যাথা—হুড্রু (73 মিটার), জোনা প্রভৃতি। খনিজ তৈল বাদে প্রায় সবরকম খনিজ দ্রব্য এখানে পাওয়া যায়।

(iii) **মহানদী অববাহিকা ঃ** মধ্যপ্রদেশের সিহাওয়ার কাছ থেকে উৎপন্ন হয়ে পূর্ব ভারতের উচ্চভূমির দক্ষিণ পূর্ব ভাগে প্রবাহিত হয়ে মহানদী বঙ্গোপসাগরে পড়েছে। ওড়িশা উচ্চভূমির পশ্চিমে মহানদী এক পর্বতবেষ্টিত উচ্চ অববাহিকা গঠন করেছে যার গড় উচ্চতা 600 থেকে 1000 মিটার। এই অঞ্চলটিতে স্লেট পাথর ও চুনাপাথরের প্রাধান্য দেখা যায়। এটি ছত্তিশগড় সমভূমি নামেও পরিচিত।

(iv) **দণ্ডকারণ্য ঃ** ছত্তিশগড়ের দক্ষিণ ভাগে পাহাড় পর্বত ও অরণ্যময় এক বিস্তীর্ণ উচ্চভূমি রয়েছে। এটি দণ্ডকারণ্য নামে পরিচিতি পেয়েছে।

(v) **গড়জাত পাহাড় ঃ** মহানদী অববাহিকার পূর্বভাগে ওড়িশা উচ্চভূমিটি **(গড়জাত পাহাড়)** অরণ্যময়। এখানকার উল্লেখযোগ্য পাহাড়গুলি হল বোনাই, কেওনঝড়, সিমলিপাল যা আকরিক লৌহ, আকরিক ম্যাঙ্গানীজ, বক্সাইট প্রভৃতি খনিজ দ্রব্যের জন্য বিখ্যাত।

---

*Wadia লিখেছেন "The Archaean terrain of Chota Nagpur received successsive epierogenic uplifts during the Tertiary of over 2500 feet". অর্থাৎ আরাবল্লীর ন্যায় এখানে ও কয়েকটি ক্ষয়চক্র (multi-cyclic) সংঘটিত হয়েছে। ভূ-তাত্ত্বিক ইতিহাস বলে এই মালভূমি চারবার উত্থিত হয়েছে এবং প্রতিটি উত্থিত ভূমিভাগের মাঝে একটি করে খাড়া ঢাল রয়েছে যা জলপ্রপাত সৃষ্টিতে সাহায্য করেছে। সবচেয়ে বেশী উত্থিত হয়েছে পশ্চিমের পাট অঞ্চল।

(ii) উপদ্বীপীয় (দাক্ষিণাত্য) মালভূমি

ত্রিভূজাকৃতি এই অঞ্চলটি এক বিস্তীর্ণ মালভূমি। এটি উত্তরে সাতপুরা পর্বত, মহাদেব পর্বত ও মহাকাল পর্বত, দক্ষিণে কন্যাকুমারিকা অন্তরীপ, পশ্চিমে সহ্যাদ্রি বা পশ্চিমঘাট পর্বতটি এবং পূর্বদিকে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত পূর্বঘাট পর্বত (মহেন্দ্রগিরি) দ্বারা বেষ্টিত। পশ্চিমঘাট পর্বতটি পশ্চিম উপকূল সমভূমি থেকে খাড়াভাবে উঁচু হয়ে একটানা উত্তর থেকে দক্ষিণে প্রসারিত। পশ্চিমঘাট পর্বতের পূর্বভাগ ধীরে ধীরে ঢালু হয়ে নেমে এসে মালভূমির সঙ্গে মিশেছে। দাক্ষিণাত্য মালভূমির পূর্বাংশ পূর্বঘাট একটি অবিচ্ছিন্ন পর্বতমালা নয়। মহেন্দ্রগিরি (1501 মিঃ) এর সর্বোচ্চ শৃঙ্গ। নল্লোমালাই, ভেলিকোণ্ডা, জাভাদি, শেভরয়, পচামালাই প্রভৃতি পাহাড়গুলি উল্লেখযোগ্য বিচ্ছিন্ন পাহাড়। উত্তর পশ্চিম থেকে সহ্যাদ্রি ও উত্তর পূর্ব থেকে পূর্বঘাট নীলগিরিতে মিশেছে। নীলগিরির উচ্চতম শৃঙ্গের নাম দোদাবেতা (2,637 মিটার)। নীলগিরির দক্ষিণে পালঘাট ফাঁক (gap)। পালঘাট ফাঁকের আরও দক্ষিণে প্রসারিত **সহ্যাদ্রিকে** দক্ষিণ ঘাট বলে। দক্ষিণঘাটের আনাইমুদি (2,695 মি.) দাক্ষিনাত্য মালভূমির সর্বোচ্চ শৃঙ্গ। আনাইমুদি থেকে তিনদিকে দক্ষিণ সহ্যাদ্রি প্রসারিত। **ভূ-প্রকৃতি অনুযায়ী দাক্ষিণাত্য মালভূমিকে** প্রধানতঃ **দুটি** ভাগে ভাগ করা হয়। যথা—(1) **উত্তর দাক্ষিণাত্য মালভূমি** এবং (2) **দক্ষিণ দাক্ষিণাত্য মালভূমি।**

প্রথমটি অর্থাৎ উত্তর দাক্ষিণাত্য মালভূমির আবর দুটি অংশ ঃ (1) **সাতপুরা পর্বত** ও (2) **মহারাষ্ট্র মালভূমি।**

সাতপুরা পর্বত ঃ মহারাষ্ট্র মালভূমির উত্তরে অবস্থিত সাতপুরা পর্বতের পশ্চিমভাগ লাভাবৃত। পাঁচমারিতে অবস্থিত ধূপগড় (1,350 মি) এর সর্বোচ্চ শিখর। সাতপুরার পূর্ববাগ **মহাকাল মালভূমির** পূর্বভাগে মহাকাল পর্বত অবস্থিত। উত্তরে মহাদেব পাহাড় ও দক্ষিএর গাউলগড় পাহাড় মিলে সাতপুরার মধ্যভাগকে অনেকটা চওড়া করেছে। পশ্চিমে সাতপুরা পর্বত পশ্চিমঘাট বা সহ্যাদ্রির সাথে যুক্ত হয়েছে।

মহারাষ্ট্র মালভূমি ঃ সম্পূর্ণভাবে লাভাবৃত এই মালভূমি সহ্যাদ্রি পর্বত গঠন করেছে। লাভাবৃত বলে পর্বতের চূড়াগুলি চ্যাপ্টা এবং সিঁড়ির মত ধাপে ধাপে নেমে এসেছে। মহারাষ্ট্র মালভূমির এই ধরণের ভূমিভাগ **ডেকান ট্রাপ** (সুইডিশ ভাষায় **ট্রাপ** মানে ধাপ বা সিঁড়ি) বলে। এখানে সহ্যাদ্রির গড় উচ্চতা 900 মিটার। এই অঞ্চলে মহাবালেশ্বর (1,408 মি.) ও কলসুবাই (1,646 মি.) অবস্থিত। মহারাষ্ট্র মালভূমি থেকে পূর্বদিকে কয়েকটি ছোট ছোট পাহাড় প্রসারিত হয়েছে। এদের মধ্যে অজন্তা পাহাড়, বালঘাট পাহাড়, ও মহাদেও পাহাড় প্রসারিত হয়েছে। এদের মধ্যে অজন্তা পাহাড়, বালাঘাট পাহাড়, ও মহাদেও পাহাড় উল্লেখযোগ্য। মালভূমির মাঝে মাঝে নদী উপত্যকা দেখা যায়। এগুলির মধ্যে—তাপ্তী উপত্যকা, গোদাবরী উপত্যকা, ভীমা উপত্যকা, ওয়ার্ধা উপত্যকা ও বেনগঙ্গা উপত্যকা উল্লেখের দাবী রাখে।

দক্ষিণ দাক্ষিণাত্য মালভূমিকে আবার দুভাগে ভাগ করা হয় ঃ **কর্ণাটক মালভূমির** ও **তেলেঙ্গানা মালভূমি।**

কর্ণাটক মালভূমি ঃ পশ্চিম উপকূল বাদে গোটা কর্ণাটক রাজ্য কর্ণাটক মালভূমির অন্তর্গত। গ্রানাইট ও নিস্ শিলায় গঠিত এই অঞ্চলকে ভূ-প্রকৃতি অনুসারে এই মালভূমিকে দ'ভাগে ভাগ করা যায়। যথা— **মালনাদ** ও **ময়দান।**

মালনাদ ঃ কানাড়া ভাষায় **মাল** মানে পাহাড় এবং **নাদ** নামে দেশ। অর্থাৎ **মালনাদ** কথাটির অর্থ **পাহাড়ী দেশ**। সহ্যাদ্রির পূর্ব পাশে উত্তর পশ্চিম থেকে দক্ষিণ ও দক্ষিণপূর্বে 320 কিমি লম্বা ও 35 কিমি চওড়া অঞ্চলটি মালনাদ নামে পরিচিত।

ময়দান ঃ ময়দান তরঙ্গায়িত উচ্চভূমি। এটি মালনাদের পূর্বে অবস্থিত।

তেলেঙ্গোনা মালভূমি ঃ অন্ধ্রপ্রদেশে অবস্থিত তেলেঙ্গানা মালভূমি প্রাচীন গ্র্যানাইট ও নিস্ পাথর দিয়ে গঠিত। তেলেঙ্গানার উত্তরভাগ পর্বতসঙ্কুল। এখানে সাতমালা পাহাড় অবস্থিত। মালভূমির অন্যান্য অংশ ঢেউ খেলানো ভূমিভাগ।

(৩) উপকূল সমভূমি

উপদ্বীপ ভারতকে উপকূল সমভূমি ঘিরে আছে। পশ্চিমে আরবসাগরের তীরবর্তী সমভূমি ও পূর্বে বঙ্গোপসাগরের তীরবর্তী সমভূমি ভারতের মূল ভূখণ্ডের দক্ষিণতম শেষ প্রান্ত কন্যাকুমারীতে মিলিত হয়েছে। উপকূল সমভূমিকে প্রধানতঃ দুটি ভাগে ভাগ করা যায় ঃ **(ক) পশ্চিম উপকূ সমভূমি ও (খ) পূর্ব উপকূল সমভূমি।**

(ক) পশ্চিম উপকূল সমভূমি ঃ পশ্চিম উপকূলের প্রাকৃতিক বিভাগ ছয়টি ঃ

(i) **কচ্ছ উপদ্বীপ ঃ** এই অঞ্চলটি একসময় একটি দ্বীপ ছিল। রণ অঞ্চল গঠিত হওয়ার পর এটি ভারতের মূল ভূখণ্ডের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। এটি উত্তরে কচ্ছের রণ এবং দক্ষিণে আরবসাগর ও কচ্ছ উপসাগর দ্বারা বেষ্টিত। কচ্ছ উপদ্বীপের উত্তরে এক নোনা নিম্নভূমির সৃষ্টি হয়েছে। এটি বৃহৎ রণ ও ক্ষুদ্র রণ এই দুই ভাগে বিভক্ত। বৃহৎ রণ সমভূমির মধ্যে মাঝে মাঝে দ্বীপের মত কয়েকটি উচ্চভূমি রয়েছে। এদের মধ্যে পাচ্চাম, খাদির ও বেলা উল্লেখযোগ্য। প্রতিবছর বর্ষায় বানস্ ও লুনী নদীর জলে এবং কখনও বা সমুদ্রের জলে এই অঞ্চল প্লাবিত হয়। দক্ষিণভাগে ভুজ অঞ্চলের ভূপ্রকৃতি মরুসদৃশ। মাঝে মাঝে গাছপালাশূন্য পাথুরে মরু পাহাড় ও বালিয়াড়ি দেখা যায়।

(ii) **কাথিয়াবাড় উপদ্বীপ ঃ** এক সময় একটি স্বতন্ত্র দ্বীপ থাকলে ও পরে মূল ভূখণ্ডের সাথে যুক্ত হয়ে এটি উপদ্বীপ গঠন করেছে। কচ্ছ উপসাগর, আরব উপসাগর ও খাম্বাত উপসাগর এই অঞ্চলকে ঘিরে আছে। উত্তর পূর্ব অংশে নিম্ন জলাভূমি রয়েছে, যা নলহ্রদ অঞ্চল নামে পরিচিত (যা উপদ্বীপ অংশকে গুজরাট সমভূমি থেকে আলাদা করেছে)। কাথিয়াবাড় উপদ্বীপের উপকূলবর্তী সমভূমি খুবই নীচু, কিন্তু এর মধ্যভাগটি মালভূমি। এই উপদ্বীপের মধ্যভাগের উচ্চভূমি থেকে উৎপন্ন নদীগুলি বিভিন্ন দিকে চক্রের মত প্রবাহিত (কেন্দ্রবিমুখ জলনির্গম প্রণালী, Radial drainage pattern)।

(iii) **গুজরাত সমভূমি ঃ** অপেক্ষাকৃত প্রশস্ত সবরমতী, মাহী নদীর পলিসঞ্চিত এই সমভূমি নলহ্রদ ও সবরমতী নদীর মোহনা নিয়ে গঠিত। নলহ্রদ অঞ্চল উত্তরের ক্ষুদ্র রণ থেকে খাম্বাত উপসাগরকে আলাদা করেছে।

(iv) **কোঞ্চন উপকূল সমভূমি ঃ** উত্তরে দমন থেকে দক্ষিণে গোয়া অবধি বিস্তৃত দীর্ঘ ও অপ্রশস্ত উপকূল ভাগ (পশ্চিমঘাটের পশ্চিমাংশ) উপকূলটি **কোঙ্কণ উপকূল সমভূমি** নামে পরিচিত। এখানকার উপকূলভাগ খুব ভগ্ন। সমুদ্রের ধারে কর্দমাক্ত জলাভূমি বা বালুময় তটভূমি দেখা যায়। কোঙ্কন উপকূল নিমজ্জিত উপকূলের প্রকৃষ্ট উদাহরণ। অতীতে মুম্বাই থেকে দক্ষিণে গোয়া পর্যন্ত স্থলভাগ সমুদ্রের তলায় বসে গিয়ে ভারতের এই অংশে রিয়া উপকূল গঠন করেছে। এই উপকূলে বৈতরনী, উল্হাস ও অম্বা এসে আবার সাগরে মিশেছে। নাতিদীর্ঘ এই সব নদী খাড়া পথে নেমে এসে খাঁড়ি সৃষ্টি করেছে।

(v) **কর্ণাটক উপকূল সমভূমি ঃ** কর্ণাটক রাজ্যের উপকূলের পশ্চিম প্রান্তের খানিকটা স্থলভাগ সমুদ্রের তলায় বসে গিয়ে রিয়া উপকূলের আকৃতি নিয়েছে (পূর্বের ন্যায় এটি নিমজ্জিত উপকূলের উদাহরণ)। রিয়ার পিছনে দ্বিতীয় সারিতে আছে বালিয়াড়ি, কাদমাটি গঠিত নিম্নভূমি, উপহ্রদ ও কালী এবং মায়াবতীর মতন সঙ্কীর্ণ নদী উপত্যকা (এটি আবার অগ্রবর্তী উপকূলকে নির্দেশ করেছে) তৃতীয় সারিতে পাহাড়ের গা বেয়ে গড়ে উঠেছে ল্যাটেরাইট আবৃত মালভূমি।

(vi) **কেরল উপকূল বা মালাবার উপকূল সমভূমি ঃ** কর্ণাটক রাজ্যের দক্ষিণ সীমা থেকে কন্যাকুমারী পর্যন্ত বিস্তৃত উপকূল কেরল বা মালাবার উপকূল সমভূমি নাম পরিচিত। ভূ-প্রকৃতি অনুযায়ী এই অঞ্চলকে তিনটি ভাগে ভাগ করা যায় ঃ

(১) তটভূমি — সংলগ্ন বালুময় বেলাভূমি। উপকূলের বালিয়াড়ির স্থানীয় নাম **টেরিস**। এই উপকূলের মাঝে

মাঝে উপহ্রদ (লেগুন) দেখা যায় যা স্থানীয় ভাষায় **কয়াল** নামে পরিচিত। কয়ালগুলির প্রাকৃতিক দৃশ্য মনোরম (এরকম কয়েকটি কয়াল ভেমবানাদ, অষ্টমুণ্ডি ইত্যাদি)। এগুলি নারকেল গাছে ঘেরা (২) বালুময় উপকূলের পূর্বভাগে **পলিমাটির ঢালু সমভূমি** এবং (৩) আরো পূর্বদিকে রয়েছে পশ্চিমঘাট পর্বতের পাদদেশে **গভীর চিরহরিৎ বনভূমি।**

(খ) **পূর্ব উপকূল সমভূমি ঃ** ওড়িশার সুবর্ণরেখা নদী মোহনা থেকে দক্ষিণে কণ্যাকুমারী পর্যন্ত বঙ্গোপসাগরে উপকূল বরাবর এই সমভূমি বিস্তৃত। মহানদী, গোদাবরী, কৃষ্ণা ও কাবেরী ব-দ্বীপ অঞ্চলে এর বিস্তার অনেকখানি। অবশ্য তামিলনাড়ু উপকূলভাগে এই সমভূমির বিস্তার সবচেয়ে বেশি। গোদাবরী ব-দ্বীপ অঞ্চলের উত্তর-পূর্বে পূর্বঘাট পর্বতমালা প্রায় খাড়াভাবে নেমে এসেছে। তাই সেখানে উপকূল ভাগ খুব সঙ্কীর্ণ। পূর্ব উপকূলের প্রধান ভাগ তিনটি, যথা—ওড়িশা, অন্ধ্রপ্রদেশ ও তামিলনাড়ু। এই তিনটি ভাগেই নদীগুলি তাদের মোহনায় বদ্বীপ সৃষ্টি করেছে ঃ ওড়িশা উপকূলে মহানদী ব-দ্বীপ, অন্ধ্রপ্রদেশ উপকূলে গোদাবরী বদ্বীপ ও কৃষ্ণা বদ্বীপ এবং তামিলনাড়ু উপকূলে কাবেরী বদ্বীপ। মহানদীর মোহনা থেকে কৃষ্ণার মোহনা পর্যন্ত উপকূলভাগটি উত্তর সরকার এবং কৃষ্ণার মোহনা থেকে কন্যাকুমারী পর্যন্ত উপকূলভাগটি **করমণ্ডল** নামে পরিচিত। তামিলনাড়ু ও অন্ধ্রপ্রদেশের উপকূলভাগ স্থানীয় ভাষায় **পাইয়ানঘাট** নামে পরিচিত।

ওড়িশা উপকূল সমভূমি ঃ সুবর্ণরেখা নদীর মোহনা থেকে ঋষিকুল্লা নদীর মোহনা পর্যন্ত বিস্তৃত হল ওড়িশা উপকূল সমভূমি। এর মাঝে মহানদী বদ্বীপ সমভূমি গঠন করেছে। মহানদী কয়েকটি শাখানদীতে ভাগ হয়ে গেছে। এদের মধ্যে কাটাজুরি ও কুশভদ্রা প্রধান। মহানদী ব-দ্বীপের দক্ষিণ পশ্চিম ভাগে চিল্কা হ্রদ (লেগুন)। ভারতের বৃহত্তম উপহ্রদ।

অন্ধ্রপ্রদেশ উপকূল সমভূমি ঃ ওড়িশা উপকূল থেকে পুলিকট হ্রদ পর্যন্ত বিস্তৃত অন্ধ্রপ্রদেশ উপকূল সমভূমি। গোদাবরী নদী ও কৃষ্ণানদী এই সমভূমি অঞ্চলে পাশাপাশি দুটি বদ্বীপ সমভূমি গঠন করেছে যাদের মাঝে রয়েছে কোমেরু হ্রদ। গোদাবরী নদী গোমতি, বশিষ্ট ও বৈনতেয়—এই তিনটি শাখায় বিভক্ত। কৃষ্ণা নদী ডিওয়াই দ্বীপের দুপাশ দিয়ে দুটি শাখায় বিভক্ত হয়েছে। আরো নীচে নদীটি তিনটি শাখায় বিভক্ত হয়ে সমুদ্রে পড়েছে।

তামিলনাড়ু উপকূল সমভূমি ঃ এই সমভূমির বিস্তার হল উত্তরে পুলিকটহ্রদ থেকে দক্ষিণে তাম্বপর্ণী অববাহিকা পর্যন্ত। কোলেরুণ ও কাবেরী নামে তিরুচিরাপল্লীর পূর্বদিকে কাবেরী দু'টি শাখায় বিভক্ত হয়েছে। আরো দক্ষিণে কাবেরী শাখাটি কতগুলি শাখানদীতে বিভক্ত হয়ে সমুদ্রে পড়েছে।

(৪) সিন্ধু-গঙ্গা সমভূমি

ভারতের উত্তরে হিমালয়ের পার্বত্য অঞ্চল এবং দক্ষিণে দাক্ষিণাত্য মালভূমির অন্তর্গত মধ্য ভারতের উচ্চভূমির মধ্যবর্তী অঞ্চল 'উত্তর ভারতের বিশাল সমভূমি' নামে পরিচিত। এই সমভূমি পূর্ব-পশ্চিমে প্রায় 2,500 কিমি দীর্ঘ এবং উত্তর-দক্ষিণে 240-320 কিমি প্রশস্ত। সমগ্র সমভূমির আয়তন প্রায় 6,52,000 বর্গ কিমি। এই সমভূমির পশ্চিম ও দক্ষিণ-পশ্চিমের অংশ যথাক্রমে পাঞ্জাব সমভূমি ও শুষ্ক রাজস্থানের সমভূমির অন্তর্গত। পাঞ্জাব সমভূমি সিন্ধুর বিভিন্ন উপনদীর (শতদ্রু, বিপাশা) পলি দ্বারা গঠিত। এটি দক্ষিণ-পশ্চিমে রাজস্থানের শুষ্ক সমভূমিতে মিশেছে। দিল্লী থেকে আরাবল্লী পর্বত পর্যন্ত একটি শৈলশিরা পাঞ্জাব সমভূমি ও গাঙ্গেয় সমভূমির মধ্যে একটি গৌণ জলবিভাজিকা রূপে অবস্থান করছে। পাঞ্জাব সমভূমির পূর্ব সীমানায় যমুনা নদী থেকে দক্ষিণ-পূর্বদিকে বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত বিশাল অঞ্চল গঙ্গা ও তার বিভিন্ন উপনদী ও শাখানদীর পলি দ্বারা গঠিত। এটিই বিখ্যাত গাঙ্গেয় সমভূমি (The Ganga Plains)। গাঙ্গেয় সমভূমি উত্তরপ্রদেশ, বিহার ও পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে

অবস্থিত এবং এর মোট আয়তন 3,57,000 বর্গকিমি। গাঙ্গেয় সমভূমির উত্তর-পূর্বে রয়েছে অসম, ব্রহ্মপুত্র নদ ও তার বিভিন্ন উপনদী ও শাখানীবাহিত পলি দ্বারা গঠিত সমভূমি 'ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা' নামে পরিচিত। এই উপত্যকা 'উত্তর ভারতের বিশাল সমভূমি'র অন্তর্গত। এই সমতলক্ষেত্র প্রায় 700 কিমি দীর্ঘ, 80 কিমি প্রশস্ত এবং এর আয়তন প্রায় 56,000 বর্গকিমি।

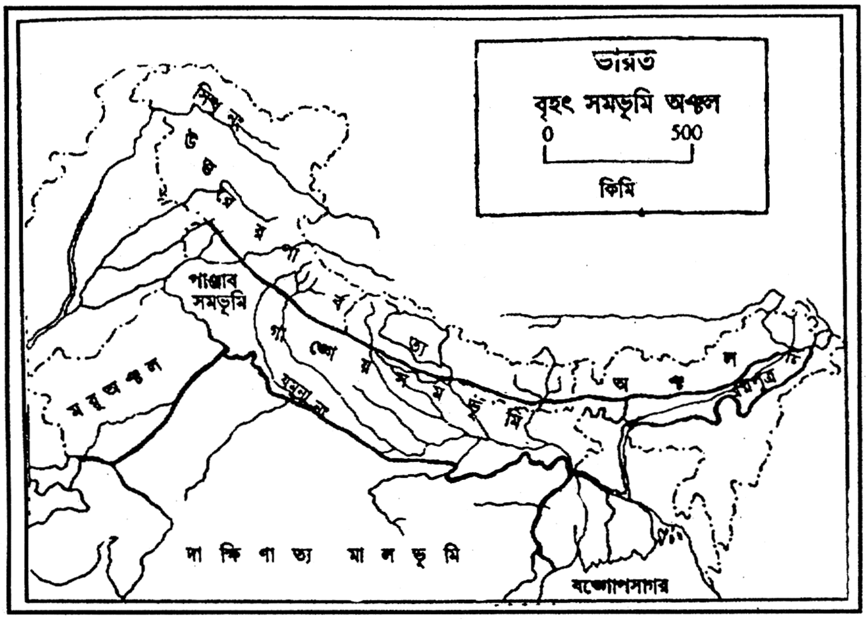

চিত্র 3.12 ঃ ভারতের বৃহৎ সমভূমি অঞ্চল

ভূ-প্রকৃতি ও গঠন (Topography & Structure) ঃ

ভূবিদ্‌গণ অনুমান করেন যে, হিমালয় গঠিত হওয়ার সময় ভূ-আন্দোলনের ফলে উত্তরদিক থেকে আগত চাপ প্রতিরোধ করতে গিয়ে দাক্ষিণাত্য মালভূমির উত্তরাংশ অবনমিত হয় ঃ এই অবনমিত অংশ 'প্লিস্টোসিন' যুগ থেকে বর্তমান যুগ পর্যন্ত উত্তরে হিমালয় পর্বত ও দক্ষিণে দাক্ষিণাত্য মালভূমি থেকে আগত বহু নদী, তাদের উপনদী ও শাখানদীর দ্বারা বাহিত সূক্ষ্ম নরম পলি দ্বারা ভরাট হয়ে এই বিশাল সমভূমি গঠন করেছে। এই বিশাল সমভূমি অঞ্চলের কোন অংশই সমুদ্রপৃষ্ঠে থেকে ৩০০ মিটারের বেশী উঁচু নয়।

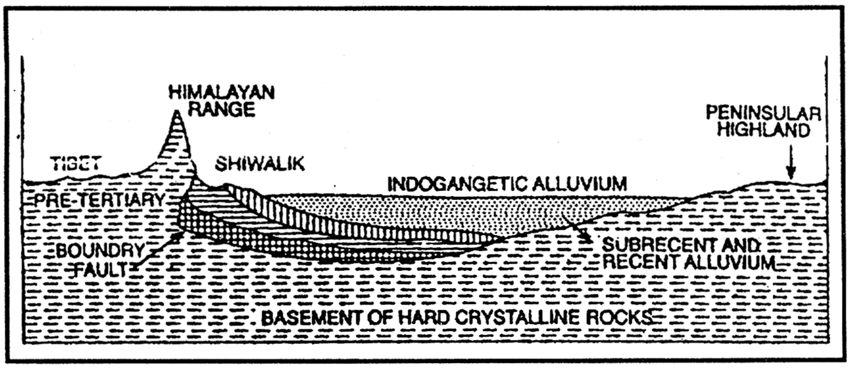

চিত্র 3.13 ঃ সিন্ধু-গঙ্গা সমভূমি ঘাতে পলিসঞ্চয় ও সিন্ধু-গঙ্গা সমভূমির সৃষ্টি

উত্তর ভারতের সমভূমির ভূ-প্রকৃতি একেবারেই সমতল। এর কোথাও কোন পাহাড় নেই এবং ভূমির উচ্চতার পার্থক্য এতই সামান্য যে তা উপলব্ধি করাও প্রায় যায় না। কেবল মাঝে মাঝে উঁচু ঢিবি, স্বাভাবিক বাঁধ (Levee), প্লাবনভূমির খাড়া পাড় (Flood plain Bluff), ছোট ছোট নদী ও নালা-কর্তিত ক্ষয়প্রাপ্ত ভূমি (Badlands) প্রভৃতি অবস্থান এই সমতল ক্ষেত্রের একঘেয়েমির মধ্যে কিছুটা বৈচিত্র্য এনেছে।

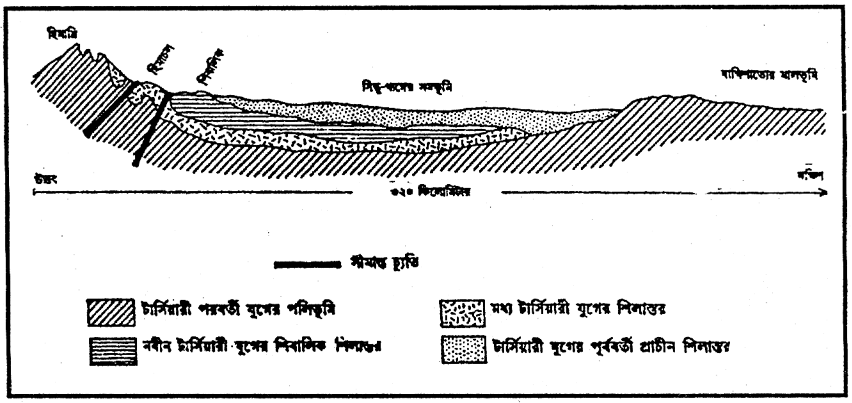

চিত্র 3.14 ঃ সিন্ধু-গঙ্গা সমভূমির শিলাস্তর

এই সমভূমির উত্তরে শিবালিক পর্বতের পাদদেশ বরাবর 10–15 কিমি প্রশস্ত এক বিস্তীর্ণ অঞ্চল হিমালয় থেকে আগত বিভিন্ন নদী দ্বারা বাহিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রস্তরখণ্ড বা ট্যালাস দ্বারা আবৃত। এই অংশে ক্ষুদ্র প্রস্তর খণ্ড ও বালি দ্বারা ত্রিকোণাকার ব-দ্বীপের মত উচ্চভূমি (Alluvial Cone or Fan) গঠিত হতে দেখা যায়। প্রস্তরখণ্ড বা ট্যালাস দ্বারা আবৃত অঞ্চলকে পাঞ্জাবে **ভাবর** (Bhabar) এবং অসম ও উত্তরবঙ্গে **দুয়ার** (Duar) বলে। ভাবর-র ঠিক দক্ষিণে, প্রায় সমান্তরালে 15-30 কিমি প্রশস্ত এক বিস্তীর্ণ জলাভূমি দেখা যায়। একে 'তরাই-র জলাভূমি' বলে। এটি জঙ্গলে সমাকীর্ণ। কোন পাহাড় নেই এবং ভূমির উচ্চতার পার্থক্য এতই সামান্য যে তা উপলব্ধি করাও প্রায় যায় না। কেবল মাঝে মাঝে উঁচু ঢিবি, স্বাভাবিক বাঁধ, প্লাবনভূমির খাড়া পাড়, ছোট ছোট নদী ও নালা কর্তিত ক্ষয়প্রাপ্ত ভূমি (Badlands) প্রভৃতির অবস্থান এই সমতল ক্ষেত্রে একঘেয়েমির মধ্যে কিছুটা বৈচিত্র্য এনেছে।

সমভূমির মধ্যভাগে নদীগুলি তাদের মধ্য ও নিম্নগতিতে এঁকে বেঁকে অনেক সময় গতি পরিবর্তন করে প্রবাহিত হয়। বর্ষায় এই নদীগুলিতে অনেক সময় বন্যা দেখা দেয়। বন্যায় যেসব নবীন পলিমাটি নদীর উভয়তীরে সঞ্চিত হয়, তাদের উত্তরপ্রদেশে 'খাদার' (Khadar) এবং পাঞ্জাবে 'বেট' (Bet) বলে। এই মাটি খুবই উর্বর। নিম্নদোয়াব অঞ্চলে কিছু কিছু বালিয়াড়ি দেখা যায়। এই প্রাচীন পলিমাটিকে **ভাঙ্গর** (Bhangar) বলা হয়। প্রাচীন পলিগঠিত এই উচ্চ ভূমিগুলি বহুদিন ধরে ক্ষয়প্রাপ্ত হওয়ার ফলে তাদের মধ্যে মাঝে মাঝে চুনজাতীয় পদার্থের আধিক্য ঘটে। তাদের **কংকর** (Kankar) বলা হয়।

আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য (Regional Characteristies) উত্তরভারতের বিশাল সমভূমিকে ঢাল ও অন্যান্য ভূ-প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য অনুসারে 3টি উপ-প্রাকৃতিক বিভাগে ভাগ করা যায়। যথা—

(1) পাঞ্জাব ও হরিয়ানার শতদ্রু সমভূমি ঃ পাঞ্জাব ও হরিয়ানা নিয়ে শতদ্রু সমভূমি গঠিত। দিল্লী পর্যন্ত প্রসারিত শৈলশিরা শতদ্রু সমভূমিকে গঙ্গা সমভূমি থেকে পৃথক করেে রেখেছে। এই সমভূমি অত্যন্ত সমতল এবং গড় উচ্চতা 200–240 মিটারের মধ্যে। সমগ্র সমভূমিটি দক্ষিণ-পশ্চিমে সিন্ধু-সমভূমির দিকে ঢালু। সিন্ধুর

২টি উপনদী যথা— বিপাশা ও শতদ্রু এখানে প্লাবনভূমি গঠন করেছে। অপেক্ষাকৃত নীচু প্লাবনভূমিকে এখানকার স্থানীয় ভাষায় **বেট** বলে। দুটি বেটের মধ্যবর্তী উঁচু অঞ্চলকে **ভাঙ্গর** বলে। দুটি নদীর মধ্যবর্তী পলিগঠিত উচ্চ অঞ্চলকে **দোয়াব** বলে। শতদ্রু সমভূমির দোয়াব ২টি। ইরাবতী ও বিপাশা নদী দুটির মধ্যবর্তী অঞ্চলকে বারি দোয়াব এবং বিপাশা ও শতদ্রু নদী দুটির মধ্যবর্তী অঞ্চলকে বিষ্ট (Bist) দোয়াব বলে।

(2) গঙ্গা সমভূমি ঃ গঙ্গা সমভূমি পশ্চিমে যমুনা নদী থেকে পূর্বে ভারত-বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক সীমানা বরাবর বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত। উত্তরপ্রদেশ, বিহার ও পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের মধ্যে অবস্থিত এই সমভূমির মোট আয়তন প্রায় 3,57,00 বর্গকিমি। গঙ্গা সমভূমি উচ্চ, মধ্য ও নিম্ন এই ৩টি অংশে বিভক্ত।

উচ্চ গাঙ্গেয় সমভূমি ঃ যমুনার বামতীর থেকে এলাহাবাদ পর্যন্ত অংশকে উচ্চ গঙ্গা সমভূমি বলা হয়। এই অঞ্চলের গড় উচ্চতা ১০০ মিটার, পূর্বদিকে ২০০ মিটার সমোন্নতি রেখা এই অঞ্চলকে মধ্যগাঙ্গেয় সমভূমি থেকে পৃথক করেছে। এই উচ্চ গঙ্গা সমভূমির ৪টি প্রাকৃতিক বিভাগ হল— **গঙ্গা-যমুনা দোয়াব ঃ** দো কথার অর্থ 'দুই' এবং 'আব' কথার অর্থ জল। গঙ্গা-যমুনা দোয়াব অঞ্চলে ভারতের অন্যতম উর্বর কৃষিভূমি বর্তমান। এর ২টি ভূ-প্রাকৃতিক বিভাগ হল— (ক) **উচ্চগঙ্গা-যমুনা দোয়াব** এবং **নিম্ন গঙ্গা-যমুনা দোয়াব**। স্থানীয় ভূ-প্রাকৃতিক বৈষম্য অনুযায়ী উচ্চ গঙ্গা-যমুনা দোয়াবকে **৩টি** অঞ্চলে ভাগ করা হয়, যথা—(a) গড়-তরাই অঞ্চল (b) সাহারান অঞ্চল, (c) মীরাট অঞ্চল। নিম্ন গঙ্গা-যমুনা দোয়াব ২টি অঞ্চলে [যথা—(a) কানপুর সমভূমি ও (b) এলাহাবাদ সমভূমি] বিভক্ত।

(ii) রোহিলখণ্ড সমভূমি ঃ এটি গঙ্গা-যমুনা দোয়াব ও অযোধ্যা সমভূমির মধ্যবর্তী উর্বর কৃষিপ্রধান অঞ্চল। এখানে রামগঙ্গা নদী প্রবাহিত হয়েছে। রোহিলখণ্ড সমভূমিকে ভূপ্রাকৃতিক গঠন অনুযায়ী ৩টি অঞ্চলে ভাগ করা যায়। যথা— (a) রোহিলখণ্ড তরাই, (b) মেরোদাবাদ সমভূমি, (c) বেরিলী সমভূমি।

(iii) অযোধ্যা সমভূমি ঃ এটি পলিগঠিত উর্বর কৃষিভূমির অন্তর্গত। এখানে গোমতী ও ঘর্ঘরা নদী দুটি প্রবাহিত। অযোধ্যা সমভূমিকে ভূ-প্রকৃতি অনুযায়ী ৪টি ভাগে ভাগ করা যায়। যথা— (a) অযোধ্যা তরাই, (b) উত্তর অযোধ্যা সমভূমি, (c) দক্ষিণ অযোধ্যা সমভূমি (লক্ষ্ণৌ সমভূমি), (d) সরযূপার সমভূমি।

(iv) যমুনাপার সমভূমি ঃ যমুনা নদীর ডান তীরবর্তী এলাকাকে যমুনাপার সমভূমি বলে। এই অঞ্চলে চম্বল নদী প্রবাহিত হয়ে যমুনা নদীর সাথে মিলিত হয়েছে।

(II) মধ্য গাঙ্গেয় সমভূমি ঃ এলাহাবাদ থেকে রাজমহল পাহাড় পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চল মধ্যগঙ্গা সমভূমি নামে পরিচিত। গঙ্গা ও তার উপনদী ঘর্ঘরা, গণ্ডক, কোশী এবং শোন এই অংশের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে। এই অঞ্চলের গড় উচ্চতা 30-100 মিটার। বিহার অংশে গঙ্গার উত্তর দিকের সমভূমি অঞ্চল উত্তর বিহার সমভূমি ও গঙ্গার দক্ষিণের সমভূমি অঞ্চল দক্ষিণ বিহার সমভূমি নামে পরিচিত। এই অংশে বহু জলাভূমি দেখা যায়। এগুলি দক্ষিণ বিহারে জলা বা জল এবং উত্তর বিহারে কাউর/চাউর (caurs) নামে পরিচিত। নদী মধ্যবর্তী বালুচরগুলি **দিয়ারা** ভূমি নামে পরিচিত। গঙ্গার পাড় প্লাবনভূমি থেকে উঁচু হয়ে স্বাভাবিক বাঁধ (Levee) সৃষ্টি করেছে। প্লাবনভূমিতে অনেক জলাভূমি ও অশ্বক্ষুরাকৃতি হ্রদ দেখা যায়।

(III) নিম্ন গঙ্গা সমভূমি ঃ বিহার রাজ্যের কিষাণগঞ্জ এবং সমগ্র পশ্চিমবঙ্গের (দার্জিলিং ও পুরুলিয়া জেলার পার্বত্য অংশ বাদে) প্রায় 81,000 বর্গকিমি স্থান জুড়ে এই সমভূমিটি বিস্তৃত। এর গড় উচ্চতা 3–100 মিটার। ভূমিরূপের তারতম্য অনুসারে নিম্নগঙ্গা সমভূমিকে (i) উত্তরবঙ্গ সমভূমি, (ii) রাঢ় সমভূমি ও (iii) ব-দ্বীপ অঞ্চল—এই 3টি উপবিভাগে ভাগ করা যায়।

(i) **উত্তরবঙ্গ সমভূমি ঃ** উত্তর-পূর্ব হিমালয়ের পাদদেশ অঞ্চল থেকে দক্ষিণে গঙ্গা ব-দ্বীপের (Bengal basin) উত্তর সীমা পর্যন্ত এই অঞ্চল বিস্তৃত। এর আয়তন প্রায় ২৩,০০০ বর্গকিমি। উত্তরবঙ্গের পার্বত্য নদীগুলি

নুড়ি, কাঁকড়, পলিমাটি জমা করে হিমালয়ের পাদদেশে তরাই সমভূমি গড়ে তুলেছে। ভারতের সমভূমি অঞ্চলের সঙ্গে পার্বত্য রাজ্য ভুটান ও চীনের তিব্বত মালভূমির সংযোগকারী পথের মধ্যবর্তী অংশে এই তরাই অঞ্চল অবস্থিত বলে পশ্চিমবঙ্গে তরাইকে ডুয়ার্স বলে। এখান তরাই সমভূমি 3 ভাগে বিভক্ত। যথা— (a) শিলিগুড়ি

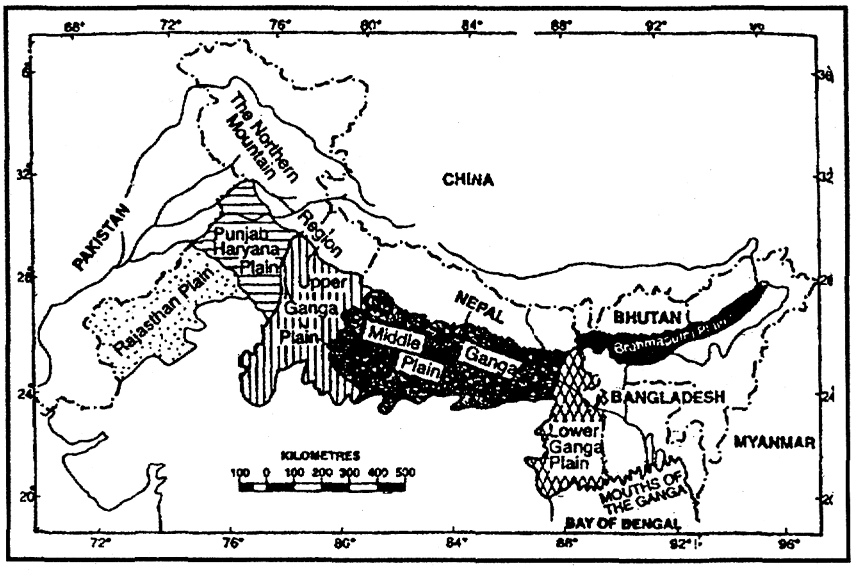

চিত্র 3.15 ঃ উত্তর ভারতের সমভূমির আঞ্চলিক বিভাগ

ডুয়ার্স বা পশ্চিম ডুয়ার্স, (b) জলপাইগুড়ি ডুয়ার্স বা মধ্য ডুয়াসল, (c) আলিপুর ডুয়ার্স বা পূর্ব ডুয়ার্স। সামগ্রিকভাবে তরাই বা ডুয়ার্স অঞ্চল হল এক বিস্তীর্ণ ঢেউ খেলানো সমভূমি। এর গড় উচ্চতা 75–150 মি.। মহানন্দা, তিস্তা, জলঢাকা, রায়ডাক, সংকোশ, জয়ন্তী প্রভৃতি খরস্রোতা পার্বত্য নদীগুলি এই অঞ্চলে প্রবাহিত। যুগ যুগ ধরে এসকল পার্বত্য নদী বালি, নুড়ি ও পাথর প্রভৃতি বহন করে এনে হিমালয়ের পাদদেশ অঞ্চলটিকে ভরাট করে তুলেছে।

ভূ-প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী কোচবিহার সমভূমি অনেকটা তরাই সমভূমির মত। এই সমভূমির অনেক জায়গা সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে 50 মিটারের বেশী উঁচু নয়। সর্বত্রই জলাভূমি ও ঝিল দেখা যায়। তরাই সমভূমি, কোচবিহার সমভূমি ছাড়াও আরো ৩টি ভূ-প্রাকৃতিক বিভাগ নিয়ে উত্তরবঙ্গের সমভূমি অঞ্চল গঠিত। যথা— মহানন্দা—তিস্তা উপত্যকা, পশ্চিম দিনাজপুর সমভূমি ও মালদহ সমভূমি।

বরেন্দ্রভূমি ঃ তরাই ও ডুয়ার্স অঞ্চলের দক্ষিণে এই সমভূমি অঞ্চলটি গঙ্গা নদী পর্যন্ত বিস্তৃত। অনেকের মতে, হিমালয়ের পার্বত্য অঞ্চল থেকে বয়ে আনা পদার্থে এই অঞ্চলের সৃষ্টি হয়েচে। এখানে ঢেউ খেলানো প্রাচীন পলিমাটির তৈরী ভূমি রয়েছে। মহানন্দা নদীর পশ্চিমভাগে নতুন পলিমাটি গঠিত ভূমি রয়েছে। পশ্চিমের এ অংশটির মধ্য দিয়ে কালিন্দী নদী প্রবাহিত। কালিন্দী নদীর বাম তীরের অংশকে তাল বলে। কালিন্দী নদীর ডানতীরের সমভূমি খুবই উর্বর পলিমাটি দিয়ে গঠিত। এই সমভূমির নাম দিয়ারা।

রাঢ় সমভূমি ঃ ব-দ্বীপ ও মালভূমির মধ্যবর্তী মুর্শিদাবাদ, বীরভূম, বাঁকুড়া, বর্ধমান ও মেদিনীপুরের বেশ কিছু অংশে এই রাঢ় সমভূমি বিস্তৃত হয়েছে। এখানে ল্যাটারাইট জাতীয় লাল মাটির আধিক্য দেখা যায়। পশ্চিমে ছোটনাগপুর মালভূমি অঞ্চল থেকে আগত বাঁশলই, ব্রাহ্মণী, দ্বারকা, অজয়, দামোদর, শিলাই, দ্বারকেশ্বর, কংসাবতী

প্রভৃতি নদীর দ্বারা বাহিত প্রাচীন পলল ও লাল দোঁয়াশ মৃত্তিকা এবং কিছু নবীন পলল মৃত্তিকা সঞ্চিত হয়ে সমগ্র অঞ্চল গঠিত হয়েছে। অগভীর ও মোটা দানার এই মাটিতে ক্ষারের অংশ বেশী ও জৈব পদার্থ কম থাকায় উর্বরতাও কম।

(iii) ব-দ্বীপ অঞ্চল ঃ এই সমভূমিটি গঙ্গার ডানতীরে মুর্শিদাবাদ, নদীর কলকাতা, হাওড়া, হুগলী, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগণা, বর্ধমান ও মেদিনীপুর জেলার পূর্বাংশে অবস্থিত। এই ব-দ্বীপ অঞ্চলটি গঙ্গা-পদ্মা ও ভাগীরথী-হুগলী নদীর মধ্যবর্তী পৃথিবীর বৃহত্তম ব-দ্বীপের অংশ বিশেষ। পলিমাটি সমৃদ্ধ বলে এখান কার জমির উর্বরতা শক্তি অত্যন্ত বেশী।

ভূগঠন প্রক্রিয়ার বৈশিষ্ট্য এবং নদ-নদীর প্রকৃতি অনুসারে গাঙ্গেয় ব-দ্বীপকে ৩টি ভাগে ভাগ করা যায়। (a) মৃতপ্রায়, (b) পরিণত ও (c) সক্রিয় বদ্বীপ।

(a) **মৃতপ্রায় বা মুমূর্ষ ব-দ্বীপ** (Moribund deltas) ঃ এই ব-দ্বীপ অংশে জলঙ্গী, ইছামতী, ভৈরবী, চূর্ণী প্রভৃতি নদীগুলি গঙ্গা বা পদ্মা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে মৃতপ্রায় হওয়ায় এই অঞ্চলে ব-দ্বীপ গঠন আর সম্ভব নয়। এই অঞ্চলকে বাগড়ি অঞ্চল বলা হয়। এখানে প্রচুর বিল, জলাভূমি ও অশ্বক্ষুরাকৃতি হ্রদ দেখা যায়।

(b) **পরিণত ব-দ্বীপ** (Mature Delta) ঃ ছোটনাগপুরের মালভূমি থেকে অনীত নদীবাহিত প্রচুর বালি, কাঁকড়, পলি প্রভৃতি জমে বর্ধমান, মেদেনীপুর, হাওড়া ও হুগলী জেলায় এই ব-দ্বীপ অঞ্চলের গঠন প্রায় শেষ। তাই এখানে জলাভূমির সংখ্যা অনেক কম ও মৃত্তিকা ও বেশ কঠিন।

(c) **সক্রিয় ব-দ্বীপ** (Active Delta) ঃ উত্তর ও দক্ষিণ ২৪-পরগণা এবং কলকাতা জেলার দক্ষিণে নদী ও সমুদ্র বাহিত পলি দিয়ে ব-দ্বীপের গঠনের কাজ আজও চলছে। সমুদ্রের জোয়ারের প্রভাবে এখানকার মৃত্তিকা কিছুটা লবণাক্ত যা প্রধানত ম্যানগ্রোভ অরণ্যে সমাকীর্ণ।

(d) **ব্রহ্মপুত্র সমভূমি ঃ** এই সমভূমি অঞ্চলও উত্তর ভারতের বিশাল সমভূমির অন্তর্ভুক্ত। তিনদিক পর্বতবেষ্টিত এই সংকীর্ণ সমভূমি অঞ্চল ব্রহ্মপুত্র, মিসমি, দিবং এবং লোহিত ও অন্যান্য বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র, নদীর পলল সঞ্চিত হয়ে গঠিত হয়েছে। সমগ্র অঞ্চলটির আয়তন প্রায় 56,500 বর্গকিমি। প্রায় ৭০০ কিমি দীর্ঘ এবং গড়ে ৪ কিমি প্রশস্ত এই উপত্যকার গড় উচ্চতা 50–150 মিটার এবং ঢাল অত্যন্ত কম। ব্রহ্মপুত্র নদের মধ্যে বড় বড় চর দেখতে পাওয়া যায়। পলি সমৃদ্ধ এখানকার মাটি খুবই উর্বর। ব্রহ্মপুত্রের গতিপথে অবস্থিত মাজুলী বালুচরটিকে বিশ্বের বৃহত্তম নদী গঠিত দ্বীপ (৯২৯ বর্গ কিমি) বলা হয়।

3.1.2 নদনদী (Rivers)

সারা ভারত জুড়েই অংসখ্য নদনদী রয়েছে। নদী হল সবচেয়ে প্রয়োজনীয় প্রাকৃতিক সম্পদ। নদী পরিকল্পনাবিদ, অর্থনীতিবিদ, ভৌগোলিক, ভূতত্ত্ববিদ, জলবিজ্ঞানী ও বিভিন্ন ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞদের দৃষ্টি আকর্ষন করেছে। নদী জলসেচ, শিল্প, গৃহস্থালীর ব্যবহারের এক বড় উৎস। এছাড়া জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের কেন্দ্র গড়ে উঠতে নদী সাহায্য করে। দেশের প্রায় সব উর্বর ভূমি নদীর পলিসঞ্চয়ের ফলে সৃষ্ট হয়েছে। অনেক নদী অভ্যন্তরীন জলপথ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। নদীর ধারে বসবাসকারী অসংখ্য মানুষের উপজীবিকা হল মৎস্যশিকার।

মোটের ওপর, ভারতে গড়ে বছরে 118 সেমি. বৃষ্টিপাত হয় যা 3,700,440 কিউবিক মিটার (168 মিলিয়ান হেক্টর মিটার) ভূপৃষ্ঠস্থ জলের সমতুল্য। এর মধ্যে প্রায় 12,50,480 মিলিয়ান কিউবিক মিটার (56 মিলিয়ান হেক্টর মিটার বা 34 শতাংশ) বাষ্পীভবনের মাধ্যমে আকাশে ফিরে যায়। 7,50,000 মিলিয়ান কিউবিক মিটার (36 মিলিয়ান হেক্টর মিটার বা 44 শতাংশ) ধাবধারা (Run off) রূপে নদীতে মেশে। এক সমীক্ষায় জানা যায় যে গোটা দেশের সমস্ত নদনদীর বার্ষিক জল প্রবাহ হল 1,858,100 মিলিয়ান কিউবিক মিটার, যার মধ্যে এক-তৃতীয়াংশের বেশি (33.77%) হল ব্রহ্মপুত্রের (3.4)। এর পরের স্থান হল গঙ্গা (25.2%), গোদাবরী (64%), সিন্ধু (4.3%), মহানদী (3.6%), কৃষ্ণা (2.9), নর্মদা এবং অন্যান্য নদীর। পরপৃষ্ঠার সারণীগুলিতে ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান নদীপ্রণালীর (river systems) নদী এলাকা, বাৎসরিক জল প্রবাহ, প্রবাহের হার এবং সঞ্চয় ক্ষমতা দেখানো হয়েছে। ব্রহ্মপূত্র নদীর বাৎসরিক জলপ্রবাহ সবচেয়ে বেশী। এর প্রবাহ হার (rate of flow) বেশি, অথচ এর জল সঞ্চয় ক্ষমতা সবচেয়ে কম। তাই এর বেশীর ভাগ জল সমুদ্রে গিয়ে মেশে। পক্ষান্তরে, গঙ্গা ও কৃষ্ণার সঞ্চয় ক্ষমতা সবচেয়ে বেশী। এজন্য পরিকল্পনা নেওয়া দরকার যাতে নদীর বিশাল জলধারাকে যথাযথভাবে সংরক্ষণ ও ব্যবহার করা যায়।

❑ ভারতের জলনির্গম প্রণালী ঃ

আয়তনের ভিত্তিতে ভারতের নদনদীগুলোকে নিম্নোক্ত তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যায় (Khullar, 2006)।

(a) **প্রধান নদী অববাহিকা ঃ** এদের ধারণা এলাকা হল 20,000 বর্গ কি.মি. ও তার বেশী। ভারতবর্ষের সব নদীর মোট পৃষ্ঠ প্রবাহ বা ধাবধারার 85 শতাংশ এই ধরনের অববাহিকা দিয়ে প্রবাহিত হয়। এদের সংখ্যা হল চৌদ্দ এবং এগুলি বেশি বৃষ্টিপাতযুক্ত এলাকায় অবস্থিত (প্রতি 100 বর্গ কি.মি. তে 63 মিলিয়ান কিউবিক মিটার) । কর্কটক্রান্তি রেখার উত্তরে তিনটি, সাতটি কর্কটক্রান্তিরেখা এবং 20^0 উত্তর অক্ষাংশের মধ্যে এবং চারটি দাক্ষিণাত্যে অবস্থিত।

(b) **মধ্যম আকৃতি অববাহিকা ঃ** এদের ধারণ এলাকা 2,000 এবং 20,000 বর্গ কি.মি-র মধ্যে। এদেশের সব নদীর পৃষ্ঠ প্রবাহ বা ধাবধারার 7 শতাংশ এই ধরনের অববাহিকা দিয়ে প্রবাহিত হয়। এদের সংখ্যা হল 44 এবং মাঝারি বৃষ্টিপাতযুক্ত এলাকায় (প্রতি 100 বর্গ কি.মিতে 45 মিলিয়ন কিউবিক মিটার।) প্রবাহিত।

(c) **ক্ষুদ্র অববাহিকা ঃ** এদের ধারণ এলাকা হল 2,000 বর্গ কি.মি-র কম। দেশের সব নদীর মোট পৃষ্ঠ প্রবাহ বা ধাবধারার 4 শতাংশ এই ধারণ অববাহিকা দিয়ে প্রবাহিত হয়। এই অববাহিকাগুলি হয় শুষ্ক এলাকায়, নয় উপকূল এলাকায় বিশেষ করে পশ্চিম উপকূলে (যেখানে সঙ্কীর্ণ উপকূলের জন্য নদীগুলি খুব ছোট) অবস্থিত।

আঞ্চলিক বন্টনের ভিত্তিতে ভারতের জননির্গম প্রণালীকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়। যথা (1) **উত্তর ভারতের নদনদী** এবং (2) **দক্ষিণ ভারতের নদনদী**। প্রথমটির মধ্যে রয়েছে হিমালয় অঞ্চল, বৃহৎ সমভূমি এবং উপদ্বীপের উত্তরাংশ। এখানকার প্রধান নদীগুলি হল গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র, সিন্ধু ও রাজস্থান সমভূমির নদীগুলি। এই জল নিকাশী এলাকা বঙ্গোপসাগর, আরব সাগর এবং অন্তদেশীয় অববাহিকার দিকে মুখ করে আছে। দক্ষিণ ভারতের

জলনিকাশী এলাকা দাক্ষিণাত্যের উচ্চভূমি এবং নিকটবর্তী উপকূলীয় সমভূমির উপর ছড়িয়ে আছে। এখানকার নদনদীর মধ্যে আছে পূর্ববাহিনী কৃষ্ণা, গোদাবরী, কাবেরী, পেন্নার, ভাইগাই নদী এবং পশ্চিম বাহিনী নর্মদা, তাপ্তী। এরা হয় বঙ্গোপসাগরে নয় আরব সাগরে পড়েছে।

জটিল প্রাকৃতিক, এবং ভূতত্ত্বের বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে ভারতে কয়েক প্রকার জলনির্গম প্রণালী গড়ে উঠেছে। যেমন **পূর্ববর্তী** (সিন্ধু, ব্রহ্মপুত্র, শতদ্রু ইত্যাদি)। **অধ্যারোপ** (দামোদর সুবর্ণরেখা, চম্বল, বানাস ইত্যাদি) **'বৃক্ষরূপী** (গাঙ্গেয় সমভূমিও দক্ষিণ ভারতের নদনদী), **আয়তকার** (কোশী ও তার উপনদী এবং বিন্ধ্য মালভূমির বেলেপাথর এলাকা), **কেন্দ্রবিমুখ** (অমরকণ্টক অঞ্চলে শোন, মহানদী ও নর্মদা নদীর) **জাফরীরূপী** (সিংভূমের পুরনো ভঙ্গিল এলাকা), **সমান্তরাল** (বিজয়ওয়াড়া এলাকা ও পশ্চিম উপকূল সমভূমি), **অন্তর্দেশীয় জল নিকাশী এলাকা** (রাজস্থানের মরুভূমি এলাকা) (Tiwari) 2004.

❑ হিমালয় জলনির্গম প্রণালী

হিমালয় নদী সংগঠনের মধ্যে রয়েছে সিন্ধু, গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্র অববাহিকা এলাকা। এখানকার অধিকাংশ নদী হল নিত্যবাহী এবং বরফগলা জল তথা মৌসুমী বৃষ্টির জলে পুষ্ট। এই নদীগুলি তাদের যৌবন অবস্থায় রয়েছে এবং পার্বত্য প্রবাহে গভীর খাত, V-আকৃতির উপত্যকা, খরস্রোত, জলপ্রপাত ইত্যাদি ক্ষয়জাত ভূমিরূপ গঠন করেছে। কিন্তু বৃহৎ সমভূমির উপর দিয়ে প্রবাহিত হবার সময় নদীগুলির প্রৌঢ় অবস্থা পরিলক্ষিত হয়। এরা সঞ্চয়জাত ভূমিরূপ যেমন সমতল উপত্যকা 'অশ্বক্ষুরাকৃতি হ্রদ, স্বাভাবিক বাঁধ, বন্যাগঠিত সমভূমি, বদ্বীপ ইত্যাদি সৃষ্টি করেছে। পার্বত্য অঞ্চলে নদীগুলি খুব আঁকাবাকা পথে প্রবাহিত হচ্ছে কিন্তু সমভূমিতে প্রচণ্ড আঁকাবাঁকা গতিতে প্রবাহিত হয়। এমন কি তার গতিপথও মাঝে মধ্যে পরিবর্তন করেছে। এজন্য নৌচলাচল ও জলসেচের ক্ষেত্রে নদীগুলি সমস্যা সৃষ্টি করে। নদীবর্তনের (যদিও তা নিত্যবাহী) ক্ষেত্রে ঋতুভিত্তিক হেরফের যথেষ্ট পরিলক্ষিত হয়। তাই বর্ষাকালে ভয়ঙ্কর বন্যা দেখা দেয়। কিন্তু শুষ্ক ঋতুতে নদীগুলিতে চড়া জেগে ওঠে। নদীগুলি খুব ক্ষয়কার্য করে চলেছে। এর প্রমাণ মেলে নদীগুলির প্রচণ্ড বালি ও পলি বহন ক্ষমতা দেখে। হিমালয়জাত নদীগুলির পর্যায়ক্রমে 'V' এবং 'U' আকৃতি দেখে মনে হয় যে হিমালয়ের উত্থান এখনও ঘটে চলেছে। (Tiwari, 2004) হিমালয়ের নদীগুলির আর একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল এই যে তারা পর্বতকে কেটে তাদের গতিপথ (দৈর্ঘ্য বরাবর longitudinal valleys) করে নিয়েছে। আর ও উল্লেখ করা যেতে পারে যে পর্বতগুলির চেয়ে নদীগুলি পুরাতন অর্থাৎ হিমালয়ের নদীগুলি পূর্ববর্তী নদীর উদাহরণ। নীচে হিমালয়ের নদীগুলির বিবর্তন নিয়ে আলোচনা করা হল।

❑ হিমালয় নদী ব্যবস্থার বিবর্তন (Evolution of the Himalayan river system) ঃ

হিমালয়ের নদীগোষ্ঠীর বিবর্তন ভূবিজ্ঞানীদের কাছে হেঁয়ালি রয়ে গেছে। তাই RL. Singh লিখেছেন "Some unwarranted features of the Himalanlayan rivers do require explantions" Spate র ভাষায় in particular the longitudinal courses of the Indus, Sutlej and Tsangpo on the Tibetan plateau, and the great gorges of these and other rivers cutting right across the great Himalayas in the vicinity of its highest peaks, challenged explanation; on the southern flanks there is a series of sharp Vs. pointing to the northwest in many of the rivers at or near their crossing of the Siwalik / alluvium boundary"। সোজা কথায় সিন্ধু, শতদ্রু এবং ব্রহ্মপুত্রে দৈর্ঘ্য বরাবর গতিপথ এবং তাদের ও অন্যান্য নদীর গভীর উপত্যকা যা বৃহত্তম শৃঙ্গগুলির নিচু সম্মুখভাগে অবস্থিত বৃহৎ হিমালয়শ্রেণীকে ছেদ করেছে তার ব্যাখ্যা দরকার। এছাড়া শিবালিক পলিসীমান্তের কাছে কতকগুলি পরপর তীক্ষ্ণ উপত্যকা রয়েছে

যা উত্তরপশ্চিম প্রবাহকে নির্দেশ করছে। ব্যাপারটি Pascoe এবং Pilgrim নামক দুই ইংরেজ ভূবিজ্ঞানীকে গভীরভাবে ভাবিয়েছিল এবং 1919 সালে তাঁরা এ বিষয়ে আলাদা আলাদা ভাবে প্রবন্ধ প্রকাশ করলেন। Pascoe-র Early History of the Indus, Brahmaputra and Ganges নামে Quarterly Journal of the Geological Society (vol. 75, 1919)-এ একটি এবং Pilgrim 'History of the Drainiage of Nothern India' নামে goumal of the Royal Asiatie Society of Bengal (New Series, vol. 15,1919)-তে আর একটি প্রবন্ধ লেখেন। এঁদের বক্তব্য হল শিবালিক পর্বতের গঠনের মূলে রয়েছে বালুকা, নুড়ি ও প্রস্তর খণ্ডের ব্যাপক গভীরতা। এর কারণ হিসেবে পলিশঙ্কুতে (Alluvial cone) ব্যাপকাকারে বাহিত পদার্থের সঞ্চয়কে দায়ী করা হয়েছে। এই পদার্থসমূহ হিমালয় থেকে ক্ষয়িত ও নদীদ্বারা বাহিত হয়ে হিমালয়ের পাদদেশ (foot hill)

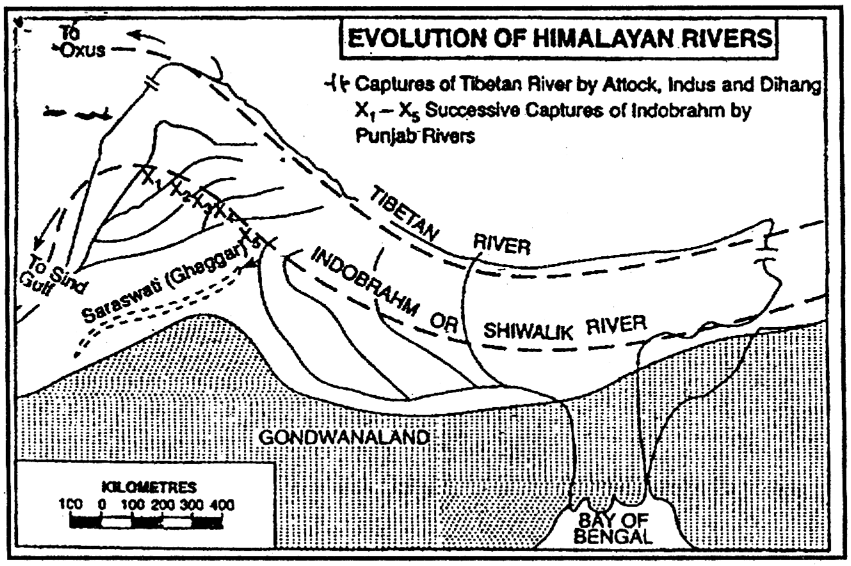

চিত্র 3.16 ঃ হিমালয়ের নদী বিবর্তন

অঞ্চলকে গঠন করেছে। এখন প্রশ্ন হল এত ব্যাপক পলিসঞ্চয় কিভাবে ঘটল? দুই ভূবিজ্ঞানীর মত হল বিলম্ব টার্সিয়ারী (late Tertiary) যুগে বর্তমান সিন্ধু-গঙ্গা সমভূমির উত্তরে শিবালিক পর্বত বরাবর পূর্বদিকে অরুণাচল হতে পশ্চিমে পাঞ্জাবের উত্তর পশ্চিম কোণ পর্যন্ত এক নদী প্রবাহিত ছিল যাকে প্যাসকো ইন্দোব্রহ্ম এবং পিলগ্রিম শিবালিক নদী নাম দিয়েছেন। শিবালিক পর্বতে পলল শঙ্কু ধরনের পলি সঞ্চয় ও পূর্ব থেকে পশ্চিমে এই সঞ্চয় ক্রমশ গভীরতা বৃদ্ধি থেকে এরূপ অনুমান করা হয়। খুব সম্ভবত এই শিবালিক বা ইন্দোব্রহ্ম তার নিম্নাংশে বর্তমান সিন্ধু নদীর কিছু পশ্চিম দিয়ে আরব সাগরে পড়ত। পিলগ্রিম-র মতে কাংড়া ও ভুটানে উর্দ্ধ শিবালিক (upper Siwalik) ছোট ছোট পাথরের টুকরো সঞ্চয়ের গভীরতা একদা ঐ নদীর উত্তর পশ্চিম প্রবাহকে নির্দেশ করছে।

বর্তমান নদী বিন্যাস এক সময় দাক্ষিণাত্য মালভূমির উত্তর প্রান্ত আরাবল্লী পর্বত থেকে শিলং মালভূমি (shillong plateau) পর্যন্ত একটানা বিস্তৃত ছিল। এই মালভূমির উত্তর প্রান্ত (northern flank) উত্তর ও দক্ষিণের নদীর জলবিভাজিকার কাজ করত। এরপর শিবালিক পর্বত সৃষ্টির সময় শিবালিক নদী ক্রমশ দক্ষিণদিকে সরে আসতে থাকে। পক্ষান্তরে এই মালভূমির এক অংশ অবনমিত হয়ে (subside) বঙ্গোপসাগরের সৃষ্টি করে। আবার শিলং মালভূমি ও রাজমহল পাহাড়ের মাঝের অংশে অবস্থিত দক্ষিণ বাহিনী এক নদী পূর্নযৌবন লাভ

করে (rejuvenation)। এই নদী (গঙ্গা) মস্তকদিকে ক্ষয় করতে করতে (headward erosion) উপরোক্ত জলবিভাজিকাকে অতিক্রম করে এবং এক সময় উক্ত জলবিভাজিকার উত্তর সীমায় পৌঁছে শিবালিক নদীকে বিচ্ছিন্ন (Dissected) ও গ্রাস করে (capture)। এই ভাবে আজকের গঙ্গা নদী জন্ম হয়।

উপরোক্ত নদীটি ছাড় ও Pascoe তিব্বতীয় নদী (Tibetian river) নামে আর ও একটি বড় নদীর কথা বলেছেন। এই নদীটি পূর্বে পেমাকই (pemakoi) হতে গিলগিট পর্যন্ত প্রবাহিত ছিল। এই প্রাচীন নদী ওক্সাসে (Oxus) প্রবাহিত হয়ে থাকতে পারে বা ফুটোপাস কিংবা কারনালি, শতদ্রু বা উচ্চ সিন্ধু (Upper Indus) নদ দ্বারা সমভূমিতে নামতে পারে। প্যাসকোর মতে এই নদীটি পরে ইরাবতী, চিন্দুইন, মেঘনা, কালী, গণ্ডক, শতদ্রু, ও সিন্ধু দ্বারা বিচ্ছিন্ন হয়েছে। (চিত্র 3.17)

সমালোচনা ঃ প্যাসকো ও পিলগ্রিমের এই মতবাদ নানা দিক দিয়ে সমালোচিত হয়েছে। নীচে সেগুলি নিয়ে আলোচনা করা হল।

সপক্ষে যুক্তি ঃ (১) বলা হয়ে থাকে বঙ্গোপসাগরের তলদেশ বসে যাওয়ার (Subsidence) দরুণ দক্ষিণবাহিনী নদীর পুনর্যৌবন লাভ হতে পারে। তাই ইভান (Evan) ও ওল্ডহ্যাম (Oldham) বলেছেন যে ভূ-আন্দোলনই পূর্বেকার নদীবিন্যাসের (Drainage system) পরিবর্তনের অধিক সম্ভাব্য কারণ বলে মনে হয়।

(২) আমরা জানি যে হিমালয়ের দক্ষিণ দিকে বেশি বৃষ্টিপাত হয়। তাই নদীগুলের ক্ষয় করার ক্ষমতা বেশী। তাই উচ্চ হিমালয়ের (Upper Himalaya) দক্ষিণের নদীগুলো দ্রুতগতিতে মস্তক ক্ষয় করে উত্তরের নদীগুলোকে গ্রাস করতে পারে বলে অনুমান করা হয়।

(৩) এটা আরো বলা হয়ে থাকে যে হিমালয় পর্বত সৃষ্টি হওয়ার আগে থেকেই নদীগুলি বিদ্যমান ছিল। কিন্তু ভূমি উত্থানের (upliftment) চেয়ে নদীর নিম্নক্ষয় বেশি ছিল। ফলে পাহাড়কে কেটে নদী তার প্রবাহপথ বজায় রাখতে পেরেছে।

বিপক্ষে যুক্তি ঃ (১) প্যাসকো শতদ্রুকে তিব্বতীয় নদীর এক অধিকৃত অংশ হিসেবে উল্লেখ করেছেন। ডেভিসের বক্তব্য হল হিমালয়ের নদীগুলির মধ্যে কনিষ্ঠতম হল শতদ্রু। এটি প্রাচীন গণ্ডোয়ানা চ্যুতিরেখা বরাবর প্রধান হিমালয় বসে গেলে শতদ্রুর সৃষ্টি হয়েছে।

(২) প্যাসকোর তিব্বতীয় নদী সম্পর্কে Annadale ও Terra উভয়েই সংশয় প্রকাশ করেছেন। Annadale-র মতে উপদ্বীপ ও অবশিষ্ট ভারত এই দুয়ের মধ্যে একটি লম্বাটে অবনমিত অঞ্চল (Depressed zone) বা প্রণালী (Strait) ছিল যা আস্তে আস্তে সরু হতে থাকে ও সব শেষে হিমালয় সৃষ্টির সময় এটির অবলুপ্তি ঘটে ও বর্তমান ভূমিরূপের (শিবালিক) উদ্ভব ঘটে। de Terra ইন্দোব্রহ্ম নদী সম্বন্ধে কঠোর সমালোচনা করেছেন। এ প্রসঙ্গে Spate লিখেছেন 'on the main question of the Indobrahm, de terra is decidely hostile He holds that the Siwalik deposits on local precipitates of an antecedent slope drainage 'successive fan and basin sediments.......their origin differs in no way from that of other foredee fillings (Alps, Rocky Mountains).' সোজা কথায়, de Terra-র মতে শিবালিক হল পূর্ববর্তী নদীর স্থানীয় সঞ্চয়, যুগপৎ পলল ব্যঞ্জন ও অববাহিকায় সঞ্চয়। এর উৎপত্তি রকি পর্বতের ন্যায় সম্মুখ খাত (fore deep) সঞ্চয় থেকেই হয়েছিল। যদিও তাঁর মতামত থেকে সম্পূর্ণভাবে সিদ্ধান্তে আসা যায় না, তবুও কৃষ্মাণ ও আয়েঙ্গার কয়েকটি প্রশ্ন তুলেছেন। প্যাসকো ও পিলগ্রিমের মতানুসারে রাজমহল-শিলং ফাঁক সাম্প্রতিককালের। কিন্তু কৃষ্মান ও আয়েঙ্গার বলেন এই ফাঁক বহু পুরনো যুগের।

এছাড়া উজান (upper) আসামে টিপাস্ বেলেপাথরের প্রকৃতি ও গভীরতা প্রমার করে যে উপরোক্ত শিবালিক

নদীর উৎসস্থল নদীমোহনার ন্যায় দেখতে। Spate লিখেছেন .... Krishnan and Aiyengar.. stress... the maturity of the gap between the Rajmahal hills and the Shillong plateau, completely incompatible with the recency demanded by the Pascoe-Pilgrim hypothesis, and make a most telling criticism by bringing forward the width, thickness and lithology of Tipam sandstones of Assam corresponding to the Siwaliks and indicating (on Pascoe-Pilgrim principles) estuarine conditions near the source of the supposed river"

আধুনিক মতবাদ ঃ এতদিন আমরা জানতাম যে হিমালয়ের নদীগুলি পূর্ববতী নদীর উদাহরণ। এই ধরনের নদী তার গতিপথে কোন বাধা পেলে ঐ গতিপথ থেকে সরে না গিয়ে সরাসরি বাধাকে অতিক্রম করে। কিন্তু হিমালয় পর্বতের পূর্ববর্তী নদীগুলি গাঠনিক সীমান্ত অঞ্চলে গঠনের (structure) সাতে তালে রেখে বরাবর গতিপথ পাল্টেছে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় যে উত্তর-পশ্চিম সিন্ট্যাক্রিস বাঁক বা পূর্বদিকে বালিপুঞ্জে (fold) দক্ষিণদিকে তীক্ষ্ণ (sharp) বাঁক নেওয়ার সাথে তাল মিলিয়ে ব্রহ্মপুত্র ও সিন্ধুনদী যথাক্রমে দক্ষিণ দিকে বাঁক নিয়েছে।

সিন্ধু (Indus) ঃ সিন্ধু নদ তিব্বতের মানস সরোবর হ্রদের 100 কি.মি. উত্তরে কতকগুলি প্রস্রবণ থেকে উৎপন্ন হয়ে দক্ষিণ-পূর্ব থেকে উত্তর-পশ্চিমে তিব্বতে 250 কি.মি. পথ অতিক্রম করে ভারতে (কাশ্মীর রাজ্যে) প্রবেশ করেছে। কাশ্মীরে সিন্ধু দক্ষিণ পূর্ব থেকে উত্তর পশ্চিমে 560 কি.মি. পথ গভীর উপত্যকার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে বুঞ্জির কাছে গভীর খাত কেটে (5,200 মিঃ গভীর) দক্ষিণে বেঁকে পুনরায় 90 কি.মি. পথ অতিক্রম করে পাকিস্থানে প্রবেশ করেছে এবং অবশেষে দক্ষিণ পশ্চিমে প্রবাহিত হয়ে আরব সাগরে পড়েছে। ভারতে সিন্ধু মোট দৈর্ঘ্য প্রায় 709 কি.মি. এবং এর অধিকাংশই পার্বত্য অঞ্চলের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে। ফলে এই উপত্যকার জনবসতি খুব কম এবং অর্থনৈতিক দিক দিয়ে এলাকা অনুন্নত।

সিন্ধুর মোট জল নিকাশী এলাকা হল, 178,440 বর্গ কি.মি.। এদের মধ্যে 453,250 বর্গ কি.মি. হিমালয় পর্বত ও পর্বতের পাদদেশে রয়েছে। বাকী অংশ ভারত ও পাকিস্থানের সিন্ধু সমভূমিতে অবস্থিত। দেশভাগের ফলে সিন্ধু অববাহিকার বেশীর ভাগ অংশ পাকিস্থানে পড়েছে। ভারতের মধ্যে রয়েছে মাত্র 27.26% অববাহিকা এলাকা।

সিন্ধুর বাঁ তীরের উপনদীগুলি বড়। নিম্নে সেগুলি সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা হল। **ঝিলাম** এর উৎপত্তিস্থল হল ভেরীনাগের কাছে একটি ঝর্ণা (4900 মিটার উচ্চতা)। উৎস থেকে উলার হ্রদ পর্যন্ত এটি উত্তরমুখী। এর নীচের দিকে নদীটি দক্ষিণমুখী হয়ে প্রবাহিত হয়েছে ও কাশ্মীর উপত্যকার দিকে প্রবাহিত হচ্ছে। বড়মুলার নীচে পীরপাঞ্জাল পর্বতশ্রেণীর মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হবার সময় নদীটি প্রাচীরের মত 200 মিটার গভীর গিরিখাত খনন করেছে। কাশ্মীরে উৎপত্তি হয়েছে এমন কিছু উপনদী যেমন লিডার, সিন্ধু ও পোহরু ঝিলাম এসে মিশেছে। মুজঃফরবাদে ঝিলাম চুলের কাঁটার মত দক্ষিণে বাঁক নিয়েছে এবং উত্তরতীরে কিষাগঙ্গার সাথে মিশেছে। এরপর নদীটি 170 কি.মি. দীর্ঘ ভারত-বাংলাদেশ সীমানা রচনা করেছে। সল্ট রেঞ্জের বহিঃস্থ স্পারকে কেটে নদীটি ঝিলাম শহরের কাছে সমভূমিতে নেমেছে। এরপর আরো 322 কি.মি. নীচে ত্রিমূর্তে ঝিলাম চন্দ্রভাগার সাথে মিশেছে।

চন্দ্রভাগা জাস্কর পর্বতশ্রেণীর কাছে বরালাচা গিরিপথের কাছে উৎপত্তি হয়েছে। 4900 মিটার উচ্চতায় গিরিপথের দু'ধারে দুটো ছোট নদী চন্দ্রা ও ভাগা হল চন্দ্রাভাগার উৎস। এই যুগ্ম নদী পীরপাঞ্জাল শ্রেণীর সমান্তরালে অবস্থিত পাঙ্গী উপত্যকার মধ্য দিয়ে উত্তর পশ্চিমে প্রবাহিত হচ্ছে এবং 1,838 মিটার উচ্চতায় চন্দ্রভাগা জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যে প্রবেশ করেছে, কিষ্টওয়ার কাছে ঝিলাম একটি গভীর গিরিখাত খনন করেছে।

কোন কোন স্থানে গিরিখাতটি 100 মিটার পর্যন্ত গভীর। এখানে ঝিলাম দু'পাশের খাড়া পর্বতের মধ্যে দিয়ে প্রায় 290 কি.মি. পথ অতিক্রম করেছে। এরপর কিছুদূর পর্যন্ত নদীটি দক্ষিণমুখী হয়ে প্রবাহিত হয়েছে। তারপর পশ্চিমে প্রবাহিত হয়ে জম্মু ও কাশ্মীরের আখনর (Akhnor)-র কাছে চন্দ্রভাগা সমভূমিতে নেমেছে। দক্ষিণ পশ্চিমে 644 কি.মি. প্রবাহিত হয়ে পাকিস্থানের পাঞ্জাব সমভূমিতে চন্দ্রভাগা শতদ্রুর সাথে মিশেছে। নদীটির মোট দৈর্ঘ্য 1,180 কি.মি.। এর অববাহিকা এলাকা হল 26,155 বর্গ কি.মি. (ভারত পাকিস্তান সীমানা পর্যন্ত)। মারালা (Marala)-তে এর বাৎসরিক জল প্রবাহ হল 29,000 মিলিয়ান কিউবিক মিটার। ইরাবতী হিমাচল প্রদেশে রোটাং গিরিপথের কাছে কুলু পাহাড় থেকে উৎপত্তি হয়েছে। উৎস থেকে প্রথমে উত্তর পশ্চিম দিকে প্রবাহিত হবার পর ছাম্বার কাছে ইরাবতী দক্ষিণ পশ্চিমে বাঁক নিয়েছে, এবং গভীর গিরিখাত খনন করেছে। মাধোপুরের কাছে ইরাবতী পাঞ্জাব সমভূমিতে প্রবেশ করেছে ও অমৃতসরের কাছে পাকিস্তানে প্রবেশ করেছে। উৎস থেকে 7,250 কি.মি. প্রবাহিত হবার পর পাকিস্থানের রংপুরের কাছে ইরাবতী চন্দ্রভাগায় মিশেছে।

বিতস্তা ঃ চন্দ্রভাগার উৎসের কাছেই বিতস্তার সৃষ্টি। পীরপাঞ্জাল পর্বতশ্রেণীর দক্ষিণ সীমানায় রোটাং গিরিপথের কাছে সমুদ্র পৃষ্ঠ থেকে 4,062 মিটার উচ্চতায় বিতস্তার জন্ম। উচ্চগতিতে নদীটির ঢাল খুব খাড়া (প্রতি কিমিতে 24 মিটার) এরূপ ঢালে প্রবাহিত হয়ে নদীটি ধৌলধর পর্বতশ্রেণীতে প্রায় 700 মিটার গভীর গিরিখাত খনন করে অতিক্রম করেছে। শিবালিক পাহাড়ে পৌঁছে বিতস্তা উত্তরদিকে খাড়া বাঁক নিয়েছে। তারপর পাহাড়টিকে বেষ্টন করে দক্ষিণ দিকে বেঁকেছে এবং পঙ্ (pong) এর কাছে সমভূমিতে নেমেছে। পুনরায় বিতস্তা দক্ষিণ পশ্চিমে প্রবাহিত হয়ে হারিক (Harike)-এর কাছে শতদ্রুর সাথে মিশেছে। শতদ্রু তুলনামূলকভাবে ছোট নদী, 460 কি.মি. লম্বা। এর পুরো প্রবাহপথ ভারতের মধ্যেই। এর মোট অববাহিকা এলাকা 20,303 বর্গ কিমি.।

শতদ্রু ঃ পশ্চিম তিব্বতে নর্মদা গিরিপথের কাছে মানস সরোবর-রাক্ষস হ্রদ থেকে শতদ্রুর উৎপত্তি। সিন্ধুর মত শিপকিলা গিরিপথ পর্যন্ত শতদ্রু উত্তর পশ্চিমবাহিনী। বৃহৎ হিমালয় ও অন্যান্য হিমালয় পর্বতশ্রেণীর মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হবার সময় নদীটি গভীর গিরিখাত খনন করেছে। তিব্বতের নারী খোরসান (Nari khorsan) প্রদেশে শতদ্রু অতুলনীয় ক্যানিয়ন সৃষ্টি করেছে, যা কলোরেডো নদীর গ্র্যাণ্ড ক্যানিয়ন নদীর সাথে তুলনীয়। শিপকি গিরিপথের কাছে নামশিয়াতে সিপ্টি এসে শতদ্রুর সাথে মিশেছে। রূপনগরের (রোপার) কাছে শতদ্রু সমভূমিতে নেমেছে ও পশ্চিমে বাঁক নিয়েছে। হারিকের (Harike) কাছে বিতস্তা এসে শতদ্রুতে মিলেছে। ফিরোজপুর থেকে ফাজিলকা পর্যন্ত ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে 120 কি.মি. দীর্ঘ সীমা নির্দেশ করে শতদ্রু বয়ে যাচ্ছে। শতদ্রু এরপর মিঠানকোট-এর কাছে সিন্ধুতে মিলেছে। 1,450 কি.মি। দৈর্ঘ্য পথের মধ্যে শতদ্রুর 1,050 কি.মি দৈর্ঘ্য পথের মধ্যে শতদ্রুর 1,050 কি.মি প্রবাহপথ ভারতের মধ্যে।

ভারত ও পাকিস্থানের মধ্যে Indus Water Treaty অনুসারে ভারত সিন্ধু নদীর 20 শতাংশ জলপ্রবাহ ব্যবহার করতে পারে।

গঙ্গা (Ganga) ঃ (প্রায় 2,510 কি.মি.) ভারতের সর্বপ্রধান নদী গঙ্গা হিন্দুদের নিকট অতি পবিত্র নদীরূপে পরিগণিত হয়ে থাকে। উত্তরাঞ্চলে হিমালয়ের (উত্তরাখণ্ড) উচ্চ পার্বত্য অংশে 6,600 মিঃ উচ্চতায় গোমুখ বা গঙ্গোত্রী নামক হিমবাহ হতে উৎপন্ন ভাগীরথী (যা গঙ্গা নামেও পরিচিত) এবং বদ্রীনাথের উত্তরে 7,800 মিঃ উচ্চতায় অবস্থিত অলকাপুরী হিমবাহ থেকে উৎপন্ন অলকানন্দা দেবপ্রয়াগে মিলিত হয়েছে। এই দুইটি নদীর মিলিত প্রবাহই পরে গঙ্গা নামে প্রবাহিত। দেবপ্রয়াগের পর গঙ্গা আরও 70 কি.মি. পথ দক্ষিণে প্রবাহিত হয়ে নাগটিব্বা ও শিবালিক পাহাড়কে ভেদ করে হরিদ্বারের কাছে সমভূমিতে নেমেছে। হরিদ্বারের পর গঙ্গা দক্ষিণ পূর্ব ও পূর্ববাহিনী হয়ে উত্তরপ্রদেশ ও বিহারের মধ্য দিয়া 1,200 কিমি. পথ অতিক্রম করে দক্ষিণমুখী হয়েছে এবং রাজমহল পাহাড়ের পূর্বদিকে দিয়ে প্রবাহিত হয়ে পশ্চিমবঙ্গে প্রবেশ করেছে। পশ্চিমবঙ্গে মুর্শিদাবাদ জেলার

সারণি

সিন্ধু জলনির্গম প্রণালী

নদীর নাম	উৎস (কি.মি.)	দৈর্ঘ্য (বর্গ কি.মি.)	জলনিকাশী এলাকা মিলি. কিউ. মিটার	গড় বাৎসরিক জলপ্রবাহ
সিন্ধু	মানস সরোবরের হ্রদের কাছে (32^0 উঃ অঃ, 81^0 পূঃ দ্রাঃ) 5180 মিটার উচ্চতায়	2,880 (709 কিমি ভারত)	1,178,440 (321,290 ভারতের মধ্যে)	1,10,450 পাকিস্তানের কোলাবাগে
ঝিলাম	ভেরীনাগ (4900 মি. উচ্চতা)	724	34,775 ভারত পাকিস্থান সীমান্ত পর্যন্ত	27,890 মঙ্গলাতে
চন্দ্রভাগা	বরালাচা গিরিপথ	1,180	26,155 ভারতের পাকিস্থান সীমা পর্যন্ত	29,000 মারলাতে
ইরাবতী	রোটাং গিরিপথের কাছে	725	14,442 (5,957 কি.মি. ভারতে)	8,000 মাধোপুরে
বিতস্তা	রোটাং গিরিপথের কাছে 4,062 মিটার উচ্চতায়	460	20,303	15,800 মাণ্ডিতে
শতদ্রু	মানসসরোবর-রাক্ষস হ্রদ 4,570 মিটার	1,450 (1050 কি.মি.)	25,900	16,600 রূপনগরে

ধুলিয়ানের কাছে গঙ্গা দুইটি অংশে বিভক্ত হয়েছে। একটি শাখা পদ্মা নামে দক্ষিণ পূর্বদিকে বাংলাদেশের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে অবশেষে মেঘনা নামে বঙ্গোপসাগরে এবং ফরাক্কার কাছে ধুলিয়ানে গঙ্গার অপর শাখা ভাগীরথী-হুগলী নামে পশ্চিমবঙ্গের মধ্য দিয়ে দক্ষিণে প্রবাহিত হয়েছে। ভাগীরথীর হুগলীর দক্ষিণ তীরে পশ্চিম হতে আগত কতকগুলি উপনদী এসে মিলিত হয়েছে। এদের মধ্যে ময়ূরাক্ষী অজয়, দামোদর, রূপনারায়ণ (শিলাই ও দ্বারকেশ্বরের মিলিত প্রবাহ), হলদি (কাঁসাই ও কেলেঘাই এর মিলিত প্রবাহ) বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ভাগীরথীর পূর্বতীরে বহু শাখানদী দক্ষিণে প্রবাহিত। এদের মধ্যে ভৈরব, জলঙ্গী, মাথাভাঙ্গা, চুর্ণী, গড়াই, প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। জলঙ্গী নবদ্বীপের কাছে ভাগীরথীর বামতীরে মিলিত হয়েছে। যমুনা—গঙ্গার উপনদীগুলির মধ্যে যমুনা সবচেয়ে বড়। যমুনোত্রী হিমবাহ থেকে এর উৎপত্তি। পার্বত্য অঞ্চলে অনেক ছোট ছোট নদী যেমন ঋষিগঙ্গা, উমা ও হনুমানগঙ্গা যমুনায় মিশেছে। পার্বত্য অঞ্চলে যমুনার প্রধান উপনদীর হল টনস। এটির উৎপত্তি হয়েছে 3,900 মিটার উচ্চতায় অবস্থিত বদরপুঞ্জ হিমবাহ থেকে। কলসীর কিছুটা দূরে টনস্ যমুনায় মিশেছে। যমুনার আর একটি উপনদী হল হিণ্ডেন। মথুরা পর্যন্ত যমুনার প্রবাহ দক্ষিণমুখী, এরপর এলাহাবাদ পর্যন্ত যমুনার প্রবাহ দক্ষিণপূর্বমুখী। আগ্রা ও এলাহাবাদের মধ্যে উপদ্বীপের থেকে উৎপন্ন অনেকগুলি উপনদী যমুনায় মিশেছে। যেমন চম্বল, সিন্ধু, বেতোয়া, ও কেন।

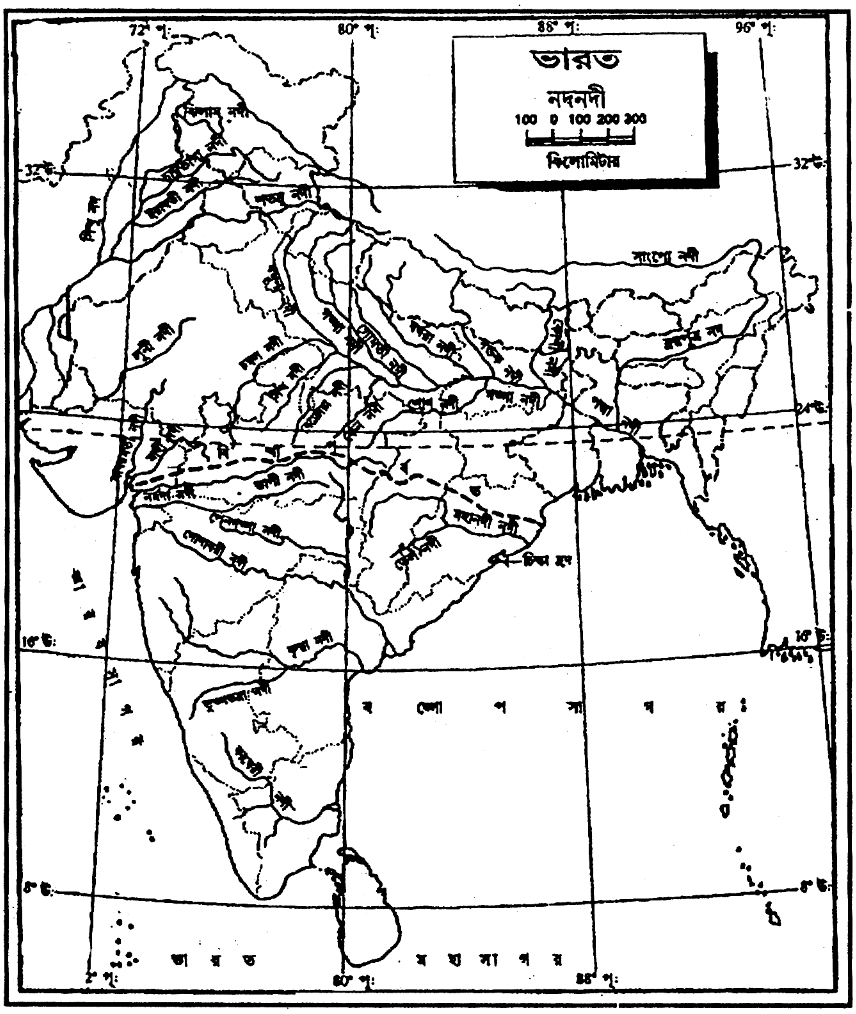

চিত্র 3.17 ঃ ভারতের নদনদী

বিন্ধ্য পর্বতশ্রেণীর জানাপাও উচ্চভূমি (700 মিটার) থেকে **চম্বলের** উৎপত্তি। মালব মালভূমির মধ্য দিয়ে উত্তর-পশ্চিমে প্রবাহিত হয়ে চৌরাসিগড়ের কাছে নদীটি গিরিখাত খনন করেছে। গিরিখাতটি প্রায় 96 কি.মি. লম্বা ও কোটা শহর পর্যন্ত বিস্তৃত। অল্প বৃষ্টিপাত ও নদী পাড় প্রচণ্ড ক্ষয়ের দরুন চম্বল উপত্যকা ব্যাডল্যাণ্ড ভূমিতে পরিণত হয়েছে। এটাওয়া জেলায় (উত্তরপ্রদেশ) চম্বল যমুনার সাথে মিশেছে। বানাস চম্বলের অন্যতম উপনদী। আরাবল্লী পর্বতশ্রেণীর দক্ষিণাংশে উৎপত্তি হয়ে বানাস সোয়াই মাধোপুরার কাছে চম্বলে মিশেছে। বিদিশা মালভূমি (543 মিটার উচ্চতায়) থেকে উৎপন্ন হয়ে দীর্ঘ 413 কিমি. পথ অতিক্রম করে **সিন্ধু** যমুনায় মিশেছে। ভোপাল জেলায় 470 মিটার উচ্চতায় **বেতোয়া** উৎপন্ন হয়ে হামিরপুরের কাছে যমুনায় মিশেছে। ধাসান বেতোয়ার এক উল্লেখযোগ্য উপনদী। মধ্য প্রদেশের বানাস পর্বতশ্রেণী থেকে উৎপন্ন হয়ে কেন (360 কি.মি) চিলার কাছে যমুনায় মিশেছে।

শোনের উৎপত্তিস্থল হল অমরকণ্টকের প্রস্রবন (৬০০ মিটার উচ্চতা)। দানাপুরের কাছে শোন (784 কি.মি) গঙ্গায় মিশেছে। শোনের উল্লেখযোগ্য উপনদীগুলি হল জোহিল্লা, গোপাট, রিহান্দা কানহার এবং নর্থ কেয়েল।

ছোটনাগপুর মালভূমির খামারপাত নামক স্থান থেকে উৎপত্তি হয়ে প্রস্ত উপত্যকার মধ্যে দিয়ে দামোদর প্রবাহিত হয়ে (541 কি.মি) পশ্চিমবঙ্গে প্রবেশ করেছে এবং বাঁকুড়া ও বর্ধমান জেলার মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হয়ে কলকাতার 48 কিমি. দক্ষিণে হুগলী নদীতে মিশেছে। এক সময় প্রলয়ঙ্করী বন্যার জল দামোদরকে বাংলার দুঃখ (Sorrow of Bengal) বলা হত। বর্তমানে বাঁধ দিয়ে নদীটিকে বহুমুখী কাজের উদ্দেশ্যে লাগানো হচ্ছে।

হিমালয় পর্বত থেকে উৎপন্ন গঙ্গার বামতীরের উল্লেখযোগ্য উপনদীগুলি হল রামগঙ্গা, গোমতী, ঘর্ঘরা, গণ্ডক, বুড়ী গণ্ডক, বাগমতী ও কোশী। রামগঙ্গার উৎপত্তি হয়েছে গাড়োয়াল জেলায় 3,110 মিটার উচ্চতায়। 596 কিমি. দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে কনৌজের কাছে রামগঙ্গা গঙ্গায় মিশেছে। খো (Khoh), গঙ্গান (gangan), আরিল (Aril), কোশী এবং দেওহা (গোরা) রামগঙ্গার প্রধান প্রধান উপনদী।

মানসসরোবর-এর (তিব্বত) দক্ষিণে গুরলা মাণ্ডহাটা চূড়ার কাছে **ঘর্ঘরার** উৎপত্তিস্থল। পশ্চিম নেপালের কারনাইলী থেকে এর উৎপত্তি। প্রথমে দক্ষিণপূর্বে, পরে দক্ষিণ-পশ্চিমের গ্রেট হিমালয় পর্বত কেটে নদীটি প্রবাহিত হচ্ছে। এখানে ঘর্ঘরার পর্যায়ক্রমে একাধিক গিরিসংকটের মধ্যে দিয়ে গতিপথ। এর প্রধান প্রধান উপনদী হল সর্দা, সরযূ, রাপ্তী। বিহারের ছাপরার কাছে ঘর্ঘরা গঙ্গায় মিশেছে।

হিমাবাহ অধ্যুষিত ট্রান্স্-হিমালয়ের বরফে ঢাকা হিমবাহ থেকে **কালী** নদীর উৎপত্তি। উচ্চগতিতে কয়েকটা উপনদী ঘর্ঘরায় এসে মিশেছে। পার্বত্য অঞ্চলে নদীটি নেপাল ও কুমায়ুন সীমানা সৃষ্টি করেছে। সমভূমিতে (তানাকপুরে) এই নদীর নাম চৌকা বা সর্দা।

সারণি

গঙ্গা জলনির্গম প্রণালী

নদীর নাম	উৎস (কি.মি.)	দৈর্ঘ্য (বর্গ কি.মি.)	জলনিকাশী এলাকা (বর্গ কি.মি.)	গড় বাৎসরিক জলপ্রবাহ মিলি. কিউ. মিটার
গঙ্গা	গঙ্গোত্রী হিমবাহ 7,010 মিটার	2,525	861,404	1,52,000 (এলাহাবাদ) 4,59,040 (পাটনা)
যমুনা	যমুনোত্রী হিমবাহ 6,330 মিটার	1,376	366,223	93,020 (এলাহাবাদ)
চম্বল	মোও (Mhow)	1,050	139,468	30,050 (যমুনার সঙ্গমস্থলে)
রামগঙ্গা	গাড়োয়াল জেলা 3110 মিটার	596	32,493	15,258
ঘর্ঘরা	গুলা মাণ্ডোটাচূড়া, মানস সরোবরের দক্ষিণে	1,080	127,950	94,400
গণ্ডক	তিব্বত-নেপাল সীমানা 7620 মিটার	425 ভারতের মধ্যে	46,300 (7620 ভারতের মধ্যে)	52,200
কোশী	সিকিম-নেপাল-তিব্বত হিমালয়	730 ভারতের মধ্যে	86,900 (21,500 ভারতের মধ্যে)	61,500

গণ্ডকের উৎপত্তিস্থল হল 7,620 মিটার উচ্চতায় তিব্বত-নেপাল সীমান্ত। নেপাল হিমালয়ে কালী গণ্ডক, মায়ানগাড়ী, বারী ও ত্রিশূলী প্রভৃতি উপনদী গণ্ডকের সাথে মিশেছে। ত্রিবেণীর কাছে ঘর্ঘরা সমভূমিতে নেমেছে ও বিহারের হাজীপুরের (বৈশাখী জেলা) কাছে গঙ্গায় মিশেছে।

বুড়ী গণ্ডকের উৎপত্তিস্থল হল বারত নেপাল সীমানার কাছে সামসের (Samesar) পাহাড়ের পশ্চিম ঢাল। মুঙ্গোর শহরের বিপরীতে বুড়ী গণ্ডক গঙ্গার সাথে মিলেছে।

তিনটি নদী যথা কোশী, অরুণ কোশী এবং তামুর **কোশী** একত্রিত হয়ে কোশী (নদী) নাম ধারণ করেছে। এদের উৎপত্তিস্থল হল বরফাচ্ছাদিত সিকিম, নেপাল ও তিব্বতের পর্ব্বতচূড়া। গৌরীশঙ্কর হিমবাহের জলে এরা পুষ্ট। কোশীর মোট জলপ্রবাহের যথাক্রমে 44, 37 এবং 19 শতাংশ উক্ত তিনটি নদী থেকে পাওয়া যায়। মহাভারত পর্বত শ্রেণীর উত্তরে উক্ত তিনটি নদী একত্রিত হয়ে কোশী নাম ধারণ করেছে। সমভূমিতে কোশী প্রচুর পলি সঞ্চয় করেছে ও নদীটি বিনুনিআকৃতি ধারণ করেছে। কোশী মাঝে মাঝেই তার গতিপথ পাল্টায়। গত 250 বছরে কোশী 112 কি.মি. পশ্চিমে সরে গেছে। এর ফলে এই নদীতে প্রায়ই বন্যা হয়। এজন্য কোশীকে **বিহারের দুঃখ** বলে। নেপালের হনুমাননগরের কাছে কোশীতে বাঁধ দেওয়া হয়েছে।

গোটা আসাম জুড়েই **ব্রহ্মপুত্রের** প্রবাহ পথ হল বিনুনী আকৃতির। ব্রহ্মপুত্র তার গোটা আসাম জুড়েই **ব্রহ্মপুত্রের** প্রবাহ পথ হল বিনুনী আকৃতির। ব্রহ্মপুত্র তার গতিপথ প্রায়ই পাল্টায়। গত কয়েক বছরে এটা খুব বেশী রকম লক্ষ্য করা গেছে। এইভাবে কামরূপ জেলার পলাশবাড়ী শহরকে সম্পূর্ণভাবে নিশ্চিহ্ন করেছে। ডিব্রুগড় ও গোয়ালপাড়া শহর ও আগামীদিনে ব্রহ্মপুত্রের গহ্বরে তলিয়ে যাবে বলে অনুমান করা হচ্ছে। ব্রহ্মপুত্র প্রচুর পলি বহন করে। নদীটি প্রচুর এঁকেবেঁকে প্রবাহিত হয়েছে। ডিব্রুগড়ের কাছে নদীটি প্রায় 16 কি.মি. চওড়া এবং অনেক দ্বীপ সৃষ্টি করেছে। এদের মধ্যে বাজুলি অন্যতম। ব্রহ্মপুত্র নদীতে যে প্রতি বছর বন্যা হয়, তাতে গড়ে 8 থেকে 10 লক্ষ বর্গকিমি এলাকা প্লাবিত হয়। এজন্য একে দুঃখের নদী (River of sorrow) বলা হয়। যা হোক, ব্রহ্মপুত্র ডিব্রুগড় পর্যন্ত (1384 কিমি.) নৌবহনযোগ্য। নদীটি সুন্দর অর্ন্তদেশীয় জলপথের উদাহরণ।

মহানদী ঃ (ব্যুৎপত্তিগত অর্থ বড় নদী) উপদ্বীপের এক গুরুত্বপূর্ণ নদী। রায়পুর (ছত্রিশগড়ে) জেলার শিহাওয়ার কাছে 442 মিটার উচ্চ দণ্ডকারণ্যের উত্তর পাদদেশ থেকে মহানদীর উৎপত্তি। উচ্চগতিতে নদীটি সড়া আকৃতির (Saucer-shaped) অববাহিকা ছত্রিশগড় সমভূমির উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। এই অববাহিকাটি উত্তর, পশ্চিম এবং দক্ষিণে পাহাড় দিয়ে ঘেরা, ফলে অনেক উপনদী এসে মহানদীতে মিশেছে। মহানদীর পূর্বতীরের প্রধান উপনদী হল ইব (251 কি.মি.), মান্দ (241 কিমি.), হাঁসদো (333 কি.মি) এবং শিওনাথ (393 কি.মি)। ডানতীরের উপনদীর মধ্যে রয়োছ ওঙ্গ (204 কি.মি) জঙ্ক/ 196 কি.মি/এবং টেল/295 কি.মি। নদীটি উৎস থেকে প্রথমে উত্তরপূর্ব ও পরে পূর্বদিকে প্রবাহিত হয়ে পূর্বঘাট পর্বতশ্রেণীতে প্রবেশ করেছে। এখানে নদীটি 23 কি.মি ব্যাপী ক্ষুদ্র ক্যানিয়নের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। নারাজ (Naraj)-র কাছে নদীটি ব-দ্বীপে প্রবেশ করেছে। মহানদীর ব-দ্বীপ 9500 বর্গ কি.মি. ব্যাপী বিস্তৃত। ব-দ্বীপটি 50 কি.মি চওড়া।

গোদাবরী উপদ্বীপের সবচেয়ে বড় নদী। পবিত্রতা, প্রাকৃতিক দৃশ্য এবং ব্যবহারগতদিক দিয়ে এর স্থান গঙ্গার পরই। একে দক্ষিণের গঙ্গা বা বৃদ্ধ গঙ্গা বলা হয়। গোদাবরীর জলকিশী হল 3,12,812 বর্গ কি.মি। যার মধ্যে 48.6% হল মহারাষ্ট্রে, 23.8% অন্ধ প্রদেশে, 5.5% উড়িষ্যা এবং 1.4% কর্ণাকে। নদীটির উৎস হল মহারাষ্ট্রের উত্তরে ট্রিম্বাক মালভূমি (আরব সাগর তীর থেকে 80 কি.মি দূরে)। উৎস থেকে নদীটি পূর্বদিকে প্রবাহিত হচ্ছে। ডানদিক ও বাঁদিক থেকে বহু উপনদী গোদাবরীতে এসে মিশেছে। ডানদিকের উপনদীর মধ্যে মঞ্জীরা (724 কি.মি) প্রধান। মধ্য মহারাষ্ট্রের জামখেদ পাহাড় থেকে উৎপন্ন হয়ে নিজাম সাগরের মধ্যে দিয়ে গিয়ে কোন্দলবাদীর কাছে মঞ্জীরা গোদাবরীতে মিশেছে। গোদাবরীর বাঁ দিকের উপনদীর মধ্যে গেনগঙ্গা, ওয়ার্ধা,

বেনগঙ্গা, ইন্দ্রাবতী এবং সাবারী প্রধান। রাজামুন্দ্রীর পরে গোদাবরী দুইটি প্রধান শাখায় ভাগ হয়েছে। পূর্বের অংশটির নাম গৌতম গোদাবরী এবং পশ্চিমের অংশের নাম বশিষ্ঠ গোদাবরী। এখানে গোদাবরী একটি বড় দ্বীপ গঠন করেছে।

উপদ্বীপের দ্বিতীয় বৃহত্তম নদী হল **কৃষ্ণা**। মহাবালেশ্বরের উত্তরে পশ্চিম ঘাটে গোদাবরীর উৎপত্তি। উৎস থেকে মোহনা পর্যন্ত নদীটি প্রায় 400 কি.মি দীর্ঘ। কৃষ্ণার ব-দ্বীপ এলাকা, প্রায় 4,600 বর্গ কি.মি। কৃষ্ণা ব-দ্বীপ মহানদীর ব-দ্বীপের সাথে মিশে গেছে।

সারণি

উপদ্বীপের প্রধান প্রধান নদী

নদীর নাম	উৎস (কি.মি.)	দৈর্ঘ্য (কি.মি.)	জলনিকাশী এলাকা (বর্গ কি.মি।)	গড় বাৎসরিক জলপ্রবাহ মিলি. কিউ. মিটার	উপনদী
মহানদী	দন্ডকারণ্য (ছত্রিশগড়ের রায়পুরে সিহওয়া)	857	141,400	67,000	ইব, খন্ড, হাঁসদা, শিওনাথ, ওঙ্গ, জঙ্ক, টেল
গোদাবরী	মহারাষ্ট্রের নাসিকের কাছে ত্রিম্বক মালভূমি	1465	312,812	105,000	মঞ্জীরা, পেনগঙ্গা, ওয়াধা, বেনগঙ্গা, ইন্দ্রাবতী সবরী, প্রাণহিতা
কৃষ্ণা	মহাবালেশ্বরের কাছে	1400	259,948	67,670	কয়না, ঘাটপ্রভা, মালপ্রভা, ভীমা, তুঙ্গা ভদ্রা, মুসী, মুনেরু
কাবেরী	পশ্চিমঘাটের টকাবেরী	800	87,900	20,950	হেরাঙ্গী, হেমাবতী, লোকপাবানী, শিমসমা, আর্কবতী, লক্ষণতীর্থ, কাবানী, সুবনাবতী, ভবানী, অমরাবতী
নর্মদা	অমরকণ্টক মালভূমি	1310	98,796	40,700	হিরণ, ওরসাঙ্গ, বর্ণা, কোলার, বুবনার, বাঞ্জার, শার শাখার, তাওয়া, কুণ্ডী
তাপী	মধ্যপ্রদেশের বেতুল জেলার মূলতাই	730	65,145	17,980	পূর্ণ, বেতুল, পাতকী, গঞ্জাল, ডাটরঞ্জ, বোকাড অমরাবতী

কৃষ্ণার জলনিকাশী এলাকা হল 2,58,948 বর্গ কি.মি। এদের মধ্যে প্রায় 43.8% কর্ণাটকে, 29.4% অন্ধ্রপ্রদেশে এবং 26.8% মহারাষ্ট্রে। কয়না, ঘাটপ্রভা, মালপ্রভা, ভীমা, তুঙ্গাভদ্রা, মুসী, এবং মুনেরু কৃষ্ণার উপনদী।

কাবেরী দক্ষিণ ভারতের সবচেয়ে পবিত্র নদী এবং এই জন্য একে দক্ষিণের গঙ্গা (Ganga of the South) বলা হয়। এর উৎসস্থল হল 1341 মিটার উচ্চতায় অবস্থিত তালাকাভেরী (পশ্চিমঘাটের ব্রহ্মগিরি

শৈলশ্রেণী)। উৎস থেকে মোহনা (আবর সাগর) পর্যন্ত এর দৈর্ঘ্য হল 800 কি.মি। এর জননিকাশী এলাকা হল 87,900 বর্গ কি.মি। যার মধ্যে 55.5% তামিলনাড়ুতে, 41.2% কর্ণাটকে এবং 33% কেরালায়। নদীটির একটি অনন্য বৈশিষ্ট্য হল এর উচ্চগতি দক্ষিণ পশ্চিম মৌসুমী বৃষ্টিপাতের জলে পুষ্ট (গ্রীষ্মকাল), কিন্তু নিম্নপ্রবাহ প্রত্যাগমনকারী উত্তর-পূর্ব মৌসুমী বৃষ্টির জলে পুষ্ট (শীতকাল)। এই জন্য নদীটি নিত্যবাহী। তাই সারা বছর জলপ্রবাহের পার্থক্য কমই হয়। এজন্য কাবেরী জলসেচ ও জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের পক্ষে খুব উপযোগী। উত্তর দিক থেকে হেরাঙ্গী, হেমবতী, সিমসা, লোকপাবণী, অর্কাবতী এবং দক্ষিণ দিক থেকে লক্ষণতীর্থ, ভবানী এবং অমরাবতী কাবেরীতে এসে মিশেছে।

কাবেরীর উচ্চপ্রবাহে অনেকগুলি জলপ্রপাত রয়েছে। এদের মধ্যে শিবসমুদ্রম উল্লেখযোগ্য। কাবেরীতে বাঁধ দিয়ে কৃষ্ণরাজসাগর নামে এক হ্রদ (কৃত্রিম) সৃষ্টি হয়েছে। এর সাথে শিবসমুদ্রমকে যোগ করা হয়েছে। তিরুচিরাপল্লীর পশ্চিমে কাবেরী দু'ভাগে ভাগ হয়ে গেছে। উত্তরের অংশের নাম কোলেরুণ দক্ষিণে কাবেরী। এরা পুনরায় 70 কিমি. দূরে (নিম্ন অববাহিকায়) মিলেছে। এদের মাঝে রয়েছে শ্রীরঙ্গম দ্বীপ। এরপর কোলেরুণ নদী উত্তর-পূর্ব দিকে প্রবাহিত হয়ে সমুদ্রে পড়েছে। আর কাবেরী নদীও দক্ষিণ দিকে গিয়ে সমুদ্রে মিশেছে।

❑ উপদ্বীপের পশ্চিমবাহিনী নদী ঃ

পূর্বের তুলনায় পশ্চিমের নদীর সংখ্যা কম, আয়তনে ও তারা ছোট। পশ্চিমবাহিনীর দুটি উল্লেখযোগ্য নদী হল নর্মদা ও তাপ্তী। বলা হয়ে থাকে এই নদী দুটি তাদের সৃষ্ট খাতে প্রবাহিত হচ্ছে না। এরা গ্রস্ত উপত্যকা (যা হিমালয় সৃষ্টির সময় হয়েছিল) দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। আরও লক্ষ্য করার মত যে নদীগুলো তাদের মোহনায় ব-দ্বীপ গড়ে তোলে নি। এর কারণ হল নদীগুলির গতিপথ শক্ত শিলায় গঠিত। তাদের শাখা নদী ও নেই। সররমতী, মাহী, লুনি পশ্চিমবাহিনী নদী। এছাড়া অসংখ্য ছোট ছোট নদী পশ্চিমঘাট পর্বত থেকে উৎপন্ন হয়ে আরব সাগরে মিলেছে। এরকম কিছু নদী হল কোঙ্কন উপকূলে বৈতরনী, উলহাস, আম্বা, সাবিত্রী ও বশিষ্ঠ। কর্ণাটক উপকূলে কালী নদী, গঙ্গাবতী, তাদ্রী সারাবতী, নেত্রবতী ও মালাবার উপকূলে বেপোর, ভরতপূজা, পেরিয়ার ও পাম্পা। এই সব নদীগুলো পশ্চিমঘাট পর্বতে গভীর খাত কেটে প্রবাহিত হবার সময় অনেক ক্ষেত্রেই জলপ্রপাত সৃষ্টি করেছে।

উপদ্বীপের অন্যান্য নদীগুলির মধ্যে সুবর্ণরেখা, ব্রাহ্মী, পেনেরু, পোনিয়ার এবং ভাইগাই উল্লেখযোগ্য। ঝাড়খরেডর রাঁচী মালভূমির উচ্চতায় 600 মিটার উচ্চতায় উৎপত্তি হয়ে সুবর্ণরেখা দক্ষিণ পূর্ব দিকে প্রবাহিত হয়ে পশ্চিমবঙ্গ ও উড়িষ্যার সীমান্ত নির্দেশ করেছে। নদীটি গঙ্গা ও মহানদী ব-দ্বীপের মধ্যবর্তী স্থানে বঙ্গোপসাগরে মিশেছে। এর মোট দৈর্ঘ্য 395 কিমি। এর জলনিকাশী এলাকা হল 19,300 বর্গ কিমি যার 71 শতাংশ পড়েছে ঝাড়খণ্ডে, 11 শতাংশ উড়িষ্যা এবং 18 শতাংশ পশ্চিমবঙ্গে। রাউরকেল্লার কাচে কোয়েল ও শঙ্খ নদী মিলে **ব্রাহ্মণী** নাম ধারণ করেছে। ব্রাহ্মণীর মোট দৈর্ঘ্য 800 কিমি. জলনিকাশী এলাকা হল 39,033 বর্গ কিমি, যার মধ্যে 40% রয়েছে ঝাড়খণ্ডে, বাকী উড়িষ্যা ও মধ্যপ্রদেশে। এর প্রধান উপনদী হল কুরা (Kura), সানখাদ ও টিকরা। ব্রাহ্মণীর মোহনা হল মহানদী। কর্ণাটকের নন্দী চূড়া থেকে উৎপত্তি হয়ে নদীটি উত্তরদিকে প্রবাহিত হয়ে অন্ধ্রপ্রদেশে প্রবেশ করেছে। এরপর পূর্বদিকে বেঁকে সরু খাতের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হয়ে বঙ্গোপসাগরে মিশেছে। এর মোট দৈর্ঘ্য 597 কিমি, জলনিকাশী এলাকা হল 55,213 বর্গ কিমি যার 88% শতাংশই রয়েছে কর্ণাটকে, বাকী 12% অন্ধ্রপ্রদেশে। এর প্রধান উপনদী হল জলমঙ্গলী, কুণ্ডেরু, সাইগিলেরু, চিত্রাবরী, পাপাগ্নি, ও ছেয়েরু (Chheyeru)। উপকূলের কাছেই ছোট ছোট নদী রয়েছে, যাদের মধ্যে ভাইগাই দীর্ঘতম, নদীটি অনিত্যবাহী।

উপদ্বীপের পশ্চিমবাহিনী নদীগুলির মধ্যে **নর্মদা** সবচেয়ে বড়। মধ্য প্রদেশের অমরকণ্টক থেকে উৎপন্ন হয়ে

উত্তরে বিন্ধ্য পর্বত ও দক্ষিণে সাতপুর পর্বতের মধ্যে দিয়ে পশ্চিমে প্রবাহিত হয়েছে। এর গতিপথ গ্রস্ত উপত্যকার মধ্যে দিয়ে। উৎস থেকে মোহনা পর্যন্ত (খাম্বাত উপসাগর) এর দৈর্ঘ্য হল 1,310 কিমি। এর মধ্যে মধ্য প্রদেশে এই নদীর দৈর্ঘ্য 1,078 কি.মি। জব্বলপুরের কাছে নর্মদার ধুয়াধারা জলপ্রপাত পৃথিবী বিখ্যাত। যেহেতু জলপ্রপাত মার্বেল শিলায় গঠিত, তাই একে মার্বেল পাথর (Marble Rocks) বলে। নর্মদা মান্দার ও দাদির কাছে তুটি ছোট জলপ্রপাত (12 মিটার) করে ও মহেশ্বরের কাছে সহস্রধারা জলপ্রপাত উচ্চতা (4 মিটার) সৃষ্টি করেছে। মোহনার কাছে নদীমুখ প্রায় 24 কিমি. চওড়া। মোহনা থেকে 112 কিমি পর্যন্ত নদীটি নৌবহনযোগ্য। নদীর দান তীরের উল্লেখযোগ্য উপনদী হল হিরণ, 188 কি.মি দৈর্ঘ্য। অন্যান্য উপনদীগুলি হল ওরসাৎ, বর্ণা ও কোলার। বাঁদিকের উপনদীগুলির মধ্যে বুরানার, (187 কি.মি) বাঞ্জার (284 কি.মি), শার (129 কি.মি), শাক্কার (161 কি.মি), তাওয়া (172 মি.মি) এবং কুন্তী (169 কি.মি) প্রধান।

তাপ্তী (তাপী) পশ্চিমবাহিনী নদীগুলির মধ্যে দ্বিতীয় বৃহত্তম। নর্মদার যমজ (Twin) নামে পরিচিত এই নদীর উৎপত্তি স্থল হল সাতপুরা পর্বতশ্রেণীর পবিত্র মূলতাই জলাশয় (730 মিটার উচ্চতা)। সাতপুরা ও গাওয়িলগড় পাহাড়ের মাঝে এক ফাঁক (বুরহানপুর দ্বার) রয়েছে। এর মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হয়ে তাপী সাতপুরার গ্রস্ত উপত্যকাকে অধিকার করেছে। প্রথমে নিমার অঞ্চল, পরে খান্দেশ সমভূমি, পশ্চিমঘাট ও সুরাটের সমভূমির উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে তাপী খাম্বাত উপসাগরে পড়েছে। তাপীর মোট দৈর্ঘ্য হল 730 কিমি, যার মধ্যে 48 কিমির জোয়ার ভাঁটা খেলে। নদীটি মোহনা থেকে মাত্র 32 কি.মি নৌবহন যোগ্য। নদীটির ডান দিকের উপনদীগুলির মধ্যে আছে পূর্ণ, বেতুল, পাটকী, গঞ্জল, ডাথরঞ্জ, বোকাড, বোকার, সুকী, মোর, কাঙ্কী, গুলি, অরুণাবতী, গোসাই ও ভালের। আর বাঁ দিকের উপনদীর মধ্যে আছে আমভোরা খুরসী, খান্দু, কাপরা, সিপ্রা, গর্জা, খোকরী, উতাত্তলী, মোনা, ভাগুর, গিরনা, বোরী, পানঝারা, বুরে এবং অমরাবতী।

সবর এবং হাতমতীর যুগ্ম নাম হল সবরামতী। আরাবল্লী পর্বতশ্রেণীর মেবার পাহাড় থেকে এর উৎপত্তি। এর মোট দৈর্ঘ্য 320 কি.মি, জলনিকাশী এলাকা হল 21,674 বর্গ কি.মি, যার 81% গুজরাতের মধ্যে এবং মাত্র 19% রাজস্থানের মধ্যে। ধরাইতে নদীটি গিরিখাতের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হয়ে খাম্বাত উপসাগরে পড়েছে। সরমতীর উল্লেখযোগ্য উপনদী হল হাতমতী, মেধী, ওয়াকুল, হার্ণভ, মেশবা ও ভতরক। এই নদী দিয়ে বছরে 3200 মিলিয়ান কিউবিক মিটার জল প্রবাহিত হয়। মাহীর উৎপত্তিস্থল হল বিন্ধ্য পর্বত (500 মিটার উচ্চতা), নদীটি 533 কি.মি দীর্ঘ পথ পরিক্রমার পর কাম্বাত উপসাগরে পড়েছে। মাহীর জলনিকাশী এলাকা হল প্রায় 34862 বর্গ কি.মি। এর উল্লেখযোগ্য উপনদীগুলি হল সোম, আনাস, ও পানাম। লুনী বা লবণ নদীর (সংস্কৃতে লাবণাভারী) ঐরূপ নামকরণের কারণ হল বাল্টোরার নীচের অংশে এই নদীর জল লোনা। নদীটির উৎস হল আজমীরের পশ্চিমে আরাবল্লীর পর্বতের 550 মিটার উচ্চতায়। ছোট নদী হলে ও লুনী থর মরুভূমির মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে। উচ্চ অংশে নদীটি সাগরমতী নামে পরিচিত। গোবিন্দগড়ের পর সরসূচী নামে একটি উপনদী লুনীতে মিশেছে এবং এখান থেকে নদীটি লুনী নামে পরিচিতি পেয়েছে। নদীটি 482 কি.মি পথ চলার পর কচ্ছের রান-এর জলাভূমিতে হারিয়ে গেছে। নদীটির ঢাল কম এবং বিস্তীর্ণ উপত্যকার মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে।

অন্তর্দেশীয় নদীব্যবস্থা (Inland Drainage system) আমাদের দেশে এধরনের নদী ব্যবস্থা প্রধানত শুষ্ক অঞ্চলে গড়ে উঠেছে। এরকমের নদী ক্ষণস্থায়ী। এরা কোন অন্তর্দেশীয় হ্রদে গিয়ে পড়ে বা সমুদ্রে পৌঁছাবার আগেই বালির পথ হারিয়ে ফেলে।

ভারতের রাজস্থান মরু অঞ্চলে অন্তর্দেশীয় জননির্গম ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে। জয়শলমীরের উত্তরে নিম্ন ভৃগু (low cliff) দ্বারা বেষ্টিত অনেকগুলি প্লায়া (Playas) জাতীয় হ্রদ গড়ে উঠেছে। শুধুমাত্র বর্ষাকালে চারপাশের

অঞ্চল থেকে বহু কেন্দ্রমুখী নদী (centripetal drainage) এই সব হ্রদে জল নিয়ে আসে। বছরের অন্য সময় এরা শুকিয়ে যায়। রাজস্থানের পূর্ব দিকে লুনী নদীর উত্তরে সেখাওয়াতি অঞ্চলে কিছু লবণ হ্রদকে ঘিরেও অন্তর্দেশীয় জানির্গম প্রণালী গড়ে উঠেছে। (মুখোপাধ্যায় ও দাস), 1999 এই সব হ্রদের মধ্যে সম্বর, দিদওয়ানা; কুচমানা ও দেগানা প্রধান।

রাজস্থান সমভূমির উত্তর প্রান্তে ও পাঞ্জাব সমভূমির দক্ষিণপূর্বে ঘর্ঘরার সমভূমিতে এক অর্ন্তদেশীয় জলনির্গম গড়ে উঠেছে। যমুনা নদীর পশ্চিমে যমুনা-শতদ্রুর অন্তবর্তী অঞ্চলের প্রধান নদী হল ঘর্ঘরা ও সরস্বতী। বেদ ও প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে সরস্বতীকে একে বড় নদী হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। ঘর্ঘরা নদী বর্তমানে অনিত্যবাহী ও উৎস (শিবালিক পর্বতের পশ্চাৎভাগ) থেকে 467 কিমি. দূরে হনুমানগড়ের কাছে শেষ হয়ে গেছে (মুখোপাধ্যায় ও দাস, 1999)। এছাড়া বিকানীর ও ভাওয়ালপুরে হাকরা নামে ঘর্ঘরা নদীর প্রাচীন শুষ্কখাত, (যা ২ থেকে ৪ কিমি চওড়া) লক্ষ্য করা গেছে। ভূতাত্ত্বিকদের মতে প্রাচীনকালে যমুনা নদী ও রূপারের উর্ধ্বে শতদ্রু নদী ব্যবস্থার জল ঘর্ঘরা নদীপথে প্রবাহিত হত। কিন্তু সুদূর অতীতে গঙ্গা নদী যমুনা নদীকে ও নিম্ন শতদ্রু উর্ধ্ব শতদ্রুকে গ্রাস করে। ফলে এই নদীটি শুকিয়ে গেছে।

লাডাক মালভূমি অঞ্চলেও এক পর্যঙ্কে (Basin) এই অন্তর্দেশীয় নদীব্যবস্থা দেখা যায়। এই অঞ্চলে অনেকগুলি লবণ হ্রদ রয়েছে ও তাদের কেন্দ্র করে অন্তর্দেশীয় কেন্দ্রমুখী নদী নির্গম ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে (মুখোপাধ্যায় ও দাস, 1999)।

❑ উত্তর ভারত ও দক্ষিণ ভারতের নদনদীর সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য

উত্তর ভারত ও দক্ষিণ ভারতের নদীগুলির মধ্যে তুলনা করলে দেখা যায় যে উভয়ের মধ্যে সাদৃশ্যের চেয়ে বৈসাদৃশ্যই বেশী। এর কারণ হল নদীর জল পাওয়ার উৎস, যে ভূমিভাগের ওপর দিয়ে নদীগুলি প্রবাহিত হচ্ছে এবং ভূ গাঠনিক ইতিহাসের ওপর। নীচে উভয় অঞ্চলের নদনদীর একটি তুলনা দেওয়া হল।

সাদৃশ্য

উত্তর ভারতের নদী	দক্ষিণ ভারতের নদী
1. বিভিন্ন নদীতে বাঁধ দিয়ে বহুমুখী নদী পরিকল্পনা গ্রহণ করা হইয়াছে। 2. তীরবর্তী শহর ও শিল্পাঞ্চলের পানীয় জলের উৎস।	1. বিভিন্ন নদীতে বাঁধ দিয়ে অনুরূপ পরিকল্পনা গৃহীত হইয়াছে। 2. তীরবর্তী শহর ও শিল্পাঞ্চলে পানীয় জল সরবরাহ করা হয়ে থাকে।

বৈসাদৃশ্য

উত্তর ভারতের নদী	দক্ষিণ ভারতের নদী
1. অধিকাংশ নদ-নদী হিমবাহ থেকে উৎপন্ন। সেজন্য সারাবৎসর তুষারগলা জলে ও বৃষ্টির জলে এগুলি পুষ্ট থাকে।	1. হিমবাহ থেকে উৎপন্ন নয় বলে শুধুমাত্র বর্ষাকালে বৃষ্টির জলে পুষ্ট হয়। অন্য সময়ে জল বিশেষ থাকে না বা কম থাকে।
2. নদীর খাতগুলি চওড়া ও গভীর হয়; সারা বৎসরই জল থাকে বলে অধিকাংশ নদনদী নৌ-বহনযোগ্য।	2. বর্ষাকালে স্রোত খুব প্রবল হয় এবং নদী খাতগুলি গভীর ও অপ্রশস্ত, সারা বৎসর জল থাকে না বলে নৌ বহনযোগ্য নহে।

উত্তর ভারতের নদী	দক্ষিণ ভারতের নদী
3. নদ-নদীগুলি নবীন ও সমভূমির উপর দিয়ে প্রবাহিত বলে এরা প্রায়ই গতি পরিবর্তন করে।	3. নদ-নদীগুলি প্রাচীন ও মালভূমির উপর দিয় প্রবাহিত বলে গতি পরিবর্তন করে না।
4. নদনদীগুলি প্রশস্ত বলে স্রোতের বেগ কম থাকে। এজন্য নদ নদীগুলি সমতলভূমিতে জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের অনুকূল নহে।	4. নদ-নদীগুলি অপ্রশস্ত গভীর খাতের মধ্য দিয় খরবেগে প্রবাহিত হয় বলে জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের অনুকূল।
5. গতিপথের মধ্য ও নিম্ন অংশে নদীগুলি ধীরে বয়, উচ্চগতিতে নদীগুলি পার্বত্য পথে প্রবাহিত হয় বলে খুব খরস্রোতা।	5. গতি পথের প্রায় সবঅংশটুকুতে নদীগুলি খরস্রোতা
6. এখানকার নদীগুলির উচ্চ, মধ্য ও নিম্ন গতি সুস্পষ্ট।	6. উপরোক্ত তিনটি গতি সুপষ্ট নয়।
7. উপনদীর সংখ্যা প্রচুর।	7. উপনদীর সংখ্যা তুলনামূলকভাবে কম।
8. উচ্চ প্রবাহ ছাড়া নদী অববাহিকায় সৃষ্ট ভূমিরূপ বৈচিত্র্যপূর্ণ নয়।	8. অববাহিকা সৃষ্ট ভূমিরূপ বৈচিত্র্যপূর্ণ।
9. দীর্ঘ সমভূমি প্রবাহে নদীখাতের পরিবর্তন ঘটে থাকে, বিশেষ করে বর্ষার সময়।	9. কঠিন শিলাময় মালভূমিতে প্রবাহিত বলে নদীখাতের পরিবর্তন বিশেষ হয় না।
10. উৎস ও মোহনার মধ্যে উচ্চতার পার্থক্য বিশাল।	10. উৎস ও মোহনার মধ্যে উচ্চতার পার্থক্য অনেব কম।
11. নদীগুলির গতিপথ বহু ক্ষেত্রেই খুব দীর্ঘ।	11. নদীগুলির গতিপথ ততটা দীর্ঘ নয়।
12. নিম্নপ্রবাহে নদীগুলি দীর্ঘপথ প্রবাহিত হওয়ায় ব্যাপক উর্বর প্লাবন সমভূমির সৃষ্টি করেছে।	12. নিম্নপ্রবাহে অল্প দৈর্ঘ্যের জন্য প্লাবন সমভূমির বিস্তার কম।

❑ অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের উপর নদনদীর প্রভাব ঃ

ভারতবাসীদের অর্থনৈতিক জীবনযাত্রার উপর নদনদীর প্রভাব অপরিসীম। নদনদী ভারতের কৃষি বিকাশে সাহায্য করেছে। কৃষিজমি, সেচের জল, উর্বর মৃত্তিকা, সুলভ শ্রমিক, পরিবহন ও ব্যবসা বানিজ্য প্রভৃতি কৃষির উন্নতির অতি প্রয়োজনীয় উপাদান।

1. **জলসেচ ঃ** ভারতের জলসেচ পদ্ধতিগুলির মধ্যে খাল জলসেচ অত্যন্ত ব্যাপক ও জনপ্রিয়। জলসেচের কাজে ব্যবহৃত প্লাবন খাল ও নিত্যবহ খালগুলির জলের প্রধান উৎস হল নদী বাহিত জলরাশি। খাল জলসেচের গুরুত্বের কথা ভেবে বর্তমানে অনেক নদীতে বাঁধ দিয়ে খাল জলসেচের পদ্ধতিকে আরও প্রসারিত করা হচ্ছে। নদীর জল খালপথে অতি দূরবর্তী স্থানের শুষ্ক চাষের জমিতে নিয়ে আসা সম্ভব হচ্ছে। শতদ্রু বিপাশার জল খালপথে টেনে এনে ইন্দিরাগান্ধী খালের মাধ্যমে রাজস্থানের বৃষ্টিহীন মরুস্থলীতে জলসেচের কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে।

2. **কৃষিজমি ঃ** ভারতের প্রধান নদীগুলি তাদের অববাহিকা জুড়ে বিস্তীর্ণ কৃষিক্ষেত্র গড়ে তুলেছে। শতদ্রু সমভূমি, গঙ্গা সমভূমি ও ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা জুড়ে যথাক্রমে শতদ্রু, গঙ্গা ও নদী সংস্থান তিনটি উত্তরভারতে

একবিশাল কৃষিভূমি সৃষ্টি করেছে। দক্ষিণ ভারতের মালভূমি অঞ্চলেও অনুরূপভাবে নর্মদা, তাপ্তী, মহানদী, গোদাবরী, কৃষ্ণা, কাবেরী নদীসংস্থানগুলি অপেক্ষাকৃত কম উর্বর মৃত্তিকায় অনেক কৃষিজমি সৃষ্টি করেছে। একইভাবে পাহাড় ও পার্বত্য অঞ্চলেও নদী কৃষিভূমি গঠন করেছে। উদাহরণস্বরূপ পশ্চিম হিমালয়ের ঝিলামনদী তীরবর্তী শ্রীনগর উপত্যকা এবং পূর্বাচলের মনিপুর নদী উপত্যকা কৃষিসমৃদ্ধ অঞ্চল।

3. **উর্বর মৃত্তিকা ঃ** নদী তার প্রবাহপথের উভয় তীরের বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে প্লাবনভূমি রচনা করে যা উর্বর পলিমাটিতে সমৃদ্ধ। ঐ মাটির জলধারন ক্ষমতাও বেশি। ফলে নদী উপত্যকাগুলিতে কৃষিকাজের একান্ত প্রয়োজনীয় উর্বর মৃত্তিকা নদ নদীর অন্যতম দান। শতদ্রু, গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্র তাদের প্রত্যেকের অববাহিকায় যথাক্রমে উর্বর পলিমাটি সমৃদ্ধ শতদ্রু সমভূমি, গঙ্গা সমভূমি ও ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা গঠন করেছে। এরা ভারতের আদর্শ কৃষিমৃত্তিকা অঞ্চল। দাক্ষিণাত্যের লাভা অঞ্চলে কৃষ্ণা, গোদাবরী, তাপ্তী ও নর্মদা নদীগুলি তাদের অববাহিকায় উর্বর মৃত্তিকা (গাঢ় কৃষ্ণ বর্ণের মৃত্তিকা) সৃষ্টি করেছে। হিমালয়ের নদী উপত্যকাগুলিতেও উর্বর মৃত্তিকা দেখা যায়। ভারতের এই নদী গঠিত উর্বর মৃত্তিকা অঞ্চলে প্রচুর পরিমানে খাদ্যশস্য (যথা—চাল, গম প্রভৃতি), তৈলবীজ (যথা—সরিষা, রাই প্রভৃতি) বানিজ্যিক শস্য (যথা— পাট, তুলা, ইক্ষু প্রভৃতি) জন্মে।

4. **পানীয় জল ঃ** নদীর জলকে বিশুদ্ধ করে বড় বড় শহরে পানীয় জল হিসাবে সরবরাহ করা হয়।

5. **পরিবহন ঃ** ভারতের পরিবহন ব্যবস্থায় নদনদীর ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভারতে 1700 কিমি, নদীপথ দ্রব্য ও যাত্রী পরিবহনের জন্যে ব্যবহৃত হয়। নৌ পরিবহনের জন্য গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্র সুপরিচিত। গঙ্গা উপনদী যমুনা, চম্বল, বেতোয়া, শোন, গোমতী, ঘর্ঘরা, গণ্ডক, কোশী প্রভৃতিতে নৌ চলাচল করে। পশ্চিমবঙ্গের নদনদীগুলির মধ্যে গঙ্গা, ভাগীরথী, হুগলী, দ্বারকেশ্বর, রূপনারায়ন, দামোদর, জলঙ্গী, ইছামতী, মাথাভাঙ্গা, ভৈরব, চুর্নী, মহানন্দা, তিস্তা, তোর্সা প্রভৃতি নদীপথের কোন কোন অংশে দ্রব্য ও যাত্রী পরিবহন করা হয়। গঙ্গা বদ্বীপের সুন্দরবন অঞ্চল, মহানদী ব-দ্বীপ অঞ্চলের নদীগুলিতে নৌ চলাচল করে। ব্যয় সংক্ষেপ নদীপথের প্রধান সুবিধা। নদীপথের সুবিধার কথা মনে রেখে বারত সরকার হলদিয়া থেকে কানপুর পর্যন্ত একটি জাতীয় জলপথ নির্মানের জন্য কর্মসূচী নিয়েছে। গঙ্গাকে জাতীয় নদী হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে।

6. **জলবিদ্যুৎ ঃ** বিদ্যুৎশক্তির ব্যাপক চাহিদা মেটাবার জন্য এবং স্বল্প ব্যয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন করবার জন্য ভারতের প্রধান প্রধান নদীতে বাঁধ দিয়ে কৃত্রিম জলপ্রপাত সৃষ্টি করে জলবিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র গড়ে তোলা হচ্ছে। শতদ্রু নদীর ভাক্রা নাঙ্গাল বাঁধের জলবিদ্যুৎ, ডি. ভি. সি-র বরাক নদীর তিলাইয়া বাঁধ ও তাম্রপর্নী নদীর পাপনাশম বাঁধ ও অন্যান্য নদীবাঁধ থেকে বর্তমানে ভারতে পর্যাপ্ত জলবিদ্যুৎ উৎপাদন করা সম্ভব হয়েছে। এরা একদিকে যেমন কয়লা, খনিজ তেল প্রভৃতি তাপবিদ্যুৎ উৎপাদনের উৎসগুলির খরচ সাশ্রয় করেছে, অপরদিকে অপেক্ষাকৃত কম দামে বিদ্যুৎ সরবরাহ করতে সাহায্য করেছে। তাপবিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্যও নদীপ্রবাহের প্রয়োজন হয়ে থাকে।

7. **শিল্পশহর, বন্দর ও ব্যবসা বানিজ্যকেন্দ্র ঃ** পানীয় জলের সরবরাহ, নদীর প্রবাহপথে আবর্জনা পরিষ্কারের সুবিধা, জল দিয়ে ধুয়ে যন্ত্রপাতি ও দ্রব্যাদি পরিষ্কার করার সুবিধা, ক্ষেত্রবিশেষে রাসায়নিক বিয়োজনের জন্য পর্যাপ্ত জলসরবরাহের সুবিধা, পরিবহনের সুবিধা প্রভৃতির জন্য নদীতীরবর্তী অঞ্চলে অনেক শিল্পশহর, বন্দর শহর ও ব্যবসাবানিজ্য কেন্দ্র গড়ে উঠেছে।

8. **বহুমুখী নদী পরিকল্পনা ঃ** বর্তমান কালে ভারতের অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য বিভিন্ন নদীর ওপর বহুমুখী নদী পরিকল্পনা গ্রহণ করে এই সকল নদীকে বিভিন্ন ভাবে অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের কাজে লাগানো হচ্ছে। এক একটি নদী পরিকল্পনাকে কেন্দ্র করে নতুন নতুন অর্থনৈতিক অঞ্চল গড়ে উঠেছে, যেমন দামোদর উপত্যকা।